রাষ্ট্রতত্ত্ব

প্রথম খণ্ড

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ.
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

প্রকাশক—শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অষ্টম সংস্করণ : জুন, ১৯৬৫

মুদ্রাকর—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর প্রিণ্টার্স
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করা এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এইজন্য অনেক লেখক এই শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রদর্শন' এই আখ্যা দিতে চাহেন।

রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় তত্ত্বকথা আলোচনা করাই রাষ্ট্রদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, তাৎপর্য ও রাষ্ট্রকর্তব্যের মূলনীতি ব্যাখ্যা করাই রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়বস্তু। কিন্তু এই নামকরণও আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের সম্যক্ পরিচায়ক নহে। রাষ্ট্রদর্শন বলিলে শুধু রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝায়। দার্শনিক দিক ছাড়াও রাষ্ট্রের একটি কার্যকর দিক আছে। যে শাসন-পদ্ধতিতে ও যে নীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাহা রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনপদ্ধতি রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়বস্তু নহে। ইহা একটি রাষ্ট্রবিশেষের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা মাত্র, যাহা শুধু ভারতেই প্রযোজ্য। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রটির বিষয়বস্তুকে সিজ্‌উইক, পোলক প্রভৃতি লেখকগণ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—তত্ত্বগত রাজনীতি ও ফলিত রাজনীতি। রাষ্ট্রদর্শন বলিলে শুধু তত্ত্বগত রাজনীতিকে বুঝায় ও ফলে আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের পরিধি সংকুচিত হয়, কারণ আমরা আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রে তত্ত্বগত রাজনীতি ও ফলিত রাজনীতি উভয়েরই আলোচনা করি। এইজন্য বর্তমান যুগে আমাদের এই শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয় ও এই নামই সকলে গ্রহণ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু শুধু তত্ত্বগত রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহা ফলিত রাজনীতি সম্বন্ধেও আলোচনা করে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ও সরকার কতকগুলি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায়। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রে আমরা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যপদ্ধতির আলোচনা করি, সেইরূপ অন্য দিকে আবার যে মূল সূত্রগুলির উপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত তাহারও আলোচনা করি। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য আলোচিত হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রদর্শনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র বলা যাইতে পারে। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রটির সর্বজনগ্রাহ্য নাম হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

অনেক লেখক বিশেষ করিয়া ফরাসী লেখকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একক শাস্ত্র না বলিয়া অনেকগুলি শাস্ত্রের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (Political Sciences)। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের বিশেষ একটি দিকের আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত রাষ্ট্রসম্বন্ধে আলোচনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় শাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় একমাত্র শাস্ত্র নহে। বর্তমান যুগে যদিও আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচ্য বিষয়বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে ইহাদের আলোচনা সম্ভবপর নয়। এই বিষয়গুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐগুলির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভবপর নয়। এই বিষয়গুলিকে পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত না করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই বিশেষ শাখা বলিয়া গণ্য করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Scope of Political Science)

মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী, তাই সমাজ গঠন করিয়া সংঘবদ্ধভাবে বাস করে। মানুষের এই সামাজিক জীবন বহুমুখী। এই বহুমুখী জীবনের একটা দিক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার রাজনৈতিক জীবনে। আর এই রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে যে অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া, সেই প্রতিষ্ঠানটি হইল 'রাষ্ট্র'। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া তাহার যে বৃহত্তর জীবন সংগঠন করিয়াছে, সেই রাষ্ট্রকেন্দ্রীভূত মানবজীবনের আলোচনা করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। মহামতি অ্যারিস্টট্‌ল্ বলিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব। বর্তমান যুগের মানুষসম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌লের উক্তি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য না হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের প্রভাব মানবজীবনের উপর যেরূপ সুদূরপ্রসারী, অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই মানবজীবনের উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই মানুষকে বুঝিতে হইলে, তাহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর সম্যক্ বিশ্লেষণ করিতে হইলে, রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট

মানুষকেই আমাদের জানিতে হইবে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত এই রাষ্ট্রের বিষয়ই আলোচিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে শুধু রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচিত হয় তাহা নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের সংগঠন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বরাষ্ট্রের সহিত পররাষ্ট্রের সম্বন্ধ, নাগরিক অধিকার ও শাসনযন্ত্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। সর্বোপরি আলোচিত হয় রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও রাষ্ট্র কর্তব্য। মানুষ তাহার সামাজিক জীবনকে সার্থক করিবার জন্য রাষ্ট্ররূপ যে বিশাল সৌধ কোন্ অজানা অতীত যুগ হইতে গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা কি পরিমাণে মানব-জীবনের সহায়ক হইয়াছে ও ভবিষ্যতে মহত্তর জীবনগঠনে কতদূর সহায়ক হইতে পারে—তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

বর্তমান রাষ্ট্রের নীতি, গঠনপ্রণালী ও শাসনপদ্ধতির সহিত সম্যক্ পরিচিত হইতে হইলে রাষ্ট্রের অতীত জীবনের আলোচনা করা প্রয়োজন। পুরাতন কাঠামোর সংস্কার সাধন করিয়া মানুষ তাহাকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়াছে। তাই বর্তমান রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইলে অতীত ও মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা দরকার। অতীত ও বর্তমান রাষ্ট্রের যথাযথ স্বরূপ জানিতে পারিলেই আমরা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিতে সমর্থ হইব। যুগযুগান্তর ধরিয়া রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ তাহার মুক্তির সন্ধান খুঁজিতেছে। আদর্শ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সেই মুক্তির সন্ধান মিলিতে পারে। তাই রাষ্ট্রের আদর্শ পরিণতি কি তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়বস্তু। ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্বন্ধবিচার ও আদর্শ সম্বন্ধস্থাপনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সার্থকতা (Utility of the Study of Political Science)

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা মানুষ কি প্রকারে লাভবান হইতে পারে—এই শাস্ত্রের আলোচনার উদ্দেশ্য কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষকে জানিতে হইলে, তাহার কার্যাবলীর সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সমাজবদ্ধ মানব-

জীবনের চরম পরিণতি হইল রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানবজীবনের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। রাষ্ট্র শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক নাগরিককে তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশে সুবিধা দান করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানুষ আত্মসচেতন হইয়া তাহার নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যসম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির মধ্যে সমাজচেতনা সঞ্চারিত করিয়া ব্যক্তিকে স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্য হইতে পরার্থপরতার ব্যাপকতর স্তরে উন্নীত করে। এই শাস্ত্রের আলোচনা মানুষকে নানা বিষয়ে চিন্তাশীল করিয়া তুলে এবং মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করিয়া কিভাবে উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মত গঠন করিতে শিক্ষা লাভ করে। পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলি দূর করিয়া সুনাগরিক হইতে পারিলে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে আর বিবাদের অবকাশ থাকে না। সুতরাং নিছক জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীতও এই শাস্ত্রের অনুশীলনেব একটা বাস্তব উপকারিতা অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই শাস্ত্রের আলোচনা ভারতীয় নাগরিকগণের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে নাগরিকগণের দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকগণের পক্ষে তাহাদের সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইতে হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত? (Is Political Science a Science?)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইতে পারে কি-না এ বিষয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে পূর্বে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাক্‌ল ও ফরাসী লেখক কোঁত প্রভৃতি এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এত ব্যাপক, জটিল ও

অনিশ্চয়তাপূর্ণ যে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকার্য সম্ভব নয়। এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর পরিধি এত বিস্তৃত ও এত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তু ইহার আলোচ্য বিষয় যে, রাসায়নিক ও জ্যোতির্বিদ্ যে পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া সেরূপ কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া এই শাস্ত্রের কোন একটি নির্দিষ্ট অনুশীলনপদ্ধতিও নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। বিরোধীপক্ষ আরও বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের মত বাস্তব নয়। এই শাস্ত্রে অনেক অবাস্তব বা কাল্পনিক বিষয়ের আলোচনা হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া কোন মতেই সমীচীন নয়।

বর্তমান যুগে এই বিরুদ্ধ মতবাদের অবসানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে কি-না সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান কি-না নির্ণয় করা সহজ হইবে। 'বিজ্ঞান' শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল বিশেষরূপ বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা বা গবেষণাদ্বারা আহরণ করা হয় এবং সেইজন্য এই জ্ঞানকে বিশেষ বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বলা হয়। এই সুসংবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়ম সংকলন করা যায় ও সেই সংকলিত সূত্রসমূহের প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করা হয়, কেননা তাহাদের বিষয়বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শৃঙ্খলিত জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং এইরূপে নির্ণিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্যোপযোগী সূত্রেও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া রাজনৈতিক বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মানুষের

রাজনৈতিক আচরণ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন হইলেও মানুষের আচরণে মূলত কতকগুলি সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষাকার্য করিতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর পক্ষে তাহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এই শ্রেণীবিভক্ত ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিয়া বাস্তব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োগ করাও সম্ভবপর। সমস্ত বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ সূত্র থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও রাজনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব ; সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত না করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

অধুনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইলেও অন্যান্য বিজ্ঞান-গুলির সহিত ইহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের কারণ হইল যে, শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাকার্যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের যে সুবিধা আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সে সুবিধা নাই। বৈজ্ঞানিক তাঁহার বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে পারেন, তাহার সঠিক পরিমাপ জানিয়া ও তাহাকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিকের গবেষণার সকল বস্তুই একই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকিলে একই রকমের ফলপ্রসূ হইবে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তাঁহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা অভ্রান্ত ও সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরূপ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। যে বিষয়-বস্তু লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলোচনা করেন, তাহা বহুল পরিমাণে বাহ্যিক পরি-বেশের উপর নির্ভর করে। আর এই বাহ্যিক পরিবেশ এত দ্রুত পরিবর্তনশীল যে, ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হউক না কেন তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। রাসায়নিক যে পদ্ধতিতে অম্লজান ও উদ্‌জান মিশ্রিত করিয়া জলে পরিণত করিতে পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঠিক সেই পদ্ধতিতে গণতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। রাসায়নিক দ্রব্যগুলির নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। বাহ্যিক কোন শক্তিই তাহাদের এই প্রতিক্রিয়া-সংঘটন প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাই তাহাদের সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা নির্ভুল ও সঠিক হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-

বিজ্ঞানী যদি মানবচরিত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াসম্বন্ধে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইতে পারে না। তাহার কারণ, মানবচরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নয়। অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে মানবচরিত্রেরও পরিবর্তন হয়। তবে সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও পরীক্ষামূলক গবেষণা সম্ভব। যখনই কোন রাষ্ট্র তাহার অনুসৃত নীতি বা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া নূতন নীতি বা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তখনই তাহাকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আশ্রয় লওয়া বলা যাইতে পারে। এই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়। বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে পরপর বহু শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া অবশেষে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। আদর্শ শাসনতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্যে সকল সভ্য দেশেই জনগণের উপর দিয়া এই পরীক্ষাকার্য চলিতেছে। কিন্তু পরীক্ষার ফল সব দেশে সমান হয় না। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এইজন্য লর্ড ব্রাইস্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। কোন সমাজবিজ্ঞানই প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির মত সম্পূর্ণ নয়। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চিন্তাধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পরিবর্তন চলিতেছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে স্থির সিদ্ধান্ত করা সহজসাধ্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ধনবিজ্ঞানের মতই একটি প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি (Methods of Political Science)

কি প্রণালীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একাধিক অনুসন্ধান-পদ্ধতি আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হয় নাই। তাহার কারণ তখন পর্যন্ত এই শাস্ত্র বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে নাই। বর্তমানে ইহা বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ও ইহার আলোচনা বর্তমানে

নানারূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হয় :—

(ক) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method)

এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত এই আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, পরীক্ষাকার্যে বৈজ্ঞানিকের যে সুবিধা আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সে সুবিধা নাই। বৈজ্ঞানিক অনেক কিছুর সঠিক পরিমাপ করিয়া নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে রাজনৈতিক ঘটনার সঠিক পরিমাপ করিয়া বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক, জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বলিয়া প্রাকৃত বিজ্ঞানসমূহের মত ইহার অনুসন্ধানকার্য সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ইহার অনুশীলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

(খ) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method)

এই পদ্ধতির সারমর্ম হইল যে, মানুষের স্বভাবের মূল প্রবণতাগুলি সর্বত্রই সমান। কিন্তু অবস্থাভেদে মানুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি ও কার্যাবলী ভিন্ন-রূপে প্রকাশ পায়। এই কথা স্মরণ রাখিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে হইবে। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রধান কার্য হইল বহু রাষ্ট্রের সহিত তাঁহার পরিচয় করা। প্রত্যেক রাষ্ট্র কর্তৃক ইহার অনুসৃত নীতি ও কার্যপ্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ করিবার শক্তি থাকা দরকার। রাষ্ট্রের শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়। অনেকগুলি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা দেখিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা সেগুলির পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নির্ভুল বিশ্লেষণ দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সন্ধান মিলিবে। সেই মূলসূত্রগুলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে রূপায়িত করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা সার্থক হইবে।

(গ) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)

এই পদ্ধতিকে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইতিহাসই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে পারে না। বর্তমান যুগে যে সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদ বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে সেগুলি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মানুষের রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই সমস্ত মতবাদের যথাযথ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সেই সময়কার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সে জ্ঞান-আহরণ ইতিহাস ব্যতিরেকে হয় না। রাজনৈতিক মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিরূপে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা লইয়া বিশ্লেষণ না করিলে তাহা জানা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ প্রগতির পথে, না অবনতির পথে—তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক মতে বিশ্লেষণ। কিন্তু এই বিশ্লেষণ-কার্য নিরপেক্ষভাবে করিতে হইবে। কোন কারণেই কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা মতবাদের প্রতি ব্যক্তিগত সহানুভূতি বা বিরুদ্ধ ভাবের বশবর্তী হইয়া সমালোচনা করা হইলে রাজনৈতিক সূত্রগুলি নির্ভুল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত ধারণার উর্ধ্বে উঠিয়া তাহাদের নিজস্ব গুণাগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে। তাহা হইলে পদ্ধতিটি সমধিক কার্যকর হইবে।

(ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)

অ্যারিস্টটল্, মন্টেস্কু, লর্ড ব্রাইস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে অতীত যুগের ও বর্তমানকালের রাষ্ট্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের তুলনামূলক বিচার করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, পাশাপাশি একসঙ্গে অনেকগুলি রাষ্ট্রের দোষ-গুণ নির্ণয় করিতে পারিলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের উৎকৃষ্টতর বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা সহজ

হয়। অ্যারিস্টটল্ তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করিবার নিমিত্ত অতীত যুগের বহু রাষ্ট্রের ও তাঁহার সমসাময়িক অনেকগুলি রাষ্ট্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সতর্কতার প্রয়োজন। যে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না, সেগুলিকে বর্জন করিয়া শুধু তুলনীয় বিষয়গুলির আলোচনা করিলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

(ঙ) আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method)

ফরাসী ও বিশেষ করিয়া জার্মান লেখকগণ এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র একটি আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাত্র এবং ইহার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা ও আইন বলবৎ করা। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে আইনের সীমাবহির্ভূত কোন সামাজিক প্রভাবের কার্যকারিতা এই পদ্ধতির সমর্থকগণ অস্বীকার করেন। রাষ্ট্র একটি বহু জটিল সমস্যাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। শুধু আইনজীবীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না।

(চ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method)

এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও গঠনের সহিত জীবদেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ বিবর্তনবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়। রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু শুধু বাহ্য সাদৃশ্যের দ্বারা রাজনৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না। অনেক সময় এই বাহ্য সাদৃশ্য ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

(ছ) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method)

এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি সমাজদেহ বলিয়া কল্পনা করা হয়। সমাজদেহ গঠিত হয় নাগরিকগণের সমবায়ে ও নাগরিকগণ এই সমাজদেহের অংশ। এই অংশগুলির গুণাগুণের উপর সম্পূর্ণ দেহের অর্থাৎ রাষ্ট্রের গুণাগুণ

নির্ভর করে। এই পদ্ধতিও জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির ন্যায় বিবর্তনবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করে।

(জ) মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological Method)

মনোবিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সূত্রের সাহায্যে অনেক সময় রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞান মানুষের কাজের পিছনে যে উদ্দেশ্য থাকে তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করে। সংঘবদ্ধভাবে মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহা মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। কি কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদল সৃষ্ট হয়, কি কারণে রাষ্ট্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধে, এগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

উপরি-উক্ত তিনটি পদ্ধতির কোনটিকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলে না। জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতিগুলি রাষ্ট্রকে শুধু একটি বিশেষ দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সুতরাং এগুলিকে পদ্ধতি না বলিয়া বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বলিলে অধিক সমীচীন হইবে।

(ঝ) দর্শনমূলক পদ্ধতি (Philosophical Method)

রুশো, মিল্, সিজ্উইক প্রভৃতি লেখকগণ এই পদ্ধতির সমর্থক। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে মানবপ্রকৃতি-সম্বন্ধে একটি মনঃকল্পিত ধারণা করা হয় এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কর্তব্য ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলি নীতি স্থিরীকৃত হয়। এই নির্ধারিত নীতিগুলির সহিত রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা চলে।

এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক সময় ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়া ইহার সমর্থকগণ অনেক সময় রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব সত্য উপেক্ষা করিয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতিগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ইহার কোন-একটি বিশেষ পদ্ধতি এককভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কোন পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সঠিক

অনুসন্ধান-পদ্ধতি নির্ণয় করিতে গেলে বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতির, যথা ঐতিহাসিক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, দর্শনমূলক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রভৃতির সমন্বয় সাধন করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানকার্য পরিচালিত করা উচিত। তবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির সন্ধান মিলিবে ও সেই সূত্রগুলির সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধবিচার
(Relation of Political Science to other Sciences)

বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, (ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Sciences) ও (২) মানবীয় বিজ্ঞান (Human or Social Sciences)। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগৎ সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য আহরণ করিয়াছে। যুক্তির ভিত্তিতে এই তথ্যগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া মানুষ নানা বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে যে তথ্যগুলির অধিকারী হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির ভিত্তিতেই পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। আর, জীবজগৎ ও মানবসমাজ সম্বন্ধে মানুষ যে তথ্যগুলি আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির সুসংবদ্ধ ও যুক্তিসম্মত প্রকাশ হইল মানবীয় বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত। উপরি-উক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্রগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও এই শাস্ত্রগুলি কোন-না-কোন দিক দিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান—সুতরাং এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অপরাপর মানবীয় বিজ্ঞান-গুলির সম্পর্কে বিচার করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Relation to Sociology)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ করাই হইল সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। মানুষকে লইয়া আলোচনা শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হয় না, আরও অনেক বিজ্ঞান আছে যেগুলি মানবজীবনের কোন-না-কোন দিক

লইয়া আলোচনা করে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল মানবীয় বিজ্ঞানই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই মানবীয় বিজ্ঞানগুলির কোন একটি পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানে মানুষের সামাজিক জীবনের সকল রকম অবস্থার আলোচনা হয়। এই বিজ্ঞানের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে হইলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মানবজাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রার প্রণালী—সব বিষয়ের আলোচনা হয় এই সমাজবিজ্ঞানে। এই কারণে সমাজবিজ্ঞানকে মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় সামাজিক মানুষের শুধু একটা দিক। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানবজীবনের যে দিকটা আলোচিত হয় তাহাই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপগুলি মাত্র আলোচিত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়া আরও অনেক কিছু আলোচিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইল নাগরিক জীবনের অধিকার ও কর্তব্য। কিন্তু এই অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সচেতন থাকে। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্বর্তী একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। রাষ্ট্রজন্মের বহু পূর্বেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহসম্বন্ধে যে-সমস্ত দেশগত আচার ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা রাষ্ট্রকর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর ও অধিক ব্যাপকভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান সমাজবিজ্ঞান হইতে আহরণ করিতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী না হইলে রাষ্ট্রসম্বন্ধে তাঁহার নির্ভুল ধারণা হইতে পারে না। বর্তমান যুগে যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এত ব্যাপক হইয়াছে যে, সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে আরও ইহার আলোচনা সম্ভবপর নয়, তথাপি একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষীকৃত শাখা। মানুষ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইবার বহু পূর্বেই সমাজ গঠন করিয়া সমাজসম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল, সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আলোচনা শুরু হয় সমাজজীবনের গোড়াপত্তন হইতে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয় রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইতে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Relation to History)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্যর জন্ সিলি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইতিহাস হইল রাজনীতির মূল এবং রাজনীতিই হইল ইতিহাসের পরিণতি।

"Politics without History has not root
History without Politics has no fruit".

একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইতিহাসে আলোচিত হয় মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ও মানব-সভ্যতার বহুমুখী কাহিনী। রাষ্ট্র মানবসমাজের একটি প্রতিষ্ঠান যাহা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের কাহিনী ইতিহাসপাঠে জানা যায়। মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের নিকট অতিমাত্রায় ঋণী। ইতিহাসে মানবসমাজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদিগকে ভবিষ্যতের আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত রাজনৈতিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতি হইতে পারে না। তাই বলিয়া আমরা যদি মনে করি যে, ইতিহাসে শুধু রাজনীতিরই আলোচনা হয়, তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। ইতিহাস শুধু রাজনীতিরই ইতিহাস নয়। মানবসভ্যতার সবদিকই আলোচিত হয় এই ইতিহাসে। তাহার সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, নৈতিক, কৃষ্টিগত সব কিছুরই কাহিনী ইতিহাসের বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাস হইতে শুধু সেই সকল তথ্য আহরণ করেন যে-তথ্যগুলি রাজনৈতিক জীবন-সংগঠনে সহায়তা করে। ধর্মের ইতিহাস বা চারুকলার ইতিহাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কোন প্রয়োজন হয় না।

ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্তু যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে, সেইরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তুই ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক অংশ আছে যেগুলির সহিত ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের প্রকৃতিনির্ণয় বা রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে এমন অনেক মতবাদ আছে যাহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ও দার্শনিক তত্ত্বের উপর

প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। গার্ণার বলেন যে, ঠিকভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে রাষ্ট্রনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা করা প্রয়োজন। আর ঠিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গেলে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান (Relation to Economics)

গ্রীক দার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক লেখক ধনবিজ্ঞানকে একটি পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া গণ্য করিতেন না। তাঁহাদের মতে ধনবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহাদের মতে ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থ আহরণ করা। ধনবিজ্ঞানের এইরূপ সংকীর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশের কারণও ছিল। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করাই রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করা হইত। এই কারণে রাষ্ট্রকে প্রভূত ক্ষমতাশালী করিয়া সমস্ত শক্তির আধার করিয়া গড়িয়া তোলা হইত। সেইজন্যই ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের আয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রকে অসীম শক্তিশালী করিয়া গঠন করা।

বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি অনেক ব্যাপক হইয়াছে। বর্তমানে ধনবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রের জন্য অর্থসংগ্রহ লইয়া আলোচনা করে না, জনসমষ্টির কল্যাণের জন্য অর্থের ব্যবহার কিভাবে হওয়া উচিত সমগ্রভাবে তাহার আলোচনা করে। তাই বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগসম্বন্ধে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম। মানুষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কিভাবে ধন উৎপাদন করে ও উৎপাদিত ধন বিনিময়ের দ্বারা অর্থে রূপান্তরিত করিয়া অর্থের মাধ্যমে নিজস্ব পারিশ্রমিক নির্ধারিত করিয়া কিভাবে তাহার অভাবমোচন করে ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা বর্তমানে এত বিরাট আকার ও জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে যে, এই শাস্ত্রের সম্যক্

অনুশীলনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র হইতে ইহার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই বর্তমানে ধনবিজ্ঞান একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র পৃথক্ তথাপি উভয় শাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয় শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক—সমাজের হিতসাধন করা। বেকার-সমস্যার দূরীকরণ, দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া দেশে যথেষ্ট ধনাগমের ব্যবস্থা করা এবং তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। ধনবিজ্ঞানের সম্পর্করহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন সুফল দিতে পারে না। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, এমন কি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বহুল পরিমাণে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অপরপক্ষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা—ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনব্যবস্থা বর্তমান যুগে রাষ্ট্রদ্বারা নির্ধারিত হয়। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত বহু জনহিতকর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্র হইল ধনোৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক। অধুনা বহু রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত করিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ধনবিজ্ঞানের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণ হইল যে, বর্তমান রাষ্ট্র জনগণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত; শুধু ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই বর্তমান রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ট্র বলা হয়। এই কল্যাণরাষ্ট্র জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত করে। এই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অবর্তমানে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ করিয়া ধনোৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটিত। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র যেরূপ মানুষের সামাজিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া দেয়, সেইরূপ আইনের দ্বারা রাষ্ট্র মানুষের পরস্পরের সহিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করিয়া সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সহায়তা করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের আলোচনার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবপর নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব (Relation to Anthropology)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান, সুতরাং নৃতত্ত্বের সহিত এই শাস্ত্রের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। অধুনা নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলে এরূপ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি, আদিম মানব সমাজের নানাবিধ সংগঠন ও জাতিতত্ত্বের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছে। জেংকস, মরগ্যান প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নৃতত্ত্ব হইতে বহু তথ্য আহরণ করিয়া সেই তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ দুইটি নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট-সম্পর্কের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইনের উৎপত্তি বিচার করিতে গেলেও দেখা যায় যে, প্রাচীন মানব সমাজে প্রচলিত নিয়ম-কানুন, প্রথা, আচার, বিধিনিষেধগুলির দ্বারা বর্তমান যুগের রাষ্ট্রস্বীকৃত আইনগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Relation to Ethics)

প্রাচীন যুগের সকল দেশের দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের শাখা বলিয়া গণ্য করিতেন। নীতিশাস্ত্রকেই তাঁহারা মূলশাস্ত্র বলিয়া মনে করিতেন ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূল সূত্রগুলি নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত। প্রাচীন ভারতেও রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, রাজার কর্তব্য প্রভৃতি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ তাঁহার 'রাজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই নৈতিক আদর্শের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রের আদর্শ এই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনৈতিক কার্যকলাপের একমাত্র মাপকাঠি ছিল নৈতিক আদর্শ এবং এই নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রাষ্ট্রের কার্য প্রধানতঃ পরিচালিত হইত।

ইতালীয় চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে সুবিধাবাদ আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে বলপ্রয়োগ মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি-মতবাদ প্রচারের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পুরাতন নৈতিক

আদর্শবাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। হব্‌স্, লক্, রুশো প্রভৃতি লেখকগণ এইরূপে নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিতে সহায়তা করিলেন। ফলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক্ শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পৃথক্ এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। নীতিশাস্ত্র মানুষের সমগ্র জীবনের—তাহার চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও বাহ্যিক আচরণ সব লইয়াই আলোচনা করে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আলোচনা করে শুধু মানুষের বাহ্যিক আচরণের। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এ কথা বলিলেও ভুল হইবে, কেন-না রাষ্ট্র-বিজ্ঞান মানুষের সমগ্র বহির্জীবন লইয়াই আলোচনা করিতে পারে না। শুধুমাত্র মানুষের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনাই হইল এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইতে সংকীর্ণতর। নীতিবিগর্হিত কার্য করিলে কোন দৈহিক শাস্তি নাই। বিবেকদংশন অথবা লোকনিন্দা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বে-আইনী অথবা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য করিলে দৈহিক শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ স্থিরীকৃত হয়, যেমন মিথ্যাভাষণ বা অকৃতজ্ঞতা সর্বসময়ে ও সর্বদেশে নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশগুলি, যেগুলিকে আইন বলা হয় সেগুলি রচিত হয় জনস্বার্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ জনগণের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া। যুদ্ধের সময় আকাশপথে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনাচ্ছাদিত আলো রাখা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু অনাচ্ছাদিত আলো রাখা নীতিশাস্ত্রবিরোধী নয়।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলিতে হইবে যে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করা যায় না। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ মানব করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। সমাজে

মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচিত নীতিশাস্ত্র তাহারই নির্দেশ দেয়। কোন্‌টি ন্যায় কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয়, তাহা নীতিশাস্ত্রে আলোচিত হয়। এক কথায় নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যে উহাদের বহিঃপ্রকাশের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া দেয়। রাষ্ট্রপ্রণীত আইনগুলির বৈধতা নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে স্থিরীকৃত হয়। যদি কোন আইনের প্রচলিত নীতিবাদের সহিত সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে সে আইন জনগণ মান্য করিতে চায় না। রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। এই সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে জনগণের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আইন প্রণয়ন করিয়া এবং নীতিবিগর্হিত আইন, প্রথা ও লোকাচার দূর করিয়া রাষ্ট্র জনগণের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করিতে সহায়তা করে। বস্তুত, নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নির্দেশের মধ্যে সব সময় সূক্ষ্ম পার্থক্য করা যায় না। বর্তমান জনমত অনুসারে যাহা নীতিশাস্ত্রসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে রাষ্ট্রনির্দেশের মাধ্যমে পরবর্তী কালে তাহা নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপে রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের দ্বারা জনমতের পরিবর্তন ঘটে ও মানুষের নৈতিক জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। এক শতাব্দী পূর্বে আমাদের ভারতবর্ষে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল ও তখন এই প্রথা নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই প্রথাকে আইনের দ্বারা রহিত করা হয়। কালক্রমে জনগণের নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ হইতে এই প্রথা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তাহার কারণ আমরা শুধু বে-আইনী বলিয়া যে এই প্রথা আর মানি না তাহা নয়। এই প্রথা একটি দুর্নীতি ও নীতিশাস্ত্রবিরোধী, রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এই নৈতিক জ্ঞান জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম ও প্রধান তাৎপর্য হইল ব্যক্তির ও সমষ্টির মঙ্গলসাধন। রাষ্ট্রের আদর্শ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং নীতিশাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব (Relation to Psychology)

মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন জীব হইলেও অনেক সময় সহজাত প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ ও উত্তেজনার দ্বারা কার্যে পরিচালিত হয়। মনস্তত্ত্বে মানুষের এই যুক্তিবহির্ভূত কার্যাবলীর আলোচনা করা হয়। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষের পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়। কিন্তু মানুষের রাজনৈতিক কার্যাবলী অনেক সময়েই যুক্তিহীন ভাবাবেগ বা উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত নহে। ম্যাকডুগাল, ল্যা বঃ প্রভৃতি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেশের শাসনব্যবস্থার উপর মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রভাবের গুরুত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত, একমাত্র সেই শাসনব্যবস্থাই স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হয়। অনেক সময় বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীতে যে গণ-আন্দোলন উত্থিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই দাবী প্রকৃত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা জনসাধারণের এক বিশেষ ভাবাবেগের অভিব্যক্তি মাত্র। প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা বা প্রচলিত আইনের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের মূলেও অনেক ক্ষেত্রে এই যুক্তিহীন গণ-বিক্ষোভ কার্যকর হইতে দেখা যায়। সুইস্ দেশে যে শাসনব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা অন্য দেশে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই—ইহার মূলেও রহিয়াছে বিভিন্ন জাতির গঠনপ্রকৃতি ও মনোভাবের পার্থক্য। ইংলণ্ডের বিচিত্র শাসনব্যবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় যে, এই শাসনব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে ইংরাজ জাতির স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত নহে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কিছু কিছু মনস্তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইলেও সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপই মনস্তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলশাস্ত্র (Relation to Geography)

ভূগোলশাস্ত্রের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছু সম্বন্ধ আছে। মানুষের চরিত্র,

চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালী তাহার আবাসভূমির ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। দেশের জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য বা অনটন, সমুদ্র বা পর্বতের নৈকট্য প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চরিত্রগঠনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এই ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী লেখক বোঁডা, মন্টেস্কু, রুশো প্রভৃতি মনস্বিগণ লোকচরিত্রের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাক্ল তাঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলিয়াছেন যে. মানুষ তাহার নিজের ও সামাজিক জীবনের কার্যাবলীতে স্ব-ইচ্ছা অপেক্ষা ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা অধিকতরভাবে চালিত হয়। বাক্লের মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র-পরিচালনাকার্যে ভৌগোলিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংলণ্ড যে তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সভ্যতা, শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল তাহার বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্র (Relation to Jurisprudence)

ব্যবহারশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রপ্রণীত ও রাষ্ট্রসমর্থিত আইনগুলির প্রকৃতি ও প্রয়োগবিধি বিশ্লেষণ করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যবহারশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় রাষ্ট্রের শাসনকার্য। এই শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্র কতকগুলি আইন বা বিধি প্রণয়ন করে, সেগুলির সাহায্যে রাষ্ট্র তাহার সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং রাষ্ট্র-কর্তৃক সৃষ্ট আইনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা চলে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্যবহারশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু সংকীর্ণতর ও এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন (Relation to International Law)

সামাজিক জীবনে প্রত্যেকটি মানুষ যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও একের সহিত অন্যের সম্পর্ক কতকগুলি আইন বা বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক কতকগুলি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত স্বরাষ্ট্রের সম্পর্ক যে-বিধানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই বিধানগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও জাতীয় আইনগুলির মত আন্তর্জাতিক আইনগুলি অতটা সুস্পষ্ট নয় এবং অতটা সহজে বলবৎ করা যায় না, তথাপি বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি এই আইন অনুসারে তাহাদের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালিত করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্রের বহির্মুখী কার্যকলাপ-সম্বন্ধে আলোচনা করা ও এই বহির্মুখী কার্যকলাপের একটা আদর্শ মান স্থির করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রের আদর্শ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয় করে না, আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও আলোচনা করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন, অপর দিকে সেইরূপ পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের একটা আদর্শ মান নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই মান স্থিরীকৃত হইলে সর্ব জাতির ও সকল দেশের মঙ্গল। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সহিত আন্তর্জাতিক আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; অপর পক্ষে রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী (New Approach to the Study of Political Science)

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। এই প্রাচীনপন্থিগণ মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক, তুলনামূলক, আরোহ (Inductive) ও অবরোহ (Deductive)

পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের আলোচনালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি প্রধানতঃ আদর্শগত ছিল, কারণ তাঁহাদের পর্যালোচনা শুধু কি প্রকারে এবং কেন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে ইহাতেই সীমাবদ্ধ নহে, কি হওয়া উচিত সে বিষয়েও তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এক শ্রেণীর লেখক গতানুগতিক আদর্শগত পদ্ধতি বর্জন করিয়া এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। এই লেখকগণ 'আচরণ পর্যবেক্ষক' শ্রেণী (Behaviouralists) বলিয়া পরিচিত। ইহাদের আলোচনা-পদ্ধতি আদর্শগত নয়। ইহাদের আলোচনা-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণমূলক (Emperical)। আচরণ পর্যবেক্ষকগণ কোন ঘটনার মূল্যায়ন না করিয়া শুধু কি প্রকারে এবং কেন ঘটনা ঘটে তাহাই আলোচনা করেন। সুতরাং আচরণ পর্যবেক্ষকগণ ধনবিজ্ঞানীদের অনুরূপ পদ্ধতিতে ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার বর্জন করিয়া নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা করেন।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নহে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন-প্রকৃতি অথবা ইহাদের আইনগত আদর্শ অপেক্ষা আচরণ পর্যবেক্ষকগণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্ষেত্রে আচরণ এবং কর্মতৎপরতার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। অর্থাৎ আচরণ পর্যবেক্ষকগণ রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সাহায্যে রাজনৈতিক ঘটনার পর্যালোচনা করেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীনপন্থী ও আধুনিক আচরণ পর্যবেক্ষণপন্থিগণের মধ্যে বিশেষ কোন মূলগত পার্থক্য নাই, শুধু বিষয়-বস্তু বিন্যাস প্রণালী, গুরুত্ব প্রদান ও পদ্ধতির পার্থক্য। প্রাচীনপন্থিগণ অনুসৃত পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি ছিল যে, তাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা ক্ষেত্রে মানব-চরিত্রের প্রভাবের উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। আচরণ পর্যবেক্ষণ-পন্থিগণ রাজনৈতিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উপর মানব-চরিত্রের প্রভাব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। অর্থাৎ আচরণ পর্যবেক্ষণপন্থিগণ প্রাকৃত বিজ্ঞান-সমূহের অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ

পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মতবাদ ও আদর্শ গঠন করিতে চাহেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিজ্ঞানীগণ প্রাকৃতিক পদার্থ ও শক্তিগুলিকে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া যে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানক্ষেত্রে অনুরূপ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহায্যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। ভোটদান ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করিয়া হয়ত কিছু পরিমাণ নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব, কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা বা ন্যায়পরতা সম্পর্কে আচরণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা কোন মতবাদ গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে, আচরণ পর্যবেক্ষণপন্থিগণ তাঁহাদের অনুসৃত পদ্ধতির সাহায্যে প্রাচীনপন্থিগণের অসম্পূর্ণতা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনপন্থিগণের অনুসৃত পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাজ্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন নাই।

সংক্ষিপ্তসার

নামকরণ—আমাদের আলোচ্য বিষয়ের নামকরণ লইয়া লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাজনীতি, রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই তিন নামে এই শাস্ত্র অভিহিত হয়। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও জটিলতা বিবেচনা করিয়া বর্তমান যুগের অধিকাংশ লেখক এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু—রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া সমাজবদ্ধ মানুষের যে দিকটা প্রকটিত হইয়াছে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মানবজীবনে রাষ্ট্রের প্রভাব অপরিসীম। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও তাৎপর্য এই শাস্ত্রে আলোচিত হয়। অতীত যুগের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বর্তমান রাষ্ট্রকে বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যৎ যুগের আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনার প্রয়াস পায়। রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা শুধু যে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় তাহা নয়, ইহা দ্বারা মানুষ বাস্তব জীবনেও লাভবান হয়। এই শাস্ত্র মানুষকে তাহার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আত্মসচেতন করে। এতদ্ব্যতীত মানুষের মধ্যে সমাজ চেতনা

বৃদ্ধি করিয়া মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মান স্থিরপূর্বক উন্নত জীবনযাপনে সহায়তা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত ?—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, অনিশ্চয়তা ও ইহার অনুসন্ধান-পদ্ধতির বৈচিত্র্যের জন্য এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে অনেকে আপত্তি করেন ; কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই শাস্ত্রের অনুশীলন সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ও কার্যতঃ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই ইহার অনুশীলনকার্য পরিচালিত হয়। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত এই শাস্ত্র সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও ইহা একটি অসম্পূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি—রাষ্ট্রবিজ্ঞান-অনুসন্ধানের নানারূপ পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোনটিই একক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্যক অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং দুই বা ততোধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে সুফল পাওয়া যায়। পদ্ধতিগুলি যথাক্রমে নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হয়ঃ ১। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ; ২। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ; ৩। ঐতিহাসিক পদ্ধতি ; ৪। তুলনামূলক পদ্ধতি ; ৫। দার্শনিক পদ্ধতি ইত্যাদি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক নির্ণয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান—রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষীকৃত শাখা বলা যাইতে পারে। সমাজবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানবজাতির সমগ্র জীবন, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় শুধু রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের রাজনৈতিক জীবন। রাষ্ট্র মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি সমাজবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা বহুলাংশে সংকীর্ণতর।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস—ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান সংগৃহীত হয়। মানুষের রাজনৈতিক চেতনা সুদূর অতীত হইতে সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে বর্তমান মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা ইতিহাসপাঠে জানা যায়। কিন্তু ইতিহাসকে নিছক রাজনৈতিক ঘটনার

কালনিরূপণ-বিদ্যা বলিলে ভুল হইবে; ইতিহাসে মানবসভ্যতার সব দিকই আলোচিত হয়। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মূল সূত্রের সন্ধান পাইতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য আবশ্যক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান—মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বহুলাংশে রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হইল দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা। এই উন্নয়ন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতির উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে ধনবিজ্ঞানের সম্পর্কবিহীন রাজনীতি কোন সুফল দিতে পারে না। রাষ্ট্রের কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও কার্যকারিতা অনেকাংশে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—উভয় শাস্ত্রই মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচিত তাহার নির্দেশ দেয়। উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ নাগরিক হইতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অপেক্ষা ব্যাপকতর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু মানুষের সামাজিক জীবনের বাহ্যিক আচরণের মান স্থির করিয়া দেয়। নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যে উহাদের বহিঃপ্রকাশের মান স্থির করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব—মানুষ সব সময় যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না, অনেক সময় ভাবাবেগ দ্বারাও কার্যে পরিচালিত হয়। মানুষ তাহার কার্যাবলীর পশ্চাতে যে সব সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, মনস্তত্ত্ব সেই সব সহজাত প্রবৃত্তিগুলির বিষয় আলোচনা করে। মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অনেকক্ষেত্রে যুক্তিহীন উত্তেজনা ও ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং অনেক রাজনৈতিক ঘটনা মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলশাস্ত্র—রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে মানব-চরিত্রের উপর নির্ভর করে। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের উপর মানুষের প্রকৃতি গড়িয়া উঠে। তাই রাষ্ট্রপ্রকৃতিও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইন—ব্যবহারশাস্ত্র

ও আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষীকৃত শাখা মাত্র। ব্যবহারশাস্ত্রে রাষ্ট্র-প্রণীত আইনের আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি ও সমাজ

(Individual and Society)

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক—Relaton between Individual and Society.

ব্যক্তিকে লইয়াই সমষ্টি এবং সমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব। সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় না। পিতা-মাতার স্নেহ, আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাসা পাইবার এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মানুষ সমাজ গঠন করিয়া বাস করে। সমাজ একদিনে বা একজন লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও সভ্য হইয়া উঠিতেছে, সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে ততই বুঝিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের উপর সমাজের প্রভাব প্রসার লাভ করিতেছে। মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ নানাভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইল, মানুষ কেন স্বেচ্ছায় সমাজের এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইল ?

এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইল যে, মানুষ সমাজ ছাড়া বাস করিতে পারে না। সমাজের বাহিরে তাহার জীবন শুধু নিঃসঙ্গ ও দুঃসহ হয় না, সমাজের বাহিরে মানুষ ভাবের ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পায় না। মানুষের মধ্যে যে স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলি থাকে, সমাজের বাহিরে সেগুলির বিকাশ আদৌ সম্ভব নহে। সমাজে মানুষের কতকগুলি রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয়। এই রীতি-নীতিগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল এবং এইগুলির সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। সামাজিক পরিবেশে,

সামাজিক প্রভাবে মানুষের মন শুদ্ধ ও সৎপথগামী হয়—সমাজের বাহিরে সামাজিক প্রভাবের অবর্তমানে তাহার ভালমন্দ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন, যে-মানুষ সমাজে বাস করে না সে পূর্ণ মানুষ নহে। সে হয় অতি-মানব না হয় নিম্নস্তরের জীব।

তাহা হইলে কি সমাজ ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই? মানুষকে কি একেবারেই সমাজের দাসরূপে ভাবিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মানুষকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি মানুষ হইল সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষ যেমন সমাজ ছাড়িয়া বাস করিতে পারে না, সেইরূপ মানুষ ছাড়া সমাজের কোনো অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি এবং মানুষের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের উন্নতি হয় এবং মানুষের উন্নতি হইলেই সমাজ-ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। মানুষকে বাদ দিয়া সমাজ গঠিত হইতে পারে না এবং সমাজকে বাদ দিয়া মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। সুতরাং মানুষ ও সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

মানুষ বড় না সমাজ বড়, এ প্রশ্নের আজ আর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যখন সমাজ-চেতনা দুর্বল ছিল, তখন ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গলের পথ সুগম করা হইয়াছিল। তাই প্রাচীনকালে সামাজিক নির্দেশ ও সামাজিক বিধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়া অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হয়। এইরূপে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই ব্যক্তির উপর সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে মানুষের সমাজ-চেতনা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মানুষ যতই বুঝিতে পারিতেছে যে, সমষ্টির কল্যাণ না হইলে তাহার নিজের কল্যাণ স্থায়ী হইতে পারে না, মানুষ ততই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। সমাজের প্রতি মানুষের এই স্বেচ্ছাকৃত আনুগত্য একদিকে যেমন সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধগুলির কঠোরতা প্রশমিত করিয়াছে। কারণ, সমাজও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া, ব্যক্তির স্বাধীনতা লোপ করিয়া সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না।

যে সমাজ অহেতুক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে সমাজ স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা।

সমাজের অগ্রগতি –Growth of Society

সাধারণতঃ বলা হয় যে, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব অর্থে কি বুঝা যায় তাহার আলোচনা প্রয়োজন। বহু জনসমষ্টি সভ্যজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বাস করে। তাহারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ-জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সমাজ মানব-জীবনকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন লিখিত আইন-কানুনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার ও রীতি-নীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের জীবন বহুমুখী। বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ সমাজদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সঙ্ঘ ও নানা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সমাজের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ধর্মসংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিক-সঙ্ঘ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত। রাষ্ট্রও সমাজদেহের মধ্যে এইরূপ একটি সঙ্ঘ।

সুতরাং জনসমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং এই জনসমষ্টি সাধারণ স্বার্থে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিঃসঙ্গভাবে বাস করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। তাহার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে অপর মানুষের সঙ্গ কামনা করে। একদিকে এই সহজাত প্রবৃত্তির ও অন্যদিকে সমাজবদ্ধ জীবনের সুখ-সুবিধাগুলি, এই উভয়ে মিলিয়া মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজ সৃষ্টি করিয়া বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছে।

সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করি, তাহা গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। বর্তমান সমাজ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল।

মানুষ একাকী বাঁচিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের সাহায্য

প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ জীবন যে মানুষকে শুধু তাহার জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা দেয় তাহা নহে, মানুষ সংঘবদ্ধভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। সহযোগিতার সাহায্যেই মানুষের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং এই সহযোগিতাই হইল মানব-সমাজের মূলভিত্তি।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন যে, বাঁচিয়া থাকাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ভালভাবে বাঁচিয়া থাকাই হইল জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য (Life is not merely living but it is living well)। উন্নততর জীবন-যাপনের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এব মানুষের এই চিত্তবিকাশের ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, চারু ও কারুশিল্প এবং গীতবাদ্য প্রভৃতি জন্মলাভ করে। এইগুলি হইল সভ্য জীবনযাপনের অপরিহার্য উপাদান। মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়াই সমাজের সাহায্যে সে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে।

বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও বর্তমানে মানুষ আর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীকে নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধিও সুদূর-বিস্তৃত। এইজন্য আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে।

পরিবারই হইল সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন সংগঠন। সন্তান-সন্ততির জন্ম, লালন-পালন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুরুষের নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সমবায় গঠিত হয়, তাহাকে পরিবার বলা হয়। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ব্যতীতও পরিবারের মধ্যে সমগোত্রীয় আত্মীয় থাকিতে পারে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিই হইল পরিবারের মূল ভিত্তি এবং

এই কারণেই প্রত্যেক পরিবারের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ঐক্য দেখা যায়। মানব-সমাজের সর্বত্রই পারিবারিক এই ঐক্যের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী পুরুষের এই মিলন ব্যতীত পরিবার গঠিত বা স্থায়ী হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-পুরুষের এই মিলন নির্দিষ্ট বিবাহ-পদ্ধতি বা অন্য বিধি অনুযায়ী স্থির হয় এবং এই নির্ধারিত পদ্ধতি বা বিধির বলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপিত এবং সমর্থিত হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক পরিবারের পরিচয়সূচক একটি স্বতন্ত্র নাম থাকে এবং এই নামের দ্বারা সন্তান-সন্ততিগণ পরিচিত হয়।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিতে হয়, অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি প্রাথমিক অভাব পূরণের সামগ্রী আহরণ করিতে হয়। পরিবারের সকল ব্যক্তিকেই সমবেতভাবে এই অর্থনৈতিক কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সন্তান-সন্ততিগণের জন্ম ও লালন-পালনের জন্য যে সমুদয় সামগ্রী প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিতে হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক পরিবারের একটি আবাস গৃহ থাকে এবং আবাসস্থলকে কেন্দ্র করিয়া পরিবারের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের স্বতন্ত্র আবাসস্থলের পরিবর্তে যৌথ গৃহও দেখা যায়।

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত পরিবারের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, পরিবার হইল মানব-সমাজের আদি ও প্রাথমিক সংগঠন। মানুষ কোন দিন যে পরিবার ছাড়া জীবন যাপন করিত ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সর্বত্র ও সকল স্তরের সভ্যতায় পরিবারের অস্তিত্ব ও প্রভাব দেখা যায়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব-জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পারিবারিক প্রভাব কার্যকর হইতে দেখা যায়। সুতরাং পরিবার হইল মানব-ইতিহাসের একটি সার্বজনীন সংগঠন।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিবার গঠন করে নাই। মানব-জীবনের এক স্বাভাবিক ভাবাবেগই হইল পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি। একই পরিবারের লোকজন যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া

হইতেছে। পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা বর্তমান যুগে ক্ষীয়মাণ। স্ত্রী-জাতি আজ তাঁহাদের নানাপ্রকার সংঘ, সমিতির সাহায্যে তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর। বহুদেশে আজ স্ত্রীজাতি পুরুষের সমানাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়তঃ, বংশগত (Recial) ভিত্তিতেও গঠিত জনসমষ্টি অনেক সময় লোকসমাজ বলিয়া পরিচিত হয়, যথা আর্যসমাজ (the Aryan Community), য়্যাংলোস্যাকসন্ সমাজ (the Anglo-Saxon Community), শ্লাভ জাতি বা সমাজ (the Slav Community)। এই লোকসমাজগুলিরও চরিত্রগত, আচারগত, ঐতিহ্যগত কতিপয় সমতা এই জনসমষ্টির মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে সার্ভিয়া রাজ্যটি অষ্ট্রিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বৃহত্তর শ্লাভ রাষ্ট্র রুশিয়া সার্ভিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু জাতির ভিত্তিতে গঠিত লোকসমাজ যে সর্বকালে সমস্বার্থসম্পন্নহয়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

তৃতীয়তঃ, ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতেও জনসমষ্টিকে লোকসমাজ বলা হয়, যথা, ইহুদি সমাজ (the Jewish Community), মুসলমান সমাজ (the Muhammadan Community), হিন্দু সমাজ(the Hindu Community), ক্রীশ্চান সমাজ (the Christian Community)। ধর্মগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত লোকসমাজের কতিপয় আচারগত, ঐতিহ্যগত ও স্বার্থগত সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও এই লোকসমাজগুলি যে সর্ববিষয়ে ঐক্যবদ্ধ তাহা সত্য নহে। সমধর্মী হইলেও এক ইউরোপে প্রায় তিরিশটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠন দেখা যায় এবং এই সমধর্মী লোকসমাজগুলির মধ্যে কলহ-বিবাদও নিরন্তর ঘটে। মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও উপরি উক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। আধুনিককালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ধর্মগত ভিত্তিতে গঠিত লোকসমাজের দুর্বলতা সূচিত করে। অপর পক্ষে মধ্যযুগে জেরুজালেম লইয়া ক্রীশ্চান ও মুসলমান লোকসমাজ দুইটির মধ্যে যুদ্ধ, জার্মানী হইতে ইহুদি বিতাড়ন, ভারত-বিভাগ প্রভৃতি ধর্মগত ভিত্তিতে গঠিত লোকসমাজের শক্তির পরিচায়ক।

চতুর্থতঃ, ভাষা-ভিত্তিক লোকসমাজেরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতের বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল বাংলা ভাষা-ভাষী সমাজ। আচারগত, ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত এই লোকসমাজটি ইহার ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য ভারতের

অন্যান্য লোকসমাজ হইতে পৃথক। এই লোকসমাজের উদ্দেশ্য হইল মাতৃভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির সংরক্ষণ, উন্নতি ও প্রসার। নবগঠিত বাংলাদেশ প্রধানতঃ মুসলমান রাষ্ট্র হইলেও এই ভাষাগত ও কৃষ্টিগত ঐক্যের কারণে ভারতের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সহিত অধিকতর নিকট সম্পর্কযুক্ত।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, লোকসমাজ বা সম্প্রদায়গুলি বৃহৎতর সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গ এবং প্রত্যেকটি লোক-সমাজের কতিপয় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য থাকিলেও ইহারা বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার পরিপূরক মাত্র, প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। এদিক দিয়া দেখিলে এই বিভিন্ন লোকসমাজগুলিকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বৃহত্তর সমাজ হইল যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বা সাধারণ সরকার, আর বিভিন্ন লোকসমাজগুলি হইল স্থানীয় সরকার।

সংঘ বা সমিতি (Association)

সামাজিক মানুষের বহুমুখী জীবনের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য যখন জন সমষ্টি একত্রিত হইয়া নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখন এই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে একটি সংঘ বা সমিতি বলা হয়। প্রত্যেক সংঘ বা সমিতির উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ অর্থাৎ একটিমাত্র উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই সমিতিগুলির সৃষ্টি হয় এবং বৃহত্তর সমাজ মধ্যে ইহার অঙ্গ হিসাবে এই সংঘগুলি ইহাদের উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপর। এই সমিতিগুলি সামাজিক, শিক্ষাগত, কৃষ্টিগত, ধর্মগত অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থসংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তৎপর হয়। তাই সমাজ মধ্যে আমরা ধর্মীয় সংঘ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সমিতি, বণিকসভা, সমবায় সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি নানা জাতীয় সমিতি দেখিতে পাই। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকেও একটি সংঘ বলা যাইতে পারে। তবে ব্যাপকতা, উদ্দেশ্য ও ক্ষমতার দিক দিয়া রাষ্ট্র হইল অসীম, আর অন্যান্য সংঘগুলি হইল সসীম। সংঘগুলি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষা ভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসমষ্টি লইয়া গঠিত হইতে পারে। সমিতির প্রধান ঐক্য-বন্ধন হইল উদ্দেশ্য। একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জনসমষ্টি জাতি-ধর্ম-ভাষা-নিরপেক্ষভাবে একই সংঘের সদস্য হইতে পারে। ইহাই হইল সম্প্রদায়ের সহিত ইহার পার্থক্য।

কতকগুলি সংঘ প্রয়োজনের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মলাভ করে,

অপর পক্ষে অন্যগুলি রাষ্ট্রের অনুমোদনে জন্মলাভ করে। পরিবার (Family) হইল মানুষের আদিম সংঘ। ইহাকে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নাই বা ইহার অস্তিত্বের জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। সমাজ গঠনের প্রাথমিক ও অপরিহার্য উপাদানরূপে পরিবার প্রথা আত্মপ্রকাশ করে।

মানুষ শুধু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব নহে বা শুধু নাগরিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। মানুষের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, কৃষ্টিগত প্রভৃতি জীবন আছে। রাষ্ট্র সমাজের সর্বাত্মক সংঘ হইলেও মানবজীবনের এই বহুমুখী ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। তাই সমাজ মধ্যে এই বিভিন্ন জাতীয় সংঘের আবির্ভাব।

(সংঘ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

প্রতিষ্ঠান (Institution)

প্রতিষ্ঠান বলিতেও একটি উদ্দেশ্য-সাধক সংঘ বা সমিতি বুঝায় এবং জনসমষ্টি লইয়াই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠান শব্দটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা স্থির করা দুরূহ। কারণ পরিবারকে প্রতিষ্ঠান বলা হয়, শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকেও উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, অপর পক্ষে বিবাহপ্রথাকেও একটি প্রতিষ্ঠান (Institution) বলা হয়। কিন্তু যে অর্থে পরিবার ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত হয় অনুরূপ অর্থে বিবাহপ্রথাকে প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। কারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার বা শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পার্থক্য থাকিলেও এই উভয়ের একটা বাস্তব অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবাহপ্রথার এরূপ কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। এই প্রতিষ্ঠান মানুষের সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা-জড়িত বিতনের ফল। বিবাহপ্রথা কতকগুলি সামাজিক আচারপদ্ধতি ও নিয়ম লইয়া গঠিত এবং দেশভেদে ইহার বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোথায়ও বা এই বিবাহপ্রতিষ্ঠান প্রথাগত আচার ও নিয়মের স্তর উত্তীর্ণ হইয়া আইনের সমর্থন বলে স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে এই প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য হইল ইহা একটি পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠান।

সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তি ও সমাজ—ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ছাড়া মানুষ বাস করিতে পারে না, তাই সমাজের সৃষ্টি। সমাজ একদিনে সৃষ্টি

হয় নাই। পরিবারই হইল সমাজ সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর। বিভিন্ন পরিবারের সমাবেশে ও সহযোগিতায় যৌথ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বিরামহীন বিবর্তনের ফলে মানবসমাজ বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের চরিত্র চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করিয়া কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না—ব্যক্তি সমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। যে সমাজ ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনে অসমর্থ, সে সমাজের অস্তিত্ব সমর্থন করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সমাজ হইল মানুষের সর্ববৃহৎ ও সর্বাত্মক সংগঠন। কিন্তু মানুষের বহুমুখী জীবনের সকল চাহিদা সমাজ পূরণ করিতে পারে না—এই কারণে সমাজ মধ্যে ক্ষুদ্রতর বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংগঠনগুলি মানুষের আচার-আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত জীবনের চাহিদা পূরণ করে। তাই সমাজ মধ্যে আমরা বিভিন্ন সংঘ, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটি মানব-জীবনে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অভাব পূরণ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

রাষ্ট্রসংজ্ঞা (Definition of the State)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতথ্য আলোচিত হয়। সুতরাং প্রথমেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ইতালির চিন্তাবীর ম্যাকিয়াভেলী 'রাষ্ট্র' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস করিত। রাষ্ট্রের আয়তন নগরেই সীমাবদ্ধ থাকিত। গ্রীক ও রোমকগণ যথাক্রমে 'পোলিস্' ও 'সিভিটাস' এই দুইটি শব্দ দ্বারা রাষ্ট্রকে বুঝাইত। টিউটন যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্র' নামকরণ হইল। টিউটনেরাই সর্বপ্রথম 'স্ট্যাটাস্' কথাটি ব্যবহার করিল। বর্তমান যুগে 'রাষ্ট্র' শব্দটি অনবধানতাবশতঃ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় 'রাষ্ট্র' শব্দটি জাতি, সরকার, সমাজ, দেশ প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় আবার রাষ্ট্র শব্দটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকার বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অংশগুলিকে রাজ্য (State) বলা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাষ্ট্র' শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতীত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কয়েকটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে. এই সমস্ত লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির জন্মদাতা মহামতি অ্যারিস্টটল্ বলিয়াছেন যে, স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে যখন অনেকগুলি পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হয়, তখনই তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বলিতে লেখক মানবচরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। আর এই মানবজীবনের চরম নৈতিক উৎকর্ষ লাভ হয় রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে। সুতরাং অ্যারিস্টটল্ ও অতীত যুগের

অন্যান্য দার্শনিকের মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

জার্মান পণ্ডিত ব্লুনৎস্লি ও সিডেল্ রাষ্ট্রের অনুরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ব্লুনৎস্লির মতে, যখন একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সংঘবদ্ধ হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। সিডেল্ বলেন, যখন বহুসংখ্যক লোক পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ অধিকার করিয়া কোন উচ্চতর শক্তির অধীনে সম্মিলিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। উড্রো উইলসনের মতে, নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয় ("A state is a pople organised for law within a definite territory")।

অন্যান্য বহু লেখক তাঁহাদের নিজস্ব ভাষায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলির কোনটি ত্রুটিবিহীন নহে। অনেকের মতে ডঃ গার্ণার রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র অল্পবিস্তর বহুসংখ্যক জনসমষ্টি যাহারা স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে ও যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সরকার আছে, যে শাসনপ্রতিষ্ঠানের নির্দেশ ঐ স্থানের অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত।

("The state, as a concept of Political Science and Public law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a difinite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabi tants render habitual obedience.")

আধুনিককালের দুইজন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী—ল্যাস্কি ও ম্যাকাইভার রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ল্যাস্কি বলেন, "The modern state is a trritorial society divided into government and subjects claiming, within its allotted physical area, a supremacy over all other associations." (আধুনিক রাষ্ট্র হইল

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ সমাজ যে সমাজ হইল শাসক ও শাসিত লইয়া গঠিত এবং যাহা ইহার নিজস্ব নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর আধিপত্য দাবী করে)। অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি যদিও রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদ নীতির সমর্থক ছিলেন তথাপি তিনি রাষ্ট্রকে সার্বভৌমিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিতে চাহেন নাই।

ম্যাকাইভার বলেন, "The state is an assocition which, acting through law as promulgated by a government ondwed to this end by coercive Power, maintains, within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order." (রাষ্ট্র হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা আইন ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জবরদস্ত ক্ষমতার অধিকারী সরকার কর্তৃক ঘোষিত আইনের সাহায্যে কার্য করিয়া নির্ধারিত ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানবসমাজে সামাজিক শৃংখলার সার্বজনীন ও বাহ্যিক পরিবেশ অটুট রাখে)।

অধ্যাপক ল্যাস্কির ন্যায় ম্যাকাইভারও বহুত্ববাদের উগ্র সমর্থক। তিনি রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবে।

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of the State)

উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলি, বিশেষ করিয়া, ডঃ গার্ণারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত; যথা, জনসমষ্টি, নিদিষ্ট ভূ-ভাগ, শাসনপ্রতিষ্ঠান বা সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা। জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ হইল রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্বের ভিত্তি; শাসনপ্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি।

(ক) জনসমষ্টি (Population)

বহু জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টির অবশ্য শ্রেণীবিভাগ করা যায়; যথা, পূর্ণ-নাগরিক, অসম্পূর্ণ-নাগরিক অর্থাৎ যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই, বিদেশী ও প্রজা। প্রজাগণের শুধু কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকে, কিন্তু তাহাদের অধিকারের দাবী

স্বীকৃত হয় না। বৃটিশ শাসনকালে ভারতীয়গণ প্রজাপদবাচ্য ছিল। রাষ্ট্রগঠনে একদল লোক প্রয়োজন, কিন্তু কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত, তাই অ্যারিস্টটল্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক রুশো পর্যন্ত রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্লেটো রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা ৫,০৪০-এ এবং অ্যারিস্টটল্ ১০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান যুগে মনাকো, স্যান্ম্যারিণো প্রভৃতি অল্পসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া, মহাচীন ও ভারতের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্রও পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগেও জনসংখ্যার দিক দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। য়্যান্ডোরা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হইল মাত্র ৫.০০০, অপর পক্ষে চীনদেশের জনসংখ্যা হইল ৪১২ মিলিয়নেরও অধিক। কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন সংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সরকারের সর্ববিধ কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

রাষ্ট্রগঠনে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশে যথেষ্ট জনবল থাকা একান্ত প্রয়োজন। হিট্‌লার শাসনকালে জার্মানীতে ও মুসোলিনি শাসনকালে ইতালিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু-সন্তানের জনক-জননীকে সরকারী সাহায্য প্রদান করা হইত। কিন্তু উৎপাদন পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য-বিহীনভাবে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের উন্নতির সহায়ক না হইয়া দেশের দুর্গতির কারণ হয়। সুতরাং বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ (Definite territory)

নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ বলিতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা বুঝায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আধিপত্য এবং কার্যকলাপ এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে

পরিচালিত হয়। তাই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে শুধু ভূমির উপরিভাগ বুঝায় না। ইহা এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রান্তর্গত ভূ-ভাগ, ভূগর্ভস্থ সমুদয় পদার্থ, আকাশপথ, নদনদী, গিরিপর্বত ও তিন মাইল পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল এই ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু রাষ্ট্রের এই নিজস্ব ভূ-খণ্ডের উপর একাধিপত্যের দুই-একটি বাধা আছে। বিদেশ হইতে আগত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের গৃহ স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সে গৃহ পররাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আইনতঃ পরিগণিত হয়। দিল্লীতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিদেশী যুদ্ধজাহাজ পররাষ্ট্রের বন্দরে সাময়িক কালের জন্য অবস্থান করিলেও তাহার উপর বন্দর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। তাহাদের দলের একজন নেতা থাকিতে পারে যাহার আদেশ দলস্থ সকলে মান্য করে, তথাপি তাহারা স্থায়িভাবে কোথাও বসবাস না করা পর্যন্ত রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। যখন একদল লোক স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের লইয়া রাষ্ট্রগঠনের সূত্রপাত হয়। কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহার যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা স্থির হয় নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থিরীকৃত করা যায় না। বর্তমান যুগে যে সমুদয় সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ভূখণ্ডের আয়তনের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। স্যান্ম্যারিণো রাষ্ট্রের আয়তন হইল মাত্র ৩৮ বর্গমাইল, অপরপক্ষে ভারতের আয়তন হইল ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৯৯ বর্গমাইল, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ৩০ লক্ষ বর্গমাইল এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন হইল ৮৭ লক্ষ বর্গমাইল। তবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকারের রাষ্ট্রেরই ভূখণ্ড থাকা চাই। এস্থলে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও মর্যাদা সব সময়েই এই ভূখণ্ডের আয়তনের উপর নির্ভর করে না। বৃটেন, জার্মানী, ফরাসী প্রভৃতি দেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে জগৎ-সভ্যতায় ইহাদের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। মনাকো বা স্যান্ম্যারিণোর ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিপদ হইল যে, এ জাতীয় রাষ্ট্র কখনও সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে

পারে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইহারা পরনির্ভরশীল হয় এবং এই পরিনির্ভরশীলতা অনেক সময় ইহাদের স্বাধীনতা হরণ করে। তবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সুবিধা হইল যে, রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা স্বল্প হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ অধিকতর সুসংবদ্ধভাবে একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয়ভাবে তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের কতকগুলি সুবিধা আছে। রাষ্ট্রের আয়তন বিস্তৃত হইলে সে রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজসাধ্য। এই কারণেই রুশ দেশ জয় করা অসম্ভব। ইহাছাড়া, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ইহাদের নৈসর্গিক-সম্পদের প্রাচুর্যের সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু অতিকায় রাষ্ট্রগুলির প্রধান অসুবিধা হইল যে আয়তনের ব্যাপকতার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র ক্ষীণ ও দুর্বল হয়। ফলে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হয়। শাসনব্যবস্থায়ও নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি প্রচলনের ফলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। তাই বর্তমান যুগের রাষ্ট্র-সংজ্ঞায় জনসমষ্টি ও ভূ ভাগ রাষ্ট্রগঠনের এই দুইটি উপাদানের কোন সীমারেখা স্থির করিবার প্রয়োজন হয় না।

(গ) শাসনযন্ত্র বা সরকার (Government)

একদল লোক কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করিলেই তাহাকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া চলে না। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। সুসংবদ্ধ জনসমষ্টির এই ঐক্যবদ্ধতা শাসনযন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। তাই যতদিন পর্যন্ত না তাহারা এক সুনিয়ন্ত্রিত শাসনযন্ত্র রচনা করিয়া তাহার কর্তৃত্বাধীনে আসে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের কোন সূচনা হইতে পারে না। এই শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি, যে শক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে বাস্তব

রূপ দিতে পারে। শাসনযন্ত্রবিহীন বা শাসনযন্ত্রবিকল রাষ্ট্র নাবিকহীন পোতের মত বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের নিয়ামক বা কর্ণধার। মানুষ যেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও সেইরূপ পরিচালিত হয় শাসনযন্ত্রের দ্বারা। তাই শাসনযন্ত্রকে সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিয়া ভুল করে। শাসনযন্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে; যথা, আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। এই তিন বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীসমষ্টিকে লইয়া রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র গঠিত।

(ঘ) সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty)

রাষ্ট্রগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শাসনযন্ত্র থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্রকে এই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রান্তর্গত সমগ্র জনসমষ্টির নিকট হইতে একক ও পূর্ণ আনুগত্য দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাই যাহার উপর রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রভুত্ব করে। রাষ্ট্রের ভিতর এমন কোন শক্তি থাকিতে পারে না, যে শক্তি রাষ্ট্রের কোন কার্যকে অবৈধ বা অযৌক্তিক বলিয়া অমান্য করিতে পারে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (Internal Sovereignty) বলা হয়। রাষ্ট্র যে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বেসর্বা তাহাই নয়। এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় না। নিজ ইচ্ছা অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাহার কার্য পরিচালনা করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইল, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার পরিচালনা করিবার অবাধ ও চরম ক্ষমতা; অপরটি হইল, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি (External Sovereignty)। যে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নাই, সে রাষ্ট্র স্বভাবতঃই

বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি এমন কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের রাষ্ট্রপদবাচ্য বলা যায় কি-না এ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। এই দেশগুলি রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের ফলে এমন একটি অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে যে, ইহারা নামমাত্র ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার করে, কিন্তু কার্যতঃ কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডের শাসনপাশ হইতে মুক্ত। এই দেশগুলিকে রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত করিবার নিমিত্ত গার্ণার তাঁহার প্রদত্ত রাষ্ট্রসংজ্ঞায় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া "বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় অনুরূপভাবে মুক্ত" (Independent or, nearly so, of external control) শব্দগুলির ব্যবহার করিয়াছেন।

এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের পর রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের বহু প্রগতিশীল লেখকও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অস্বীকার করেন। তাঁহারা মনে করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতি-পরিচালনায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিশ্বশান্তি স্থাপনের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহারা বিশ্বমানবের কল্যাণে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রের এই বহিঃস্থ সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান ঘটাইতে চান।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ব্যক্তিগত না স্থানগত? (State Sovereignty—personal or territorial?)

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে গেলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই উঠে যে, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা স্থান-নির্বিচারে ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য না ব্যক্তি-নির্বিচারে নির্দিষ্ট ভূভাগের উপর প্রযোজ্য? সার্বভৌমিকতা যদি ব্যক্তিবাচক বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অবাধ ক্ষমতার বলে স্বদেশ অথবা বিদেশ সর্বত্রই সমানভাবে তাহার নাগরিকদের উপর কর্তৃত্ব করিতে

পারে। রাষ্ট্রপ্রণীত আইন নাগরিকদের উপর সর্বত্রই সমানভাবে প্রযোজ্য। অপর পক্ষে যদি সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্থানবাচক বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল লোকের উপর—কি নাগরিক, কি বিদেশী—সমানভাবে ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যাহারাই বাস করুক না কেন সকলেই রাষ্ট্রের আইন মানিতে বাধ্য। এই শেষোক্ত মতবাদ অনুসারে বর্তমান যুগে সার্বভৌমিকতার প্রয়োগ হয়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের এই অবাধ কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমারেখার বাহিরে অন্য রাষ্ট্রের উপর বলবৎ হইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিনষ্ট হয়। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নির্দিষ্ট ভূ ভাগে সীমাবদ্ধ থাকিলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যত্যয় দেখা যায়। কোন দেশের রাষ্ট্রদূত অথবা যুদ্ধ জাহাজ সাময়িকভাবে যখন অন্য দেশে অবস্থান করে, তখন তাহাদের উপর সেই রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্রদূত সাময়িকভাবে ভিন্ন দেশে বাস করিলেও সে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন নহে।

সার্বভৌমিকতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা এ যুগে আর কার্যকর নাই। এই ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য দেশ ভিন্ন দেশেও তাহাদের অবাধ ও প্রতিহত ক্ষমতা বলবৎ করিত। বিগত শতাব্দীতে এই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র এশিয়ার কতকগুলি দেশে বিশেষ করিয়া চীনদেশে তাহাদের অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ করিত। এই ক্ষমতার বলে কোন ইংরাজ নাগরিক চীনদেশে গুরুতর অপরাধ করিলেও কোন চীন বিচারালয়ে চীনের আইন অনুসারে তাহার বিচার হইতে পারিত না। ইংরাজ নাগরিকের বিচার ইংরাজ বিচারকের দ্বারা তাহার স্বদেশীয় আইনানুসারে হইত। ইংলণ্ডের আইন ইংলণ্ডের বাহিরে ভিন্ন রাষ্ট্র চীনদেশে কার্যকর করা হইত। বর্তমান যুগে এই ভৌম-অধিকার-বহির্ভূত ক্ষমতার (Extra-territorial jurisdiction) অবসান ঘটিয়াছে। তথাপি একটি ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। এক রাষ্ট্র অপর দেশে জাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া দাবী করিতে পারে। যে আইনের দ্বারা এই দাবী সমর্থিত হয় তাহাকে *Jus*

Sanguinis (রক্তের ভিত্তিতে আইন) বলা হয়। এই আইন সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রের বাস্তব ও অবাস্তব রূপ (Idea vs. Concept of the State)

রাষ্ট্রসংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, রাষ্ট্র একটি বস্তুনিরপেক্ষ ধারণামাত্র, অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকে একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রের অবাস্তব রূপকে ইহার বাস্তব অস্তিত্বের উপাদান, জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়াও কল্পনা করিতে পারা যায়। এই অবাস্তব রূপ বহুলাংশে যৌথ কারবারের অস্তিত্বের অনুরূপ। বাস্তব দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের এই বাস্তব ও অবাস্তব উভয় দিকই আলোচিত হয়।

অনেক লেখক আবার রাষ্ট্রসংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করেন আদর্শ রাষ্ট্রের মাপকাঠিতে। পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের উপাদান অধুনা-প্রচলিত রাষ্ট্রের উপাদান হইতে পৃথক্। আদর্শ রাষ্ট্র বলিতে তাঁহারা মনে করেন রাষ্ট্রের যাহা হওয়া উচিত অর্থাৎ ভুলত্রুটিবিহীন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আর প্রচলিত রাষ্ট্রগুলি হইল ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মানবীয় প্রতিষ্ঠান। অনেকে মনে করেন, এক বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনেই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সার্থক হইবে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া টমাস্ মুর পর্যন্ত বহু লেখকই আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু কার্যতঃ এখন পর্যন্ত আদর্শ রাষ্ট্র একটি কল্পনামাত্র রহিয়া গেল।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিকল্পনা দেখা যায়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল্ উভয়েই নগর-রাষ্ট্রের ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পরিকল্পিত এই আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান ত্রুটি ছিল যে, এই রাষ্ট্র সর্বসাধারণের জন্য পরিকল্পিত হয় নাই, মুষ্টিমেয় নাগরিকদের সুখ-সুবিধার জন্যই এই রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। নগর-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইবার পর বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের একটা পরিকল্পনার প্রয়াস দেখা যায়। মহাবীর

আলেকজান্দার হইতে আরম্ভ করিয়া নাৎসী নায়ক হিট্‌লার পর্যন্ত এই আদর্শকে কার্যকর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও সফল হয় নাই। শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন আদর্শই মানবসমাজে স্থায়ী হইতে পারে না। অষ্টাদশ বা বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে একটা নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই আদর্শবাদ জাতীয়তাবোধ বা 'একজাতি একরাষ্ট্র' এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন ভাষাভাষী বা ধর্মালম্বী জাতিগুলি নিজ নিজ স্বাধীন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে নিজস্ব সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইল। বর্তমান শতাব্দীতে প্রথম মহাসমরের পরবর্তী কাল হইতে আদর্শ রাষ্ট্রসম্বন্ধে আবার নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন হইয়াছে। মানুষ বোধহয় বুঝিয়াছে যে, জাতিগত বৈষম্যের জন্য পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত থাকা মানবধর্ম নয়। তাই আবার বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, আর এই প্রচেষ্টা রূপায়িত হইয়াছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনে।

রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

(ক) স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (Permanence and Continuity)

রাষ্ট্রের একটি বিশেষ লক্ষণ হইল যে, ইহার বিনাশ নাই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি অস্থায়ী কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র হইল একমাত্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু শাসনযন্ত্রের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না।

(খ) রাষ্ট্রের সমানাধিকার (Equality of States)

রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইলেই প্রত্যেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের বলে সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। যেমন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট সমান অধিকার দাবী করিতে পারে, সেইরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রই সমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি দাবী করিতে পারে। এই অধিকার

দুই প্রকারের—আইনগত অধিকার (Legal Right) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Right)। আইনগত অধিকারের বলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের চক্ষে সমান বলিয়া পরিগণিত হয়। রাজনৈতিক অধিকারবলে সকল রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সমানভাবে যোগদান করিবার ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাষ্ট্রের আইনগত অধিকার সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকারে সাম্য নীতি এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N.) সংগঠনে এই নীতির কার্যকারিতার অভাব দেখা যায়।

রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইনসম্মত সংজ্ঞা (The State as a Concept of International Law)

আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে রাষ্ট্রসংজ্ঞা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'রাষ্ট্র' সংজ্ঞা অপেক্ষা ব্যাপকতর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হওয়া চাই। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে এই স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে ও নিজস্ব ইচ্ছানুসারে চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাহার থাকিবে। যখনই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে ও তাহার স্বাধীনতা অন্য রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তখনই সে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রমর্যাদা লাভ করে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর বহুদিন পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রমর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। অনেক রাষ্ট্রই ইহাকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি করে ও ইহার সহিত কোন কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করে না। বর্তমান সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপর কয়েকটি রাষ্ট্র নয়া চীনকে রাষ্ট্র বলিয়া এখনও স্বীকার না করিলেও চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করিয়া পূর্ণ রাষ্ট্রমর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে। যদিও ইংলণ্ড, ভারত, রাশিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ ইহাকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রধান উপায় হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করা।

ভারতকে কি স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্র বলা চলে?
(Is India a State ?)

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্টের পূর্বে এ প্রশ্নের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন ভারত সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। বহু জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শক্তিশালী শাসনযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু উল্লিখিত তারিখের পর হইতে ভারত, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্বাধীন উপনিবেশগুলির সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারত পূর্ণাবয়ব রাষ্ট্রমর্যাদা লাভ করিয়াছে। ভারত তাহার নিজের সংবিধান সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে রচনা করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ভারত যে স্বাধীন রাষ্ট্র নয় ইহার সপক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, ভারত এখনও পর্যন্ত বৃটিশ সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য রহিয়াছে ও বৃটিশ রাজার আনুগত্য স্বীকার না করিলেও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

নূতন সংবিধানে ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট নেতা হইলেন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। বৃটিশ রাজার ভারত সম্পর্কে আদৌ কোন ক্ষমতা নাই, এমন কি রাষ্ট্রের কোন কাজে বা রাষ্ট্রীয় কোন উৎসবেও তাঁহার নাম উল্লেখিত হয় না। তাঁহার এই নেতৃত্ব শুধু একটি ধারণামাত্র। ভারতকে বৃটিশ সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য রাখিবার নিমিত্তই এই সাধারণতন্ত্র রাজ্য হইতে 'বৃটিশ' শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদি সদস্য ও এই জাতিপুঞ্জের সভায় বহুক্ষেত্রে ভারত তাহার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিয়া বৃটেনের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছে। ভারত যে সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহা তাহার নিরপেক্ষ নীতির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সক্রিয়ভাবে ভারত এখনও পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে যোগদান করে নাই। কতকগুলি কারণে ভারত স্ব-ইচ্ছায় এই সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য রহিয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন বৃটেনের সহিত বহুদিন হইতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ভারতের নূতন সংবিধান বহুলাংশে বৃটেনের

সংবিধানের অনুসরণ করিয়াছে। এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ভারতের আরও কিছুদিন পর্যন্ত বৃটেনের সহিত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত আবশ্যক বলিয়া ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মনে করেন। সেইজন্য ভারত সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক ছেদ করে নাই। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারত স্ব-ইচ্ছায় এই সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য হইয়াছে ও স্ব-ইচ্ছায় ইহার সদস্যপদ ত্যাগ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ইহার আছে। সুতরাং ভারতকে পূর্ণাবয়ব রাষ্ট্র না বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে? (Is the United Nations a State ?)

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রসংঘের (League of Nations) উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানও ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চিরতরে যুদ্ধের সম্ভাবনার অবসান করিয়া পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হইল এই প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় কিনা।

অনেক লেখক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত করেন, অনেকে আবার এই প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রগুলির উপর স্থান দিয়া ইহাকে একটি অভিভাবক রাষ্ট্র (Super state) রূপে গণ্য করেন।

আন্তর্জাতিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে রাষ্ট্রের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতে পারে। সাধারণ রাষ্ট্রগুলির ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানটির শাসন বিভাগ (নিরাপত্তা পরিষদ), আইন বিভাগ (সাধারণ সভা) ও বিচার বিভাগ (আন্তর্জাতিক আদালত) আছে। ইহার কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার জন্য একটি দপ্তরখানা আছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইহার একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র বা রাজধানী আছে ও ইহার নিজস্ব কোষাগার ও বাৎসরিক আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহাদের স্থায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী

প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে। বর্তমানে কাশ্মীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কতিপয় প্রতিনিধি ভারতে নিযুক্ত আছেন। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি চুক্তি করিতে পারে। গণতান্ত্রিক চীনের সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাস্তব দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্র বলা যায় না। যে কয়টি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত তাহার কোনটিই সম্যকরূপে এই প্রতিষ্ঠানে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, এই প্রতিষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই বা ইহার নিজস্ব নাগরিক নাই। অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের অনুরূপ শাসনযন্ত্র থাকিলেও এই প্রতিষ্ঠানের শাসনযন্ত্র কর্তৃক বিধিনিষেধ সদস্য রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ সম্মতি ও সাহায্য ব্যতীত কোন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধ ঘোষণা করিবার যে ক্ষমতা উল্লেখ করা হয় তাহার অর্থ হইল যে, এই প্রতিষ্ঠান সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য সৈন্য ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু সদস্য রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই সুপারিশ গ্রহণ না করিতেও পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের কোথাও এ-কথার উল্লেখ নাই যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা জাতিপুঞ্জে সমর্পণ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে ভারত প্রভৃতি বহু রাষ্ট্রই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী। কোন রাষ্ট্রের অনিচ্ছা বা অসম্মতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান অনিচ্ছুক রাষ্ট্রের উপর ইহার সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে সক্ষম নয়। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। সুতরাং ইহাকে রাষ্ট্র পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থতা বা সালিসি করিতে পারে, কিন্তু মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা ইহার অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলি পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অভিভাবক রাষ্ট্র বলা দূরে থাকুক, রাষ্ট্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলিবে না। কয়েকটি বিশেষ

উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা ব্যতীত ইহাকে অন্য নামে অভিহিত করা যুক্তিসম্মত নয়।

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)

সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ সামাজিক জীব। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই সামাজিক জীব অর্থে আমরা কি বুঝি। বহু জনসমষ্টি সভ্য জীবন যাপন করিবার জন্য একসঙ্গে বাস করে। তাহারা নানা বিষয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মনুষ্যসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয় তখনই সমাজ-জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সমাজ মানবজীবনকে প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনরূপ লিখিত আইন-কানুনের আবশ্যক হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার, রীতি-নীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের জীবন বহুমুখী এবং এই বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন তৃপ্ত করিবার জন্য মানুষ সমাজদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুবিধ সংঘ বা সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সমাজমধ্যে আমরা দেখিতে পাই পরিবার, ধর্মসংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্র সমাজ-মধ্যে এইরূপ একটি সংঘ। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘগুলি অপেক্ষা একটি বিশিষ্ট সংগঠনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। ইহার কার্যকলাপ সমাজগণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। সুসংবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সমাজ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে, রাষ্ট্র সমাজকে সৃষ্টি করে নাই। সেইজন্য সমাজ-জীবনের মূল-নীতিগুলিকে রাষ্ট্র উপেক্ষা করিতে পারে না। সমাজের সহিত রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়:—

(ক) প্রথমতঃ, সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর। সমাজ মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-

মধ্যে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ শুধু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ।

(খ) কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না, কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে গেলে সমাজের সংজ্ঞা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়।

(গ) সমাজগঠনের সূত্রপাত রাষ্ট্রগঠনের বহু পূর্বে হইয়াছিল। রাষ্ট্রগঠন সমাজ-বিবর্তনের একটি অধ্যায় মাত্র। রাজনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমাজবদ্ধ মানুষ বহু পরে রাষ্ট্র গঠন করে।

(ঘ) রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের বা সরকারের প্রয়োজন হয়। এই সরকারের মাধ্যমেই জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পায়। সরকার হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। কিন্তু সমাজের এরূপ কোন শাসনযন্ত্র নাই। এস্কিমো, বেদুইন প্রভৃতি এমন অনেক আদিম জাতি আছে যাহারা সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করিলেও তাহাদের কোন শাসনযন্ত্র নাই।

(ঙ) সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। এই উপাদান ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর হইলেও সমাজের এরূপ কোন বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা নাই।

(চ) পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়ের পার্থক্য অধিকতর সুস্পষ্ট। রাষ্ট্র শুধু মানুষের বহির্জীবনের আচরণ স্থির করিয়া দেয়। তাহার অন্তর্জীবন অর্থাৎ তাহার চিন্তাধারা, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সীমারেখা স্থির করা সম্ভব। কিন্তু সমাজ নানাভাবে মানুষের সমগ্র জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভয় প্রভৃতি সামাজিক প্রবণতার দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়। নানাবিধ সামাজিক বিধিনিষেধ তাহার এই মনুষ্যত্ববিকাশে সহায়তা করে। এই সামাজিক প্রবণতা ও বিধিনিষেধগুলিকে রাষ্ট্র ব্যক্তির আত্ম-বিকাশের পথ সুগম করিবার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে সৃষ্টি বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য সংঘ (State and other Associations)

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। অন্যান্য সংঘগুলিও রাষ্ট্রের মত জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। ইহাদেরও শাসনযন্ত্রের মত কার্যকরী সমিতি ও আইন-কানুন আছে। কিন্তু এই কয়েকটি সাদৃশ্য ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নাই। অধিকন্তু উহাদের পার্থক্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) প্রথমতঃ, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা আছে, আর এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। কিন্তু অন্যান্য সংঘ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে সীমাবদ্ধ নয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বাহিরে অন্য রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের কার্য পরিচালনা করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ মিশন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংঘ। কিন্তু ভারতের বাহিরে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকগণও এই সংঘের সভ্য হইতে পারেন এবং এই সংঘের কার্য অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডেও পরিচালিত হইতে পারে। এমন কি, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী একটি সংঘ গড়িয়া উঠিতে পারে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের কার্যকলাপ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ব্যাপ্ত।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মানুষ মাত্রকেই একটা-না-একটা রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে। জন্মকাল হইতে মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। সাবালক হইলে তাহার ইচ্ছানুসারে এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতেই হইবে। কিন্তু সামাজিক অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন। যে-কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার ক্রীড়াসংঘ বা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া মানুষের পক্ষে বাধ্যতামূলক ; অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

(গ) তৃতীয়তঃ, একজন লোক একই সময়ে মাত্র একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া আইনতঃ ও কার্যতঃ অসম্ভব। কিন্তু একটি লোক একই সময়ে অন্যান্য বহু সংঘের সভ্য হইতে পারে—তাহাতে কোন বাধা নাই।

(ঘ) চতুর্থতঃ, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘগুলির মধ্যে প্রভেদ অনেক বেশী। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তৃপ্ত করিবার জন্য ধর্মসংঘগুলির আবির্ভাব হইয়াছে, শিক্ষায়তনগুলির সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ও নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি সংঘের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এইরূপ এক বা একাধিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে। মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অন্যান্য সংঘগুলির উদ্দেশ্য অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

(ঙ) পঞ্চমতঃ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হইতেও পারে। যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহারা গঠিত হয় সেই উদ্দেশ্য সফল হইলে বা অন্য কারণে তাহারা লোপ পাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের বিনাশ নাই। অন্যান্য সংঘগুলির রাষ্ট্রের মত স্থায়িত্ব বা ধারাবাহিকতা নাই।

(চ) ষষ্ঠতঃ, অন্যান্য সংঘগুলি অনেক সময় মানুষের বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রও এইরূপ জনহিতকর সংঘ গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু সকল সংঘই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন ও রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাহাদের কার্যকলাপের অবসান ঘটাইতে পারে।

(ছ) পরিশেষে, রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘগুলির প্রধান পার্থক্য হইল যে, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আর, এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণের ও অন্যান্য সংঘগুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে। কোন সংঘের কোন একজন সভ্য যদি সেই সংঘবিরোধী কাজ করে তাহা হইলে সেই সংঘ সেই সভ্যকে জরিমানা করিতে পারে বা সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোন দৈহিক শাস্তি দিবার ক্ষমতা ঐ সংঘের নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র তাহার সভ্যগণকে যে-কোন শাস্তি এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও দিতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজগণ্ডির মধ্যে যে বহুবিধ সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্রই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংঘ। ব্যাপকতা, উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও স্থায়িত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র হইল অসীম—অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি সসীম।

রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র (State and Government)

দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র প্রায় প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। যে চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহার মধ্যে শাসনযন্ত্র একটি মাত্র। যদিও রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি এই শাসনযন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়, তথাপি রাষ্ট্র শাসনযন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যদিও মস্তিষ্ক দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয় তথাপি মস্তিষ্ক যেমন সমগ্র মানুষটিকে বুঝায় না, সেইরূপ শাসনযন্ত্র শব্দটি দ্বারা সমগ্র রাষ্ট্রসংজ্ঞাটির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বা সরকারের মধ্যে অনেক বাস্তব প্রভেদ আছে।

(ক) প্রথমতঃ, রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র অধিবাসীকে লইয়া। সকল নাগরিকই রাষ্ট্রের সভ্য। কিন্তু সরকার গঠিত হয় অনেক অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনাকার্যে যাহারা নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আইন-সভাগুলির সদস্য, শাসনবিভাগীয় কর্মচারী ও বিচারবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দকে লইয়া শাসনযন্ত্র গঠিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা ব্যাপকতর।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ। কোন রাষ্ট্রবিশেষের কথা ভাবিতে গেলে একটা ভৌগোলিক সীমার কথা মনে পড়ে। কিন্তু সরকার বলিতে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কল্পনার প্রয়োজন হয় না। সরকার প্রধানতঃ শাসনকার্যে রত অল্পসংখ্যক লোককে বুঝায়।

(গ) তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার হইলেও সরকার পরিবর্তনশীল। সরকারের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোনরূপ বিপর্যয় ঘটে না।

(ঘ) চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকারের এ ক্ষমতা নাই। সরকার রাষ্ট্রের বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালনা করে। কিন্তু রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে।

(ঙ) পঞ্চমতঃ, সকল দেশেই একই উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূভাগ, শাসনযন্ত্র ও সার্বভৌম ক্ষমতা—এই চারিটি উপাদান সকল রাষ্ট্রেই বর্তমান। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে সব রাষ্ট্রই এক পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু দেশভেদে শাসনযন্ত্রের রূপ বিভিন্ন হয়। রাষ্ট্র হিসাবে

গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একই প্রকার। কিন্তু দুইটি দেশের শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ পৃথক্।

(চ) পরিশেষে, বলিতে পারা যায় রাষ্ট্র একটি মনঃকল্পিত ধারণা মাত্র; ইহার কোন বাস্তব রূপ নাই। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। রাষ্ট্র বলিলে একটি বস্তুনিরপেক্ষ কল্পনা বুঝায় আর সরকার হইল রাষ্ট্রের সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ। তাই সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রই হইল সকল অধিকারের উৎস।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকাশ (Different manifestations of the State)

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশ ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রাষ্ট্র বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে শুধু গঠন প্রকৃতির পার্থক্য দেখা যায় তাহা নহে, এই রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধির মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

১। নগর-রাষ্ট্র (City-state)

প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশে নগরকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাষ্ট্রের আয়তন প্রধানতঃ নগরেই সীমাবদ্ধ থাকিত বলিয়া এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নগর-রাষ্ট্র বলা হইত। গ্রীক ও রোমক সভ্যতা এই নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। এই নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিবাসীর প্রচুর অবসর ছিল, এবং যাহারা রাষ্ট্রপরিচালনা কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিবার যোগ্যতার অধিকারী ছিল তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। ক্রীতদাস, দিন-মজুর ও স্ত্রীলোকগণ রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া তাহারা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত না। মধ্যযুগেও ইয়ুরোপে ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি কতিপয় নগর-রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়।

প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রের সহিত আধুনিক অতিকায় রাষ্ট্রগুলির নানাদিক দিয়া পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন যুগের নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন নাগরিকগণ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও

সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিত, কিন্তু বর্তমান যুগের রাষ্ট্র পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালের রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় বিশ্রামভোগী পরজীবী অভিজাত সম্প্রদায় নাগরিক সুখ-সুবিধার অধিকারী ছিল, বর্তমান রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে এতটা ভেদ দেখা যায় না। সকলেরই সমান অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন যুগের নগর-রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়া হইত। রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু রাষ্ট্রের জন-কল্যাণ ক্ষমতার দ্বারাই সমর্থিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী একটি নিকৃষ্ট স্তরের জীব বলিয়া পরিগণিত হইত। যে শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না, বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাপকাঠিতে তাহাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায় না।

২। প্রাচীন অতিকায়-রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য (Empire)

নগর-রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের পূর্বে প্রতীচ্য দেশে কতিপয় অতিকায় রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। স্বরাষ্ট্র ব্যতীত বহু পররাষ্ট্র বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা এই সকল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধাসত্ত্বেও এই সকল সাম্রাজ্য বহুদিন পর্যন্ত বহু বিভিন্ন জাতির উপর আধিপত্য অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন মিশর, চীন, ভারত, পারস্য ও আসিরীয়া দেশগুলি কর্তৃক এই সকল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সম্রাটই ছিলেন সর্ব বিষয়ের অধিকর্তা—তাঁহার ইচ্ছা ছিল চরম আইন। বিজিত দেশগুলির কোনপ্রকার স্বাধীনতা ছিল না। সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ ছিল। অনেক সময় বিজেতা বিজিত জাতিসমূহকে ক্রীতদাস পর্যায়ে পর্যবসিত করিত।

মিশর, পারস্য প্রভৃতি সাম্রাজ্যের পর অদ্বিতীয় বীর আলেকজান্দার কর্তৃক ম্যাসিডোনিয়ান্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি অল্পকালের মধ্যে আলেকজান্দার সমগ্র গ্রীস দেশে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া দুর্বার বেগে মিশর, পারস্য ও ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। অবশ্য তাঁহার অকালমৃত্যুর ফলে তাঁহার এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য

ধ্বংস হয়। ইহার পর রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। প্রাচীন সাম্রাজ্য গুলির মধ্যে সভ্যতার অগ্রগতিতে রোমক সাম্রাজ্যের অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক। রোমক শাসনপদ্ধতি ও আইন পরবর্তী যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার পথ-নির্দেশক বলিয়া আজও পর্যন্ত পরিগণিত হয়।

অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ, ফরাসী, রুশ ও অটোম্যান-তুর্ক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ নিছক পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। তাই পৃথিবীর কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই।

৩। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র (Feudal State)

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র ইয়ুরোপ কতকগুলি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দেশে রাজতন্ত্র বর্তমান থাকিলেও রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক দেশই কতকগুলি সামন্ত অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং এক এক অঞ্চলের সামন্ত ছিলেন সেই অঞ্চলের প্রকৃত শাসনকর্তা। সামন্তগণ দেশের রাজাকে নির্দিষ্ট কর প্রদান ও যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। ইহা ব্যতীত অন্য সর্ববিষয়ে তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। নিজ নিজ এলাকায় তাঁহারা সর্ববিষয়ে স্বৈরাচারী ছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জাপানেও এই সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল হইল যে, দেশে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার না থাকার ফলে রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়। সামন্ত নেতাগণের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে দেশে সর্বদা অশান্তি ঘটে। এই ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী ব্যতীত কৃষক, শ্রমিক ও বণিক প্রভৃতি শ্রেণী লইয়া গঠিত সাধারণ শ্রেণী ভূমিদাসে পর্যবসিত হয়।

৪। জাতীয় রাষ্ট্র (Nation-State)

অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যখন সমান্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটে, সেই সুযোগে ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশের নৃপতিবর্গ ক্ষমতাশালী বণিকশ্রেণীর সাহায্যে নিজ নিজ দেশে নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তার করিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেন। কিন্তু এই সময়কার রাষ্ট্রগুলি জাতির ভিত্তিতে গঠিত হইলেও একমাত্র রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের মালিক—জনসাধারণের শাসন-

ব্যবস্থায় কোন হাত ছিল না। রাজার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জাতির মধ্যে সাজাত্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। পোল্যাণ্ডের যথেচ্ছা বিভাগ, নেপোলিয়নের খুসীমত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ ও নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ভিয়েনা চুক্তির রচয়িতাগণের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের নৈতিক কর্তব্যের প্রতি ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সাহায্য করে। পরবর্তী কালে এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ এরূপ উগ্র ও দুর্বার রূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্যতা স্বীকৃত হয়। ফলে, প্রথম বিশ্ব সমর পরিসমাপ্তির পর ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে জাতির এই দাবী সর্বপ্রথম স্বীকৃত হইয়া জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটে। জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'। পোল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ একই ভাষাভাষী ও একই ঐতিহ্যের অধিকারী, সুতরাং তাহাদের নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার আছে। জার্মানী, রুশিয়া বা অষ্ট্রিয়ার পোলাণ্ডের উপর কর্তৃত্ব করিবার কোন অধিকার নাই।

জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান নানাদিক দিয়া কাম্য হইলেও জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দাবী অবাধ ও শর্তহীন নহে। যে স্থলে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ফলে একদিকে আত্মকলহ ও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হয় এবং অপর দিকে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেরূপ স্থলে এই অধিকারকে অনধিকার বলা চলে।

৫। বিশ্ব-রাষ্ট্র (World State)

বিশ্ব-রাষ্ট্র হইল রাষ্ট্রের আদর্শ রূপ—ইহার বাস্তব কোন অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত দেখা যায় না। রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে যে সাজাত্যবোধ জাগরিত হয়, তাহার ফলে জাতির ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি একদিকে যেরূপ স্বাধীনভাবে তাহাদের আত্মোন্নতির দ্বারা জগৎ-সভ্যতা সমৃদ্ধ করিল, অপর দিকে সেইরূপ পারস্পরিক কলহ, বিদ্বেষ ও ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইল। উগ্র স্বাদেশিকতার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। পর পর দুইটি বিশ্ব-মহাসমর এই অত্যধিক স্বাদেশিকতার ফল।

দুইটি বিশ্ব-মহাসমরের ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় মানবজাতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী হইয়াছে। মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, জাতীয় রাষ্ট্রই সমাজ সংগঠনের শেষ অধ্যায় নহে এবং জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই মানুষের শেষ কর্তব্য নহে। মানুষ বুঝিয়াছে যে, জাতিগত বৈষম্যের জন্য পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত থাকা মানবধর্ম নয়। তাই বিশ্ব-রাষ্ট্র সংগনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, আর এই প্রচেষ্টা রূপায়িত হইয়াছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনে।

কিন্তু বিশ্ব রাষ্ট্র গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হইল রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমিকতার ধারণা এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই ধারণা বর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ব-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব বিরোধ, চীনের সমস্যা ও সর্বোপরি পশ্চিম ও পূর্ব গোষ্ঠীর রাষ্ট্রজোটের মারাত্মক দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে গঠিত বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের প্রধান অন্তরায়। বিভিন্ন জাতিগুলি যে দিন বুঝিতে পারিবে যে, যে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা ও প্রগতির রক্ষক, সে রাষ্ট্রের পক্ষে বিধ্বংসী যুদ্ধ দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট করা কথনই উচিত নয়—সেদিন বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মুক্ত হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রসংজ্ঞা—যখন একদল লোক কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে আইনশৃংখলা রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া শাসনযন্ত্র গঠন করে ও বহির্নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তাহাদের সামাজিক জীবন যাপন করে, তথন তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত; যথা, (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) শাসনযন্ত্র ও (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা। উপাদানগুলির মধ্যে শেষোক্তটি রাষ্ট্রগঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ হইল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রসম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। বর্তমান রাষ্ট্রসংজ্ঞায় জনসমষ্টি ও ভূভাগের কোন নির্দিষ্ট

সীমা স্থির নাই। রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহার স্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতা ও অন্য রাষ্ট্রের সহিত সমানাধিকার উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে রাষ্ট্রপদবাচ্য হইতে হইলে অন্য রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়।

জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূভাগ লইয়া রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু রাষ্ট্রের একটা অবাস্তব রূপ আছে—যাহার সহিত যৌথ কারবারের অস্তিত্বের তুলনা করা যাইতে পারে।

অনেক লেখক আবার রাষ্ট্রকে একটা আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আদর্শ রাষ্ট্র একটা মনঃকল্পিত ধারণা যাহার সহিত বর্তমান ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ রাষ্ট্রের তুলনা করা চলে না। অনেক লেখক বিশ্ব রাষ্ট্রগঠন-পরিকল্পনাকেই আদর্শ রাষ্ট্রের বাস্তব পরিণতি বলিয়া মনে করেন।

ভারত কি স্বাধীন রাষ্ট্র?—বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতকে স্বাধীন না বলিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যদিও ভারত নামমাত্র বৃটিশরাজের নেতৃত্ব স্বীকার করে তথাপি ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারত সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজার কোন ক্ষমতা নাই। ভারত কতকগুলি সুবিধার জন্য সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের সদস্য রহিয়াছে। যে-কোন মুহূর্তে ভারত এই সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের সদস্যপদ নিজের ইচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে পারে।

রাষ্ট্র ও সমাজ—মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমাজের সৃষ্টি। সমাজ নানাবিধ সংঘ গঠন করিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া এই প্রয়োজন তৃপ্ত করে,—রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

১। সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র।

২। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না, কিন্তু সমাজগঠনে ইহার প্রয়োজন হয় না।

৩। রাষ্ট্রজন্মের বহু পূর্বে সমাজ গঠিত হয়।

৪। শাসনযন্ত্র বা সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলিতে পারে না, কিন্তু সমাজের গঠনে সরকারের প্রয়োজন হয় না।

৫। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে সার্বভৌম ক্ষমতার উপর; সমাজের এ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না।

৬। রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের উদ্দেশ্য অধিকতর ব্যাপক। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই সমাজের কাজ।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ—১। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই, সংঘের ভূখণ্ড না হইলেও চলে।

২। রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংঘ; অন্যান্য সংঘগুলি স্থায়ী না হইতেও পারে।

৩। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুমুখী; রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার সর্ববিধ উন্নতিসাধনে সহায়তা করে, অন্যান্য সংঘগুলি দুই একটি বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাহায্য করে।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রান্তর্গত সকলের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে, অন্যান্য সংঘগুলির অবাধ ক্ষমতা নাই।

৫। মানুষ ইচ্ছামত এক বা একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে বা সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য তাহাকে হইতেই হইবে—নাগরিক হওয়া বাধ্যতামূলক।

রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র—শাসনযন্ত্র বা সরকার রাষ্ট্রগঠনের একটি উপাদান মাত্র। রাষ্ট্রের সহিত ইহার পার্থক্য আছে।

১। রাষ্ট্রান্তর্গত সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের সভ্য, কিন্তু সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া—আইনসভার, শাসনবিভাগের ও বিচারবিভাগের কর্মীদের লইয়া সরকার গঠিত হয়।

২। রাষ্ট্র স্থায়ী সংঘ, সরকার পরিবর্তনশীল।

৩। রাষ্ট্র বলিতে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধারণা হয়, কিন্তু শাসনযন্ত্র বলিতে শুধু কার্যরত কতকগুলি বিশেষ লোকের সমষ্টি বুঝায়।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে।

৫। সকল রাষ্ট্রেরই একই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেশভেদে শাসনযন্ত্রের পার্থক্য দেখা যায়।

৬। রাষ্ট্র সর্ববিধ নাগরিক অধিকারের উৎস। কিন্তু নাগরিক অধিকার রক্ষার ভার সরকারের উপর। তাই নাগরিকগণের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না—অভিযোগ হইল সরকারের বিরুদ্ধে।

৭। রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহা একটি ধারণা মাত্র। সরকার হইল রাষ্ট্রের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকাশ—১। নগর-রাষ্ট্র, ২। সাম্রাজ্য, ৩। সামন্ত রাষ্ট্র, ৪। জাতীয় রাষ্ট্র ও ৫। বিশ্ব-রাষ্ট্র।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

(Theories about the Origin and Nature of the State)

উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মত—কোন্ সময়ে বা কি পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত। কোন পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী যে রাষ্ট্রের গঠনকার্য হইয়াছে ইতিহাসও এরূপ সাক্ষ্য দেয় না, সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন লেখক রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিতে গিয়া বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের কোনটিকেই একক সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। যে সমস্ত চিন্তাশীল লেখক রাষ্ট্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন। প্রথমটি হইল, দর্শনমূলক পদ্ধতি ও দ্বিতীয়টি হইল, ঐতিহাসিক পদ্ধতি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে আমাদের উপরি-উক্ত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রথমোক্ত পদ্ধতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে; যথা, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি—মতবাদ, বলপ্রয়োগে বিজয় ও অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—মতবাদ, সামাজিক চুক্তি—মতবাদ। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দুইটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে; যথা, পরিবারের ক্রম সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—মতবাদ ও ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—মতবাদ।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি অথবা রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি—মতবাদ (Theory of Divine Origin of the State)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতবাদে

বলা হয়, ভগবান্ স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করেন। বিধাতার অভিপ্রায় মানবসমাজে রাজার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এই মতবাদের চারিটি উপ-সিদ্ধান্ত আছে। প্রথমতঃ, একমাত্র রাজতন্ত্র হইল ঈশ্বরানুমোদিত পদ্ধতি অর্থাৎ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য স্বয়ং ভগবান্ রাজাকে মনোনীত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী। তৃতীয়তঃ, রাজা তাঁহার কার্যের জন্য একমাত্র ভগবানের নিকট দায়ী, কোন পার্থিব শক্তির নিকট দায়ী নহেন। চতুর্থতঃ, প্রজাসাধারণের একমাত্র কর্তব্য হইল বিনা বিচারে রাজ-আজ্ঞা পালন করা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই মতবাদটি অতি প্রাচীন। ভারত, মিশর, চীন প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশসমূহে অতি পুরাকাল হইতে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক বা রোমকগণ এই মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন নাই। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ক্রমশঃ লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। মধ্যযুগে যখন ধর্মগুরু পোপ ও রাষ্ট্রনায়ক সমাজের মধ্যে সর্বাধিনায়কত্ব লইয়া বিরোধ শুরু হয়, সেই সময়ে পোপ এই মতবাদটির বলে নিজ অবাধ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজার সমর্থকগণ রাজাকেই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে পোপের সমর্থকগণ পোপকেই ঈশ্বরানুমোদিত প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে জনসাধারণকে অনুরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অবশ্য পোপের পরাজয় ঘটিল। পোপের ক্ষমতার অবসান ঘটিলে রাজা নিজ ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারের ফলে গণতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদ প্রয়োগ করা হয়। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া রাজার কাহারও নিকট দায়ী হওয়ার প্রশ্ন ছিল না। এই মতবাদটি ইংরাজ লেখক স্যার রবার্ট ফিল্‌মারও সমর্থন করেন। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ এই মতবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি এই মতবাদ সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তকও রচনা

করেন। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও এই মতবাদ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই তিনটি দেশের শাসকগণ মিলিতভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাবৃন্দের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ভগবানের আদেশে এক পবিত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এক তিব্বত দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে এই মতবাদটি আর কার্যকর ছিল না। অধুনা নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা চলে না। এই রাষ্ট্রের ভিত্তি ইসলাম ধর্মের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী একমাত্র মুসলমান ব্যতীত কোন অ-মুসলমান নাগরিক এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন না। সামাজিক চুক্তি—মতবাদটির আবির্ভাবের ফলে এই বহু প্রাচীন মতবাদটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

সমালোচনা—এই মতবাদটির বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান। মানুষ নিজ ইচ্ছানুসারে ও নিজের সুবিধার জন্য ইহার সৃষ্টি করিয়াছে। ভগবান্ এ সমস্ত পার্থিব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ শুধু রাজতন্ত্র সমর্থন করে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিদ্বারা শাসিত রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ আলোকসম্পাত করিতে পারে না। বর্তমান যুগে রাজতন্ত্র একরূপ বিলোপের পথে। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থার যে নব নব রূপ বর্তমান রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায়, এই মতবাদের ভিত্তিতে সেগুলির উৎপত্তির বিচার সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, এ মতবাদটির পরিণতি অতি বিপজ্জনক ও কার্যতঃ দেখা গিয়াছে যে-সমস্ত রাজা এই মতবাদের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা ভগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধি এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেক শাসক প্রজার ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া স্বীয় ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে প্রজার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। রাজাকে ভগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও অত্যাচারী শাসকের অস্তিত্ব এই মতবাদদ্বারা সমর্থিত হয় না। কারণ, ভগবান্ হইলেন সর্বমংগল-বিধায়ক ও সর্ববিধ গুণের আকর। সুতরাং যিনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করিবেন তিনি

কখনই জনসাধারণের অহিত করিতে পারেন না। ফলে, এই মতবাদ শাসকবর্গকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের অবসান (Decline of the Divine Right Theory)

নানাকারণে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে আর কেহ এই মতবাদে বিশ্বাস করে না। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ অবসানের প্রধান কারণ হইল সামাজিক চুক্তি মতবাদের আবির্ভাব। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি মনুষ্য-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রচার করিল এবং এই প্রচারের ফলে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তি ও অতি-মানবীয় রূপ পরিবর্তিত হইল। দ্বিতীয়তঃ, 'রিফরমেশন' আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের মনে মধ্যযুগীয় ধর্মসম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। ইহার ফলে পোপের অবাধ ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া শাসকগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। শাসনব্যাপারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার ফলে রাষ্ট্র ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান হইতে জাগতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। তৃতীয়তঃ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার ও প্রসারের ফলে জনসাধারণের উপর ধর্মের বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত জনসাধারণ ক্রমশঃই রাষ্ট্রকে একটি মনুষ্যসৃষ্ট জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিল।

মূল্য-নির্ধারণ (Evaluation of the Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ে এই মতবাদে অধুনা কেহই আস্থা স্থাপন করে না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে এই মতবাদটি কোন কোন বিষযে মানবসমাজে প্রভূত হিতসাধন করিয়াছিল। বর্তমানযুগে অসার ও অনুপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও যে যুগে এই মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে যুগে ইহার কার্যকারিতা ও প্রভাব অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, প্রাচীনকালের মানুষ বর্তমান যুগের মানুষের মত সুসংবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত ছিল না। সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি হইল আইন-শৃংখলা মানিয়া চলিবার কর্তব্যবুদ্ধি। এই বুদ্ধি যখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয় তখন অন্য উপায়ে এই বুদ্ধি সমাজদেহে

সঞ্চারিত করিতে হয় নতুবা সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন অচল হইয়া যায়। রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি ও রাজা ভগবানের মনোনীত প্রতিনিধি—এই বিশ্বাস রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন সমাজে প্রচার করিয়া এই মতবাদটি রাষ্ট্রগঠনের প্রথম যুগে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। প্রজারা রাজাকে ঈশ্বরের দূত মনে করিয়া তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিত। এইরূপে অন্ধ-বিশ্বাসের মধ্য দিয়া মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তি মধ্যযুগীয় ধর্ম-ব্যবস্থার নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পার্থিব ব্যাপারের নিয়ামক-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। রাজনীতি, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রথম আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল। এই মত-বাদের সহায়তায় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হইল। সুতরাং এই মতবাদ হইতে বর্তমান গণতন্ত্রের সূত্রপাত হইল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের একটা অন্তর্নিহিত সত্য আছে যাহা যুগে যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একটা নৈতিক উদ্দেশ্যও আছে। জন-সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই নৈতিক বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া যদি শাসকগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। এই মতবাদের আরও একটি সত্য হইল যে, শাসকবর্গ যদি মনে করেন যে, আইনের কাছে দায়িত্ব ছাড়াও তাঁহাদের অতিরিক্ত একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা উন্নততর হয়।

পরিবারের ক্রমসম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ

(ক) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal Theory)

এই মত অনুসারে রাষ্ট্রকে পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ বলিয়া মনে করা হয়। কতকগুলি পরিবারকে লইয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া জাতি এবং অবশেষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পারিবারিক সংগঠনের ক্রমিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—এই মতবাদের মূল কথা হইলেও

পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। স্যর হেনরি মেইনের মতে আদিম মানব পরিবারগুলি পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) ভিত্তিতে গঠিত ছিল। এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলি হইল প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন এবং এই সংগঠনের কর্তা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। ইনি পিতৃশ্রেষ্ঠ (Patriarch) রূপে পরিচিত ছিলেন ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির উপর ইহার অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। পরিবারের মধ্যে ইনি ছিলেন সর্বময় কর্তা ও সমগ্র পরিবার ইহার নির্দেশে পরিচালিত হইত। পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া যখন গোষ্ঠীতে পরিণত হইল তখন সেই গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হইতেন গোষ্ঠীপতি। এইরূপে কতকগুলি গোষ্ঠী মিলিত হইয়া কালক্রমে রাষ্ট্রে পরিণত হয় ও পিতৃশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের পদে অভিষিক্ত হন। সুতরাং পিতৃশ্রেষ্ঠের নেতৃত্বে একদিন যে পরিবার সংগঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই বর্তমান রাষ্ট্রের অঙ্কুর নিহিত ছিল বলিয়া এই মতবাদে ধরা হয়।

স্যর হেনরি মেইনের বহু পূর্বে অ্যারিস্টটল্ পরিবার হইতে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। স্যর রবার্ট ফিল্মার এই মতবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

সমালোচনা (Criticism)—ম্যাক্লীনান, মর্গান প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রাচীন রোম ও আরও কতিপয় দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলেও এই জাতীয় পরিবার সর্বদেশে প্রবর্তিত ছিল না। বহু দেশে বহু জাতির মধ্যে পরিবার গঠিত হইত মাতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে। বর্তমান যুগেও এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রবর্তিত আছে। তাহা ছাড়া, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের উদ্ভব হইয়াছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার উদ্ভবের বহু পূর্বে। অনেক লেখক আবার মেইনের মতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এমন অনেক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা পরিবার সংগঠন না করিয়া দলবদ্ধভাবে সমষ্টিগত জীবন যাপন করে। কাজেই পরিবারের পরিব্যাপ্তিতে যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে একথা বলা অভ্রান্ত সত্য হইতে পারে না।

(খ) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal Theory)

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সত্যতা মূলতঃ সমর্থন করিলেও পারিবারিক সংগঠনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ হইতে পৃথক্। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ প্রমাণ করিতে চায় যে, আদিম পরিবারগুলি মাতৃশ্রেষ্ঠাকে (Matriarch) কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত হইয়াছিল। পুরুষের পরিবর্তে নারীই ছিল পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী। ম্যাক্‌লীনান, জেংকস্ প্রমুখ এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে মানবসমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে মাতাই ছিলেন সন্তান-সন্ততিদের রক্ষক ও অভিভাবক। নির্দিষ্ট পিতার অবর্তমানে মাতার পরিচয়ে সন্তান সন্ততিদের পরিচয় পাওয়া যাইত। সুতরাং মাতাকে কেন্দ্র করিয়া পরিবার গঠিত হইত। প্রাচীন গ্রীক ও জার্মান জাতিদের মধ্যে এরূপ মাতৃসম্বন্ধীয় জ্ঞাতি-নির্ণয়-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ভারতে মালাবারের নাইরদিগের মধ্যে এখনও পর্যন্ত এই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সংগঠনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

সমালোচনা (Criticism)—পিতৃকর্তৃত্বীয় পরিবারের মতবাদের মত মাতৃকর্তৃত্বীয় মতবাদ সম্পর্কেও একথা বলা চলে যে, এই মতবাদের সমর্থনে কোন ইতিহাস নাই। হেনরি মেইনের মতবাদের সমালোচনা করিয়া জেংকস্ বলিয়াছেন যে, পরিবার হইতে জাতির ক্রমপরিণতির যে মতবাদ মেইন প্রচার করিয়াছেন, কার্যতঃ দেখা যায় যে, পরিণতি হইয়াছে ঠিক বিপরীত দিক হইতে। জেংকসের মতে প্রথম ও আদি দল ছিল জাতি (Tribe), এই জাতি ভাঙ্গিয়া কতকগুলি উপজাতির (Clan) সৃষ্টি হয়, উপজাতি ভাঙ্গিয়া কতকগুলি গোষ্ঠী হইল ও অবশেষে গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া বহুসংখ্যক পরিবারের সৃষ্টি হইল। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে ব্যক্তি একক ও নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি আবার সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সমাজগঠনের প্রাথমিক উপাদান হইয়া দাঁড়াইল।

রাষ্ট্র পরিবার-সম্প্রসারণের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে এই মতবাদ হইতে রাষ্ট্র উৎপত্তির একটা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। পারিবারিক সংগঠন ও পিতৃশ্রেষ্ঠ অথবা মাতৃশ্রেষ্ঠার কর্তৃত্ব আত্মীয়তা-বন্ধনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ যে বন্ধনের ভিত্তিতে এক সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে সংগঠিত হয়, তাহা পারিবারিক বন্ধন অপেক্ষা

শুধু পৃথক নয়, আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জাতিত্ব বা স্বগোত্রীয় বন্ধনের ক্রমপরিণতিই যে রাষ্ট্র-উদ্ভবের একমাত্র কারণ একথা বলা সমীচীন নয়।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত যে মতবাদগুলি প্রচলিত আছে, বলপ্রয়োগ মতবাদ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্র সম্বন্ধে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা এই মতবাদে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই মতবাদ একটা নির্দিষ্ট অভিমত দেয়, দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও এই মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই মতবাদের সারমর্ম হইল যে, শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতিকে শারীরিক শক্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করিয়াছে। এই মতবাদে মানবচরিত্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক কলহপ্রিয়তা ও ক্ষমতালাভের প্রবণতা আছে তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সত্য বটে যে, মানুষ একদিকে সামাজিক জীব, কিন্তু সমাজে বাস করিয়াও মানুষ তাহার আদিম ও স্বাভাবিক কলহপ্রিয়তা ও ক্ষমতালিপ্সার প্রবৃত্তি জয় করিতে পারে নাই। তাই কি ব্যক্তিগত জীবনে কি সংঘবদ্ধ জীবনে মানুষ এই প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুর্বলের উপর তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। এই প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষাই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের অন্যতম কারণ। প্রাচীন মানবসমাজ নানা গোষ্ঠী, দল ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীপতি বা দলপতি নিজের অনুচরদের পূর্ণ আনুগত্য ও সক্রিয় সহযোগিতার বলে অন্য দলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিত। এইরূপে যখন কোন দলপতি তাহার অনুচরদের সাহায্যে যথেষ্ট আয়তনের কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাসনকার্য আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। সুতরাং যুদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের একটা প্রধান উপায়।

'জোর যার মুল্লুক তার,' Might is right,' 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—'None but the brave deserves the fair,' প্রভৃতি প্রবাদবচনগুলি

সব দেশেই প্রচলিত আছে ও এইগুলি. রাষ্ট্র যে তাহার অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়ে অপরিহার্যরূপে বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য দেয়।

বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হইলেই বলপ্রয়োগের কার্যকারিতার অবসান ঘটে না। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যও বলপ্রয়োগ প্রয়োজন। দুর্বল বা অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বিজিত লোকজন সুবিধা পাইলে বিজেতার অধীনতাপাশ হইতে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, সেজন্য বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা সব সময়েই রাখা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলারক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষাকল্পে সব বিজেতাকেই পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ভিত্তি, সম্প্রসারণ ও অস্তিত্ব পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ধারণা করা হয়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিশ্লেষণ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্ণয় করিতে এই মতবাদ বহুদিন পূর্ব হইতে প্রবর্তিত আছে। কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই মতবাদ ব্যবহার করিয়াছেন। মধ্যযুগে খৃষ্টধর্মের মহিমা ও অবাধ প্রতিপত্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ধর্মযাজকগণ এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, রাষ্ট্রশক্তি পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর পোপের ক্ষমতা ঈশ্বরানুমোদিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরাও এই মতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বিরোধী অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়া রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চান। প্রকৃতির বিধানানুযায়ী জীবন-সংগ্রামে একমাত্র যোগ্যতমেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। রাষ্ট্র দুর্বলকে সাহায্য করিয়া জীবনযুদ্ধের ক্ষেত্র সংকুচিত করে ও তদ্দ্বারা প্রকৃতির বিধান কার্যকর হইতে বাধা দেয়। সমাজতন্ত্রবাদী মতের একদল উগ্র সমর্থক বলেন যে, রাষ্ট্র মূলতঃ পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র পশুবল প্রয়োগ করিয়া দুর্বল শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণপূর্বক ধীরে ধীরে তাহাদের ধ্বংস সাধন করিতেছে। কার্ল মার্ক্স, লেলিন প্রমুখ উগ্র সমাজতন্ত্রবাদিগণের মতে রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিলীন হইয়া যাইবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একদল জার্মান দার্শনিক এই বলপ্রয়োগনীতির এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে একমাত্র রাষ্ট্রই হইল শক্তির

নিদর্শন ও বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়। তাঁহারা জগৎ জুড়িয়া জাতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি পরিব্যাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগনীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য নীতি বলিয়া মনে করিতেন। রাষ্ট্র-জীবনদর্শনে এই নীতি কার্যকরী হওয়ার ফলে জার্মান জাতিকে বহুবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত মারাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে।

সমালোচনা—রাষ্ট্রগঠনে পশুবলের দান উপেক্ষণীয় নহে, এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও একমাত্র শারীরিক শক্তির দ্বারাই যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে একথা বলা যায় না। এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা বলপ্রয়োগ নীতিকে রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে না। এ সম্বন্ধে রুশো বলেন, যে অধিকার পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে অধিকারেরও অবসান ঘটে। ইতিহাসের ঘটনাবলীতেও এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন রূপে রাষ্ট্রগঠনের সহায়তা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শারীরিক শক্তি যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইহা মনে করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাত হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, শারীরিক বলই রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান নহে। তৃতীয়তঃ, নৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই মত সমর্থনযোগ্য নহে। যে মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র সে উদ্দেশ্য কখনও সফল করিতে পারে না। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা যদি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠনই এই মহান্ আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, এই মতবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী। গণতন্ত্রের ভিত্তি জনমতের ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীতে বিশ্বাস করে; কিন্তু এই মতবাদ মানবচরিত্রের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু ক্ষুদ্রতার উপর গুরুত্ব দেয়। 'জোর যার মুল্লুক তার'—এই নীতি প্রযুক্ত হইলে শুধু যে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীভাব বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা লোপ

পাইবে। একমাত্র যুদ্ধদ্বারাই আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান হইবে। ফলে, মানুষের বহু যুগের কষ্টার্জিত সভ্যতা ও কৃষ্টি ধ্বংস হইয়া পৃথিবীতে এক অসহনীয় বন্য পরিবেশের সৃষ্টি হইবে।

উপরি-উক্ত সমালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বলপ্রয়োগ নীতি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু সমর্থনযোগ্য না হইলেও একথা মানিয়া লইতে হইবে যে, পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলি এই বলপ্রয়োগ-দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল ও বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলিও শেষ পর্যন্ত এই শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাহা না হইলে পুলিশ ও সেনাবিভাগ স্থায়িভাবে রাখিবার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না। সমস্ত রাষ্ট্রই এই দুইটি বিভাগের বিলোপ সাধন করিয়া রাষ্ট্রের ব্যয়সংকোচ দ্বারা অন্যান্য বহু জনহিতকর কার্য করিতে পারিত। আসল কথা হইল যে, রাষ্ট্রকে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ও বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষাকল্পে পশুবলের প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু সকলেরই রক্ষক ও পালক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনগণদ্বারা সমর্থিত হইবে। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। গণতন্ত্র আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সত্য আজ মানিয়া লইতে হইবে যে, জনসাধারণের সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লব,' ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের 'ফরাসী বিপ্লব' ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের 'রুশ বিপ্লব' স্বৈরাচীর রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের সমাধি রচনা করিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, জনসাধারণ শুধু শাস্তি বা পীড়নের ভয়ে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্বীকার করে তাহা নয়, স্বীকার করে এই কারণে যে, রাষ্ট্রের শক্তি জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত আইন অনুসারে জনসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হয়। তাই বলা হয় জনসাধারণের ইচ্ছা বা সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি—শক্তি নয় (**"Will, not force, is the basis of modern state."**)

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে এই মতবাদটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই মতবাদটি যে শুধু

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করে তাহা নহে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিশ্লেষণেও এই মতবাদটি সহায়তা করে।

রাষ্ট্র একটি সামাজিক চুক্তির ফলে গঠিত হইয়াছে—ইহাই এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও মানুষের পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। এই মতবাদের সারমর্ম হইল যে, মানুষ একদিন সমাজগণ্ডির বাহিরে বাস করিত। সমাজগঠনের পূর্বে মানুষ এমন একটা অবস্থায় বাস করিত যেখানে মনুষ্য-প্রণীত কোন আইন-কানুন ছিল না। মানুষ নিজের ইচ্ছামত তাহার দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত করিত। রাষ্ট্র-উৎপত্তির পূর্বে মানুষের এই প্রাক্‌সামাজিক অবস্থাটি 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' বা 'প্রকৃতির রাজত্ব' (State of Nature) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ ক্রমশঃই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। দুর্বলের উপর সবল অত্যাচার করিলে দুর্বলকে রক্ষা করিবার কোনরূপ আইনসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল না। তাই মানুষ তার আদিম জীবনযাত্রা-প্রণালী পরিবর্তন করিয়া সুসংবদ্ধ জীবনযাপনমানসে নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইল। চুক্তির ফলে মানুষ সমাজবদ্ধ হইল, রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিয়া রাষ্ট্ররূপ সংঘ গঠন করিল ও প্রকৃতির রাজত্বের অনিশ্চয়তার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিল।

এই মতবাদটি বহু প্রাচীন। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য এবং গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল্ প্রভৃতি এই মতবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত লেখকদ্বয় এই মতবাদটি যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন। রোমক লেখকগণ বিশেষ করিয়া পলিবিয়াস্ এই মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁহার মতে রাজার নির্দেশ জনসাধারণ আইন বলিয়া মান্য করে, তাহার কারণ রাজশক্তির উৎস হইল জনসাধারণ। রাজা জনসাধারণের প্রতিনিধি মাত্র। মধ্যযুগে রাজতন্ত্রবিরোধী লেখকগণদ্বারা এই মতবাদটি বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। তাঁহাদের মতে অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত এমন কি হত্যা করিবার অধিকারও প্রজাসাধারণের আছে। কেননা, জনসাধারণের প্রদত্ত ক্ষমতার বলেই রাজা বলীয়ান্ ও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে রাজাকে শাস্তি দিবার অধিকার জনসাধারণের আছে।

এইরূপে ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এই মতবাদ নানারূপে প্রচার করিয়াছিলেন। এই লেখকগণের মধ্যে ইংরাজ লেখক হবস্ ও লক্ এবং ফরাসী লেখক রুশো এই মতবাদের সমর্থনকারী হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের পরেও জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল্ কাণ্ট ও ইংরাজ রাজনীতিবিশারদ বার্কও এই মতবাদের আলোচনা করেন। বর্তমান যুগে এই মতবাদটির আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতই হবস্, লক ও রুশোর অভিমত লইয়া আলোচনা করিতে হয়, কারণ এই তিন ব্যক্তিই চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে—এই মতবাদটি বিশেষ গুরুত্বের সহিত প্রচার করিয়াছেন।

হবসের অভিমত

'লেভিয়াথান্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হবস্ তাঁহার চুক্তিবাদী মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মনুষ্যসৃষ্ট কোনরূপ আইন-শৃংখলা ছিল না—প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। 'জোর যার মুল্লুক তার—এই নীতিদ্বারাই মানুষের অধিকার নির্ধারিত হইত। হবসের মতে মানুষ স্বভাবতঃই অসদ্ ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ করে। তাহার নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই তাহার প্রধান প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে সব সময়েই পরিচালিত হইত। মানুষের জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মানুষ সব সময়ে পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠতর শক্তির বলে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিত। শ্রেষ্ঠতর শক্তি ছাড়া মানুষের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায় বাধা দিবার অন্য কোন পন্থা ছিল না। সুতরাং হবসের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে মানুষ এমন একটা বন্য অবস্থায় ছিল যেখানে তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালী একদল রক্তপিপাসু নেকড়ে বাঘের জীবনযাত্রা প্রণালীর অনুরূপ ছিল। এইরূপ ভীষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল তখন তাহারা একযোগে মিলিত হইয়া এই ভয়াবহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে ইচ্ছুক হইল। তাহারা সকলেই প্রাকৃতিক পরিবেশে যে অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, সেই অবাধ স্বাধীনতা একটা পারস্পরিক চুক্তি

দ্বারা বিনা শর্তে, নিঃশেষে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া তাহাদের নিজেদের একজনের হস্তে সমর্পণ করিল। এই লোকটি সমাজে রাজা বলিয়া পরিচিত হইল ও সমস্ত লোকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইল। জনসাধারণের উপর তাহার অসীম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল।

হবসের মতে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের দুর্বিষহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া একটা চুক্তি করিল—যে চুক্তির ফলে একজন শাসনকর্তার আবির্ভাব হইল। সুতরাং শাসক চুক্তির একটি পক্ষ নহে। মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া—তাহার হস্তে তাহারা তাহাদের তথাকথিত প্রাকৃতিক সমস্ত অধিকার বিনা শর্তে সমর্পণ করে। রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য অর্থাৎ জনগণের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এইজন্য প্রজাগণ রাজার নিকট কোন কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিবে না বা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারিবে না। সুতরাং হবসের মতে রাজা প্রজার উপর কোনরূপ অবিচার করিতে পারেন না। অবিচার করার অর্থ হইল চুক্তি ভঙ্গ করা। রাজা কোনরূপ চুক্তি করেন নাই, কাজেই কোন চুক্তিদ্বারা তিনি বাধ্য নহেন। জনগণই নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে। সুতরাং প্রজাগণ যদি রাজার নির্দেশ অমান্য করে বা বিদ্রোহ করে, তাহা হইলে প্রজাগণই চুক্তিভঙ্গের দোষে দায়ি হইবে। আর যে চুক্তিদ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, সে চুক্তি ভঙ্গ করিলে পুনরায় প্রাকৃতিক পরিবেশের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফিরিতে হইবে। চুক্তিভঙ্গের ফলে সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বিকল হইবে।

উপরি উক্ত যুক্তিদ্বারা হবস্ জনসাধারণের উপর রাজার অব্যাহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে রাজার আদেশই হইল আইন। সুতরাং তাঁহার মতবাদ দ্বারা তিনি স্বৈরাচার সমর্থন করেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী হবসের এই মতবাদের উপর অনেক আলোকসম্পাত করিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন ও তাঁহার এই মতবাদ দ্বারা ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের যথেচ্ছ শাসন-ব্যবস্থার সমর্থন করেন। তাঁহার পুস্তকের নামকরণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'লেভিয়াথান্' শব্দটির অর্থ হইল অতিকায় সামুদ্রিক জীববিশেষ। এই জীবের শক্তিও অপরিসীম। চুক্তির দ্বারা যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার ক্ষমতাও এই সামুদ্রিক জীববিশেষের ক্ষমতার মত অবাধ ও অপরিসীম। হব্‌স্ এমন একটি মতবাদ প্রচার করিলেন, যে মতবাদ মানুষকে অতি নিকৃষ্ট স্তরের জীব বলিয়া চিত্রিত করিল। প্রাকৃতিক রাজত্বে মানুষ যখন বাস করিত তখন তাহার জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পাশব ও স্বল্পায়ু"। চুক্তির দ্বারা সামাজিক জীবন লাভ করিয়াও মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। প্রাকৃতিক পরিবেশের অরাজকতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মানুষ স্বৈরাচারী শাসনের নিষ্পেষণে পূর্ববৎ জর্জরিত হইতে লাগিল। হব্‌সের মতে একটিমাত্র চুক্তি দ্বারা সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি চুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনসম্মত রাজশক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন, কিন্তু যাহারা চুক্তি করিয়া এই রাজশক্তির সৃষ্টি করিল, সেই গণশক্তিকে তিনি অস্বীকার করিলেন। হব্‌স্ তাঁহার পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচনা করিয়াছিলেন।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হব্‌স্ যদিও তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্বৈরতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন তথাপি গণশক্তি যে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির উৎস তাহা বিশেষ গুরুত্বের সহিত বলিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিও জনসাধারণের ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হব্‌স্ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার পুস্তকে এই গণবিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ও বিশেষ করিয়া তাঁহার স্বদেশ ইংলণ্ডে অন্তর্বিপ্লব দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া লোকের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। হব্‌স্ এমন একটি রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে শক্তি স্বীয় ক্ষমতাবলে রাজনৈতিক বিবাদের অবসান ঘটাইয়া দেশে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করিতে পারে।

লকের অভিমত

জন্ লক্‌ও এই সামাজিক চুক্তি-মতবাদের বিশদ্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হব্‌স-প্রবর্তিত মতবাদের মূল সূত্রগুলির সহিত লকের মতবাদের মূল

সূত্রগুলির সাদৃশ্য থাকিলেও দেখা যায় যে, এই উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্।

লকের মতে রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে সমাজের বাহিরে এমন একটি অবস্থায় মানুষ বাস করিত, যে অবস্থাকে তিনিও প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রকৃতির রাজত্ব বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে লক্ প্রাক্-সামাজিক (Pre-social) যুগ না বলিয়া প্রাক-রাষ্ট্র (Pre-political) যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হইত। লকের মতে মানুষ স্বভাবতই দুর্বৃত্তপ্রকৃতি নহে। প্রাক্-রাষ্ট্র যুগে মানুষ যে স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, তাহা শুধু শ্রেষ্ঠতর শারীরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ন্যায়বোধ ও প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মানুষের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে সমস্ত মানুষই ছিল স্বাধীন ও সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার জন্য মানুষ বাধ্য হইয়া এই শান্তিময় প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সমস্ত অসংবদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত, সেগুলি সম্বন্ধে মতভেদ হইলে মীমাংসা করিবার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে দোষীকে শাস্তি দিবার নিরপেক্ষ কোন বিচারক ছিল না। তৃতীয়তঃ, বিচারব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্য কোন শাসন বিভাগও ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই অনিশ্চয়তা দূর করিয়া একটি বিধিসম্মত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন মানুষ উপলব্ধি করিল। এই উপলব্ধির ফলে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। তাহার পর তাহারা দ্বিতীয় চুক্তিদ্বারা একজনকে রাজা করিল। প্রথম চুক্তির দ্বারা একটি রাষ্ট্র গঠিত হইল ও দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা একটি সরকার—রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজার সহিত তাহাদের এই চুক্তি হইল যে, তিনি আইন প্রণয়ন করিয়া লোকের জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা বজায় রাখিবেন ও প্রজারা এই নিমিত্ত তাঁহার অনুশাসন মানিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে। লকের মতে রাজা চুক্তির একজন পক্ষ ও তিনি যতদিন চুক্তির শর্ত মানিয়া কাজ করিবেন ততদিন তিনি জনগণের সমর্থন পাইবেন। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে অর্থাৎ

স্বেচ্ছায় অথবা নিজের অক্ষমতাহেতু শাসনকার্য পরিচালনা করিতে না পারিলে তাঁহার রাজনৈতিক অধিকারও হারাইবেন। এই মতবাদদ্বারা লক্ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লব' সমর্থন করেন।

লক্ তাঁহার স্বদেশের ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার মতবাদটির ব্যাখ্যা করেন। হব্সের মত তিনি মানবচরিত্রকে এত নীচ প্রকৃতির বলিয়া মনে করেন নাই। লকের মতে পর পর দুইটি চুক্তি-দ্বারা রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু হব্স্ এবিষয়ে মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। লকের মতে মানুষ নিঃশেষে সমস্ত ক্ষমতা বিনা শর্তে সরকারের হস্তে অর্পণ করে নাই। জনসাধারণের হস্তেই শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে, যে ক্ষমতার বলে জনসাধারণ অন্যায়কারী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। লকের মতে আইন রাজার নির্দেশ নহে। আইনের উৎস হইল জনমত এবং এই জনমত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। সুতরাং লক্ তাঁহার মতবাদদ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। কিন্তু তিনি এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন যে, তাহার ফলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী হইয়া ওঠে। হব্সের মতবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে যেরূপ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, লকের পরিকল্পিত রাষ্ট্রে সেইরূপ সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়—সরকারের স্থায়িত্ব জনসমষ্টির খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে। হব্স গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তিতে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। লক্ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া গণশক্তিকেই সর্বশক্তির আধার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য হইল এই রাষ্ট্রশক্তি ও গণশক্তির মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজের রাজনৈতিক জীবনধারা অব্যাহত রাখা। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ফরাসী দার্শনিক রুশো এই মতবাদের ব্যাখ্যা করেন।

রুশোর অভিমত

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে রুশো তাঁহার 'কণ্ট্রাক্ট সোস্যাল' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি-সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন। রুশোর এই সামাজিক চুক্তি-মতবাদ সম্বন্ধে

বলা হইয়াছে যে, তিনি হবসের পদ্ধতিতে লকের মতবাদের সম্যক পরিবর্ধন করেন। তিনিও হবস্ ও লকের প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানুষের জীবনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু তাঁহার মতে প্রকৃতির রাজ্যে ছিল আদর্শ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে কোনরূপ কলহ-বিবাদ ছিল না। তাহারা পরস্পরের সহিত পরম সুখে ও সম্প্রীতিতে জীবন যাপন করিত। মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ কোনরূপ কৃত্রিম বন্ধন বা বাধ্যবাধকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না। মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্ত জীবন যাপন করিত। প্রকৃতির রাজ্যের এই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে রুশো মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। এই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে তাহাদের নানারূপ সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন সমস্যাগুলির সমাধান করিবার প্রয়োজন হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রবর্তনের ফলে মানুষের আদিম সরলতা ও পূর্ণ সাম্য অন্তর্হিত হইল। যেদিন হইতে মানুষ এই সমস্ত সমস্যা-সমাধানের জন্য চিন্তা করিতে শিখিল, সেইদিন হইতে তাহাদের অধঃপতন হইল ("The man who reflects is corrupt")। মানুষ ক্রমে ক্রমে আপন-পর বিচার করিতে শিখিয়া স্বর্গরাজ্যের শান্তিময় ও পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতা-বিশিষ্ট জীবন হইতে বঞ্চিত হইল। ইহার ফলে মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদবুদ্ধির আবির্ভাব হইল। শেষ পর্যন্ত এই ভেদবুদ্ধি মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকলহ ও নানারূপ নীচতার সৃষ্টি করিয়া মানুষকে হবস্-বর্ণিত অসহনীয় প্রাকৃতিক অবস্থায় পর্যবসিত করিল। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত মানুষ নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। এই রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া মানুষ প্রাকৃতিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইল। সুতরাং এদিক দিয়া হবস্-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রুশো-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে সাদৃশ্য রহিল।

রুশোর মতে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটিমাত্র চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হবস্ বা লকের মতানুযায়ী তাহারা বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিল না। মানুষ নিজেদের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি করিল যে, তাহারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতা

প্রয়োগ করিত তাহা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ না করিয়া সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার নির্দেশের অধীনে সমর্পণ করিল। সমষ্টিগত এই ইচ্ছাকেই রুশো সাধারণ ইচ্ছা (General Will) আখ্যা দিয়াছেন। রুশো কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কতিপয় জনসমষ্টির উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ না করিয়া সমষ্টির এই সাধারণ ইচ্ছাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু রুশো-বর্ণিত এই সাধারণ ইচ্ছার সহিত হব্‌স্‌-বর্ণিত অবাধ রাজতন্ত্রের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। হব্‌সের 'লেভিয়াথান্' যেরূপ অসীম, চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী, রুশোর সাধারণ ইচ্ছাও তদ্রূপ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। রুশো রাজার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ না করিলেও যে সমষ্টিগত বা সাধারণ ইচ্ছায় ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা কার্যতঃ স্বৈরাচারী শাসকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, রুশো হব্‌সের মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

সাধারণ ইচ্ছা (General Will)—রুশো তাঁহার এই সমষ্টিগত সাধারণ ইচ্ছার নিজস্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ নিজেদের মধ্যে যে পারস্পরিক চুক্তি করে, সেই চুক্তির ফলে এই সাধারণ ইচ্ছার জন্ম। এই চুক্তির কোন দ্বিতীয় পক্ষ নাই। এই চুক্তির দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সমস্ত ক্ষমতা পরিহার কবিয়া সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ করিল। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ক্ষমতাকে সমষ্টিগত ইচ্ছা বা ক্ষমতায় সমর্পণ করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা সাম্যনীতির অবসান ঘটিল না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নবগঠিত রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে যাহা সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা ফিরিয়া পাইল। চুক্তির দ্বারা ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া কেহই পরাধীন হইল না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চুক্তিদ্বারা গঠিত এই সমষ্টিগত ইচ্ছাতে রুশো সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন। এই ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য। একমাত্র সমষ্টিই প্রত্যক্ষভাবে এ-ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। রাষ্ট্রের মধ্যে সমষ্টির এই ইচ্ছা হইল চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। এই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল সমষ্টির মঙ্গলসাধন করা। সাধারণের মঙ্গলসাধন করা যে

ইচ্ছার উদ্দেশ্য নয়, সে ইচ্ছা সমষ্টিগত হইলেও তাহাকে রুশো সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া মনে করেন না। হব্‌সের মত তিনি এই সাধারণের ইচ্ছাকেই সর্বশক্তিময়, অবাধ ও অপ্রতিহত কর্তৃত্বের আধার বলিয়াছেন। যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার সংঘর্ষ হয় তাহা হইলে সাধারণের ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তি তাহার প্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ভ্রান্ত ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াছে ও এরূপ স্থলে সাধারণের ইচ্ছা বলপ্রয়োগদ্বারা ব্যক্তির উপর বলবৎ করা যাইবে। কারণ সাধারণের ইচ্ছা যে শুধু অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী তাহা নয়, ইহা সব সময়েই অভ্রান্ত ও সমষ্টির মঙ্গলবিধায়ক। সুতরাং রুশোর মতবাদ অনুসারে সরকারের কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই। সরকার সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনযন্ত্র মাত্র। সরকার সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশে সাধারণ ইচ্ছাপ্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

লাস্কি প্রভৃতি অনেক লেখক রুশোর এই মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বলিতে পারা যায় যে, কার্যতঃ এই সাধারণের ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংখ্যালঘিষ্ঠের কার্যতঃ কোন কর্তৃত্ব নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠেরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের কার্যে আপত্তি করিয়া বাধা দেয় তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠেরা তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছা জানে না বলিয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য করা যায়। ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতের বিরুদ্ধে বলা চলে যে, ইহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের সমর্থন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা হব্‌সের 'লেভিয়াথানের' মতই স্বৈরাচারী। তবে রুশোর কল্পিত চুক্তিতে রাজার কোন স্থান নাই। হব্‌সের মত তিনি রাজাকে অপ্রতিহত স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার সমর্থন করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হব্‌স্ ও লকের মতবাদের—রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা—সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে রুশো লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। লাস্কি বলেন যে, বর্তমান রাষ্ট্রজীবনে প্রত্যক্ষভাবে এই সাধারণ ইচ্ছা প্রয়োগ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব;

সমালোচনা—এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বহু সমালোচনা হইয়াছে। এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, চুক্তির দ্বারা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই গঠিত হয় নাই। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত মে-ফ্লাওয়ার চুক্তির নজির দেখাইয়া অনেক লেখক ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চুক্তির সম্পাদনকারীরা এই মতবাদে বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন দিনই বাস করেন নাই বা তাঁহারা চুক্তির দ্বারা কোন নূতন রাষ্ট্রও গঠন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে এক দেশ হইতে অন্য দেশে গিয়াছিলেন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অযৌক্তিকও বটে। সভ্যতার নির্দিষ্ট স্তরে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন আদিম মানব প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত তাহারা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এখানে তাহার প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Right) ছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও অধিকার প্রকৃতির রাজ্যে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কেন না প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন কোন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না যিনি মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া, চুক্তি বলবৎ করিতে গেলে আইনের প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক আইন কখনও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই মতবাদের মধ্যে গুরুতর অসংগতি দেখা যায়। চতুর্থতঃ, স্যর হেনরি মেইন-এর মতে আদিম মনুষ্যসমাজগুলি জন্মগত অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন সমাজমধ্যে মানুষের পদমর্যাদা স্থির হইত জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে, চুক্তি বা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নয়। সেই অবস্থার বিবর্তনের ক্রমপরিণতি হইল চুক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা। সুতরাং চুক্তি হইল সামাজিক অগ্রগতির পরিণতির নিদর্শন, এই মত অনুযায়ী ইহার গোড়াপত্তনের নিদর্শন হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদে জনমতকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জনমত সব সময়ই যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জনমত যে সব সময়েই বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহাও নয়, পরন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তিহীন উত্তেজনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া জনমত

স্বৈরাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের ও দশের অনেক অনিষ্ট সাধন করে। ফরাসী বিপ্লবে ও রুশ বিপ্লবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর নামে যে সব অন্যায়, অবিচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দ্বারা অতি সহজেই অনুমেয় যে, জনমতের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র যে সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ষষ্ঠতঃ, এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি অংশীদারী কারবারের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়। অংশীদারী কারবার যেরূপ কতকগুলি লোক তাহাদের সুবিধার জন্য ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, রাষ্ট্রও সেইরূপ কতকগুলি লোকের খামখেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারেরা যে উদ্দেশ্যে কারবার গঠন করে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তদপেক্ষা বহু গুণে ব্যাপক ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ নাগরিক হইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই তাহার জীবনের বহুমুখী প্রবণতা সার্থকতা লাভ করে। পরিশেষে, এই মতবাদের বিরুদ্ধে ইহা বলা যায় যে, যদিও আদিম পিতৃপুরুষগণ একটা চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই চুক্তিদ্বারা উত্তরপুরুষদের বাধ্য থাকিবার কোন সংগত কারণ নাই। বর্তমান পার্লামেণ্ট সভা আইন করিয়া যেমন ভবিষ্যৎ পার্লামেণ্ট সভাকে সেই আইনের দ্বারা বাধ্য রাখিতে পারে না, সেইরূপ আইনের দৃষ্টিতে অতীত যুগে পিতৃপুরুষদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বর্তমান বংশধরদিগকেও বাধ্য করিতে পারে না।

মতবাদের মূল্য নির্ধারণ ও ইহার বাস্তব গুরুত্ব (Evaluation and Practical Importance of the Social Contract Theory)

এই মতবাদ অযৌক্তিক, বিপজ্জনক ও ইতিহাস দ্বারা আদৌ সমর্থিত হয় না, সুতরাং রাষ্ট্র উৎপত্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কে এই মতবাদ কোনরূপ নূতন আলোকসম্পাত করিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ হিসাবে পরিত্যক্ত হইলেও অন্যদিক দিয়া এই মতবাদের যথেষ্ট সার্থকতা আছে ও যে যুগে এই মতবাদ কার্যকর ছিল সে যুগে ও তৎপরবর্তী কালে এই মতবাদ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার

ভিত্তির উপর স্থাপিত—এই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মতবাদটি বর্তমান গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। কোন রাজশক্তি যে ঐশ্বরিক বিধান বা শক্তিবাদের উপর স্থায়ী হইতে পারে না, এই মতবাদ তাহাই প্রচার করিল। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ রাজার হস্তে অবাধ ও দায়িত্বহীন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া স্বৈরাচারের প্রবর্তন করে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ জনগণের ইচ্ছাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া প্রচার দ্বারা স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাইতে সাহায্য করে। এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, যাহার ফলে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারের অবসান হইয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বাণীর উৎসও হইল এই মতবাদটি। আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা দিয়াছিল এই মতবাদটি ও তদবধি আজ পর্যন্ত এই মতবাদটি নিপীড়িত মানবসম্প্রদায়কে আশার বাণী যোগাইতেছে। রাষ্ট্র কোন-একটা বাস্তব চুক্তিদ্বারা গঠিত না হইলেও এই পারস্পরিক চুক্তির ধারণা শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া এই মতবাদটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা আনিতে সক্ষম হইয়াছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া এই মতবাদ ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিতে সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-বিবর্তনের ইতিহাসে এই মতবাদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। বলপ্রয়োগনীতির অবসান ঘটাইয়া শাসক-শাসিতের সম্পর্ক স্থির করিয়া এই মতবাদটি লোকায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করিতে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ, এই মতবাদটিকে বর্তমান গণতন্ত্রের অগ্রদূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

চুক্তিবাদিগণ আধুনিক সার্বভৌমিকতা সংজ্ঞার রূপায়ণে সাহায্য করেন। হব্‌সের মতবাদের মধ্যে আইনগত সার্বভৌমিকতা ধারণার অংকুর দেখা যায় যাহা পরবর্তী কালে জন অস্টিন সুষ্ঠুভাবে বিবৃত করেন। লক্‌ রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। আর রুশো লোকায়ত্ত সার্বভৌমিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। লক্‌ পরোক্ষভাবে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীবিধান নীতিও আলোচনা করেন যাহা পরবর্তী কালে ফরাসী লেখক মণ্টেস্কু বিশদভাবে আলোচনা করেন।

হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (Points of Agreement and Difference between Hobbes, Locke and Rousseau)

সাদৃশ্য—১। উপরি-উক্ত তিনজন লেখকই সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া শাসক-শাসিতের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

২। রাষ্ট্র জন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত—এ বিষয়েও তিনজন লেখক একমত।

৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের অনিশ্চয়তা ও অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ সম্মিলিতভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করে—এ বিষয়েও হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর মধ্যে একমত দৃষ্ট হয়।

৪। এই পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব—একথা তিনজন লেখকই সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিলেও এই তিনজন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই মতবাদের বিশ্লেষণ করেন। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ছিল বিভিন্ন। এইজন্য উপরি-উক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের মতবাদের মধ্যে মূলগত বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়।

বৈসাদৃশ্য—১। তিনজন লেখকই প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানব-জীবনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে তিনজন লেখকই তিনটি পৃথক মত পোষণ করিতেন ও সেইজন্য তিনটি পৃথক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ। তাঁহার মতে মানুষ স্বভাবতই দুর্বৃত্তপ্রকৃতি এবং সর্বদাই অন্যের ক্ষতিসাধন করিয়া স্বীয় ইষ্টসাধনে তৎপর। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বীয় শ্রেষ্ঠতর শক্তি ব্যতীত অধিকার রক্ষা করিবার জন্য কোনপ্রকার আইনসম্মত উপায় ছিল না। লক্‌ ও রুশো উভয় লেখকই রাষ্ট্র-উৎপত্তির পূর্বে প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখ করিয়াছেন। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা দুর্বিষহ হয় নাই। পরন্তু মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস করিত।

রুশো প্রাকৃতিক পরিবেশকে মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আদিম মানব প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব বজায় রাখিয়া বাস করিত। কিন্তু মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা ক্রমশই জটিলতর হইয়া মানুষের আদিম সরলতা ও সাম্যভাব দূরীভূত হইলে সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান দেখা দিল। এই ভেদ-বুদ্ধির আবির্ভাবের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের শেষ অধ্যায়ে মানুষ হব্‌স্‌-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের দুর্বিষহ অবস্থায় উপনীত হইল।

২। হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মনুষ্যকৃত কোন আইন ছিল না। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের জীবন পরিচালিত হইত। মানুষ অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী ছিল এবং অবাধ স্বাধীনতা প্রাকৃতিক পরিবেশে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা আনয়ন করিয়া মানুষের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিল। হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মানুষের প্রাক্-সামাজিক অবস্থা। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের জীবন পরিচালিত হইত। মানুষ স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারী ছিল। মানুষের জীবন হব্‌স্‌-বর্ণিত 'নিঃসঙ্গ, কদর্য, পাশবিক ও স্বল্পায়ু' ছিল না। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল প্রাক্-রাজনৈতিক অবস্থা। রুশোর মতেও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রথম পর্যায়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তাহাদের মধ্যে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ে সভ্যতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম হইয়া তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইল।

৩। হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়াবহ অনিশ্চয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের কয়েকটি অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইল। রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভয়াবহ অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল।

৪। হব্‌সের মত অনুসারে একটিমাত্র চুক্তিদ্বারা রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

লকের মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তি (Social Contract) দ্বারা

রাষ্ট্র গঠিত হয়। তৎপরে দ্বিতীয় একটি রাজনৈতিক চুক্তি (Political or Governmental Compact) দ্বারা সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি শাসনযন্ত্র (রাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত হয়।

হব্‌সের মত অনুসরণ করিয়া রুশোও বলেন, একটিমাত্র চুক্তিদ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ও তৎপরে জনসাধারণ আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের নিছক প্রতিনিধি হিসাবে একটি শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি করে।

৫। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হব্‌স্ রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। লক্ ও রুশো রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

৬। হব্‌সের মতে মানুষের মধ্যে একটি একতরফা চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাজা চুক্তির কোন পক্ষ ছিলেন না—চুক্তির ফলেই রাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। লকের মতে রাজা হইলেন চুক্তির একটি পক্ষ। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর যে দ্বিতীয় চুক্তি হয় তাহা রাজা ও প্রজার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

রুশোর মতে মানুষের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি হয়—ইহাতে রাজতন্ত্রের কোন স্থান নাই।

৭। হব্‌সের মতে মানুষ বিনা শর্তে নিঃশেষে তাহাদের সমুদয় ক্ষমতাই রাজতন্ত্রে সমর্পণ করে—এমন কি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকারও তাহারা সমর্পণ করে।

লকের মতে মানুষ শর্তসাপেক্ষে রাজার হস্তে আংশিকভাবে তাহাদের কতিপয় অধিকার সমর্পণ করে। কিন্তু বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা তাহারা নিজ হস্তে রাখে।

রুশোর মতে মানুষ কোন রাজতন্ত্রে অধিকার সমর্পণ না করিয়া তাহাদের সমবেত সাধারণ ইচ্ছার (General Will) হস্তে অধিকার সমর্পণ করে।

৮। হব্‌সের মতে রাজা (সরকার) চুক্তির পক্ষ না হওয়ার জন্য জনসাধারণের রাজার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাজতন্ত্র একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বিনাশ নাই। জনগণের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার নাই—কারণ জনগণ, নিঃশেষে বিনাশর্তে সমুদয় ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া রাজতন্ত্রে সমর্পণ

করিয়াছে। সুতরাং রাজার বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হইল চুক্তি ভঙ্গ করা আর চুক্তিভঙ্গের ফলে রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বিকল হইলে মানুষকে পুনরায় প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

লকের মতে যেহেতু রাজা চুক্তির একটি পক্ষ, সেইহেতু তিনি চুক্তির শর্ত-দ্বারা বাধ্য। তাঁহার মতে রাজা অক্ষমতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চুক্তি ভঙ্গ করিলে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার আইনসঙ্গত অধিকার জনসাধারণের আছে। সুতরাং বিদ্রোহ দ্বারা সরকারের পরিবর্তন হইলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে।

রুশোর মতেও সরকার চুক্তির পক্ষ নহে—সুতরাং চুক্তি বা সার্বভৌম ক্ষমতার সহিত সরকারের কোন সম্পর্ক নাই। লোকায়ত্ত সার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

৯। হব্‌সের মতে চুক্তিদ্বারা বহু ব্যক্তি এক ব্যক্তির হস্তে (রাজার) বা একটি সংসদের হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করে।

লকের মতে জনগণ আংশিকভাবে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

রুশোর মতে চুক্তির পূর্বে মানুষ সাম্যের অধিকারী ছিল ও চুক্তিদ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া মানুষই তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। রুশোর মতে জনগণের সমবেত সাধারণ ইচ্ছার হস্তে ক্ষমতা সমর্পিত হইল ও এই সাধারণ ইচ্ছার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রত্যেক মানুষ ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরও স্বাধীন ও সমান রহিল।

১০। হব্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ দ্বারা ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বৈরাচার সমর্থনের প্রয়াস পান।

লক্‌ তাঁহার মতবাদ দ্বারা ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লব' সমর্থন করেন।

রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেন।

১১। হব্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ দ্বারা সার্বজনীন সার্বভৌমকে উপেক্ষা করিয়া আইনানুগ সার্বভৌমত্বে সমুদয় ক্ষমতা আরোপ করেন—ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়।

লক্‌ তাঁহার মতবাদ দ্বারা সার্বজনীন সার্বভৌমত্বে সমুদয় ক্ষমতা আরোপ

করিয়া আইনানুগ সার্বভৌমকে উপেক্ষা করেন। ফলে, শাসনযন্ত্র দুর্বল ও অস্থায়ী হয় এবং জনসাধারণের খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হয়।

রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহার মতবাদ সফল হয় না।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব হ্রাস (Decline of the Social Contract Theory)

প্রত্যেক রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সমসাময়িক অবস্থার বিশেষ প্রয়োজন মিটাইতে নূতন নূতন মতবাদের সৃষ্টি হয় এবং প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন মতবাদের পরিবর্তে নূতন মতবাদের জন্ম হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ ও বলপ্রয়োগ মতবাদ দুইটিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সামাজিক চুক্তি মতবাদের আবির্ভাব হয়। কিন্তু মানুষের চিন্তাধারা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক চুক্তি মতবাদও একসময়ে অলীক ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে সমস্ত কারণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান পদ্ধতি আবিষ্কার হইল প্রধান। গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষ কল্পনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মানুষের যে সকল মনঃকল্পিত ধারণা ছিল তাহার আমূল পরিবতন ঘটিল। ফলে, রাষ্ট্র সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে যখনই এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রযুক্ত হইল তখন কল্পনাসাহায্যে গঠিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইল।

দ্বিতীয়তঃ, ডারউইন-প্রবর্তিত বিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) আবির্ভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে এই বিবর্তনবাদ গৃহীত হইল। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক্ষেত্রেও এই মতবাদ প্রয়োগ করিয়া বলা হইল, রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল। কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিনে বা একটি উপাদানের

সাহায্যে রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। সুতরাং বিবর্তনবাদ আবিভাবের ফলে কষ্ট-কল্পিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব হ্রাস পাইল।

তৃতীয়তঃ, পরবর্তী কালে যখন গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ (Theory of Popular Sovereignty) স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সামাজিক চুক্তি মতবাদের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিল না। কারণ, সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাহায্যে যে সত্য অস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ সে সত্যকে স্পষ্টতর ও অধিকতর শক্তিশালী করিয়া প্রকাশ করিল।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও গণতন্ত্রের অভ্যুদয় (Social Contract Theory and Democracy)

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুইটি হইল গণতন্ত্রের মূলকথা। সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সমাজ-জীবনে অপরিহার্য। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার স্থায়িত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা ও সাম্য সামাজিক চুক্তি মতবাদেরই পরিণতি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদে বলা হয় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের মূল কথা সামাজিক চুক্তি মতবাদের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এই মতবাদ ব্যক্তির ন্যায়সংগত অধিকার-গুলির রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবও পরোক্ষভাবে এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বাধীনতা ও সাম্যের এই বাণী যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নিপীড়িত জনসাধারণের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপর

প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। লকের মতবাদ গ্রহণ করিয়া আমেরিকার বিপ্লবিগণ বলেন যে, মানুষ তাহার প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ বিশেষ করিয়া সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যে সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে, সে সরকার কখনই তাহাদের বিনা সম্মতিতে তাহাদিগকে প্রাকৃতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, লক্ স্পষ্টভাবে সরকারের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে সরকার হইল জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সরকারের কাজ জনসাধারণের ইচ্ছা ও সম্মতির দ্বারা পরিচালিত হইবে। সরকার আইন অনুসারে শাসন পরিচালনা করিবে এবং বে-আইনী কাজ করিলে জনসাধারণ আইনভঙ্গকারী সরকার বাতিল করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারিবে। আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হইল: জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গণতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শাসন ও আইন-প্রণয়ন কার্যের পৃথকীকরণ। লক্ তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে এই বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছাকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির আধার বলিয়াছেন। তিনি বলেন শাসন-ব্যবস্থা যখন সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আত্মশাসন বলা হয়। রুশো জনসাধারণের সম্মতিকেই শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে সরকার হইল সমাজের প্রতিনিধিমাত্র এবং সরকার যতদিন সমাজের আস্থাভাজন থাকে ততদিন কাজ করে। কিন্তু রুশোর এই গণতন্ত্রও সমষ্টির স্বৈরাচার দোষে দুষ্ট।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রচারক হব্‌স্ গণতন্ত্র-বিরোধী ছিলেন। হব্‌স্ রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থাকে অভিন্ন করিয়া স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিদ্বারা যে শাসন-ব্যবস্থা গঠিত হয় তাহাতে হব্‌স অসীম ও অবাধ ক্ষমতা আরোপ করিয়া ব্যক্তি-

স্বাধীনতার সমাধি রচনা করেন। তবে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এমন কি চরম স্বৈরতন্ত্র সমর্থক হব্‌স্‌ও বলেন যে, রাজার অসীম ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল জনগণ যাহারা চুক্তি দ্বারা বিনাশর্তে নিঃশেষে পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া রাজতন্ত্রে ক্ষমতা সমর্পণ করে। সুতরাং হব্‌সের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদও গণতন্ত্রের অভ্যুদয়ে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (**Historical or Evolutionary Theory**)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। কোন উপাদানই একক রাষ্ট্র গঠন করে নাই। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য গার্ণার বলিয়াছেন। তিনি সকল রকম মতবাদ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নহে, অথবা পশুবলের ফল নহে, পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা বা পরিবারের সম্প্রসারণদ্বারাও ইহার সৃষ্টি হয় নাই। রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমপ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। গঠনের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের সূত্রপাত হইয়াছিল অতি সাধারণভাবে, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ইহা ক্রমশই জটিলতর হইতে লাগিল।

রাষ্ট্রের সূত্রপাত কিভাবে হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তবে বর্তমান যুগে জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রের আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্র গঠনের কয়েকটি অপরিহার্য উপাদান এবং এই দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। এইজন্য ঐতিহাসিক মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রথমতঃ, মানুষ সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়।

মানুষের এই **সমষ্টিগত**ভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধ্যেই রাষ্ট্রগঠনের বীজ উপ্ত আছে। রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। আদি সমাজে **রক্তসম্পর্কের বন্ধন** (Kinship) মানুষকে পরিবার বা গোষ্ঠীতে একত্রিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পরিবার ও গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হইয়া বৃহত্তর উপজাতি বা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে রক্তসম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষুদ্র পরিবার হইতে বৃহত্তর ও জটিলতর জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালে **ধর্মের বন্ধন** (Religion) রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। আদিম মানবজাতি নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের চক্ষে দেখিত। সমাজের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত চতুর ব্যক্তি নিজেদের এই নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়া অন্য লোকগুলির উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিল। এই লোকগুলি সমাজের রক্ষক বা নেতা বলিয়া পরিচিত হইলেন। কালক্রমে যখন ধর্মীয় সংগঠনগুলির সৃষ্টি হইল তখন ইঁহারা ফ্যারাও, পোপ বা খলিফা নাম ধারণ করিয়া সমাজে ধর্মগুরুর পদমর্যাদা লাভ করিলেন। এইজন্যই দেখা যায় যে, প্রাচীনকালের রাজারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মগুরু বলিয়াও অভিহিত হইতেন। বর্তমান যুগেও ইংলণ্ডের রাজা প্রচলিত ধর্মমহামণ্ডলের অধিকর্তা (Head of the Established Church) বলিয়া পরিচিত। এইরূপে রাজনৈতিক চেতনা-উন্মেষের পূর্বে ধর্মই মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করিয়া রাষ্ট্রের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের কোন এক স্তরে **পাশবিক বলের** (Force) কার্যকারিতার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। মানুষ যখন তাহাদের ভ্রাম্যমাণ জীবন পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের দলপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে নির্দিষ্ট ভূভাগে বসবাস আরম্ভ করিল তখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে প্রবর্তিত হইলে এই সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনের জন্যই মানুষের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের ধন, মান ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ফলে, প্রত্যেক সমাজে একজন

দলপতির উদ্ভব হইয়াছে আর এই দলের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। যুদ্ধকালে যিনি নেতা বা দলপতি নির্বাচিত হইতেন শান্তির সময়েও তাঁহার কর্তৃত্ব কালক্রমে স্বীকৃত হইল। এইরূপে সামরিক প্রয়োজনে মানুষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

রাষ্ট্র-উৎপত্তির ইতিহাসে **'শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতা' (Consent of the people)** বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সমাজের কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল ও রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া, রাষ্ট্র যে জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত—এই মতবাদ জনসমাজে প্রচার করিলেন। ফলে, জনসমাজ তাহাদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। এই রাজনৈতিক চেতনা (Political Consciousness) জনসমাজে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র জনমতের ভিত্তিতে রূপায়িত হইল।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। জনসমাজে **জাতীয়তাবোধ (Principle of nationality)** যতই শক্তিশালী হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে জাতির দাবী স্বীকৃত হইয়া রাষ্ট্রগুলি 'একজাতি একরাষ্ট্র' ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। সেইজন্য বর্তমান যুগে বিশালায়তন সাম্রাজ্যের পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নানাদিক দিয়া পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহার স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভবও নয়, আর প্রয়োজনের দিক দিয়াও অপরিহার্য নয়। তাই এক শতাব্দী পূর্বের স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী রাষ্ট্র আজ তাহার নিজের ও পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদে (Internationalism) তাহার অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা অন্ততঃ আংশিকভাবে পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে।

অর্থনৈতিক কারণগুলিও (Economic Forces) রাষ্ট্রের বিবর্তনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-উদ্ভবের ফলে সম্পদের

উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করা বর্তমান রাষ্ট্রের একটি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন রাষ্ট্রই তাহার উদ্দেশ্য সার্থক করিতে পারে না। এই অর্থনৈতিক কারণে বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র হইতে ক্রমশঃই সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। মানুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণা ও কার্য-কারিতা জন্মিতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে হয়ত পরিবারের মতন সহজ ও সরল সংগঠনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল, তারপর রাজনৈতিক চেতনা-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রগঠনে এই বিভিন্ন উপাদানগুলি যে সব সময়ে পৃথকভাবে কাজ করিয়াছে তাহা নয়। রাষ্ট্রবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই উপাদানগুলি সম্মিলিতভাবেও রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করিয়াছে। মানুষ যতই সভ্য হইতেছে রাষ্ট্রসম্বন্ধে তাহাদের ধারণাও ততই পরিবর্তিত হইয়া রাষ্ট্র আজ এক অভূতপূর্ব সংগঠনে রূপায়িত হইয়াছে। মানবজীবনে বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রভাব যে শুধু সুদূরপ্রসারী তাহা নয়, মানুষ আজ রাষ্ট্রকে সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করে। সুতরাং রাষ্ট্র-উৎপত্তি সম্পর্কে ডাঃ গার্ণার ও বার্জেসের অভিমত প্রণিধানযোগ্য।

"The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family." (Garner)

এখন জিজ্ঞাস্য হইল যে, রাষ্ট্র যদি ঈশ্বর, পশুবল, চুক্তি বা পরিবার সম্প্রসারণ দ্বারা সৃষ্ট না হয় তাহা হইলে ইহার উৎপত্তির উৎস কোথায়? বার্জেস এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন: "The state is a continuous development of human society out of grossly imperfect beginning through crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organisation of mankind." (Burgess)

রাষ্ট্র হইল মানবসমাজের দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের ক্রমোন্নত ফল।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

(Theories of the Nature of the State)

বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন রাষ্ট্র একটি ঐতিহাসিক বিবর্তন-প্রসূত সংগঠন মাত্র। নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণ রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক সংগঠন বলিয়া বর্ণনা করেন। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রকে শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন, অপর পক্ষে ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্‌গণ রাষ্ট্রকে আইন-প্রণয়ন ও আইনসংগত অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি আইন-মূলক সংগঠন বলিয়া বিবেচনা করেন। উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকগণ তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত রাষ্ট্রে এরূপ গুণ ও উদ্দেশ্য আরোপিত করিয়াছেন যাহাতে রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থিত হয়। এইরূপে বিভিন্ন চিন্তাধারার ফলে রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে রাষ্ট্র সম্পর্কে কয়েকটি বিভিন্ন মতের আলোচনা করা হইল।

১। ইতালীয় দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্র' শব্দটি প্রবর্তন করেন। তিনি রাষ্ট্রকে শক্তি-ভিত্তিক বলিয়া বর্ণনা করেন। বার্নহার্ডি, ট্রিস্‌কে প্রভৃতি জার্মান লেখকগণও রাষ্ট্রকে শক্তির একমাত্র ধারকরূপে কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রে অবাধ ক্ষমতা আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের এই একমাত্র শক্তি-ভিত্তিক কল্পনা সমর্থনযোগ্য নহে। শক্তি রাষ্ট্র অস্তিত্বের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, রাষ্ট্র-শক্তি যখন ন্যায্য অধিকার রক্ষায় প্রযুক্ত হয়, একমাত্র তখনই তাহা সমর্থনযোগ্য।

২। আইনবিদ্‌গণ রাষ্ট্রকে আইন-প্রণয়ন ও ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা করেন। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, আইন-প্রণয়ন ও আইন-বলবৎ করা রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নহে। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রের আরও বহু উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং আইনবিদ্‌গণের এই মতবাদ ভ্রান্ত না হইলেও অসম্পূর্ণ।

৩। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রকে মানবজীবনের একটি অভিশাপরূপে গণ্য করেন এবং যতশীঘ্র রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত জীবনে অবাঞ্ছিতরূপে হস্তক্ষেপ দ্বারা ব্যক্তির স্বাভাবিক ও সাবলীল ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং রাষ্ট্রের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে এরূপ অতিরঞ্জিত বিরোধী মনোভাব কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কোন কোন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রমাণিত হইলেও এ যাবৎ ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্র যে সাহায্য করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

৪। বহুত্ববাদিগণ (Pluralists) বলেন, রাষ্ট্র সমাজস্থিত বহুবিধ সংঘের অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক সংঘ, ধর্মীয় ও সামাজিক অন্যান্য সংঘগুলির ন্যায় রাষ্ট্রও একটি সংঘ। প্রত্যেকটি সংঘের ক্ষমতা ইহার কার্যের আনুপাতিক হইবে। যেহেতু রাষ্ট্রের কার্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সেইহেতু রাষ্ট্রকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করা যুক্তিযুক্ত নয়। বহুত্ববাদিগণের মতে সমাজস্থিত অন্যান্য সংঘগুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিবার রাষ্ট্রের কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু বহুত্ববাদিগণের রাষ্ট্রবিরোধী এই চরম মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা না থাকিলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নহে। সামাজিক জীবনের এই ঐক্য ও শৃংখলা একমাত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি ও রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং সামাজিক জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব অপরিহার্য।

৫। কার্ল মার্কস্ প্রমুখ সমাজতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রকে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে সৃষ্ট একটি সংগঠন বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র-সংগঠনের সাহায্যে ধনী দরিদ্রকে এবং সবল দুর্বলকে শোষণ করে। সমাজে যে সম্প্রদায়ের হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সেই সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করে। সুতরাং শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। উপরি-উক্ত মতবাদ আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ, কোন কোন রাষ্ট্র হয়ত সময় বিশেষে শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও সব রাষ্ট্রকেই শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষক বলিয়া বিবেচনা করা সমীচীন

নহে। শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক রাষ্ট্র না বলিয়া বিকৃত রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল রাষ্ট্রই সাধারণ স্বার্থের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হয়।

৬। স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রে অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তিমানবকে উপেক্ষা করা হয়। এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতালীর একনায়ক মুসোলিনি স্পষ্টভাবে এই মতবাদ নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"সকলেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, কেহই রাষ্ট্রের বাহিরে নয়, কেহই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়।" ("All within the state, none outside the state, none against the state.") এই মতবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে, যে মতবাদ ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না, যে মতবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পায়, সে মতবাদ আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য বিফল হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র অস্তিত্বের কোন সমর্থন নাই।

রাষ্ট্র সম্পর্কে উপরি-উক্ত মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, কোন মতবাদই এককভাবে রাষ্ট্র অস্তিত্বের যুক্তিসম্মত সমর্থন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রশ্ন হইল তাহা হইলে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, রাষ্ট্র হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও চরম সংগঠন। এই সংগঠনের সাহায্যেই মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে পারে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল সত্যই বলিয়াছেন, 'আইন ও ন্যায়বোধ দ্বারা মার্জিত মানুষই হইল শ্রেষ্ঠ জীব। আর আইন ও ন্যায়বোধবিহীন মানুষ হইল নিকৃষ্ট জীব।' রাষ্ট্র মানুষের মধ্যে এই আইনানুগতভাব ও ন্যায়বোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সংগঠন কোন শ্রেণী-স্বার্থের ধারক নহে, ইহা সাধারণ স্বার্থের রক্ষক। সামাজিক অন্যান্য সংঘগুলির উদ্দেশ্য হইল সংঘগুলির সদস্যগণের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করা, অপর পক্ষে রাষ্ট্র হইল সার্বজনীন স্বার্থের প্রতিনিধি ও রক্ষক। সার্বজনীন স্বার্থের রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র সামাজিক

সমুদয় সংঘের পারস্পরিক সম্পর্ক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে সামাজিক জীবনে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিতে না পারে। বিরোধের অবসান ঘটাইয়া বহুর মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধনপূর্বক সার্বজনীন স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক যতই জটিল আকার ধারণ করিতেছে, সামগ্রিকভাবে সামাজিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই জটিল সম্পর্কের চরম নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে।

রাষ্ট্র মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য—এই গ্রীক মতবাদ গ্রহণযোগ্য না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র হইল সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট সংগঠন—একমাত্র যে সংগঠনের সাহায্যে সার্বজনীন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। মানুষের হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সুতরাং যে রাষ্ট্র এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম, সেরূপে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সমর্থন দূরের কথা, সে রাষ্ট্র ইহার নাগরিকগণের আনুগত্য বা বশ্যতার দাবী করিতে পারে না। পুলিশি রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে আজ কল্যাণ-ব্রতী রাষ্ট্রের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল ব্যক্তি নির্বিচারে প্রত্যেক মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা।

আইনমূলক মতবাদ (Juristic or Juridical Theory)

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আইন ছাড়া রাষ্ট্রের কোন পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা নাই। সুতরাং রাষ্ট্র হইল একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যকলাপ শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ।

আইনমূলক মতবাদ সম্পর্কেও বিভিন্ন শ্রেণীর আইনবিদ্‌গণ একমত নহেন। বিশ্লেষণমূলক শ্রেণীর আইনবিদ্‌গণের (Analytical Jurists) মতে রাষ্ট্রই হইল আইনের একমাত্র উৎস। রাষ্ট্রের কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা, ব্যাখ্যা করা ও আইন বলবৎ করা। যে আইন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত বা প্রযুক্ত হইবার নির্দেশ পায় নাই তাহা বিচার বিভাগ কর্তৃক আইনরূপে প্রযুক্ত বা কার্যকর হইতে পারে না। অপরপক্ষে ঐতিহাসিক

আইনবিদ্‌গণের (Historical Jurists) মতে রাষ্ট্রই আইনের একমাত্র উৎস হইলেও সব আইনই যে রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ হইতে হইবে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন দেশে প্রচলিত চিরাচরিত প্রথাগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ না হইলেও সর্বত্র আইন বলিয়া গণ্য হয়। ডুগুই প্রভৃতি লেখকগণ আইনকে রাষ্ট্রের উপরে স্থান দিয়া বলেন যে, রাষ্ট্র-জন্মের পূর্বেও আইনের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং রাষ্ট্র আইন-নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রের আইনের বিধান লংঘন বা অবহেলা করিবার কোন অধিকার নাই।

অনেক লেখক আবার রাষ্ট্রের আইনগত ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়াছেন। ব্যক্তির যেমন আইনগত অধিকার ও কর্তব্য আছে রাষ্ট্রেরও তদ্রূপ অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে পারে ও নিজেও অভিযুক্ত হইতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রের আইনমূলক ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে. কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব কল্পনা-প্রসূত—বাস্তব নহে। কারণ, রাষ্ট্রান্তর্গত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়া রাষ্ট্রের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা নাই।

জৈব মতবাদ (Organic or Organismic Theory)

সামাজিক চুক্তি প্রভৃতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক যে সমস্ত মতবাদ রাষ্ট্রের কৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সেই মতবাদগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একদল লেখক এই জৈব মতবাদ প্রবর্তন করেন। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহ বা উদ্ভিদ্‌দেহের সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতিগত ও গঠনগত সমতা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। জীবদেহের সজীবতা হইতে শুরু করিয়া জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যু, এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলই অনুরূপভাবে রাষ্ট্রদেহে দেখা যায়। এই সাদৃশ্যগুলি হইতে এই মতবাদে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, রাষ্ট্র প্রাণবন্ত জীবদেহের অনুরূপ একটি দেহী ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণবন্ত জীবের প্রকৃতির অনুরূপ।

রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিবার প্রয়াস মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রথম পর্যায় হইতে শুরু হইয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও রোমান দার্শনিক সিসারোর লেখার মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে

পাওয়া যায়। মধ্যযুগের মারসিগ্‌লিও, অক্‌হাম প্রভৃতি দার্শনিকেরা এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তারপর সামাজিক চুক্তি-মতবাদের লেখক হব্‌স্‌ ও রুশো এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। হব্‌স্‌ রাষ্ট্রকে একটি অতিকায় সামুদ্রিক জীবের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার পুস্তকের নামকরণ করিয়াছিলেন 'লিভিয়াথান্‌'। রুশোর মতে জীবদেহের মত রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। সরকার হইল রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক, আর রাজস্ব হইল ইহার শোণিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই মতবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ববর্তী লেখকগণ রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহ বা উদ্ভিদ্‌দেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূপ একটি দেহী বলিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা সপ্রমাণিত করিবার প্রয়াস পান। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই মতবাদের উগ্র সমর্থকগণ রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান তাহা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন। জার্মানীতেই সর্বপ্রথম এই জৈব মতবাদ ইহার চরম রূপ পরিগ্রহ করে। জার্মান দার্শনিক ব্লুনৎস্লি এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। ব্লুনৎস্লির মতে রাষ্ট্র মানুষের প্রতিমূর্তি। তিনি রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রকে পুরুষ-প্রকৃতি ও ধর্মসংগঠনকে নারী-প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করেন। ইংরাজ দার্শনিক স্পেনসারের হস্তে এই মতবাদ পূর্ণ ও চরম রূপ পরিগ্রহ করে। স্পেনসার সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই মতবাদের বিশ্লেষণ করিয়া বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। স্পেনসার রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে শুধু সেগুলির উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, উভয়ের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য আছে সেগুলিরও উল্লেখ করেন।

সাদৃশ্য—রাষ্ট্র ও জীবদেহের পরস্পরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে: ১। জীবদেহ যেরূপ কতকগুলি জীবকোষ-দ্বারা গঠিত, রাষ্ট্রও সেইরূপ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। ২। জীবদেহের প্রত্যেকটি কোষ যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও সমস্ত কোষ সম্পূর্ণ দেহের উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ রাষ্ট্রভুক্ত মানুষও প্রথমতঃ পরস্পরের উপর নির্ভশীল ও দ্বিতীয়তঃ সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ৩। জীবদেহ ও রাষ্ট্র উভয়েরই জীবন

আরম্ভ হয় ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে। তাহার পর তাহারা একই নিয়মে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশঃই জটিল রূপ গ্রহণ করে। ৪। জীবদেহের কোন একটি কোষ বিনষ্ট হইলে সমস্ত দেহের যেরূপ কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এতদ্ব্যতীত হার্বার্ট স্পেনসার উভয়ের মধ্যে কতকগুলি গঠনগত সাদৃশ্যের অবতারণা করেন। ৫। তাঁহার মতে জীবদেহের যেরূপ শিরা-উপশিরা আছে, রাষ্ট্রদেহে তদ্রূপ যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। জীবদেহে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যেরূপ স্নায়ুব্যবস্থা আছে, রাষ্ট্রেদেহের বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তদ্রূপ সরকার আছে। ৬। রাষ্ট্র ও জীবদেহ উভয়েই ক্ষয়িষ্ণু। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে নূতন অংশ গঠিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলির স্থান পূরণ হয়। রাষ্ট্রেরও তদ্রূপ বৃদ্ধ, অকর্মণ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকের স্থান নবজাত ব্যক্তির দ্বারা পূরণ হয়।

সমালোচনা

জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি গঠনগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উভয়ের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কোন দুইটি জিনিসের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাহাদের অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই মতবাদের সমর্থকগণ যে সাদৃশ্যগুলির ভিত্তিতে উভয়কে অভিন্ন বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন সেই সাদৃশ্যগুলি শুধু বাহ্যিক, মূলগত নয়। জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একদিকে যেরূপ বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখা যায়, অপর দিকে সেইরূপ বহু মূলগত বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে এবং সেই বৈসাদৃশ্যগুলি এত সম্যক্ পরিস্ফুট যে, রাষ্ট্রকে কোন মতেই জীবদেহের অনুরূপ বলা চলে না।

১। প্রথম বলা যায় যে, জীবদেহের কোন একটি কোষকে জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক মানুষেরই একটা পৃথক্ সত্তা আছে ও রাষ্ট্রের বহির্ভূত হইলেও তাহার পৃথক্ সত্তা বজায় থাকে।

২। জীবদেহের কোষগুলির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—জড়বস্তুর মত তাহাদের কোন নিজস্ব বুদ্ধি বা পৃথক্ ইচ্ছা নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই

একটা স্বীয় বুদ্ধি বা পৃথক্ ইচ্ছাশক্তি আছে এবং এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই মানুষ স্বীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে।

৩। স্পেন্সার নিজেই বলিয়াছেন যে, জীবদেহের প্রত্যেকটি জীবকোষ পরস্পরের সহিত দৃঢ় সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু সমাজে মানুষ পরস্পরের সহিত জীবকোষগুলির মত দৃঢ় সম্বন্ধযুক্ত নয়। তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে।

৪। জীবদেহের চেতনা শুধু তাহার মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত আর রাষ্ট্রের চেতনা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত আছে।

৫। পরিশেষে বলা যায় যে, জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন জীবদেহ হইতে জন্মলাভ করিয়া আভ্যন্তরীণ শক্তির বলে প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে একথা বলা চলে না। অনেক রাষ্ট্র শক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং জীবদেহের জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর সঙ্গে রাষ্ট্রের জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। জীবদেহের পরিণতি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, কিন্তু রাষ্ট্রের বিনাশ নাও হইতে পারে।

অধিকন্তু এই মতবাদের অনেক সমর্থক রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান। ফলে রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়।

মূল্যনির্ধারণ ও কার্যকারিতা

বর্তমান যুগে এই মতবাদ, অসার, অলীক ও বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও ইহার কিছু অন্তর্নিহিত সত্য আছে ও সে সত্যকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। দেহের ন্যায় রাষ্ট্রও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির উপর নির্ভরশীল এবং এই বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির উৎকর্ষের উপর রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। মানবদেহের কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যেমন সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রের কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমগ্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দূষিত হয়। সুতরাং এই মতবাদে রাষ্ট্রভুক্ত জনগণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

এই মতবাদ দুইটি বিভিন্ন দিক্ দিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রথমতঃ, স্পেনসার প্রমুখ লেখকগণ এই মতবাদের

ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়। জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা ছাড়া রাষ্ট্রের আর করণীয় কিছুই থাকে না। অপর পক্ষে এই মতবাদ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ফলে, সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে। জার্মান দার্শনিকেরা এই মতবাদের ভিত্তিতে তাঁহাদের আদর্শবাদ প্রচার করিয়া রাষ্ট্রকে একটি অপৌরুষেয় প্রতিষ্ঠান ও সর্বশক্তির আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

আদর্শবাদ (Idealist or Absolute Theory)

রাষ্ট্র সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি হইল সম্পূর্ণ বাস্তবতাবর্জিত কল্পনা মাত্র। মানুষের কল্পনায় রাষ্ট্রের আদর্শ রূপ কি হইতে পারে এই মতবাদটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা করিয়া এক আদর্শ ভিত্তির উপর এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে এই মতবাদের জন্মদাতা বলা হয়। প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত 'রিপাবলিক্' গ্রন্থে এই মতবাদের ভিত্তিতে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন। এই রাষ্ট্র ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও মানুষ এই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাহার জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া পূর্ণ পরিণতির পথে চালিত করিতে পারে। প্লেটোর মত আদর্শবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিলেও অ্যারিস্টটল্ সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনিও রাষ্ট্রের এই আদর্শ-পরিণতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পিত রাষ্ট্র একেবারে বাস্তবতাবর্জিত কল্পনা মাত্র ছিল না।

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট, ফিচে ও বিশেষ করিয়া হেগেলের হস্তে এই মতবাদ এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করে। হেগেল রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র এক অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান ও এই প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়া একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে—যে ব্যক্তিত্ব সকল ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে। এই ব্যক্তিত্বের আবার একটা নির্দিষ্ট নৈতিক মান

আছে। এই নৈতিক মানের মাপকাঠিতে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অধিকার ও সমস্ত প্রচেষ্টার পরিমাপ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের এই ব্যক্তিত্ব শুধু আত্মসচেতন নয়, ইহা সমস্ত কর্মপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টার উৎস। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বার্থ কখনই এই রাষ্ট্রের ইচ্ছার পরিপন্থী হইতে পারে না, কারণ রাষ্ট্র হইল সকল সভ্যতা, কৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও প্রচেষ্টার উৎস। রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করাই হইল জনগণের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য, কারণ রাষ্ট্রের এই অপ্রতিহত ক্ষমতা ভগবৎপ্রদত্ত।

হেগেলের শিষ্য বার্ণহার্ডি ও ট্রিট্স্কের হস্তে এই মতবাদ চরম পরিণতি লাভ করে। তাঁহারা রাষ্ট্রকে শুধু একটি অপরিসীম শক্তির আধার বলিয়া বর্ণনা করেন এবং এই শক্তির নিয়ত প্রয়োগদ্বারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধের দ্বারা করায়ত্ত করিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা রাষ্ট্রের এক মহান্ কর্তব্য বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে যুদ্ধ না করিলে রাষ্ট্রের পৌরুষের হানি হয়, সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী। অনেকে মনে করেন যে, এই আদর্শবাদী জীবনদর্শনের জন্যই জার্মান জাতি এতটা রাজভক্ত ও যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পর পর দুইটি মহাসমরে জার্মান জাতির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন রাষ্ট্রজয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও জার্মান জনসাধারণের নির্বিচারে রাষ্ট্রনির্দেশ পালন করিবার কর্তব্যবোধ প্রমাণিত হয়।

ইংলণ্ডেও আদর্শবাদী রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনা হয়। এই আলোচনা সম্পর্কে গ্রীন্, ব্রাডলে ও বোসাংকের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ইহারা জার্মান আদর্শবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকের মতে রাষ্ট্র সর্বপ্রধান সংগঠন ও সর্বশক্তির মূল উৎস হইলেও ইহার কার্যক্ষেত্রের ও শক্তির একটা সীমা আছে। মোট কথা, ইংরাজ আদর্শবাদীরা রাষ্ট্ররূপ দেবতার পাদপীঠতলে ব্যক্তিকে বলিদান দিতে চাহেন নাই।

সমালোচনা।

এই মতবাদের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। রাষ্ট্র সমাজ হইতে শুধু ভিন্ন নয় পরন্তু রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সমাজের গণ্ডি অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণতর।

এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সমাজের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সর্বময় সর্বাত্মক বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি পররাষ্ট্র ব্যাপারে রাষ্ট্রের ইচ্ছাই হইল সব ইচ্ছার উর্ধ্বে। এই ধারণার বশবর্তী হইলে একদিকে যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব লোপ পায়। এই মতবাদে রাষ্ট্রের যে স্বাধীনতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের কথা বলা হয়, তাহা স্বৈরাচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর স্বৈরাচারের পরিণতি হইল যুদ্ধবাদ।

মূল্যনির্ধারণ—এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, সংঘ হিসাবে ইহা রাষ্ট্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই যে নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার ভোগ করে ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিয়া নাগরিক অধিকার ভোগে সহায়তা করে—এই সত্যটি এই মতবাদে বিশেষ জোরের সহিত বলা হইয়াছে। সুতরাং নাগরিক অধিকারের স্রষ্টা ও রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র নাগরিকদের নিকট চরম আনুগত্য ও ত্যাগস্বীকার দাবী করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত এই মতবাদ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়া মানুষকে আদর্শ নাগরিক হইতে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদ (Marxist Concept of the State)

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ জানিতে হইলে মার্কস-প্রবর্তিত সমাজ-তন্ত্রবাদ সম্পর্কে একটু পরিচয় আবশ্যক। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ও শ্রেণী-সংগ্রামের উপরই মার্কস্ প্রধানতঃ তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মার্কসের মতবাদ তাঁহার 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' (Communist Manifesto) ও 'মূলধন' (Capital) নামক দুইখানি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। মার্কস কর্তৃক যে নূতন জীবনদর্শন ও নূতন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারিত হইল তাহার ফলে পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধিত হইল। ডারউইন যেরূপ জৈব বিবর্তনবাদ উদ্ভাবন করিয়া জীব জগতের উৎপত্তির ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, মার্কসও

সেইরূপ মানব-ইতিহাসের বিবর্তনবাদ আবিষ্কার করিয়া মানব-ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেন।

মার্কসীয় মতবাদের মূল সূত্র হইল যে, মানবজীবনে উচ্চাঙ্গ জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলি অন্য জাতীয় চাহিদা অপেক্ষা তীব্রতর এবং মানুষের মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি অন্যান্য চাহিদাগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপেক্ষা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। উপরি-উক্ত সূত্রের ভিত্তিতে মার্কস্ সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় যুগে যুগে যে পরিবর্তন দেখা যায়,– তাহার মূল কারণ হইল পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন। অর্থনৈতিক জীবনে উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রভূতভাবে মানুষের, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট কালে একটি সমাজ ইহার কলা, দর্শন, আইন, ধর্ম, আচার, রীতি-নীতিসহ যে বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা যে ধাঁচে গঠিত হয়, তাহা তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থাই সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো স্থির করে। তিনি আরও বলেন যে, যুগে যুগে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুরূপ একটি সমাজ-ব্যবস্থা ও অনুরূপ শ্রেণী-প্রাধান্যের অভ্যুদয় ঘটে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-ইতিহাসের ব্যাখ্যা করাকেই ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভাষ্য বলা হয়।

মানব-ইতিহাসের এই জড়বাদী ব্যাখ্যা মার্কস্ ইতিহাসের দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিকার যুগকেই মার্কস্ মানবসমাজ বিবর্তনের আদি অধ্যায় আখ্যা দিয়াছেন। এই যুগে শিকারের যন্ত্রপাতি ও শিকারলব্ধ পশু সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। শিকার যুগের এই অপরিণত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাও অপরিণত সাম্যবাদী ধাঁচে গঠিত ছিল।

শিকারবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন পশুপালন বৃত্তি গ্রহণ করিল তখন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কাঠামোর

পরিবর্তন ঘটিল। পশুপালন যুগে সমাজে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর আবির্ভাব হইল—পশুর মালিক শ্রেণী ও পশুর মালিকানা-বিহীন শ্রেণী। এই যুগে সর্বপ্রথম বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় অসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রেণী-সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

পশুপালন বৃত্তি গ্রহণের ফলে মানবসমাজে যে অসাম্যের সূত্রপাত হয়, পরবর্তী কৃষিযুগে এই অসাম্য আরও বৃদ্ধি পায়। কৃষিযুগে কৃষিকার্যই ছিল ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় এবং এই কারণে জমির মালিকগণ সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া ভূমিহীন শ্রেণীকে একান্তরূপে নিঃসহায় ও জমির মালিকগণের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলে। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে ভূমিদাস (Serf) শ্রেণীর আবির্ভাব হয় এবং জমির মালিক শ্রেণী ও ভূমিদাস শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটিতে থাকে।

উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটে। যন্ত্র সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রভূত পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। এই কারণে যান্ত্রিক যুগে মূলধনের মালিক কৃষিযুগের জমিদার শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করিল। অর্থের বলে মূলধনের মালিকগণ উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে বিত্তহীন শ্রেণী অনন্যোপায় হইয়া জীবিকা সংস্থানের উদ্দেশ্যে মালিক শ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। মালিক শ্রেণী এই বিত্তহীন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া -শ্রমজীবিগণকে তাহাদের শ্রমদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য শ্রমিকগণের পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে লাগিল। শ্রমদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মূল্য ও শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরি এই উভয়ের পার্থক্যকেই মার্কস্ 'উদ্বৃত্ত মূল্য' (Surplus Value) আখ্যা দিয়াছেন। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের সমগ্র পরিমাণই শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া মালিক শ্রেণী আত্মসাৎ করেন। এইরূপে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া মালিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতাও অধিকার করেন। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার বলে তাঁহারা সাহিত্য, কলা, ইতিহাস, দর্শন, আইন প্রভৃতি তাঁহাদের শ্রেণীস্বার্থের সুবিধা অনুসারে সৃষ্ট

করেন। এ যুগেও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থাও ধনতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে।

মার্কস্ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যান্ত্রিক যুগের উন্নত অবস্থায় বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎকট প্রতিযোগিতার ফলে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অধিক পরিমাণ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিবে। ইহার ফলে একদিকে যেরূপ ধনিক-মালিকের মুনাফা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে তদ্রূপ শ্রমিক শ্রেণীর আয় হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই শোষণ পদ্ধতির ফলে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইবে এবং অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য-পীড়িত হইবে। এইরূপে পশুপালন যুগে অর্থনৈতিক কারণে মানবসমাজে শ্রেণীভেদের ফলে যে অসাম্যের বীজ উপ্ত হয়, উন্নত যান্ত্রিক যুগে সেই ক্রমবর্ধমান অসাম্য তীব্রতর হইয়া উগ্র শ্রেণী-সংগ্রামে পর্যবসিত হইবে। সমস্ত দেশের ধনিক শ্রেণী তাহাদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইবে, অপরপক্ষে পৃথিবীর সমগ্র শ্রমজীবী মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন করিয়া মিলিত হইবে।

সুতরাং মার্কসীয় ইতিহাসের ভাষ্য অনুসারে বলা যায় যে, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কাঠামো সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন যুগে বিত্তবান ও বিত্তহীন—এই দুইটি শ্রেণীর বিপরীত স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে। বিত্তবান শ্রেণী ইহার স্বার্থ রক্ষাকল্পে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে। রাষ্ট্ররূপ সংগঠন হইল এই উপায়গুলির অন্যতম। এই সংগঠনের সাহায্যে বিত্তবান শ্রেণী বিত্তহীন শ্রেণীকে অবদমিত রাখিতে চেষ্টা করে। বিত্তবান শ্রেণী রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে শোষিত শ্রেণীর উপর ইহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং মার্কসের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একমাত্র এই পশুবল প্রয়োগ করিয়াই রাষ্ট্র সমাজের শ্রেণীগত কাঠামো অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। এই কারণে মার্কস্ রাষ্ট্রকে শ্রেণী স্বার্থের ধারক এবং শ্রেণী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the Marxian Concept of the State)

মার্কসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কস্ শুধু অর্থনৈতিক প্রভাবের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কার্যতঃ দেখা যায় যে, সমাজ-বিবর্তনে অর্থনৈতিক পরিবেশ ছাড়াও ধর্ম, ন্যায়, নীতি, কলা, কৃষ্টি প্রভৃতি উপাদান-গুলির প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ, দুইটি বিষয়ে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শোষণের ফলে দরিদ্র শ্রেণী দরিদ্রতর হইবে। কিন্তু শিল্পের উন্নতির ফলে প্রায় সকল দেশেই দরিদ্র শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক অবস্থার ক্রমোন্নতি দেখা যায়। মার্কস্ আরও বলিয়াছিলেন যে, বিত্তহীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে কালক্রমে রাষ্ট্র সংগঠন বিলীন হইবে। রুশ দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেও রাষ্ট্রের এখনও অবসান ঘটে নাই।

তৃতীয়তঃ, মার্কস্ যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের কথা বলিয়াছেন, সে রাষ্ট্র হিংসা-দ্বেষবর্জিত ও মানব-সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র কখনও বিপ্লব বা শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মতামতের বিভিন্ন অংশ পরস্পর-বিরোধী।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কস্ শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বব্যাপী একতার উপর তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সকল শ্রেণীর শ্রমিককে একতাবদ্ধ হইতে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক আহ্বান সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী আজও পর্যন্ত জাতীয়তাবোধ পরিহার করিয়া আন্তর্জাতিক আদর্শ গ্রহণ করে নাই।

কিন্তু এই বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, মার্কস্ তাঁহার মতবাদ প্রচার দ্বারা শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। মার্কসের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হইলেও একথা মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন-জনিত কর্ম-প্রচেষ্টা মানুষের ইতিহাসের গতিকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে।

[পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দিষ্ট ইতিহাস নাই। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনাই রাষ্ট্র-উৎপত্তির মূল সূত্র বলিয়া ধরা যায়। এ সম্বন্ধে পাঁচটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা—

১। **ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ**—এই মতবাদ রাষ্ট্রকে ভগবানের সৃষ্ট সংগঠন বলিয়া মনে করে ও রাজা ভগবৎ-প্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র ভগবানের কাছে দায়ী থাকিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। প্রাচীনকালের অনেক দেশে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল ও এই মতবাদ রাষ্ট্রগঠনের প্রথম অধ্যায়ে মানুষকে ধর্মভয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিবার শিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা রাজার স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেয় ও বর্তমান যুগের রাজতন্ত্র ব্যতীত বিভিন্ন রকম সরকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

২। **বলপ্রয়োগ মতবাদ**—এই মতবাদে 'জোর যার মুল্লুক তার' এই প্রবচনের যুক্তি যুক্ততার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। সবল দুর্বলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বও এই পশুবলের সহায়তায় বজায় রাখে। রাষ্ট্রগঠনে ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ও বাস্তব দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে একথা অনস্বীকার্য হইলেও, রাষ্ট্র যে একমাত্র পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত একথা বলা যায় না। পশুবলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রই চিরস্থায়ী হয় না। শাসিতের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত।

৩। **সামাজিক চুক্তি মতবাদ**—রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সম্পাদিত চুক্তিদ্বারা ইহার উদ্ভব হইয়াছে— এই মতবাদের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ এক প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় বাস করিত। এই অবস্থাকে প্রকৃতির রাজত্ব বলা হইয়াছে। এখানে মানুষের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিলে তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন

করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। সুতরাং রাষ্ট্র চুক্তিদ্বারা গঠিত। হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশো এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। এই তিনজন লেখক একই বিষয়ে আলোচনা করিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন ছিল। হব্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ-দ্বারা রাজশক্তির অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। লক্‌ এই মতবাদকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর রুশোর হস্তে এই মতবাদ লোকায়াত্ত সরকারের রূপ গ্রহণ করে।

এই মতবাদটি অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের ও বল-প্রয়োগ মতবাদের বিলোপ সাধন করিয়া বর্তমান গণতন্ত্রের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়।

৪। **পারিবারিক সম্প্রসারণ মতবাদ**—মাতৃতান্ত্রিক অথবা পিতৃ-তান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্র কালক্রমে ইহার বর্তমান রূপ লইয়াছে, এই মতবাদে ইহাই বলা হয়। পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে জাতি এইভাবে সহজ ও সরল সংগঠনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ক্রমশঃই জটিলতাপূর্ণ হইয়াছে। জাতিত্ববন্ধন রাষ্ট্রগঠনের সহায়তা করিয়াছে একথা স্বীকার করিলেও বলা যায় না যে, একমাত্র পারিবারিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়াও মানুষের আদিম সংগঠন যে পরিবার হইতে আরম্ভ হয় তাহারও কোন নিশ্চিত নিদর্শন নাই।

৫। **বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদ**—রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদগুলির মধ্যে এইটিই হইল বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। এই মতবাদের বিশেষত্ব হইল যে, ইহা রাষ্ট্রগঠনের কোন একটি বিশেষ উপাদান বা রাষ্ট্র-উৎপত্তির কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সবগুলির সমন্বয়ে একটি সম্ভাব্য মতবাদ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। রাষ্ট্র বহু যুগ ধরিয়া বহু ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রাষ্ট্রগঠনে রক্তসম্বন্ধ, ধর্ম, শারীরিক শক্তি, রাজনৈতিক চেতনা, জাতীয়তাবোধ, অর্থনৈতিক কারণ প্রভৃতি বহু শক্তি কার্যকরী হইয়াছে। রাষ্ট্র একদিনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা-দ্বারা বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিষয়ক মতবাদ

১। **জৈব মতবাদ**—এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া একটি সজীব ও সচেতন দেহী বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। জীবদেহ যেরূপ কতকগুলির জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত ও এই জীবকোষগুলি যেরূপ পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, তদ্রূপ রাষ্ট্রও কতকগুলি মানুষের সমন্বয়ে গঠিত ও এই মানুষগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। জীবকোষগুলি যেরূপ সমস্ত দেহের উপর নির্ভরশীল, জনগণও সেইরূপ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ব্লুনৎস্লি ও স্পেন্সার এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন।

রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্যগুলির কথা বলা হয় সেগুলি বাহ্যিক, মূলগত নয়, তাহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে এত মূলগত প্রভেদ আছে যে-জন্য রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূপ বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

২। **আদর্শবাদ**—এই মতবাদে রাষ্ট্রের বাস্তবতাবর্জিত আদর্শ পরিকল্পনা করিয়া রাষ্ট্রে এক নৈতিক ও অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হইয়াছে, যাহার ফলে রাষ্ট্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটাইতে পারে।

মার্কসীয় মতবাদ—সাম্যবাদী ইস্তাহার ও মূলধন নামক গ্রন্থ দুইখানি হইতে রাষ্ট্রসম্পর্কে মার্কসের মতবাদ জানিতে পারা যায়। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা, উদ্বৃত্তমূল্যের সূত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম—এই তিনটি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া মার্কস তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মতে শিকারযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান শিল্পযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজের যে শ্রেণীর অধিকারে থাকে, সেই শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করিয়া সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সমাজে দুই শ্রেণীর আবির্ভাব হয় ক্ষমতাসীন বিত্তবান শ্রেণী ও ক্ষমতাহীন বিত্তহীন শ্রেণী। একদল শাসক ও শোষক, আর একদল শাসিত ও শোষিত। এই শোষণের প্রতিবাদে শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষ অনিবার্য। শোষিত শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে শোষক শ্রেণীর হস্ত হইতে বলপ্রয়োগে ক্ষমতা গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে শোষিত শ্রেণীর দ্বারা

রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হইলেও শেষ পর্যন্ত শোষক শ্রেণী যখন নির্মূল হয়, তখন এক শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হয় যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য থাকে না। মার্কসের মতে বিত্তবান শ্রেণী রাষ্ট্ররূপ সংগঠনের সাহায্যে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সেনা-বাহিনী ও পুলিশ সাহায্যে তাহাদের ক্ষমতা স্থায়ী করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের শক্তি পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। শোষিত শ্রেণী রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা শোষক শ্রেণীর হস্ত হইতে বলপ্রয়োগ সাহায্যে হস্তগত করিয়া শ্রেণী-ভিত্তিক রাষ্ট্রকে শ্রেণীহীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করে।

মার্কসের মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার মূল সূত্র গ্রহণযোগ্য। শ্রেণী সংগ্রামের সাহায্যে বিত্তহীন শ্রমজীবিগণ যে তাহাদের বহু ন্যায্য অধিকার অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য।

প্রশ্নাবলী

1. Explain with reference to the views of Hobbs, Locke, and Rousseau the Social Contract Theory regarding the origin of the state. What are the defects of the theory?

হব্‌স্, লক্ ও রুশোর মতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা কর। এই মতবাদটির ত্রুটি কি কি?

2. State and explain the Marxist conception of the state.

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সের মতবাদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।

3. Discuss critically the Social Contract Theory regarding the origin of the state.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটির সমালোচনা কর।

4. Discuss the Idealistic Theory regarding the nature of the state.

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আদর্শগত মতবাদটি আলোচনা কর।

5. Discuss analytically the Evolutionary Theory regarding the origin of the state.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনবাদ নীতির বিশ্লেষণমূলক আলোচনা কর।

6. Make a critical assessment of the Organic Thory regarding the nature of the state.

রাষ্ট্রের স্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন কর।

7. Critically discuss Rousseau's interpretation of the Social Contract Theory regarding the origin of the state

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদের রুশো যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা মন্তব্যসহ আলোচনা কর।

8. State and examine the Thory of Force as an explanation of the origin of the state.

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বল-প্রয়োগ মতবাদ বিবৃত করিয়া উহার পর্যালোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বভৌমিকতা

(Sovereignty)

সার্বভৌমিকতার অর্থ (Meaning of Sovereignty)

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলিলে বুঝা যায় রাষ্ট্রের সেই সব মৌলিক সর্বোচ্চ ও অসীম ক্ষমতা, যাহা ব্যক্তি, সংসদ বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বস্তুর উপর অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র ইহার এলাকার মধ্যবর্তী যে-কোন ব্যক্তি বা সংসদের উপর আধিপত্য করিতে পারে ও তাহাদের নিকট হইতে অখণ্ড আনুগত্য ও বশ্যতা আদায় করিতে পারে। নিজের এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমত্ব পূর্ণ হওয়া চাই। যদি কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নির্দেশের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে ইহার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতা। ইহার উপর আর কোন ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা রাষ্ট্র অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা রাষ্ট্রের মৌলিক ক্ষমতা—যাহার বলে রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছানুসারে ইহার কার্যাবলী পরিচালিত করিতে পারে ও যে ক্ষমতার বলে এক রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty)

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আদিম বা মৌলিক (original)। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা কোন উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে পারে না। ইহা রাষ্ট্রের স্বৈর (absolute) ক্ষমতা। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অসীম (unlimited)। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ করা হয়। চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা অবিভাজ্য (indivisible)। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল এই ক্ষমতার অধিকারী। একাধিক প্রতিষ্ঠান একযোগে আংশিকভাবে এই ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারে না। সমাজ-ব্যবস্থার ঐক্য বজায় রাখিবার নিমিত্তই সার্বভৌমত্বের এই অবিভাজ্যতা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

একই সমাজে একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী থাকিলে সমাজ-ব্যবস্থার কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ফলে, সমাজ-ব্যবস্থা ব্যাহত হইতে পারে। তাই সমাজ-ব্যবস্থার সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সার্বভৌম শক্তির অবিভাজ্যতা প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী (permanent)। রাষ্ট্র ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সহিত এই ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তনে এই ক্ষমতার অস্তিত্বের কোন হানি হয় না। ষষ্ঠতঃ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নহে (inalienable)। কোন মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিয়া নিজে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্রও বাঁচিতে পারে না। সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছায় তাহার ভূখণ্ডের কোন অংশ অন্য রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করিতে পারে। এই কার্য দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কোন হানি হয় না। সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আইনানুমোদিত স্বত্ববিশিষ্ট (imprescriptible) দীর্ঘকাল ভোগদখল-বিশিষ্ট রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সাময়িক অপপ্রয়োগ বা অব্যবহারের কারণে নষ্ট হইতে পারে না।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ (Different Aspects of Sovereignty)

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী কে বা কাহারা ও কাহার দ্বারা এই শক্তি প্রযুক্ত হয় এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকিবার ফলে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিভিন্ন লেখকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইহার আলোচনা করিয়াছেন। সেইজন্য এই ক্ষমতার প্রকারভেদ দেখা যায়।

কার্যকরী বা প্রকৃত সার্বভৌমত্ব ও নামমাত্র সার্বভৌমত্ব (Actual and Titular Sovereignty)

রাষ্ট্রের মধ্যে যে বা যাহারা রাষ্ট্রের আদিম, স্বৈর ও চরম ক্ষমতার অধিকারী ও যাহারা এই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারে, তাহাকে বা তাহাদিগকে বাস্তব সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলা হয়। আর যাহার নামে

এই ক্ষমতা বলবৎ করা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে যিনি কার্যক্ষেত্রে এই ক্ষমতা নিজ ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাকে নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। সার্বভৌমত্বের এই দুইটি দিকের পার্থক্য বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থায় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা নামেমাত্র সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। শাসন-ব্যাপারের সকল কিছুই তাঁহার নামে কার্যকরী করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের কেবিনেট সভাই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগকারী।

বাস্তব সার্বভৌমত্ব ও আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব (De facto and De jure Sovereignty)

যে শক্তির বলে কোন কর্তৃপক্ষ বৈধভাবে বা অবৈধভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য লাভ করে ও তাহার নির্দেশ বলবৎ করিতে পারে, তাহাকে বাস্তব সার্বভৌম বলা হয়। বাস্তব সার্বভৌমত্ব আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হইয়া শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারে। জনসাধারণ ভয় বা কুসংস্কারের জন্য এই সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ মানিতে বাধ্য হয়। আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তি আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সার্বভৌম শক্তি আইনানুমোদিতভাবে রাষ্ট্রের জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য দাবী করিতে পারে এবং এই সার্বভৌম শক্তির জনগণকে আদেশ দিবার ক্ষমতা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনানুমোদিত সার্বভৌম ক্ষমতা বৈধ উপায়ে সংগৃহীত ও আইনানুমোদিতভাবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ হয়। অপরপক্ষে, বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা বৈধভাবে সংগৃহীত নাও হইতে পারে ও আইনানুমোদিতভাবে ইহার প্রয়োগ না হইয়া বলের দ্বারা এই ক্ষমতা কার্যকরী হইতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী পোল দেশ অধিকার করিয়া সেই দেশের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল ও বাস্তবক্ষেত্রে জার্মান কর্তৃপক্ষ এই চূড়ান্ত ক্ষমতা সাময়িকভাবে পোল দেশে প্রয়োগ করিত। পোল দেশের অধিবাসিগণ জার্মান কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ মানিতে বাধ্য হইয়াছিল। পোল দেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং পোল দেশে অবস্থিত জার্মান কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাস্তব সার্বভৌম

শক্তির অধিকারী বলা যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষমতার অধিকারী হইলেও জার্মান কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আইনানুমোদিত ছিল না। উচ্চতর সামরিক শক্তির বলে তাহারা পোল জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য আদায় করিত। পোল দেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষই ছিল আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, যদিও সাময়িকভাবে এই কর্তৃপক্ষ বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম ছিল। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর আইনানুমোদিত পোল কর্তৃপক্ষ পুনরায় বাস্তব সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইল। স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাংকো প্রজাতন্ত্রী কর্তৃপক্ষকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বলপূর্বক সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। আইনানুমোদিত প্রজাতন্ত্রী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অবসান হইয়া নূতন সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল ও বলপূর্বক এই সাবভৌম শক্তি কার্যকরী করা হইল। নূতন কর্তৃপক্ষ আইনানুমোদিত না হইলেও বাস্তব সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইল। বাস্তব সার্বভৌম শক্তি কালক্রমে নির্বাচন দ্বারা জনগণের সমর্থন লাভ করিতে পারিলে আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তব ও আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তি দুইটি পৃথক শক্তি নহে—সার্বভৌম শক্তির দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বাস্তব সার্বভৌম শক্তি স্থায়িত্ব লাভ করিয়া জনগণের নৈতিক সমর্থনের ফলে আইনানুমোদিত শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, অপর-পক্ষে আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তি কালক্রমে কার্যকরী ক্ষমতা লাভ করিয়া বাস্তব সার্বভৌম শক্তিতে রূপায়িত হইতে পারে।

আইনগত সার্বভৌম শক্তি ও রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি (Legal and Political Sovereignty)

সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, আর কি বৈদেশিক ব্যাপারে—ইহার সর্বময় কর্তৃত্ব। আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সার্বভৌমত্ব সহজে বুঝা যায়। কিন্তু আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রের মধ্যে এই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী কর্তৃপক্ষের স্থান নির্দেশ করা একটি জটিল সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানকল্পে দুইটি বিভিন্ন সার্বভৌম শক্তির উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

জন্ অষ্টিন রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌম শক্তিতে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে এরূপ একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকিবেন যিনি এই চরম ক্ষমতার অধিকারী ও যাঁহার মাধ্যমে এই চরম ক্ষমতা বলবৎ করা হইবে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া তাহার সমষ্টিগত ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করিবার উপর। সমষ্টিগত ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত চরম ক্ষমতাবিশিষ্ট এক কর্তৃপক্ষ থাকে। আইনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। এই কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিয়া অভিহিত হয় এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি এই আদেশ মানিতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্রের মধ্যে এইরূপ সর্বজনগ্রাহ্য আইন-প্রণয়ন করিবার অধিকারী যে কর্তৃপক্ষ, তাহাকেই আইনগত সার্বভৌম বলা হয়। আইনজীবিগণ এই সার্বভৌম ক্ষমতার নির্দেশকে আইন বলিয়া গ্রহণ করেন ও বিচারালয়গুলি এই আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে। এই আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশ অযৌক্তিক বা জনমত-বিরোধী হইতে পারে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার বৈধতাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার মত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভাকে এই আইনগত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলা যাইতে পারে; রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক রচিত আইন-ইংলণ্ডের সর্বত্র অবাধভাবে প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনতঃ একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তে থাকিতে পারে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় ভিন্ন এক কর্তৃপক্ষ এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিতেছে। আইনগত সার্বভৌমকে সব সময় রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া-স্বীকার করিলেও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায় না। আইনগত সার্বভৌম শক্তির নির্দেশদানের ক্ষমতা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে এই আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। নিছক খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আইনগত সার্বভৌম কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে, আইনগত সার্বভৌম

কর্তৃপক্ষের আড়ালে এমন আর একটি শক্তি লুক্কায়িত আছে যাহার অভিমতকে আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করে। আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের পিছনে অবস্থান করিয়া যে শক্তি আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সেই শক্তিকে রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি বলা হয়। এই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইল রাষ্ট্রের নির্বাচকমণ্ডলী যাহাদিগকে আইনগত সার্বভৌমের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। আর এই রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট আইনগত সার্বভৌম দায়ী। আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশগুলি যদি যুক্তি-বিরোধী বা নীতিজ্ঞান-বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া পরবর্তী নির্বাচনকালে নূতন আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করিতে পারে। নানাভাবে জনমত সংগঠন ও শক্তিশালী করিয়া রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি আইনগত সার্বভৌম শক্তির উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক সার্বভৌমের হস্তে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা আছে। অন্য পন্থা বিফল হইলে বিদ্রোহের মাধ্যমে রাজনৈতিক সার্বভৌম তাহাদের সমষ্টিগত ইচ্ছা আইনগত সার্বভৌমের উপর বলবৎ করিতে পারে। সুতরাং আইনগত সার্বভৌমকে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট নতি স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজনৈতিক সার্বভৌম চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ তাহারা এই ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকারী নহে। রাজনৈতিক সার্বভৌম অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলী যদি একত্রিত হইয়া সম্মিলিত-ভাবে কোন নির্দেশ দেয়, সেই নির্দেশ আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কোন বিচারালয়ই এই নির্দেশকে আইনের মর্যাদা দিয়া সেই আইনের প্রয়োগ করিতে পারে না। রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা ইংলণ্ডের আইনগত সার্বভৌম, আর নির্বাচকমণ্ডলী হইল রাজনৈতিক সার্বভৌম। রাজনৈতিক সার্বভৌম তাহাদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করিতে গেলে আইনগত সার্বভৌমের মাধ্যমে ব্যতীত অন্য উপায়ে করিতে পারে না। আর আইনগত সার্বভৌম রাজনৈতিক সার্বভৌমের ভোটের উপর নির্ভরশীল বলিয়া আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে তাহাকে নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমত সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতঃই ইহা মনে হয় যে, রাষ্ট্রের দ্বিবিধ সার্বভৌমিকতা আছে—একটি হইল আইনগত, অপরটি হইল রাজনৈতিক। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একক ও অবিভাজ্য। আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব সার্বভৌম রাষ্ট্রের দুই বিভিন্ন রূপ মাত্র। প্রথমটি আইনগ্রাহ্য। দ্বিতীয়টি আইনগ্রাহ্য নয়, সুতরাং আইনের চক্ষে ইহাকে সার্বভৌম বলা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

গণ বা সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব মতবাদ (The theory of Popular Sovereignty)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্র স্বৈরতন্ত্র হইতে বিবর্তনের ফলে বর্তমানে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বৈরতন্ত্র হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উন্নীত করিবার জন্য যতগুলি শক্তি কার্যকরী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গণ সার্বভৌমত্ব মতবাদটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের অবাধ, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল জনগণ। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি আর জনগণের নির্দেশই হইল আইন। রাষ্ট্রের মধ্যে এই গণশক্তির উর্ধ্বে অন্য কোন শক্তির অস্তিত্ব এই মতের সমর্থকগণ স্বীকার করেন না। প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশে এই গণ-সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র-ব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

রাষ্ট্রব্যবস্থা-প্রবর্তনের প্রথম যুগে সার্বজনীন সার্বভৌমত্বের দাবী স্বীকৃত হয় নাই। তখন কোন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের অনুমোদিত প্রতিনিধি বলিয়া এই শক্তির অধিকারী হইতেন। কালক্রমে রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চারের ফলে এই সার্বভৌম শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হইল। এককেন্দ্রীয় সার্বভৌম শক্তি একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইল। গণ-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সার্বভৌম শক্তি জনগণের অধিকারে পর্যবসিত হইল। ফরাসী লেখক রুশোর হস্তে এই গণ-সার্বভৌম মতবাদটি একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল। রুশোর মতে জনগণই হইল রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। সরকারের কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই, সরকার শুধু সাধারণের ইচ্ছাকে কার্যকরী করে। এই সাধারণ ইচ্ছা প্রয়োজন হইলে সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

এই মতবাদটি একটি মহান্ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'জনগণের অভিমতই হইল ভগবানের অভিমত' *Vox populi vox dei*—Voice of the people is the voice of God' রুশো তাঁহার যুক্তিতর্কের দ্বারা এই মতবাদটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্তমান জগতে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তনে সহায়তা করেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অধ্যাপক রীচি এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু রীচি গণ-সার্বভৌমত্বের দাবী উচ্চতর শারীরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমষ্টিগতভাবে জনগণের শারীরিক শক্তি সরকারের শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং সরকারের বলপ্রয়োগ নীতি যদি একটি সম্ভাব্য সীমা অতিক্রম করিয়া জনগণের উপর বলবৎ করা হয় তাহা হইলে জনগণও তাহাদের সমষ্টিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জনগণ সরকার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, সুতরাং অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া জনগণের সার্বভৌমত্বের দাবী সমর্থনযোগ্য।

সমালোচনা

এই মতবাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। মতবাদটির সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য ইহার বিরুদ্ধে প্রদর্শিত যুক্তিগুলির বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, সুসংবদ্ধ নাগরিক জীবনযাপন করিতে সহায়তা করা যদি রাষ্ট্রের একটি অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রের মধ্যে এমন একটি নির্দিষ্ট সংগঠন থাকা দরকার যাহার নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের দ্বারা। যে কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের জন্য এই আইন প্রণয়ন করিবেন, সেই কর্তৃপক্ষের একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিয়া সেইগুলিকে সুসংবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে। এই কর্তৃপক্ষ-সম্বন্ধে কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকিলে আইন-প্রণয়নে ও আইনগুলি বলবৎ করিতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটি করিয়া আইনসভা থাকে যাহার নির্দেশগুলি সকলে মান্য করে।

আইনসভা একটা নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সংগঠন, সুতরাং আইনসভার পক্ষে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব, কিন্তু তাই বলিয়া একটা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক মিলিতভাবে এই আইনসভার স্থান অধিকার করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু জনসমষ্টি সুসংবদ্ধভাবে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে অক্ষম, সেইহেতু তাহাদের অসংবদ্ধ ইচ্ছাকে আইনরূপে কার্যকরী করিয়া দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, জনগণ সুসংবদ্ধ হইয়া যদি সুস্পষ্টরূপে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও এই জনমত আইন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। কোন বিচারালয়ই এই জনমতের নির্দেশ অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে বাধ্য নয়। সুতরাং গণ-সার্বভৌমত্বের দাবী সমর্থন করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক রীচির মতে জনগণই হইল বৃহত্তর শক্তির অধিকারী, সুতরাং শক্তির পরীক্ষা দ্বারাও গণ-সার্বভৌমত্ব সমর্থিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকার অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত একদল সৈনিকের সাহায্যে বহুসংখ্যক লোককে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে। সুতরাং জনগণকে অধিকতর শক্তির অধিকারী বলাও সঙ্গত নয়।

চতুর্থতঃ, বলা হইয়াছে যে, প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া জনগণ তাহাদের সার্বভৌম শক্তিকে কার্যকরী করে। ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া জনগণ সরকার গঠন করে, আবার ভোট দ্বারাই তাহারা ইচ্ছামত সরকার পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই ভোটদান-ক্ষমতার মাধ্যমে জনগণ তাহাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের অতি অল্প সংখ্যক লোকই এই ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমান সার্বজনীন ভোটাধিকারের যুগেও জনসমষ্টির শতকরা ৫০ জনের বেশী এই অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ভোটদান-ক্ষমতা সার্বভৌমত্বের নিদর্শন ধরিয়া লইলেও ইহাকে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব আখ্যা দেওয়া চলে না। আবার এই ভোটদাতৃগণ বর্তমান দলগত রাজনীতির যুগে নিজেদের অভিমত বিসর্জন দিয়া দলীয় নেতার অভিমতের প্রতিধ্বনি করিতে বাধ্য হন। সুতরাং এ দিক

দিয়াও গণ-সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত না হইয়া দলীয় নেতৃত্বের সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত হয়।

সুতরাং বাস্তব দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদটি সমর্থনযোগ্য নয়। কোন রাষ্ট্রই জনগণ দ্বারা পরিচালিত হয় না বা পরিচালিত হইতে পারে না। জনগণ যখন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র গঠন করে তখন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসংঘকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হয়, সুতরাং এ দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও রাষ্ট্রই হইল সার্বভৌম শক্তির প্রকৃত অধিকারী।

গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, জনমত যদি সুসংবদ্ধ হইয়া জনহিতকর কার্যের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাহা হইলে এই জনমতের শক্তিকে কোন রাষ্ট্রই উপেক্ষা করিতে পারে না। সুসংবদ্ধ জনমত সর্বদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিয়া পরিগণিত হয়। আইনজীবিগণ এই গণ-সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে এই গণ-সার্বভৌমত্ব হইল একমাত্র শক্তি যে শক্তি সরকারের যথেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করিতে পারে। অধ্যাপক লাস্কির মতে গণ-সার্বভৌমত্বের প্রকৃত তাৎপর্য হইল, যে শক্তির দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাই হইল গণ সার্বভৌম শক্তি।

জাতীয় সার্বভৌমিকতা (National Sovereignty)

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে জাতীয় সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের জন্ম হয়। এই মতবাদে বলা হয় যে, জাতিই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আবাসস্থল ও একমাত্র অধিকারী। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদ হইতেই জাতীয় সার্বভৌমিকতা ধারণার সৃষ্টি হয়। এই মতবাদ পরোক্ষভাবে গণ-সার্বভৌমকিতা তত্ত্বের সমর্থন করিলেও কার্যতঃ জাতীয় সার্বভৌমিকতা ও গণ-সার্বভৌমিকতা একার্থবোধক নহে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব উপেক্ষণীয় না হইলেও আইনের দিক দিয়া জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় না। আইনগত সার্বভৌমিকতা সব সময়েই সমগ্রভাবে জাতির মধ্যে নিহিত থাকে। আর

এই জাতিই হইল জনমতের উৎস। সুতরাং এই জাতীয় স্বাধীনতা ধারণার সাহায্যে জনমতকে একটা সুস্পষ্ট রূপ ও আইনসম্মত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জাতীয় সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, এই তত্ত্বের সাহায্যে সমগ্রভাবে জাতির প্রাধান্য ঘোষণা হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধারণার কোন কার্যকারিতা নাই। জাতীয় স্বাধীনতা একটা কল্পনামাত্র—ইহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ইহা আইন প্রণয়নে অক্ষম।

সার্বভৌমিকতা ও শাসনতান্ত্রিক আইন (Sovereignty and Constitutional Law)

রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে অনেক লেখক বলেন যে, সার্বভৌমিকতা শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ, কেননা রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র এই আইন ইচ্ছামত লংঘন করিতে পারে না। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না—শাসনতান্ত্রিক আইন প্রকৃতপক্ষে সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে—রাষ্ট্রের নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন সার্বভৌমের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র—সার্বভৌমের বাধা হইতে পারে না।

উপরি-উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে এক শক্তিশালী মতবাদ গঠিত হইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয় যে, সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ আইন সাধারণ সম্পর্কিত সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইজন্য রাষ্ট্রই এই আইনগুলির অনুমোদন অধিকর্তা। অপর পক্ষে শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের গঠন-প্রকৃতি ও ইহার আচরণ-বিধি নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া এই আইনের অধিকর্তা হইল সমাজ নিজে। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র সমাজের অসংখ্য সংঘের মধ্যে মাত্র একটি সংঘ—ইহার উদ্দেশ্যও সীমাবদ্ধ। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র সমাজের অধীন। শাসনতন্ত্র সামাজিক সাধারণ ইচ্ছার বিশেষ রূপায়ণ ও প্রকাশ। সুতরাং রাষ্ট্র এই সামাজিক

সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রীয়ক্ষমতার প্রকৃত বাধাস্বরূপ। সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক দেশে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে ভোটদাতাগণের বা বিশেষ সভার মতামত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্র ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে না। রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইল সমাজ।

অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদ (Austin's Theory of Sovereignty)

সার্বভৌমতত্ত্ব সম্বন্ধে যত লেখক আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অষ্টিন্ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার মতবাদ বুঝিতে হইলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি আইনবিদ্ ছিলেন ও আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি সার্বভৌমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহার মতে সার্বভৌমত্ব বলিতে শুধু আইনানুমোদিত সার্বভৌমকে বুঝায়। অষ্টিন্ আইনশাস্ত্রের বিশদ আলোচনা করেন ও আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে সার্বভৌমত্বের আলোচনা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী লেখক হব্‌স ও বেন্থামকে অনুসরণ করিয়া অষ্টিন্ আইন ও সার্বভৌমের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, যদি কোন সমাজে এক নির্ধারিত উচ্চ মানবীয় কর্তৃপক্ষ (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ) সমাজের অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকার না করেন কিন্তু এই নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সমাজের অধিকাংশের নিকট হইতে স্বভাবজাত আনুগত্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই সমাজে ঐ নির্ধারিত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইলেন সার্বভৌম এবং ঐ উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে লইয়া ঐ সমাজকে রাজনৈতিকভাবে গঠিত স্বাধীন সমাজ বলা হয়। ("If a determinate human superior, not in a habit of obedience to a like superior, receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society and that society, including the determinate superior, is a society political and independent.")

অষ্টিনের সার্বভৌম সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রে কোন-না-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ লইয়া গঠিত এমন একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহার আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিয়া সেই সমাজে পরিগণিত হইবে। এইরূপ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষই হইলেন সেই সমাজের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। অষ্টিনের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সার্বভৌম সব সময়েই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশযোগ্য হওয়া চাই। জনমত বা রুশো-প্রবর্তিত সাধারণের ইচ্ছা প্রভৃতি অ-ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাগুলিতে সার্বভৌমত্ব আরোপ করা চলে না।

(খ) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল সমাজের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয় না বা অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য স্বীকার করে না, পরন্তু সমাজের অন্য সকলে তাহার আনুগত্য স্বীকার করে। অষ্টিনের মতে এই কর্তৃপক্ষই হইলেন সার্বভৌম ও এই সার্বভৌম চরম ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

(গ) এই ক্ষমতার অধিকারীকে মানবীয় হইতে হইবে। এই ক্ষমতা ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতা নয়।

(ঘ) সমাজে অধিক সংখ্যক লোক যদি সার্বভৌমের নির্দেশ পালন করে তাহা হইলেই যথেষ্ট। সার্বভৌম বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য সমাজের সমস্ত ব্যক্তিরই আনুগত্যের প্রয়োজন হয় না। তবে এই আনুগত্য স্বভাবজাত হওয়া চাই।

(ঙ) আইন হইল সার্বভৌমের নির্দেশ। এই নির্দেশ ছাড়া আইনের অন্য কোন উৎস নাই।

অষ্টিন্‌প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইবেন একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর এই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশই আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ক্ষমতা অসীম, স্বৈর ও অবিভাজ্য।

সমালোচনা

একাধিক লেখক অষ্টিনের সার্বভৌমতত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করিয়া এই মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ,

অষ্টিনের মতবাদ বর্তমান গণতন্ত্রের আদর্শ-বিরোধী। তিনি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সার্বজনীন সার্বভৌমকে অস্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আইনানুগ সার্বভৌমের অবাধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজনৈতিক সার্বভৌমকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। আইনানুগ সার্বভৌম আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ আইনানুগ সার্বভৌমের ক্ষমতা রাজনৈতিক সার্বভৌমের নির্দেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনবিদ্‌গণের নিকট রাজনৈতিক সার্বভৌমের বিশেষ কোন তাৎপর্য না থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে আইনানুগ সার্বভৌমের কার্যকলাপের উপর রাজনৈতিক সার্বভৌমের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের বিরুদ্ধে স্যর্ হেন্‌রী মেইনের সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, সার্বভৌম কোন ক্ষেত্রেও অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয় বা হইতে পারে না। স্বৈরাচারী শাসকদিগের মধ্যে যাহাকে অদ্বিতীয় বলা যায় এরূপ শাসককেও অনেক সময় জনমতের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। কোন দেশের স্বৈরাচারী শাসকও লোকাচার এবং প্রথাগত নিয়মগুলিকে বাতিল করিতে সাহসী হয় না। মেইন পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, স্বৈরাচারী শাসকের অন্যতম রণজিৎ সিংহের পক্ষে তাঁহার নিজ সৃষ্ট আইন নহে এরূপ বহু প্রথাগত লোকাচার ও নিয়ম মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি আইন আছে যেগুলিকে সার্বভৌমের নির্দেশ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া জনগণকে ভোটাধিকার প্রদান করেন। এই ভোটাধিকার আইনের মধ্যে নির্দেশের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। পঞ্চমতঃ, অষ্টিনের মতানুসারে যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা সার্বভৌমহীন হইতে পারে না। পরিশেষে বলা যায়, অষ্টিন্ একটি সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতে সার্বভৌমত্ব হইল সরকারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, অষ্টিনের

সার্বভৌমতত্ত্ব সম্পূর্ণ অসার নহে। অষ্টিন্‌প্রদত্ত মতবাদের সমালোচনা করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি একজন আইনবিদ্‌ ছিলেন ও আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তিনি সার্বভৌমতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। সার্বভৌমতত্ত্বের আলোচনা হিসাবে পূর্ববর্তী লেখকগণ অপেক্ষা তাঁহার মতবাদের মধ্যে একটা নূতনত্ব দেখা যায়। তিনি আইনানুগ সার্বভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌম হইতে পৃথক্‌ করিয়া বিশদরূপে তাহার ব্যাখ্যা করেন। অষ্টিনের পূর্বে সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অষ্টিন্‌ই সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের একটা নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করেন। তাঁহার মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌমকে উপেক্ষা করিয়া আইনানুগ সার্বভৌমের উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতবাদ অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট কিন্তু ভ্রান্ত নহে।

অষ্টিনের সর্বভৌমতত্ত্বের পুনঃসংজ্ঞা নির্দেশ (Austin's theory of Sovereignty redefined)

অষ্টিন্‌প্রদত্ত সার্বভৌমতত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু বিরূপ সমালোচনার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমালোচকগণের মতে অষ্টিনের সার্বভৌমতত্ত্ব মূলতঃ শক্তিভিত্তিক অর্থাৎ পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত—জনগণের ইচ্ছা বা সহযোগিতার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অনেক সমালোচক এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, অষ্টিন—এরূপ একটি সার্বভৌম শক্তির অবতারণা করিয়াছেন যাহার অস্তিত্ব বাস্তব কোন রাজনৈতিক সংগঠনে দেখা যায় না। এরূপ সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব একমাত্র দাস-ব্যবসায়ের উপনিবেশে সম্ভব।

কিন্তু অষ্টিন্‌প্রদত্ত সার্বভৌমতত্ত্ব সম্পর্কে এইরূপ অত্যধিক বিরুদ্ধ সমালোচনা বাস্তবতা-বর্জিত বলিয়া মনে হয়। একটু গভীরভাবে অষ্টিনের মতবাদ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শুধু আইনবিদের দৃষ্টিভংগী লইয়া সার্বভৌমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন নাই, পরন্তু হিতবাদী আইন-বিদের দৃষ্টিভংগী লইয়া বিধিবদ্ধ আইনগুলির পশ্চাতে যে সমস্ত প্রভাব কার্যকরী সেগুলিরও যথাযথ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সমাজের অধিকাংশ লোক সরকারের প্রতি যে স্বভাবজাত আনুগত্য প্রদর্শন করে, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া অষ্টিন্‌ বলেন, লোকে যে অরাজকতা অপেক্ষা যে-কোন

শাসনব্যবস্থা অধিকতর পছন্দ করে তাহা সমাজের অধিকাংশ লোকের সরকারের প্রতি এই স্বভাবজাত আনুগত্য প্রদর্শনের দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা জনগণের আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেহেতু এই আনুগত্য জনগণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, সেই হেতু বলা যায় যে, প্রত্যেক শাসনব্যবস্থাই জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত—শুধুমাত্র পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপক ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অষ্টিনের সার্বভৌমতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি বিভাজ্য? (Theory of Divided Sovereignty)

অছিশাসন-ব্যবস্থা (Mandate System), দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা (Condominium) প্রভৃতি উদ্ভবের ফলে সার্বভৌম শক্তির বিভাজ্যতা প্রমাণিত হয় বলিয়া অনেকের ধারণা। অছিশাসন-ব্যবস্থায় একটি পশ্চাদ্‌পদ্ জাতি কয়েকটি বিষয়ে এক বা একাধিক সভ্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সার্বভৌম শক্তি দুইটি ভিন্ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া মনে হয়। দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থায় একটি রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যুগপৎ দুইটি রাষ্ট্র দ্বারা মিলিতভাবে পরিচালিত হয়। সুদান দেশের শাসনকার্য যুগপৎ ইজিপ্‌ট ও গ্রেট বৃটেন কর্তৃক পরিচালিত হইত। এ ক্ষেত্রেও বলা হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজ্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জাতীয় (কেন্দ্রীয়) সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ হয় ও উভয় সরকার শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমালোচনা

কিন্তু উপরি-উক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই মতবাদের সমর্থকেরা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় সে সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া এই ভুল ধারণা পোষণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক যে সমুদয় ক্ষমতা পরিচালিত হয়, সেগুলি বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয় ও এই দুইটি সরকার শাসন-কার্যের উৎকর্ষের জন্য পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়া নির্ধারিত বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রকৃত তথ্য হইল যে, সরকারের ক্ষমতাগুলিকে ভাগ করা হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ভাগ হয় না। জেলিনেকের উক্তির উদ্ধৃতি করিয়া গার্ণার এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। জেলিনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার ভাগ হয় না। যে বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমতা প্রযুক্ত হয়, সেই বিষয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, অর্থ-সংক্রান্ত-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, আর, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি স্থানীয় ব্যাপারগুলির শাসন প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার ভাগ হয় বলিলে মারাত্মক ভুল হইবে। সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য। ইহাকে ভাগ করিলে ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি সীমাবদ্ধ? (Theory of Limited Sovereignty)

অনেক লেখক রাষ্ট্রকে অসীম ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী আখ্যা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা দুই দিক দিয়া সীমাবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা ঐশ্বরিক বিধান, জনমত ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর বৈদেশিক ব্যাপারে এই ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।

সার্বভৌম ক্ষমতার উপরি-উক্ত বাধাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রই ঐশ্বরিক বিধান বা জনমত অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য নয়। অবস্থার চাপে অনেক সময় রাষ্ট্রকর্তৃক নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনও প্রবর্তিত ও প্রযুক্ত হয় এবং জনসাধারণও তাহা মানিয়া চলে। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি রাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যকলাপের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয় বটে,

কিন্তু রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছা অনুসারে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে। জার্মানীতে হিট্‌লার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পূর্বতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া দিয়া জনমত ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচনা করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনের যে বাধার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও সব সময়ে কার্যকরী হয় না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এইজন্য আন্তর্জাতিক আইন বহুক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়। আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার মত উচ্চতর ক্ষমতা-বিশিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ নাই বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা নাই। বাস্তবক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য হয়ত রাষ্ট্র জনমত-বিরোধী অথবা নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্যকলাপগুলিকে সম্ভবমত পরিহার করিয়া চলে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্র সব কিছুই করিতে পারে। পারস্পরিক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সাধারণতঃ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিলেও আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়, একথা বলা চলে না। সুতরাং দেখা যায় যে, নিজ অভিরুচি অনুসারে রাষ্ট্র অনেক সময় অবাধ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োগে বিরত থাকে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা নাই—এই ক্ষমতা অসীম, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত।

সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদ (Pluralistic Conception of Sovereignty)

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অবাধ, অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া-রূপে বহুত্ববাদের আবির্ভাব হয়। ব্যবহারিক জগতে যেরূপ কোন বিষয়ের আতিশয্য ঘটিলে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, চিন্তাজগতেও তদ্রূপ কোন চিন্তাধারার আতিশয্যের ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়া বিপরীতমুখী চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের রাজনীতিবিশারদগণ রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার

ফলে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান্ হইল এবং এই সর্বশক্তিমান্ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজের অন্যান্য সংঘগুলির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিল। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা যখন চরম রূপ পরিগ্রহ করিল তখন রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার প্রতিবাদস্বরূপে বহুত্ববাদের আবির্ভাব হইল। গিয়ার্কি, মেথট্ল্যাণ্ড, বার্কার, লাস্কি, ম্যাকাইভার প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। তাঁহারা নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক মানুষের জীবন বহুমুখী। এই বহুমুখী জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য রাষ্ট্রেরও যেরূপ প্রয়োজন, সমাজের অন্যান্য সংঘগুলিরও সেইরূপ প্রয়োজন আছে। তাই মানুষ পরিবার, ধর্মসংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি নানাবিধ সংঘ সৃষ্টি করিয়াছে। এই সংঘগুলির প্রত্যেকটির একটি উদ্দেশ্য আছে ও প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ব্যক্তির আনুগত্য শুধু রাষ্ট্রের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাহাকে সমভাবেই বিভিন্ন সংঘগুলির আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। মানুষ শুধু নাগরিক জীবন লইয়া থাকিতে পারে না, তাহার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, কৃষ্টিগত জীবনও আছে। বহুমুখী জীবনের এই বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অন্যান্য সংঘগুলির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং এই সংঘগুলি নানাভাবে মানুষের জীবনে উপযোগিতা সৃষ্টি করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য করে। রাষ্ট্রও সমাজের মধ্যে এইরূপ একটি বৃহৎ সংঘ, কিন্তু রাষ্ট্রকে সমাজের একমাত্র সংঘ বলিয়া গণ্য করিলে মারাত্মক ভুল হইবে।

বহুত্ববাদীরা আরও বলেন যে, প্রত্যেক সংঘের ক্ষমতার একটা সীমা আছে—আর ক্ষমতার এই সীমা নির্ধারিত হয় সেই সংঘের করণীয় কার্যকলাপের দ্বারা। রাষ্ট্রের কার্যকলাপের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্র শুধু মানুষের বহির্জীবনের একটি প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত করে—মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নাই। তাই মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের অন্যান্য অংশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য

সামাজিক অন্যান্য সংঘগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্র এরূপ একটি বৃহৎ সংঘ, যাহা মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এ সম্পর্কে ম্যাকাইভার বলেন যে, একখানি কুঠার যেরূপ একটি পেনসিল কাটিবার পক্ষে অনুপযোগী অস্ত্র, মানুষের অন্তর্জীবনের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উন্নয়নে রাষ্ট্রও সেইরূপ অনুপযোগী। এই বিশ্লেষণের দ্বারা বহুত্ববাদীরা প্রমাণ করেন যে, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্ষমতা যদি কার্যের আনুপাতিক হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রকার্যকলাপের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে বলিয়া তাহাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া চলে না। সুতরাং সসীম রাষ্ট্রকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

উপরি-উক্ত যুক্তির অবতারণা করিয়া বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে অসীম ক্ষমতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে প্রযাস পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। সমাজের অন্যান্য সংঘগুলি, যথা বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মসংগঠন, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি উপযোগী সংঘগুলিও নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। এই সংঘগুলির উপর রাষ্ট্রের একাধিপত্য করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এইরূপে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘগুলির সমপর্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন।

তাঁহাদের মতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা যেরূপ অন্যান্য সংঘের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ, বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা তদ্রূপ অন্য রাষ্ট্রের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্র অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজস্থিত অন্যান্য সংঘগুলির অস্তিত্ব যেরূপ রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে পররাষ্ট্র সম্পর্কেও রাষ্ট্রের এই অসীম ক্ষমতা স্বীকৃত হইলে তদ্রূপ বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই অসীম ক্ষমতার বলে শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। এই ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করে। ফলে মানব সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিগত দুইটি বিশ্ব মহাসমর ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলার রক্ষক এবং সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক যে রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অশান্তি সৃষ্টি ও সভ্যতা-বিরোধী কার্যকলাপ করিবার ক্ষমতা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। সুতরাং কোন রাষ্ট্রবিশেষের যে সমস্ত কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী বা মানব সভ্যতা-বিরোধী সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিশেষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে সমস্ত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক স্বার্থ-সম্পর্কিত সে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রবিশেষের হস্তে কোন মতেই ন্যস্ত থাকিতে পারে না। এই সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা নির্ধারিত হইবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলক করিয়া রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ করেন।

সমালোচনা

বহুত্ববাদীদের মত আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাঁহাদের মতে সমাজস্থিত প্রত্যেকটি সংঘ হইল স্বাবলম্বী, স্বাধীন ও রাষ্ট্র-প্রভাবমুক্ত। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই বিভিন্ন সংঘগুলির মধ্যে অবশ্যম্ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবর্তমানে এরূপ কোন শক্তি থাকিবে না, যাহা সংঘগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রশমিত করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা গুরুতর আকার ধারণ করিলে সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এই সমালোচনার উত্তরে বহুত্ববাদীরা বলেন যে, অন্যান্য সংঘগুলির মধ্যে মতবিরোধ বা কলহ ঘটিলে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কলহ-বিবাদের অবসান ঘটাইবে। বহুত্ববাদীরা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের মর্যাদা দান করিয়া অন্যান্য সংঘগুলির পক্ষে রাষ্ট্রের নির্দেশ অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বহুত্ববাদিগণ প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষ-ভাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এদিক দিয়া

দেখিতে গেলে বলা যায় যে, বহুত্ববাদ দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট হয় নাই, শুধুমাত্র পরিবর্তিত হইয়াছে (modified but not rejected)।

দ্বিতীয়তঃ, বহুত্ববাদিগণের মতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারণেরই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রক্ষমতার সংকোচন আবশ্যক। কিন্তু ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘগুলির কর্তৃত্বাধীন করিবার ফলে সংঘগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বৃদ্ধির পরিবর্তে সংকুচিত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

তৃতীয়তঃ, লাস্কি পরবর্তীকালে বহুত্ববাদ সম্পর্কে তাঁহার পূর্বমত সংশোধন করিয়া বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পুন-র্বিন্যাস করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন না করা যায় ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ করা সমীচীন নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর পরিধি এত দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে যে, এই কল্যাণমূলক কার্যগুলির সাফল্যের জন্য সর্বাত্মক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অপরিহার্য। ইহা ছাড়াও বর্তমান যুগের সর্বাত্মক যুদ্ধের সময়ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত। সুতরাং বর্তমান যুগে বহুত্ববাদের প্রয়োগ ক্ষেত্র অতি সীমাবদ্ধ।

বহুত্ববাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, এই মতবাদ সমাজের অন্যান্য সংঘগুলির কার্যকারিতার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিয়া সেইগুলির উপযোগিতা প্রমাণিত করিয়াছে। বহুত্ববাদিরা আরও বলেন যে, এই সমাজহিতকর সংঘগুলি তাহাদের নিজ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাষ্ট্র বিনা কারণে তাহাদের কার্যকলাপের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। সুতরাং বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছে—সার্বভৌমিকতাকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা স্বীকার না করিলেও রাষ্ট্রের প্রাধান্য তাহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সার্মভৌমিকতার বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি (Location of Sovereignty)

রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি নির্ণয় করা এক জটিল সমস্যা।

এ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন মতগুলির সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

প্রথমতঃ, বহু লেখক গণ বা সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না বা কার্যক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। সুতরাং এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকারী, সেই কর্তৃপক্ষই হইল রাষ্ট্রের প্রকৃত সার্বভৌম শক্তি। এই মত অনুসারে গ্রেট বৃটেনের রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কারণ ইহা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতেই শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস বা রাজ্য আইনসভাগুলি এককভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার অধিকারী নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন-পদ্ধতি অত্যধিক পরিমাণে জটিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব কংগ্রেস সভায় $\frac{২}{৩}$ সংখ্যা সদস্যের দ্বারা অথবা রাজ্য আইনসভাগুলির $\frac{২}{৩}$ সংখ্যক সদস্যের প্রস্তাবে আহূত একটি বিশেষ সভায় দ্বারা সমর্থিত হইয়া রাজ্য আইনসভাগুলির $\frac{৩}{৪}$ অথবা আহূত বিশেষ সভার $\frac{৩}{৪}$-এর সম্মতি লাভ করিলে বলবৎ হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত হওয়ার ফলে উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং অনেক লেখক বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন—সুতরাং বিভাজ্য। কিন্তু এ মতবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যুক্তরাষ্ট্রে উভয়বিধ সরকারের অবস্থিতি থাকিলেও একটি মাত্র রাষ্ট্রের অবস্থিতি সূচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতার ভাগ হয়, সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসসভা, রাজ্য আইনসভা বা বিশেষ আহূত সভাগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না—কারণ, এই সভাগুলি সরকারের বিশেষ কর্মবিভাগ মাত্র এবং সাময়িক কালের জন্য আহূত হয়। অপর পক্ষে, সার্বভৌম শক্তি শুধু

অবিভাজ্য নহে—ইহা চিরন্তন। এইজন্য অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি নির্ণয় করা এক দুঃসাহসিক কার্য।

তৃতীয়তঃ, গেটেল্ রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত আইনসভাসমষ্টির উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়াছেন। আইনসভা বলিতে অবশ্য তিনি কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ও স্থানীয় আইনসভার উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগও আইন প্রণয়ন করে। অনেক দেশে ভোটদাতৃগণ গণভোট, গণ-নির্দেশাধিকার প্রভৃতি উপায়গুলির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়নকার্যে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং গেটেলের মতে দেশের সমুদয় আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

উপরি-উক্ত মতবাদ আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। কেন না, আইনসভা বা শাসনবিভাগ প্রভৃতি শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র। সার্বভৌমত্ব হইল একমাত্র রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য—শাসন-যন্ত্র এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সংক্ষিপ্তসার

সার্বভৌমিকতা ও ইহার বৈশিষ্ট্য—রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ, অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয়। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র সকল অধিবাসী ও সংঘগুলির উপরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদের আনুগত্য আদায় করে। বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ক্ষমতা অসীম, অবিভাজ্য, স্থায়ী ও অবিনশ্বর।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ—সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়, যথা, প্রকৃত সার্বভৌমত্ব ও নামমাত্র সার্বভৌমত্ব। ইংলণ্ডের রাজা নামমাত্র সার্বভৌম, প্রকৃত সার্বভৌম হইল কেবিনেট সভা। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তব ও আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব। আইনানুমোদিত সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইলেও কার্যতঃ ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে।

বাস্তব সার্বভৌম আইনানুমোদিত না হইয়াও কার্যতঃ ক্ষমতার প্রয়োগ করে। তৃতীয়তঃ, আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি। আইনগত সার্বভৌম আইন প্রণয়নে সর্বেসর্বা হইলেও রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট দায়ী। রাজনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমের স্রষ্টা হইলেও তাহাদের নির্দেশ আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

গণ-সার্বভৌমত্ব—এই মতবাদে জনসাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া প্রচার করা হয়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন রুশো। জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যক্ষেত্রে এই অধিকার তাহারা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। অনেকে বলেন, ভোটদানক্ষমতাই হইল সার্বভৌম শক্তি-প্রয়োগের একটা পন্থা। কিন্তু এই ভোটদানের অধিকারী সকলে নয়। ইহা ছাড়া, জনগণ সমবেতভাবে তাহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও সেই ইচ্ছা আইন বলিয়া বিচারালয় কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে না।

গণ-সার্বভৌমত্ব প্রকৃতপক্ষে সুসংবদ্ধ জনমতের বিজয় ঘোষণা করে। কোন রাষ্ট্রই জনমতের দাবী উপেক্ষা করিতে সাহসী হয় না।

অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদ—অষ্টিন্ আইনবিদের দৃষ্টি লইয়া সার্বভৌমত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজের একটি সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের উপর আইনগত সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়া তাহার নির্দেশকে আইন আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌম উপেক্ষা করিয়া আইনগত সার্বভৌমকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। আইনগত সার্বভৌমের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণীয় হইলেও তাঁহার মতবাদ সার্বভৌমত্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি বিভাজ্য?—অনেকে মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ ইহা সত্য নয়। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সার্বভৌম শক্তি স্বয়ং শাসন করিবার বিষয়গুলি ভাগ করিয়া দেয়। সার্বভৌম শক্তির কোন বিভাগ হয় না।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি সীমাবদ্ধ?—ঐশ্বরিক বিধান, জনমত ও শাসনতান্ত্রিক আইনকে অনেকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা

বলিয়া মনে করেন। বৈদেশিক ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক আইনকে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সীমা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এইগুলিকে প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা বলা চলে না। কারণ, আইনতঃ কোন রাষ্ট্রই এইগুলি মানিতে বাধ্য নয়, তবে কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় রাষ্ট্র তাহার কার্যকলাপ এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাহাতে ঐ নীতিগুলি উপেক্ষিত না হয়।

বহুত্ববাদ—রাষ্ট্রের অবাধ ও অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিবাদ হিসাবে এই মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্বর্তী বহু সংঘের মধ্যে একটি সংঘ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতির মত রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংঘ। সকল সংঘেরই সমাজ জীবনে উপযোগিতা আছে। সংঘ হিসাবে রাষ্ট্র মানব-জীবনের বহির্ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, সুতরাং ইহার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ। কাজেই কার্যের অনুপাতে ইহা অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন যে, সমাজের প্রত্যেকটি সংঘ নিজ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই সংঘগুলির উপর কতৃত্ব করিবার রাষ্ট্রের কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে, সমাজের বিভিন্ন সংঘগুলির মতবিরোধ ও বিবাদ অবসান করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রাধান্য অপরিহার্য।

সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি—সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি সম্পর্কে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা একটি জটিল সমস্যা। অনেকের মতে জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী, আবার অনেকে বলেন, যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অধিকারী, তাঁহারাই হইলেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। গেটেলের মতে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী সমষ্টিকে সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হইল যে, সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও চিরন্তন, সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রই ইহার প্রকৃত অধিকারী।

প্রশ্নাবলী

1. Distinguish between (a) Popular Sovereignty and Political Sovereignty, (b) *De Jure* and *De Facto* Sovereignty.
)

(ক) গণসার্বভৌমিকতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা, (খ) বাস্তব সার্বভৌমিকতা ও আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য কর।

2. "The concept of Sovereignty is opposed to individual liberty and international peace." Discuss critically.

"সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী"। সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

3. Write a critical note on the Austinian theory of sovereignty.

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অষ্টিনের মতবাদের উপর একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখ।

4. Explain the Monistic Theory of Sovereignty. How do the internationalists and the pluralists criticise the theory ?

সার্বভৌমিকতার একত্ববাদ নীতি ব্যাখ্যা কর। আন্তর্জাতিকতাবাদীরা ও বহুত্ববাদীরা কিভাবে একত্ববাদ নীতির সমালোচনা করে ?

5. Distinguish between the legal and political aspects of sovereignty. Illustrate your answer.

উদাহরণসহ সার্বভৌমিকতার আইনগত ও রাজনৈতিক দিকের পার্থক্য নির্দেশ কর।

6. Define the term sovereignty and discuss, in brief, the main attributes of sovereignty.

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং সংক্ষেপে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইন

(Law)

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Law)

'আইন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ-জীবনে মানুষকে অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই বিধি-নিষেধগুলিকে সাধারণতঃ সামাজিক আইন বলা হয়। সভ্য জীবনযাপনের জন্য মানুষকে যে নৈতিক বিধি মানিয়া চলিতে হয়, তাহাকে নৈতিক আইন বলা হয়। বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্রগুলিতে আইন শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানে কার্যকারণের সম্পর্ক বুঝাইতে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আইন' সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আইনের সংজ্ঞানির্দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। জন অষ্টিন্ ও তাঁহার অনুগামীদের মতে আইন হইল সার্বভৌমের নির্দেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অধস্তন ব্যক্তিরা আইন বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য। আইন যেরূপেই প্রচারিত হউক না কেন, ইহার একমাত্র উৎস হইল সার্বভৌম শক্তি। সুতরাং এই মত অনুসারে ধরা হয় যে, আইন একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয় ও আইন বলবৎ করিবার জন্য এক সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য। এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া হেন্‌রি মেইন্ বলেন যে, আইন শুধুমাত্র সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশে আইনানুগ সার্বভৌম-রচিত আইন ছাড়াও নানারূপ প্রচলিত প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি আইন বলিয়া অভিহিত হয়। মেইনের মতে সার্বভৌমের নির্দেশ আইনের একমাত্র

উৎস নহে। সামাজিক নানাপ্রকার শক্তির দ্বারা আইন প্রভাবিত হয়। প্রথা, আচার, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক শক্তি আইনের পরিবর্ধনে সহায়তা করে। সুতরাং আইনকে একটা স্থিতিশীল শক্তি না বলিয়া গতিশীল শক্তিরূপে পরিগণিত করা উচিত।

উপরি-উক্ত সমালোচনার সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে অস্টিনের অনুগামিগণ অষ্টিন্-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন : আইন হইল সমাজে মানুষের প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের আকারে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যে নিয়মগুলি শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের শক্তি ও প্রভাব দ্বারা বলবৎ করে।

হল্যাণ্ড-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞা'ই আইনের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি বলেন আইন হইল মানুষের বহির্জীবন-সম্পর্কিত কতকগুলি বিধি-নিষেধ, যাহা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক বলবৎ করা হয়। সুতরাং অষ্টিনের অনুগামিগণ দুই দিক দিয়া অষ্টিন্-প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন। প্রথমতঃ, আইন শুধু সার্বভৌমের নির্দেশ নয়, স্বভাবজাত প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির সমাবেশে আইনের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, উধ্ব তন কর্তৃপক্ষ আইনের স্রষ্টা নয়, এই কর্তৃপক্ষ আইন বলবৎ করে মাত্র। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও আইন মানিতে বাধ্য। তাহারা আইনের আওতার বাহিরে নয়।

বর্তমানে আইনের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক লেখকগণ বলেন, আইন হইল বহির্জীবন-নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি বিধি-নিষেধ, যাহা, জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে আইন জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট নয়, সে আইন কখনও বলবৎ করা যায় না। আইনের বাধ্য-বাধকতা নির্ভর করে আইনের প্রকৃতির উপর। আইন মান্য করিলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়—এই বিবেচনা দ্বারা চালিত হইয়া সাধারণতঃ লোকে আইন মান্য করে। যে আইন ব্যক্তির বা সমষ্টির পক্ষে

কল্যাণকর নয়, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকে মানিতে চায় না। সুতরাং আইন মান্য করা বা না-করা জনসাধারণের আইনের প্রকৃতিসম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করে—রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। আর রাষ্ট্র শুধু এই সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক মাত্র। এই ক্ষমতা জনসাধারণই রাষ্ট্রকে প্রদান করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র জনসাধারণের সম্মতি অনুসারেই এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, আইন যদি জনসাধারণের সম্মতির অভিব্যক্তি হয় তাহা হইলে আইন মান্য করাইবার জন্য বলপ্রয়োগের কি প্রয়োজন? একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই আইনগুলি ব্যক্তিনির্বিচারে প্রযোজ্য। সকলেই সব সময় আইন মানিতে বাধ্য। উড্রো উইলসন্ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, আইন মানুষের চিন্তাধারার দর্পণস্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি। ইহা শারীরিক ও নৈতিক শক্তির মাধ্যমে কার্যকর হয়। মানুষের চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন ঘটে। চিন্তাধারার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ আইনে প্রতিফলিত হয়। একটা দেশের আইন বিশ্লেষণ করিলে সে দেশের তৎকালীন সমাজিক চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতি জানা যায়। যেহেতু আইন মানুষকে একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার জীবনযাত্রা পরিচালিত করিতে বাধ্য করে, সেইহেতু ইহাকে সক্রিয় শক্তি বলা হইয়াছে। আইনের অবর্তমানে মানুষ তাহার খুশিমত জীবন যাপন করিতে পারে। আইন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজে নানা স্তরের লোক থাকে। একদল নৈতিকবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কর্তব্যবোধে আইন মান্য করে। নৈতিকজ্ঞানই তাহাদের আইন মানিতে বাধ্য করে। কিন্তু সমাজে এমন অনেক লোক থাকে যাহারা স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আইন মান্য করে। তাই যখন কোন আইন এই সমস্ত লোকের স্বার্থ-বিরোধী হয় তখন তাহারা আইন মান্য করিতে দ্বিধা করে। এই শেষোক্ত দলের জন্যই শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় আইন সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। যখন নৈতিক শক্তি আইন মান্য করাইতে ব্যর্থ হয়, তখন শারীরিক শক্তির প্রয়োগে আইন বলবৎ করা অপরিহার্য হইয়া উঠে।

আইনের সমর্থন (Sanction behind Law)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আইনের সমর্থন ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূল্যের (Validity and value) উপর নির্ভর করে। আইনের বৈধতা রাষ্ট্রের শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়। আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সকলেই মান্য করিবে। যে আইন সকলে মান্য করে না, সে আইনকে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক আইন বলা যায় না—আর যে আইন ইহার সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যবিহীন হয়, সে আইন প্রকৃত আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু আইনের এই সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রকৃতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রশক্তি আইনকে বৈধ করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের যদি কোন নৈতিক মূল্য না থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্র শুধু বলপ্রয়োগ দ্বারা আইন বলবৎ করিতে পারে না। শুধুমাত্র শক্তিমান রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বলিয়াই লোকে আইন মান্য করে না— আইন ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত - আইন সার্বজনীন স্বার্থের ধারক ও রক্ষক—এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই লোকে আইন মানে। সুতরাং যে আইন যত পরিমাণে নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে আইন ততই সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হইবে। সুতরাং আইনের বৈধতা নীতিজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে। আইনের নৈতিক মূল্যই ইহাকে বৈধ করিতে সাহায্য করে। সুতরাং আইনের সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রকৃতি অর্থাৎ সমর্থন ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূল্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

আইনের উৎস (Sources of Law)

আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কোন দেশেরই প্রচলিত আইন শুধু রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। নানাবিধ সামাজিক শক্তি আইন-গঠনে কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু আইনের উৎস যাহা হউক না কেন, প্রত্যেকটি আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রচারিত, স্বীকৃত ও কার্যকর হওয়া চাই। আইন-গঠনে নিম্নলিখিত শক্তিগুলি কার্যকরী হইয়াছে:

১। প্রথা (Custom)

প্রত্যেক দেশের প্রচলিত আইনগুলির মধ্যে কতকগুলির প্রথাগত বিধি-নিষেধ দেখা যায়। এই প্রথাগুলি আইনানুগ সার্বভৌম কর্তৃক রচিত হয় না। ইহারা আপনা হইতেই প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠে। রাষ্ট্র-উদ্ভবের পূর্ব হইতে এগুলি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইয়া মানুষের সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্র-উদ্ভবের পরবর্তী কালে এই প্রচলিত প্রথার অনেকগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এই স্বীকৃতির ফলেই প্রথাগুলি আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

২। ধর্ম (Religion)

প্রথার মতই ধর্মীয় আইনগুলিও আইন-সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। এই অনুশাসনগুলি সমাজ-জীবন নানাভাবে সুসংবদ্ধ করিয়া সমষ্টিগত জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়াছে। এই অনুশাসনগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালনার কার্যে সহায়ক বলিয়া রাষ্ট্র এগুলিকে সমর্থন করিয়া আইনের মর্যাদা দিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের আইনের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

৩। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Adjudication)

বিচারালয়ের আইনসম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলিও নূতন আইনের সৃষ্টিকার্যে অনেক সাহায্য করিয়াছে। বিচারকেরা শুধু আইনের প্রয়োগ করেন না, তাঁহারা প্রয়োজনমত আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। আইনের অর্থ যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহা হইলে বিচারকেরা ব্যাখ্যা করিয়া আইনের যে সিদ্ধান্ত করেন তাহাই সঠিক আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। একজন বিচারক কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইনের সিদ্ধান্ত যখন অন্যান্য বিচারকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়, তখন এই নূতন সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হয়।

৪। ন্যায়পরতা (Equity)

আইনের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক সময় বিচারকদের নিজেদের ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে হয়। বিচারকার্য

যাহাতে ন্যায়ধর্ম অনুসারে পরিচালিত হয় সেজন্য বিচারকেরা এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই ন্যায়ধর্মের ভিত্তিতেও অনেক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং বিচারকগণ দুই প্রকারে আইন সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। প্রথমতঃ, আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা ও দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রয়োগে ন্যায়ধর্মের অনুসরণ করিয়া।

৫। আইনবিদ্‌গণের আলোচনা (Scientific discussion)

অভিজ্ঞ আইনবিদ্‌গণ তাঁহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক সময় নূতন আইনের সৃষ্টি ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের সহায়তা করেন। সমষ্টিগত জীবনে কোন্‌টি আইনরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত ও কোন্‌টি বর্জনীয় এ বিষয়ে আইনবিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত প্রায় সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হয়। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করিয়া এই সিদ্ধান্তগুলি আইনে পরিণত হয়।

৬। আইন-প্রণয়ন (Legislation)

অধুনা আইন-পরিষদ্‌ই আইনের প্রধান উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। আইন পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রপরিচালন কার্য সহজ করিয়াছে।

ওপেনহাইম, হল্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আইনবিদ্ পণ্ডিতগণ উপরি-উক্ত বিষয়-গুলিকে আইনের বিভিন্ন উৎস বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি করেন। তাঁহাদের মতে জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাই হইল আইনের প্রধান উৎস। এই সমবেত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ নানা প্রণালীতে হইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন মানব-সমাজে এই সমবেত ইচ্ছা প্রথা বা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই সমবেত ইচ্ছা প্রতিনিধিমূলক আইন-পরিষদের মাধ্যমে আইনরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং উক্ত পণ্ডিতগণের মতে প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আইনের উৎস না বলাই যুক্তিসম্মত।

রাষ্ট্রীয় আইন ও অন্যান্য আইন

প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature)

সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, অনেক লেখক রাষ্ট্র-জন্মের পূর্বে মানুষ যে পরিবেশে বাস করিত তাহাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ অথবা প্রকৃতির রাজ্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যে সমস্ত আইন মান্য করিত সেগুলিকে প্রাকৃতিক আইন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

গ্রীক দার্শনিকদের লেখার মধ্যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান, মানবসমাজের নিয়মগুলি ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। মনুষ্যকৃত আইনগুলি প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অনুরূপ হইলে সেগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হইত। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল্ উভয়েই প্রাকৃতিক আইনের নজির দেখাইয়া তাঁহাদের অনেক মতবাদ সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ষ্টোয়িক দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে যে সামঞ্জস্য সমন্বিত নিয়ম বিদ্যমান, মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়া সমাজোপযোগী করিতে হয়। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি এইরূপে আইনের মর্যাদা পায়। রোমকগণ এই প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে তাঁহাদের আন্তর্জাতিক আইন (*Jus gentium*) সৃষ্টি করেন। উহা বর্তমান যুগে পূর্ণ আন্তর্জাতিক আইনরূপে গণ্য হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষে এই যুক্তি দেখান হয় যে, ইহার পশ্চাতে কোন আইনের অনুমোদন নাই। শুধুমাত্র নৈতিক অনুমোদনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই নিয়মগুলি কার্যকর করা যায় না। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি একটা নৈতিক আদর্শের মান স্থির করে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপে এই নৈতিক মান বলবৎ করা সম্ভবপর নয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের এই ত্রুটিসত্ত্বেও বাস্তব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই নিয়মগুলির প্রভাব প্রভূত পরিমাণে অনুভূত হয়। জুরির দ্বারা বিচারপদ্ধতি, বিচারকালে বিচারকদের ন্যায় ও ধর্মনীতি অনুসরণ, আন্তর্জাতিক আইনের

ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রভৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মেরই পরোক্ষ প্রয়োগ বলা যাইতে পারে।

সামাজিক আইন (Social Law)

সামাজিক আইনগুলি মানুষের সমষ্টিগত জীবনের কার্যকলাপের একটা মান স্থির করিয়া দেয়। প্রত্যেক সমাজেই এইরূপ কতকগুলি নিয়ম থাকে যাহা সমাজভুক্ত ব্যক্তিমাত্রই সাধারণতঃ মানিয়া চলে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম প্রত্যেক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন এগুলি সম্পর্কে সাধারণতঃ নিরপেক্ষ। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলি বহু ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের পূর্বতন সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেছে। মানুষের সামাজিকতা-বোধের উপরই প্রধানতঃ ইহার অনুমোদন নির্ভর করে।

ধর্মীয় আইন (Religious Law)

ধর্মীয় আইন ব'লিতে ধর্মের কতকগুলি অনুশাসন বুঝায়। প্রত্যেক ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন থাকে। এই অনুশাসনগুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসরণকারিগণ মানিয়া চলেন। কেহ যদি এই অনুশাসনগুলি অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হইবেন, অথবা সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসরণকারিদের দ্বারা সমাজচ্যুত হইবেন। কিন্তু এজন্য রাষ্ট্র তাঁহাকে কোনরূপ দৈহিক শাস্তি প্রদান করিবে না। ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ধর্মের বন্ধন সকল সমাজেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

নৈতিক আইন (Moral or Ethical Law)

সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের অপরাপর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক কতকগুলি বাস্তব কার্যকর নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বাস্তব নিয়মগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি নিয়মের কল্পনা করা যায়, যে নিয়মগুলি দ্বারা মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক একটা আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শেষোক্ত এই নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের দ্বারা

নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র জীবন ধারণ করা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। মানুষ চায় যাহাতে তাহার নৈতিক জীবনেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। নৈতিক জীবনে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে মানুষের নীতিসম্মত জীবন যাপন করিতে হইবে। এইজন্য প্রত্যেক সমাজে মানুষের ঔচিত্যবোধকে ভিত্তি করিয়া কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিধি-নিষেধগুলি মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের আদর্শ মান স্থির করিয়া দেয়। নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এইগুলিকে নৈতিক আইন বলা যায়।

রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়মের সম্পর্ক (Relation between Law and Morality)

রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন ও নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। আইন শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, অপর পক্ষে মানুষের নৈতিক ধারণা তাহার সমগ্র জীবনকে—চিন্তাধারা, কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও বাস্তব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং নৈতিক আইনের কার্যক্ষেত্র ব্যাপকতর। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন শক্তিপ্রয়োগে বলবৎ করা হয়। আইনভঙ্গকারী শাস্তি পায়, কিন্তু নৈতিক অপরাধ রাষ্ট্র কর্তৃক দণ্ডনীয় নয়। নৈতিক অপরাধীকে শুধু বিবেকদংশন অথবা লোকনিন্দা সহ্য করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট এবং ব্যক্তিনির্বিচারে সব সময়ে প্রযোজ্য, কিন্তু নৈতিক নিয়মগুলি সুসংবদ্ধ বা সুস্পষ্ট নয় এবং দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে এগুলি সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটে ও প্রয়োগেরও ব্যতিক্রম হয়। চতুর্থতঃ, নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্য, অনৌচিত্য, ন্যায় ও অন্যায়বোধের একটা নির্দিষ্ট মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সাধারণের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক জ্ঞানের উপর সব সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অকৃতজ্ঞতা, বিদ্বেষবুদ্ধি প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ, কিন্তু এগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। রাত্রিকালে বাতি না জ্বালিয়া দ্বিচক্রযান চালনা করা নৈতিক অপরাধ না হইলেও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত। যুদ্ধকালে গৃহের অভ্যন্তরস্থিত আলোক অনাচ্ছাদিত রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু শান্তির সময়ে উহা অপরাধ বলিয়া

গণ্য হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে, নীতিবিগর্হিত বলিয়াই যে মানুষের আচরণ বেআইনী ঘোষিত হয় সব সময়ে তাহা সত্য নহে। জনস্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র মানুষের অনেক আচরণকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে।

অনেক লেখক বলেন যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষাকল্পে রাষ্ট্র যে-কোন আইন—এমন কি নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনও প্রবর্তিত করিতে পারে। ("The safety of the state is its first law and to realise this end it must be above morality.") কিন্তু এই মতবাদ বিনা শর্তে গ্রহণ করা যায় না। ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রেরও নিজ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে মানিয়া লইলেও রাষ্ট্রকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্র সাময়িকভাবে নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন প্রবর্তন করিতে পারে। কারণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হইল রাষ্ট্র ও সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যদি বিপদাপন্ন হয় তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতারও অবসান ঘটিতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রকে আপৎকালে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। সেইজন্য অন্তর্বিপ্লব অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় রাষ্ট্র অনেক নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনের বলে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ অধিকার বা বিদ্যালয়গৃহকে আস্তাবলে পরিণত করিবার অধিকার প্রভৃতি নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া যাইতে পারে না। এইরূপ অবাধ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচনা করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের নীতিজ্ঞান-বিরোধী আইন করিবার অধিকার শর্তসাপেক্ষ।

এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম ও আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উভয় নিয়মই মানুষের ধর্মগত ধারণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষের নৈতিক জ্ঞান রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রপ্রবর্তিত কোন আইন যদি প্রচলিত নীতিজ্ঞানবিরোধী হয় অথবা প্রচলিত নীতিজ্ঞান হইতে বেশী অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্পদ হয়, তাহা হইলে সে আইন লোকে মান্য করে না। সুতরাং প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রাষ্ট্রের আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য

হইল মানুষের নৈতিক উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিয়া সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন সৃষ্টি করা যেগুলি মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতিসাধন করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি সঞ্চারিত করিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় রাষ্ট্রকে পুরাতন আইন বা সামাজিক আচার-প্রথার সংস্কার অথবা বিলোপসাধন করিয়া নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। নূতন আইনের দ্বারা রাষ্ট্র মানুষের ঔচিত্যবোধ বৃদ্ধি করাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিক তৎকালে প্রচলিত সতীদাহ-প্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার বিলোপসাধন করেন। আইনের দ্বারা এই কু-প্রথার বিলোপসাধন হওয়াতে কালক্রমে লোকের নৈতিক বুদ্ধিও পরিবর্তিত হইতে থাকে। সতীদাহ-প্রথা শুধু বে-আইনী হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান কালের লোকে বিবেচনা করে না—তাহারা মনে করে এই প্রথা নীতি-বিগর্হিত, তাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং আইনের মাধ্যমে লোকের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক মানুষের যেমন অপরাপর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরও তদ্রূপ অপরাপর রাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাহার কারণ হইল কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এক রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে অপরাপর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। অধুনা যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ার ফলে সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া নানাবিধ আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ আদান-প্রদানের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় কতকগুলি সর্ববাদিসম্মত নিয়মে। এই নিয়মগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় আইনের অনুরূপ প্রথায় আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। আন্তর্জাতিক প্রথা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক পরামর্শ-

সভার সিদ্ধান্ত ও খ্যাতনামা আইনবিদ্ পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন পরিপুষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় সৃষ্টি আইন অনুসারে নিম্নলিখিত উৎসগুলি আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃত উৎস বলিয়া পরিগণিত হয়। (ক) আন্তর্জাতিক প্রথাগত বিধান (conventions), (খ) আন্তর্জাতিক প্রথা, (গ) সভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের নীতি, (ঘ) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক আইনবিদের অভিমত। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিচারপ্রার্থী পক্ষগুলির সম্মতিক্রমে উপরি-উক্ত উৎসগুলি নিরপেক্ষভাবে ইহার ন্যায়বোধ (equity) প্রয়োগ করিয়া বিচার করিতে পারে। এই আইন এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের শান্তির সময়ে, যুদ্ধকালে বা নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনকালে কি সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করে। আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাই। রাষ্ট্রগুলির সম্মতিই হইল ইহার প্রধান অনুমোদন। রাষ্ট্রগুলি এই আইনানুসারে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিয়া পরোক্ষভাবে এই আইনের সমর্থন করে। আবার অনেক সময় এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ইহার সমর্থন করে।

আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলা হইবে, কি কতকগুলি নৈতিক নিয়মের সমষ্টি বলা হইবে, এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। অস্টিন্ আইনের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সংজ্ঞা অনুসারে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করা যায় না। প্রত্যেক আইনের পশ্চাতে একটি সার্বভৌম শক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য বলিয়া মনে করিলে এই আইনকে আইন আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার মত কোন সার্বভৌম শক্তি ইহার পশ্চাতে নাই। আইন অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে দণ্ড দিবার উপযুক্ত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত অবর্তমান। রাষ্ট্রগুলি বহু ক্ষেত্রে এই আইন মান্য করে না। সুতরাং যে আইন মান্য করা বা না-করা আইনভঙ্গকারীদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সে আইনকে প্রকৃত আইন বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

আন্তর্জাতিক আইন অনেক সময় রাষ্ট্রগুলি মান্য করে না—এই যুক্তিতে

ইহাকে প্রকৃত আইন বলিতে আপত্তি করা হয়। রাষ্ট্রীয় আইনও বহু ক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়। রাষ্ট্রীয় আইন ক্ষেত্রবিশেষে ভঙ্গ হইলেও যদি সেগুলিকে আইন আখ্যা দিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক আইন সময় বিশেষে ভঙ্গ হয় বলিয়া ইহাকে আইন বলিয়া স্বীকার না করা অযৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইনের বিধি অনুসারে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্বক আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিয়াছে বলিয়া কোন রাষ্ট্রই স্বীকার করে না। আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী বলিয়া যখনই কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় তখনই অভিযুক্ত রাষ্ট্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া দোষ-স্খালনের নিমিত্ত সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়। সে যে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে নাই ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়। রাষ্ট্রের এই আচরণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও ঐ আইন অনুসারে তাহার কার্য পরিচালিত করিতে যত্নবান। তৃতীয়তঃ, কোন সভ্য রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করে না। অধিকন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আন্তর্জাতিক আইনকে জাতীয় আইনের একটি অংশ বলিয়া বিবেচনা করে।

চতুর্থতঃ, অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কোরিয়ার যুদ্ধকালে ও ইংরাজ-ফরাসী কর্তৃক ইজিপ্ট আক্রমণকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক অর্থনৈতিক চাপ-সৃষ্টি ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করিতে ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বলা হয় যে, আইন হইল কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি যাহা সর্বসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন হয় আইনকে বলবৎ করিবার নিমিত্ত, আইনের অস্তিত্বের নিমিত্ত সার্বভৌম ক্ষমতা অপরিহার্য নহে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিশারদ পণ্ডিত হল্ ও ওপেনহাইম্ এই আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনের পশ্চাতেও আন্তর্জাতিক জনমতের অনুমোদন ও সমর্থন আছে। জনমতের এই অনুমোদন ও সমর্থন যত বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে আন্তর্জাতিক আইন

অনুরূপভাবে ততো শক্তিশালী হইবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক জনমত অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আইনের মত সকল ক্ষেত্রে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলি অধিকতররূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত এবং বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী বজায় রাখিবার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক আইনকে বাধ্যতামূলক করিয়া আইনের মর্যাদা দেওয়া বর্তমান যুগে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Law)

দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে আইনের শ্রেণী ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা আইন রচিত হয়, সেই কর্তৃপক্ষের পার্থক্যের ভিত্তিতে ; দ্বিতীয়তঃ, আইন কাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা দেখিয়া ইহার শ্রেণী ভাগ করা হয়।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে আইনের নিম্নলিখিত শ্রেণী ভাগ করা হয় ; যথা—

১। আইনপরিষদ্ রচিত লিখিত আইন— Statutes.

এই আইনগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনপরিষদ্ কর্তৃক রচিত হয়। বর্তমানে সব দেশেই এইরূপ আইনের প্রাধান্য দেখা যায়।

২। শাসনবিভাগীয় নির্দেশ—Ordinances.

এইগুলি শাসনবিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ অবস্থায় প্রবর্তিত হয় বলিয়া উহাদিগকে শাসনবিভাগীয় নির্দেশ বলা হয়। এই নির্দেশগুলি বিশেষক্ষেত্রে স্বল্পস্থায়িভাবে প্রয়োগ করা হয়।

৩। সচরাচরিক প্রথা—Common Law.

এই নিয়মগুলি লোকাচার হইতে উদ্ভূত হইলেও বিচারালয় কর্তৃক প্রযুক্ত ও বলবৎ করা হয়।

৪। শাসনতান্ত্রিক আইন—Constitutional Law.

এই আইনগুলি রাষ্ট্রের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। যে দেশের শাসনতন্ত্র অনমনীয়, সেই দেশেই শুধু শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

৫। আন্তর্জাতিক আইন—International Law.

এই আইন সভ্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি-সংরক্ষণে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়তঃ, আইনকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—

১। রাষ্ট্রীয় আইন—Municipal Law ও ২। আন্তর্জাতিক আইন—International Law. রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ও বলবৎ হয়। রাষ্ট্রের বাহিরে অন্য রাষ্ট্রে ইহার প্রয়োগ হয় না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ হয় সকল সদস্য রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্রীয় আইনকে পুনরায় দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(ক) ব্যক্তি-সম্পর্কিত আইন—Private Law ও (খ) সাধারণ-সম্পর্কিত আইন—Public Law. ব্যক্তি-সম্পর্কিত আইন জনসাধারণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। সাধারণ-সম্পর্কিত আইন ব্যক্তির সহিত সরকারের সম্পর্ক স্থির করিয়া শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেই ব্যবস্থা করে। সরকার-সম্পর্কিত আইনকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—(১) শাসনতান্ত্রিক আইন—Constitutional Law ও (২) শাসনবিভাগীয় আইন—Administrative Law. শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারের কার্যসমূহ স্থির করিয়া তাহার সীমারেখা টানিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থির করে। শাসনবিভাগীয় আইনগুলি সরকারী কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্তব্য নির্ধারণ করে।

আইন
- জাতীয় (National)
  - শাসনতান্ত্রিক (Constitutional)
  - সাধারণ (Ordinary)
    - সাধারণ-সম্পর্কিত (Public)
      - শাসন-সংক্রান্ত (Administrative)
      - সাধারণ (General)
    - ব্যক্তি-সম্পর্কিত (Private)
- আন্তর্জাতিক (International)

রাষ্ট্র ও আইন (State and Law)

রাষ্ট্রের সহিত আইনের কি সম্পর্ক তাহাই বিচার্য বিষয়। একদল লেখক বলেন যে, রাষ্ট্র হইল আইনের উৎস। রাষ্ট্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আইন প্রণয়ন করে এবং জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে আইনানুমোদিতভাবে কার্য পরিচালনা করে, সেজন্য আইন বলবৎ করে ও আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে। এইরূপে রাষ্ট্রসৃষ্ট আইন সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করে। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকে আইনের স্রষ্টা বা জনক বলা যাইতে পারে।

মতান্তরে ডুগুই (Duguit), ক্র্যাব্ (Krabbe) প্রভৃতি লেখকগণ আইনকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দেন। তাঁহাদের মতে আইন রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। রাষ্ট্র শুধু আইনকে স্বীকৃতি দান করে এবং আইন বলবৎ করে। তাঁহাদের মতে এমন কি সর্বশক্তিমান্ রাষ্ট্রও আইন দ্বারা বাধ্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্বও আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকে আইনের আজ্ঞাবহ বলিয়া মনে হয়।

যে সমস্ত লেখক আইনের উপর প্রাধান্য আরোপ করিয়া আইনকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দেন তাঁহারা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত নহেন। সরকার হইল রাষ্ট্রের সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, সেইজন্য সরকারের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্য। সরকারের কার্যকলাপ যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এই নিমিত্ত সমস্ত সভ্য দেশেই পৃথক এক শ্রেণীর আইন দ্বারা সরকারের কার্যকলাপেব পরিধি স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই আইনগুলিকে শাসনতান্ত্রিক আইন বলা হয়। সরকারী কার্যকলাপের দ্বারা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহার প্রতিকার বিধান করিতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে এই শাসনতান্ত্রিক আইনও পরিবর্তন করিতে

পারে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সরকারই আইন দ্বারা বাধ্য, রাষ্ট্রের কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

সংক্ষিপ্তসার

আইন

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি—'আইন' শব্দটি নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়, যথা—সামাজিক আইন, প্রাকৃতিক আইন, নৈতিক আইন, ধর্মীয় আইন ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন বলিতে বুঝায় কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, যে নিয়মগুলি ব্যক্তিগত জীবনে পারস্পরিক আচরণের মান নির্ণয় করে। আইনগুলির পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অনুমোদন আছে বলিয়া জনসাধারণ এগুলিকে মান্য করে। অষ্টিন্ আইনকে সার্বভৌমের নির্দেশ বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টিন্ প্রদত্ত সংজ্ঞায় প্রথাগত নিয়ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিব স্থান নাই বলিয়া পরবর্তী লেখকগণ উহার পরিবর্তন করিয়া আইনের নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। বর্তমানে আইন জনমতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি জনমত অনুসারেই এই আইনগুলিকে বলবৎ করে।

আইন একদিকে যেমন সামাজিক চিন্তাধারার পরিচায়ক, অন্যদিকে তদ্রূপ একটি কার্যকরী শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। আইন মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিযা মানুষের কার্যকলাপ একটা নির্ধারিত পথে পরিচালিত করে।

আইনের উৎস—প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়নীতি, আইনবিদ্‌গণের আলোচনা ও আইনপরিষদ্ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়ন—এইগুলিই হইল আইনের জন্মদাতা। বর্তমানে অধিকাংশ আইনই শেষোক্ত পদ্ধতিতে রচিত হয়।

প্রাকৃতিক আইন—প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মানুষ স্বীয় বিবেকবুদ্ধির প্রয়োগে যে নিয়মগুলি দ্বারা নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিত সেগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক আইন বলিয়া পুরাকালে অভিহিত হইত। প্রাকৃতিক নিয়মগুলির পিছনে আইনের কোন

সমর্থন নাই বলিয়া এগুলিকে কার্যকরী করা চলে না। পরবর্তী যুগে আইন-গঠন ব্যাপারে প্রাকৃতিক আইনের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

সামাজিক ও ধর্মীয় আইন—এই নিয়মগুলিও সাধারণতঃ সমাজ-ব্যবস্থায় ও ধর্মসম্প্রদায়ের সংগঠনে লোকে মানিয়া চলে। কিন্তু এগুলিও কার্যকরী করা যায় না।

নৈতিক নিয়ম—সমাজে মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচিত, নৈতিক নিয়মগুলি তাহা নির্ধারণ করে। এই নিয়মগুলি মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যে তাহার বহিঃপ্রকাশ উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। বিবেকের কশাঘাত বা লোকনিন্দাই হইল ইহার অনুমোদন। নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়।

১। নৈতিক আইন মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে—রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বহির্জীবনের একটা প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

২। নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেক বা জনমত দ্বারা অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়।

৩। নৈতিক নিয়মগুলি অপেক্ষাকৃত অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট; অপরপক্ষে রাষ্ট্র-প্রণীত আইন সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট।

৪। নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্যবোধের মান দ্বারা স্বীকৃত হয়, রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সমাজের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন পরিবর্তিত হইতে পারে।

৫। নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্যকলাপ সব সময়ে বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হয় না, অপরপক্ষে নীতিজ্ঞান-বিরোধী না হইলেও অনেক কার্যকলাপ বে-আইনী হইতে পারে।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। প্রচলিত নীতিজ্ঞান-সম্মত না হইলে কোন রাষ্ট্রীয় আইনই জনমতের সমর্থন লাভ করিতে পারে না। মানুষের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করাই হইল উভয়বিধ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক আইন—এই আইনগুলি সভ্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তি রক্ষা করে।

আন্তর্জাতিক আইন কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই—রাষ্ট্রগুলির সর্ববাদিসম্মত মতের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই আইনগুলিকে বলবৎ করিবার পক্ষে শক্তিশালী কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষও অবর্তমান। সেইজন্য অনেকে ইহাকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক আইনের সপক্ষে একটি পৃথিবীব্যাপী শক্তিশালী জনমতের সৃষ্টি হইয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে।

আইনের শ্রেণীবিভাগ—দুইটি পদ্ধতি দ্বারা আইনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, আইনপ্রবর্তনের কর্তৃপক্ষ দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ আইন কাহাদের সম্পর্কিত তাহা নির্ধারণ দ্বারা।

রাষ্ট্র ও আইন—আইনের স্রষ্টা ও আইন বলবৎ করিবার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রকে আইনের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। অপর পক্ষে বলা হয় যে, আইনের স্থান রাষ্ট্রের উর্ধ্বে, কেন না, রাষ্ট্রও আইনসম্মত কার্য করিতে বাধ্য। প্রকৃত তথ্য হইল যে, সরকারের কার্যকলাপ শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়, সুতরাং সরকার আইন দ্বারা বাধ্য—রাষ্ট্র বাধ্য নয়।

প্রশ্নাবলী

1. "Law is the expression of the general will of the community."

Discuss the statement.

"আইন হইল সমাজের সাধারণ ইচ্ছার অভিব্যক্তি।"

উক্তিটি আলোচনা কর।

2. Discuss the nature and sanction of Law. Can International law be regarded as Law in the strict sense of the term.

Give reasons for your answer.

আইনের প্রকৃতি ও সমর্থন আলোচনা কর। আন্তর্জাতিক আইন কি সঠিক ভাবে আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।

3. Is it enough to say about Law that it is the Command of the sovereign?

আইন সম্বন্ধে ইহা বলা কি যথেষ্ট যে আইন হইল সার্বভৌম ক্ষমতার নির্দেশ ?

4. Define Law and point out the sources of Law with their relative importance.

আইনের সংজ্ঞা দাও এবং ইহার বিভিন্ন উৎসগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় কর।

5. Define 'Law' and explain the relationship between Law and Morality.

আইনের সংজ্ঞা দাও এবং আইন ও নীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ

(State and Nationalism)

স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবোধ—
(People, Nationality, Nation and Nationalism)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝা যায়, একই ঐতিহ্য-দ্বারা পরিপুষ্ট একদল লোক যাহারা একই নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস না করিতেও পারে অথবা এক ভাষাভাষী নাও হইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ইহুদি জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না। তাহারা বিভিন্ন দেশে বাস করিত ও সেইজন্য তাহাদের ভাষাগত কোন ঐক্য ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের নাগরিক হইলেও সমষ্টিগতভাবে এক অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী বলিয়া ইহুদি জাতির মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ ছিল। সমগ্র ইহুদি জাতি এই ঐক্যবোধদ্বারা আজ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের সকলকেই জাতীয় মানুষ বলিয়াই মনে করে।

জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় তখনই, যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীরতর ঐক্যবোধদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্য জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। রক্তের, ভাষার, ধর্মের বা কৃষ্টির অভিন্নতা এই একতাবোধকে শক্তিশালী করিয়া জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সহায়তা করে।

জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ আত্মসচেতন হয় ও নিজেদের বহিঃশাসন হইতে মুক্ত করিয়া এক স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাহাদের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার প্রয়াস পায়, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের ফলে স্বজাতীয় মানুষ জাতীয় জনসমাজ বলিয়া

পরিচিত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের ফলে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। স্বজাতীয় মানুষ অপেক্ষা জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ গভীরতর আর এই ঐক্যবোধ রাজনৈতিক চেতনার জন্মদাতা। রাজনৈতিক চেতনা যখন গভীরতর হয় তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত একদল লোক যখন নিজেদের রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম হয়, তখন তাহাদের রাজনীতির ভাষায় জাতি বলা হয়। জাতীয়তাবোধ + রাষ্ট্র = জাতি। সুতরাং স্বজাতীয় মানুষ ও জাতীয় জনসমাজ জাতিগঠনের দুইটি প্রাথমিক স্তর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

জাতীয় জনসমাজ অনেক সময় একটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বৃহৎ জাতির ক্ষুদ্র এক অংশকে বুঝাইতে উপজাতি অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়। যেমন, বৃটিশ জাতির একটি অংশ হইল স্কচ্ উপজাতি।

রাষ্ট্র ও জাতি (State and Nation)

অনেক সময় জাতি শব্দটি ও রাষ্ট্র শব্দটি পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন বলা হয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রকৃত অর্থ হইল সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক একটি সংঘ। বস্তুতঃ রাষ্ট্র ও জাতি একার্থবোধক নহে।

নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আইন ও শৃংখলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকেই রাষ্ট্র বলা হয়: জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনব্যবস্থা ও সর্বোপরি সার্বভৌমিকতা এই চারিটিই হইল রাষ্ট্র অস্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু জাতির সংজ্ঞা রাষ্ট্র সংজ্ঞা হইতে শুধু পৃথক নয়, গভীরতরও বটে। জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মবোধ থাকা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জাতি একার্থবোধক হয় তখন যখন রাষ্ট্রভুক্ত সমগ্র জনসমষ্টি একই ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। একাত্ম-বোধের অবর্তমানে একটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব কিন্তু একজাতি গঠিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কালে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য একটি মাত্র রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত

হইলেও ইহা একজাতি ছিল না। রুশিয়ার জারের সাম্রাজ্য সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। এক শাসনব্যবস্থাভুক্ত হইলেও এই রাষ্ট্রগুলির জনসমষ্টির মধ্যে কোন একাত্মবোধ ছিল না এবং এই একাত্মবোধের অভাবে ইহারা জাতি পদবাচ্য হইতে পারে নাই।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, রাষ্ট্র ও জাতি এই দুইটি সংজ্ঞা পরস্পর-বিরোধী নয়, পরন্তু একটি অপরটির পরিপূরক। একই রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী বাস করিলে একই শাসন, আইন ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন জাতি ক্রমশই একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক জাতিতে পরিণত হয়। সুইস দেশে এইরূপে তিনটি পৃথক ভাষাভাষী জাতি একই শাসনব্যবস্থার অধীনে এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অপর পক্ষে যখন একদল লোক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের নিজস্ব রাজনৈতিক জীবন, কৃষ্টি, ভাষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়, তখন এই একাত্মবোধই তাহাদের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করিতে সাহায্য করে। ইতিহাসে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পোলাণ্ড দেশ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এইজন্য বলা হয় যে, রাষ্ট্র জাতি সৃষ্টি করে, আবার জাতিও রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। **"The state creates the nation : the nation creates the state."**

কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে জাতিভিত্তিক নয়। রাষ্ট্রগঠনের প্রধান উপাদান হইল সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধ যতই শক্তিশালী ও গভীর হউক না কেন, সার্বভৌমিকতার অবর্তমানে এই ঐক্যবদ্ধ জাতি রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিদেশী অধিকৃত জাপান-জার্মানী ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

জাতীয় জনসমাজ বা জাতি গঠনের উপাদান (Elements of Nationality)

জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে জাতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে উপাদানগুলি জাতীয় জনসমাজ গঠনে সহায়তা করে, সেইগুলিই জাতিগঠনেরও সহায়ক। একমাত্র রাজনৈতিক চেতনার বিদ্যমানতা বা অভাবের উপর ইহাদের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত। জাতিগঠনের উপাদানগুলিকে

দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, বাহ্যিক উপাদান ও ভাবগত উপাদান। এই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিলে জাতিগঠনে ইহার প্রত্যেকটির কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যায়।

কুলগত ঐক্য (Racial Unity)

অনেকে মনে করেন জাতিগঠনে কুলগত ঐক্য অপরিহার্য। যখন জাতীয় জনসমাজের সমস্ত মানুষ নিজেদের এক বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করে তখনই জাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ কথা সব সময় সত্য নয়। উদ্ভবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে জার্মান ও ইংরাজ একই টিউটন বংশোদ্ভব, কিন্তু জাতি হিসাবে ইহারা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপর পক্ষে, ইংরাজ ও স্কচ্ এক বংশোদ্ভব না হইলেও এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বংশোদ্ভব মানুষ—জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী একজাতি বলিয়া পরিচিত। সুতরাং অভিন্ন কুল জাতিগঠনের একমাত্র উপাদান বা অপরিহার্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া রক্তের যে সংমিশ্রণ চলিয়াছে তাহার ফলে কোন জাতিই আজ আর অবিমিশ্র জাতি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কিন্তু এককুলোদ্ভব হইলে জাতীয় ঐক্য দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

ভাষাগত ঐক্য (Sameness of Language)

কুলগত ঐক্য যেরূপ জাতিগঠনে অপরিহার্য নয়, ভাষাগত ঐক্যও সেরূপ অপরিহার্য নয়। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে, কিন্তু তাহাদের ভাষাগত বিভেদ জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। পরন্তু এই ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক আদর্শ জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া একই রাষ্ট্রে একজাতি হিসাবে বসবাস করিতেছে। ভাষা ভাবের আদান-প্রদানে সহায়তা করিয়া ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। সুতরাং ভাষাগত ঐক্য জাতিগঠনে সহায়তা করে একথা অনস্বীকার্য হইলেও ভাষাগত ঐক্যের অভাবে যে জাতির সৃষ্টি হইতে পারে না একথা বলা যায় না।

ধর্মগত ঐক্য (Religious Unity)

মধ্যযুগে ধর্মগত ঐক্য জাতিগঠনের একটি প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইলেও বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে ইহার প্রভাব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। একমাত্র মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি ব্যতীত অন্য কোথায়ও ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় নাই। ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়ুরোপে অনেক জাতি আছে যাহাদের মধ্যে ধর্মগত অনৈক্য জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি প্রভৃতি বহু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার ধর্মগত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও অতি আধুনিক কালে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাংলা দেশ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব জাতিগঠনের উপাদান বলিয়া গণ্য হয় না।

ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical Unity)

কতকগুলি লোক এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করিলে তাহারা একজাতিতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক ঐক্য জাতিগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাকে অপরিহার্য বলা চলে না। বহুদিনব্যাপী এক ভৌগোলিক ঐক্যের মধ্যে বসবাস করিয়াও ভারতের অধিবাসী হিন্দু-মুসলমান একজাতিতে পরিণত হয় নাই। আবার বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করিয়াও ইহুদি জাতি তাহাদের একজাতিত্ব হারায় নাই।

ভাবগত ঐক্য (Spiritual Unity)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, জাতিগঠনে বাহ্যিক উপাদানগুলি সব সময়ে বিশেষ কার্যকর হয় না। এগুলির অবিদ্যমানেও জাতির উদ্ভব সম্ভব। জাতীয় জনসমাজ বা জাতিগঠন প্রধানতঃ নির্ভর করে জাতির এক বিশেষ মনোভাবের উপর। যখন জাতীয় জন-সমাজের জনসমষ্টি তাহাদের মূলগত ঐক্যে একান্ত আস্থাবান্ হইয়া একজাতিত্ব-বোধে অনুপ্রাণিত হয়, তখনই কুলগত, ভাষাগত বা ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা একজাতিতে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হইল, এই ভাবগত ঐক্য কি?

ভাবগত ঐক্য একটা মানসিক অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতি বাহ্যিক ঐক্য অপেক্ষা মানসিক ঐক্যের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়। একদল লোকের মধ্যে কুলগত বা ভাষাগত বা আরও অনেক প্রকার সামাজিক বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু অতীতে যদি একই ইতিহাসের ঘটনাবলীর পথে তাহাদের জীবন গঠিত হইয়া থাকে, যদি তাহারা একই ঐতিহ্য বা সভ্যতার অধিকারী ও একই সুখদুঃখের অংশ গ্রহণকারী হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য তাহারা দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন একদল লোক নিজেদের অন্যান্য সকল দল হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে। অতীতের এই সম-সুখ-দুঃখভোগের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শ এই জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত করিয়া সকলকে একতার সূত্রে গ্রথিত করে। সময়ের অগ্রগতির ফলে এই ভাবগত ঐক্যের বন্ধন তাহাদেব মধ্যে দৃঢ়তর হয় ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে সম-সুখদুঃখ ও সম-স্বার্থের ভিত্তিতে একত্রিত করিয়া একজাতিতে পরিণত করে। সুইস্-জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সৃষ্টিতেও এই উপাদানটি বিশেষ কার্যকর হইয়াছে

বাহ্যিক ও ভাবগত ঐক্যের ফলে যখন একদল লোক নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে, তখনই তাহাদের জাতীয় ভাবের উদয় হয়। এই জাতীয় ভাব বা সাজাত্যবোধ **(Nationalism)** জাতিগঠনের চরম পরিণতি। সাজাত্যবোধ দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের উপর গড়িয়া উঠে। একটি দ্বারা সম-সুখদুঃখভোগী ও সম-আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল লোক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। অপরটি অসম-সুখদুঃখভোগী ও অসম-আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসমষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভেদের সৃষ্টি করে ও বিভিন্ন জাতিতে পরিণত করে।

জাতীয়ভাবের উৎপত্তি (Growth of Nationalism)

জাতীয় ভাব আদিম মানবসমাজে অত্যন্ত স্থূলভাবে বিদ্যমান ছিল। যুক্তিবিহীন এক অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ জাতিবন্ধন বা গোষ্ঠিবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হইত। তাহার রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে এই অন্ধ

প্রবৃত্তি একটি ধারণায় পর্যবসিত হয়। মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রজাসাধারণের উপর উৎপীড়ন সুরু হইলে মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তি তাহাদিগকে অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করিবার অনুপ্রেরণা আনিয়া দেয়। অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, ও রাশিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র যখন যুক্তভাবে পোল জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদের এই সাজাত্যবোধ বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইল, তখন হইতে এই অনুপ্রেরণা একটা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে কার্যকরী রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইল। এই রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি সমস্ত নিপীড়িত জাতিকে আত্মসচেতন করিয়া তাহাদের মধ্যে সাজাত্যবোধ-জাগরণে সহায়তা করে। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইয়ুরোপের রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা যখন ভিয়েনায় শান্তিবৈঠকে মিলিত হন তখনও পর্যন্ত তাঁহারা এই সাজাত্যবোধের কার্যকরী শক্তিকে উপেক্ষা করেন। ফলে, এই উপেক্ষিত সাজাত্যবোধ বিপ্লবের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের ক্ষুদ্র জাতিগুলি তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া স্বাধীন জাতি বলিয়া ঘোষণা করিল। পশুবলের দ্বারা এই সাজাত্যবোধ দমন করা প্রথম মহাসমরের একটি অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথম মহাসমর সমাপ্তির পর ভার্সাই সন্ধিবৈঠকে সর্বপ্রথম এই সাজাত্যবোধকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও সাজাত্যবোধ-ভিত্তিতে কতকগুলি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের জাতিগুলি এই সাজাত্যবোধ ভিত্তির উপর তাহাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার অর্জন করে। বর্তমান যুগে এই সাজাত্যবোধ এমনই এক গভীরতর ঐক্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে যে, পশুবলের প্রয়োগে এই শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। প্রথম মহাসমরের পর ইয়ুরোপে সাজাত্যবোধের যে বিজয় অভিযানের সূত্রপাত হইয়াছিল, দ্বিতীয় মহাসমর পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ করিয়া এশিয়া মহাদেশের নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে এই অনুভূতি একটি দুর্বার কার্যকরী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। ভারত, বর্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। যে দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও

ধর্মের পার্থক্য ভিত্তি করিয়া ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের জন্ম হইল, ২৪ বৎসর পর সেই জাতি ও ধর্মের ভিত্তি মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীশ্চান অধ্যুষিত বাংলা দেশের অভ্যুদয় ঘটিল। এইরূপে মানুষের আদিম অন্ধ প্রবৃত্তি রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ধিত হইয়া রাজনৈতিক জীবনের চরম পরিণতির পথ সুগম করিল।

এক জাতি এক রাষ্ট্র (One Nation one state)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন একদল লোক বাহ্যিক বা ভাবগত ঐক্যের দ্বারা নিজেদের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে আত্মসচেতন হয়, তখনই তাহারা তাহাদের পৃথক্ সত্তা এক পৃথক্ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক আত্মসচেতন জাতি ইহার নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করিয়া ইহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাঁচাইতে চায়। জাতির এই দাবী স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি সম-অনুভূতি-সম্পন্ন জাতি লইয়া গঠিত হইবে—একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক বিরোধী-মনোভাবাপন্ন জাতির সমন্বয় উভয় জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার অন্তরায় হইবে। বৈরিভাব, আত্মকলহ প্রভৃতি মুক্ত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক জাতি পরস্পরের সহিত শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করিয়া নিজের সভ্যতা ও কৃষ্টির অবদানে জগৎ-সভ্যতার উন্নতি করিতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রগুলি 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের চিন্তাবীর জন ষ্টুয়ার্ট মিল জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

ভারতীয়গণকে কি এক জাতি বলা যাইতে পারে (Is India a Nation ?)

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ভারতকে অনেকে একজাতি বলিয়া গণ্য করিতেন না। বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ্ প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয়গণকে এক জাতি বলিয়া পরিগণিত করা যুক্তি-সম্মত ছিল না। দেশবিভাগের পরবর্তী কালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতকে আর এক জাতি বলিয়া স্বীকার না করা অসঙ্গত। সত্য বটে,

ভারতে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি জাতিগঠনের বিভিন্ন বাহ্যিক ঐক্যের অভাব। কিন্তু ভারতবাসী আজ এক গভীরতর ভাবগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এক ভাবগত ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের দরবারে তাহাদের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই হইল ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শ। এই আদর্শ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আজ সফল হইতে চলিয়াছে। সুতরাং তিন জাতি-সমন্বিত সুইস দেশ ও বহু জাতি-সমন্বিত সোভিয়েত দেশের মত ভারতীয়গণও আজ অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

আত্মনির্ধারণের নীতি ও ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Right of Self-determination and arguments for and against it)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের নির্বন্ধাতিশয্যে স্বীকৃত হইল, তখন এই নীতিতে ইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে জাতির ভিত্তিতে পুনঃসংগঠিত করিবার একটা প্রচেষ্টা চলিল। প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের এই দাবীকে আত্মনিধারণের নীতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই নীতির ভিত্তিতেই 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' মতবাদ সমর্থিত হয়। যে সমস্ত জাতি তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের শেষ ধাপে উপনীত হইয়াছিল, এই আত্মনির্ধারণ-নীতি সেই সমস্ত নষ্টগৌরব জাতিকে তাহাদের ভাব, ভাষা, ধর্ম, তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। সুতরাং এই নীতি প্রয়োগের উপর একটা মুমূর্ষু জাতির জীবনমরণ নির্ভর করে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রযোজ্যতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সম্যক বিকাশের জন্য ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে পরপ্রভাবমুক্ত স্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজন। ভারতের দৃষ্টিভংগী, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ইংলণ্ড

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ প্রস্ফুটনের জন্য ইংলণ্ডের শাসনপাশ মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নতুবা ভারতের জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়।

এইরূপে প্রত্যেক জাতিই যদি স্বাধীনভাবে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ করিতে পারে তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানে মানব-সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়। প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির অবদানে লাভবান হয়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ফলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষের স্থলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় ও যুদ্ধের আশংকা হ্রাস পায়। কারণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের মনোভাব দূর করিয়া সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। সুতরাং রাজনৈতিক স্বাধিকারের ভিত্তি বহুজাতি না হইয়া এক জাতি হওয়া উচিত।

ইংলণ্ডের চিন্তাবীর জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই নীতির বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একটি আবশ্যিক শর্ত হইল যে, রাষ্ট্রের সীমারেখা প্রধানতঃ জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সহিত এক হওয়া চাই। ("It is in general a necessary condition of free institutions, that the boundaries of government should coincide in the main with those of nationalities.")। 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতির সমর্থক হইলেও মিল্ 'সাধারণভাবে বলিতে গেলে' এবং 'প্রধানত.' এই দুইটি কথার দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নাও হইতে পারে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের নীতি অবাধভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা ও ইহার অবাধ প্রয়োগ জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কি প্রতিকূল তাহা বিবেচনা করা উচিত। যাঁহারা সর্বক্ষেত্রে এই নীতির অবাধ প্রয়োগ সমর্থন করেন না, তাঁহারা এই নীতির বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বহুদিন হইতে এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূভাগে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করিবার ফলে সম-সুখদুঃখভোগী হইয়া এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তী কালে কোন আকস্মিক কারণে সেই ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণ নীতির

ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার দেওয়া জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অপর পক্ষে, যদি একটি জাতির দুইটি অংশ সমুদ্র, পর্বত বা অন্য কোন নৈসর্গিক ব্যবধানে দুইটি পৃথক্ ভৌগোলিক ভূভাগের বাসিন্দা হয়, তাহা হইলেও তাহাদের এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একত্র সমাবেশ দ্বারা আত্মনির্ধারণের নীতি কার্যকরী করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যাহাকে পূর্বে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয় বলা হইত, ঘটনাচক্রে বর্তমান শতাব্দীতে তাহা সম্ভব, সুতরাং বাঞ্ছনীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। প্রথম মহাসমরের পর গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে প্রথম লোক-বিনিময়ের সূত্রপাত হয়। তুরস্কের গ্রীক অধিবাসিগণ গ্রীসে ফিরিয়া আসে আর গ্রীসের তুর্ক অধিবাসিগণ তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করে। লোক-বিনিময়ের মাধ্যমে আত্মনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই সমস্যার সমাধান জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়। ইদানীং কালে ভারত-বিভাগের ফলে লোক-বিনিময় অনেক স্থলে পরোক্ষভাবে বাধ্যতামূলকরূপে দেখা দিয়াছে। এরূপ অধিক সংখ্যায় ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে লোক-বিনিময় বোধহয় অন্য কোন দেশে ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠিত পুরাতন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে যদি এই নীতির অবাধ প্রয়োগ হয় তাহা হইলে বর্তমান আটাশটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইয়ুরোপে প্রায় আটষট্টিটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে। ক্ষুদ্র সুইস্ দেশ ও ইংলণ্ড প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই তিনটির কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। পরন্তু দেশ-বিভাগের ফলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলির সন্তোষজনক সমাধান না হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সর্বদাই আত্মকলহে লিপ্ত থাকিয়া তাহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির অগ্রগতিতে যত্নবান হইতে পারিবে না।

তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলি অচিরে কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তাঁবেদার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থতঃ, এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-পুনর্গঠন কার্য একবার আরম্ভ হইলে ইহার আর পরিসমাপ্তি হইবে না। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতি এই আত্মনির্ধারণ-

নীতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র-রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবী করিবে। ফলে, ঐক্যবদ্ধ বহু রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। রাজনীতি গ্রাম্য দলীয় মনোভাবে পর্যবসিত হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ, ক্ষমতালিপ্সা, প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রভৃতি প্রবল আকার ধারণ করিয়া যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলিবে। ফলে শান্তির পরিবর্তে জগতে এক অশান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পঞ্চমতঃ, এই নীতির অবাধ প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলি (Poly-national States) যে এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অনগ্রসর বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, একথা ঠিক নয়। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র জ্ঞানবিজ্ঞানে, সভ্যতায়, কৃষ্টিতে ও শক্তিসামর্থ্যে অনেক এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র (Mono-national States) অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ও শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইস্ দেশ, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

এতদ্ব্যতীত এই আত্মনির্ধারণ-নীতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি অসন্তুষ্ট জাতির দাবীর দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে না—ইহার স্বীকৃতি ও ইহার প্রয়োগ-ক্ষমতা নির্ভর করে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ইচ্ছার উপর। সুতরাং এই আত্মনির্ধারণের নীতি একটি নৈতিক দাবী মাত্র, কাজেই ইহাকে একটি আইনসঙ্গত দাবী বলা চলে না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আলাণ্ড দ্বীপ এই আত্মনির্ধারণ-নীতির ভিত্তিতে যখন ফিনল্যাণ্ড দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুইডেনের সহিত মিলিত হইবার দাবী জানাইল, তখন লীগ অব্ নেশন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ জাতির এই দাবী শুধু নৈতিক দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

সুতরাং এই দাবী সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহা সর্বক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রযোজ্য নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া যখন একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবিশিষ্ট জাতিকে বলপূর্বক অপর একটি জাতি তাহার পদানত করিয়াছে বা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও সমগ্র জনসমষ্টির এক বিশাল অংশ তাহাদের পৃথক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এই স্বাধিকার দাবী করে—সেই সকল ক্ষেত্রে আত্ম-নির্ধারণ-নীতি প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড

ভারত, বর্মা ও কোরিয়ার এই দাবী নৈতিক ও আইনসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশুবলের সাহায্যে জাতির এই আত্মনির্ধারণের দাবী চিরদিন দমিত রাখা সম্ভব নয়—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য।

জাতির অন্যান্য দাবী (Other Rights of Nationalities)

আত্মনির্ধারণের দাবী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলেও জাতির অন্যান্য দাবীগুলি পূরণ করা উচিত। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি অন্যান্য কতকগুলি অধিকারের দাবী করিতে পারে। এই অধিকারগুলি পূরণ করিতে জাতীয় রাষ্ট্রের যত্নবান হওয়া উচিত।

(ক) জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার (Right to Exist)

একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসমষ্টিকে তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিবার অধিকার দেওয়া উচিত। জাতীয় রাষ্ট্র এমন কোন নীতি বা আইন বলবৎ করিবে না, যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইতে পারে।

(খ) ভাষা রক্ষার অধিকার (Right to Language)

একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বাস করিতে পারে। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান, শিক্ষাকার্য বা সাহিত্য ও কৃষ্টির পুষ্টিসাধন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। বলপূর্বক সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষার ব্যবহার বন্ধ করিয়া তাহাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা দান করিবার দাবী করিতে পারে না।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার (Right to Retention of Local Laws and Customs)

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই অধিকারের দাবী লীগ অব নেশন্‌স্ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক জাতির সামাজিক জীবন কতকগুলি আচার, রীতি-নীতি ও প্রথার দ্বারা বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতীয় জীবনের অনেকখানি স্থান এই সামাজিক প্রথাগুলি অধিকার করিয়া থাকে। কোন সম্প্রদায়ের এই সামাজিক প্রথাগুলি যদি সমগ্র জাতীয় জীবনের বা জাতীয়

নৈতিক জ্ঞানের পরিপন্থী না হয় তাহা হইলে এই প্রথাগুলি সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(ঘ) আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to Legal and Political Equality)

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক এই দুই প্রকার অধিকারের দাবী করিতে পারে। যোগ্যতা থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকই—সে যে সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন, ভোট দিবার ক্ষমতা বা সরকারের সর্ববিধ কাযে যোগদান করিবার অধিকার অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া কাহারও অধিকারের কোন তারতম্য হওয়া উচিত নয়। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া কোন সম্প্রদায় রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনরূপ বিশেষ অধিকার ভোগের দাবী করিতে পারে না।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানসিক অনুভূতির সক্রিয় বহিঃপ্রকাশের ফলে কতকগুলি জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া এক জাতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই অনুভূতি মানুষকে তাহার অধিকারগুলি সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া নির্যাতিত পরাধীন জাতিগুলির মুক্তিলাভের পথের সন্ধান আনিয়া দেয়। প্রত্যেক মুক্ত জাতি তাহার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া জগৎসভায় তাহার ন্যায্য আসন লাভ করিতে পারে। জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহার জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে পারে। জাতীয়তাবোধ মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে যে, জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি লোক তাহার সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রতি নির্বিচারে আনুগত্য স্বীকার করিবে, কেন-না, জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও ইহার উন্নতিবিধান প্রত্যেক মানুষের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনই হইল প্রথম ও শেষ অধ্যায়।

সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়তাবোধ একটি মহান আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিসমষ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই সমষ্টিগত জীবনের পক্ষেও জাতীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য। মানবসভ্যতা বিকাশের জন্যই প্রত্যেক প্রকৃত স্বতন্ত্র জাতির এই অধিকার থাকা প্রয়োজন। এই অধিকারের বলে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব গুণাবলী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিয়া জগৎ সভ্যতাকে উন্নততর করিতে সহায়তা করে।

রাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ফলে বহু দেশে একনায়কত্বের অবসান হইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদ জাতির মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারিত করিয়া একটা মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা দেয়।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ (Perverted Nationalism)

কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে জাতির পক্ষে তাহার পরিণাম ভয়াবহ। জাতীয়তাবাদের বিকৃতি দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। প্রথম কারণটি জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, আর দ্বিতীয়টি নির্ভর করে এক জাতির সহিত অন্য জাতির সম্পর্কের উপর। কতকগুলি ক্ষুদ্র উপজাতি বা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ জাতি গঠিত হয়। মূলগত ঐক্য থাকিলেও এই সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইতে পারে, বা বিভিন্ন আচার-প্রথার দ্বারা তাহাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এইরূপ এক বা একাধিক সম্প্রদায় মূল জাতি হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক ভাষা, ইতিহাস ও কৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এক পৃথক্ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। এই মনোভাবের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ক্যারেন জাতি ব্রহ্ম হইতে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতেছে। শ্লোভাক ও শ্লোভেনিস্ সম্প্রদায়গুলিও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে পৃথক হইবার দাবী জানাইতেছে। এই মনোভাবকে বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বলা চলে। এই মনোভাবের ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি তাহার সমষ্টিগত সংহতি ও ঐতিহ্য হারাইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে—স্বদেশপ্রেম প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়। ভারতেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই

স্বার্থপ্রণোদিত ভেদবুদ্ধি কিছু কার্যকরী হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব জাতীয় জীবনের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। সুতরাং অঙ্কুরেই ইহার বিনাশসাধন না করিলে জাতীয় জীবনে ইহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি স্বীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টিতে অত্যধিক আস্থাবান হইয়া অপর জাতিকে অবজ্ঞা করিতে শিখে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ছলে-বলে-কৌশলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতির উপর চাপাইতে চায়, তখন এই জাতীয়তাবাদ আক্রমণাত্মক মূর্তি ধারণ করিয়া বিশ্বশান্তির অন্তরায় হইয়া উঠে। এইরূপ বিকৃত জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা শুধু নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা বা আস্থারূপে প্রকাশ না পাইয়া অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। ফলে, শক্তিশালী জাতিসমূহ নিজেদের জাতীয় গর্ব ও শক্তি প্রচার করিবার মানসে দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা হরণ করে। বর্তমান যুগে এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ জাতির অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবী ব্যাপিয়া ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। বড় বড় জাতিগুলি শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রয় করিবার জন্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রসারের উদ্দেশ্যে অথবা খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের অজুহাতে ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের বহু ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অনেক সময় এই উপনিবেশ খুঁজিতে গিয়া দুই বা ততোধিক বৃহৎ জাতির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বিদ্বেষমূলক ও আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবোধের জন্য প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সহিত অথবা বিজিত জাতিগুলির সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সেজন্য বিরাট সামরিক বাহিনী ও রণসম্ভার রাখা প্রয়োজন; কিন্তু ইহার ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, সামান্য কোন কারণেই জাতিগুলির মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ ও স্বার্থপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদের পরিণামে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়। স্বার্থের হানাহানির কি ভীষণ পরিণাম, বিগত দুইটি মহাসমর তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। অধুনা আবার কয়েকটি বৃহৎ বিত্তশালী রাষ্ট্র অর্থসাহায্য দিয়া দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর কর্তৃত্ব

স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে।

জাতীয়তাবাদ একটা মহান আদর্শ। এই আদর্শে প্রত্যেক জাতিকেই প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। ইহার মূলনীতি হইল—আপনি বাঁচ ও অপরকে বাঁচিতে দাও। কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট জাতীয়তাবাদ একটা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক এবং যখন এই জাতীয়তাবাদ ইহার মহান্ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আক্রমণাত্মক হইয়া উঠে তখন ইহা যুদ্ধবাদে পরিণত হয় আর যুদ্ধবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই জন্মদাতা।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ হইতে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি হয়। যখন কোন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র বলপূর্বক দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নানাভাবে এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় স্বার্থসাধনের জন্য শোষণ করে, তখনই সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হয়। বিজিত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, শিক্ষাদীক্ষা, কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য বিজেতাগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করে। সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া একই শাসনব্যবস্থা ও একই আইন বলবৎ করা হয়। ইংলণ্ড, জার্মানি, ইতালি, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি এমন কি ক্ষুদ্রকায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিশালী রাষ্ট্র বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড পররাজ্য গ্রাস করিয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রসার করিতে দ্বিধা করে নাই।

সাম্রাজ্যবাদীরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের এই লুণ্ঠনকার্য সমর্থনের অভিপ্রায়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বেরও অবতারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, দুর্বল ও অক্ষম জাতিগুলির পক্ষে তাহাদের নিজেদের অগ্রগতির জন্য সবল ও বুদ্ধিমান্ জাতির সংস্পর্শে আসা উচিত বা সভ্য জাতিগুলি অনগ্রসর জাতিগুলিকে সভ্যতার উচ্চস্তরে পঁহুছিয়া দিবার জন্য তাহাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং, সভ্য জাতিগুলি নিঃস্বার্থে এই গুরুভার বহন করিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদের পিছনে যে-কোন দার্শনিক তত্ত্ব থাকুক না কেন,

সাম্রাজ্যবাদ যে একটা সর্বনাশা প্রলয়ংকর শক্তি ইহা আজ অবিসংবাদী সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে, মানবসভ্যতা ও প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে বিপদস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই আজ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিয়া সাম্রাজ্যবাদের কঠোরতা হয়ত কিছু প্রশমিত করা যায়। এই ব্যবস্থা দ্বারা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism)

আন্তর্জাতিকতা শুধু একটা রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতির ব্যাপার নহে, ইহার একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে। এই অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গণ্ডির বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ বিশ্বমানবতার স্তরে উপনীত হইতে পারে। আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু পরবিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করা দূষণীয়। স্বার্থসম্বন্ধে তৎপর হওয়া মানুষের ধর্ম, কিন্তু স্বার্থপরতা সর্বথা পরিত্যাজ্য। ব্যক্তিগত জীবনে যদি এই নীতি প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনেও ইহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় জীবনে এই নীতি কার্যকরী হইলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক কলহের আর সম্ভাবনা থাকে না। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব—এই মহান্ আদর্শ কোন জাতিবিশেষের জন্য রচিত হয় নাই, পরন্তু ইহা সর্বজাতির আদর্শ—এই মনোভাবের উদয় হইলে আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিয়া পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত ও কৃষ্টিগত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক জাতি যদি তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিবাদের অবসান ঘটিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলিকে নানাভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে

আনিয়া আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। আন্তর্জাতিকা-বৃদ্ধির পথে একমাত্র অন্তরায় হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কতকগুলি মহান্ কর্তব্য পালনের উপর। রাষ্ট্রের এই কর্তব্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করিয়া মানুষের সর্বাত্মক অগ্রগতিতে সাহায্য করা। যে সার্বভৌম শক্তির বলে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলাব রক্ষক বলিয়া পরিগণিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদের দ্বাবা বিশ্বশান্তি-বিনাশে সেই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রযোগ হইতে পারে না—মানুষ যেদিন এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে সেদিন জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিবে না—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'—এই নীতির দ্বারাই জাতীয় জীবন পরিচালিত হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বর্তমান জগতে এই নৈতিক মনোভাবের উদয় না হইলে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধন হইল মানব সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)

পারস্পরিক সহযোগিতা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির পক্ষে অপরিহার্য এই সত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর অনেক জাতি বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারা জাতীয়তাবাদের মূল প্রকৃতি চরম সার্বভৌমত্বের দাবী আংশিকভাবে পারিত্যাগ করিয়া আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করাইবার জন্য লীগ অব নেশন্‌সের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের গঠনগত ও প্রকৃতিগত ত্রুটি থাকায় সম্পূর্ণরূপে ইহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে বিফলকাম হয়। বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র ইহার সদস্য না থাকায় ইহার মর্যাদা ও কার্যকারিতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর আংশিক সাফল্যের সহিত কাজ করিবার পর ইতালির সহিত আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা বিশেষরূপে প্রকটিত হয় এবং ইহার নিষ্ক্রিয়তার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ত্বরান্বিত হইয়া ইহার ব্যর্থতা প্রমাণিত করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলি ও নিরপেক্ষ জাতিগুলি এবার বুঝিতে পারিল যে, একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশা যুদ্ধব্যবসায় বন্ধ না করিতে পারিলে মানুষের আর পরিত্রাণের পথ নাই। তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধশেষে একটা আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা তীব্র হইয়া উঠে। প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং বৃটিশ ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানদ্বয়ের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামে গঠিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান গঠন ব্যাপারে বিজিত জাতিগুলির কোনপ্রকার প্রভাব ছিল না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য (Objectives of the U. N.)

লীগ অব্ নেশন্সের ন্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও এক মহান্ আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল শান্তিপূর্ণ পন্থায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নানাভাবে জাতিপুঞ্জ সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা এবং মূল্য-সংরক্ষণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের সনদের ভূমিকায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া যাহাতে সকল জাতি পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে পারে তাহার জন্যও জাতিপুঞ্জ সংকল্প করিয়াছে। সংকল্প কার্যে পরিণত হইলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। প্রায় ১০০টি রাষ্ট্র লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত।

সংগঠন—সাধারণ সভা (General Assembly), স্বস্তিপরিষদ্ বা নিরাপত্তা পরিষদ্ (Security Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ্ (Trusteeship Council), দপ্তরখানা (Secretariat) এবং আরও কতকগুলি শাখাসমিতি লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত।

সাধারণ সভা (General Assembly)

এই সভায় বৎসরে একটিমাত্র অধিবেশন বসে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অধিবেশন বসিতে পারে।

ইহা ছাড়া, এই সভা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে।

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করা ও সেই সম্পর্কে সুপারিশ করা সাধারণ সভার কাজ।

নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ্ (Security Council)

পাঁচজন স্থায়ী (সাম্যবাদী চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সদস্য ও দুই বৎসরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত দশ জন—মোট পনের জন সদস্য লইয়া স্বস্তি পরিষদ্ গঠিত। এই পরিষদের প্রধান কার্য হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান করা। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ্ আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে। ১। যে-কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে, ২। বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, ৩। মধ্যস্থতার দ্বারা মীমাংসা করিতে পারে, ৪। সালিশী ব্যবস্থার সুপারিশ করিতে পারে, অথবা ৫। স্বস্তি পরিষদ্ নিজে মীমাংসা করিতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তি-স্থাপনের ক্ষমতা আছে। এই পরিষদের যে-কোন সিদ্ধান্ত পরিষদের স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের একজনের অসম্মতিতে বলবৎ করা যায় না।

কর্মসংস্থা (Secretariat)

একজন প্রধান-সচিবের অধীনে আটটি বিভাগ দ্বারা দপ্তরখানায় কার্য পরিচালিত হয়। প্রধান-সচিব স্বস্তি পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

আন্তর্জাতিক বিচারালয় হল্যাণ্ডের হেগ শহরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত পনর জন বিচারপতিকে লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আদালতের প্রধান কার্য।

অছি পরিষদ্ (Trusteeship Council)

অছি পরিষদের উদ্ভব হয় লীগ অব্ নেশেন্সের সময়ে। কিছু পরিবর্তিত আকারে এই পরিষদ্ নূতনভাবে সংগঠিত হইয়া অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছি শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অছি শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economical and Social Council)

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সাধারণ সভা এই পরিষদের মোট ২৭ জন সদস্য নির্বাচন করে। এই সভার কার্য ইহার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, কৃষি সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, মানবীয় অধিকার সংস্থা প্রভৃতি হইল এইরূপ কয়েকটি সংস্থা।

বিগত কয়েক বৎসরের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এই সংগঠন অনেকটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীমান্ত-সমস্যা, ইরাণের তৈল লইয়া বিরোধ ও কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এখনও পর্যন্ত করিতে পারে নাই। যে জাতীয় চীন সরকারের চীনের মূল ভূখণ্ডে কোন অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না, সেই চীন

বহুদিন পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য ছিল, আর বাস্তব চীন সাধারণ তন্ত্র সরকার ইংলণ্ড, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াও জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত ছিল। জার্মানি, জাপান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া যে অবস্থায় রাখা হইয়াছিল তাহাতে স্বভাবতই জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও বিশেষ আস্থা থাকিতে পারে না। স্বস্তি পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী পদ পাঁচটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত আছে। এই নীতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সমানাধিকারের পরিচায়ক নহে। আণবিক শক্তি ও হাইড্রোজেন বোমা নিয়ন্ত্রণ করিতে এখনও পর্যন্ত এই সংগঠন সমর্থ হয় নাই।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ

স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ: রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন কিন্তু একই ঐতিহ্য দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একদল মানুষকে স্বজাতীয় মানুষ বলা যাইতে পারে। যখন এই স্বজাতীয় মানুষ বংশগত, ভাষাগত বা অন্য কোন ঐক্য দ্বারা আরও গভীরভাবে একতাবদ্ধ হয়, তখন তাহাদের জাতীয় জনসমাজ বলা হয়। এই জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইলে যখন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র গঠন করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা ভাবগত ঐক্য—এইগুলিকে সাধারণতঃ জাতিগঠনের উপাদান বলা হয়। কিন্তু জাতিগঠনে বাহ্যিক উপাদান অর্থাৎ কুলগত বা ভাষাগত ঐক্য অপেক্ষা ভাবগত ঐক্য অর্থাৎ সম-সুখদুঃখবোধ ও সম আদর্শে অনুপ্রাণিত ঐক্য অধিক সহায়ক।

জাতীয়তা বা সাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির ব্যাপার। ইহা প্রধানতঃ ভাবগত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবগত ঐক্য আছে বলিয়া সুইস্ জাতি কুল বা ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও এক শক্তিশালী ও দেশপ্রেমিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতি ইহার নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য পৃথক্ রাষ্ট্রগঠনের দাবী করে।

জাতির এই স্বাতন্ত্র্যবোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন হইলে জাতিগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ অনেক হ্রাস পাইবে। প্রত্যেক জাতি নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে সাহায্য করিতে পারে।

আত্মনির্ধারণের নীতি: 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'—এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রগঠনের যে দাবী তাহাকে জাতির আত্মনির্ধারণের দাবী বলা হয়। সম্পূর্ণ পৃথক্ ঐতিহ্যবিশিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের দাবী প্রযোজ্য হইলেও সকল ক্ষেত্রে ইহার অবাধ প্রয়োগ সম্ভব নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। জাতির এই দাবী দ্বিধাশূন্যভাবে স্বীকৃত হইলে বহু প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচীন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। পরস্পরের সহিত কলহবিবাদে বিশ্বশান্তিও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

কোনও জাতিকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ধারণের অধিকার না দিলেও তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা, সামাজিক প্রথা, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়গুলিতে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।

জাতীয়তাবাদ: প্রকৃত জাতীয়তাবাদ একটা উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শ মানুষকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে ও মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা যোগায়। জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি করিয়া এই স্বদেশপ্রেম মানুষকে বিশ্ব-মানবতার ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ যখন বিকৃত হয়—স্বদেশপ্রেম যখন ভিন্ন দেশের প্রতি বিদ্বেষে পর্যবসিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয়তাবোধকে নষ্ট করিতে উদ্যত হয় তখন এই জাতীয়তাবোধ মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। এই বিকৃত জাতীয়তাবোধ হইতে যুদ্ধবাদের উৎপত্তি হইয়া ইহা শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে করায়ত্ত করিয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। এই সাম্রাজ্যবাদ মানবসভ্যতার পরম শত্রু। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের দোষগুলি কিছু পরিমাণে দূর করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিকতা: মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিকতা হইল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপর এই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি

লীগ অব্ নেশেন্স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠন দ্বারা জাতিসমূহ এই আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার কালেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার কল্পনা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আগ্রহাতিশয্যে যুদ্ধ শেষে বিজেতা ও নিরপেক্ষ জাতিসমূহকে লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনা ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে প্রায় একশত জাতি এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যভুক্ত।

নিম্নলিখিত বিভাগগুলি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত:

১। সাধারণ সভা—সদস্য জাতিসমূহ হইতে পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে।

২। স্বস্তি পরিষদ্—পাঁচজন স্থায়ী ও দশজন অস্থায়ী—মোট পনের জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। এই পরিষদ্ই হইল জাতিপুঞ্জের শাসন-বিভাগ। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন।

৩। অছি পরিষদ্—আত্মনির্ধারণের অধিকারহীন জাতিসমূহের শাসন ব্যাপারে এই পরিষদ্ তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে।

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্—সাতজন সদস্য লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। জাতিসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে এই পরিষদ্ আলোচনা করে।

৫। আন্তর্জাতিক আদালত—আন্তর্জাতিক আইন-সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে এই আদালত মীমাংসা করে।

ইহা ছাড়াও খাদ্য, স্বাস্থ্য, শ্রমিক-সম্পর্কিত বিষয়গুলির সমাধান করিবার জন্য বহু শাখা-সমিতি আছে।

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে সাফল্য লাভ করিলেও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা নিরোধ করিতে এখনও পর্যন্ত সফলকাম হইতে পারে নাই।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by Right of Self-determination of nations? Is it a desirable ideal? Give reasons for your answer.

জাতির আত্মনির্ধারণ অধিকার বলিতে কি বুঝ? এই আদর্শ কি কাম্য? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

2. "The future of civilisation lies in a Synthesis of nationalism and internationalism." Explain fully and give your own views with reasons thereof.

"সভ্যতার ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয় সাধনের উপর নির্ভর করিতেছে"—এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা কর। যুক্তি দেখাইয়া তোমার মতামত সন্নিবেশিত কর।

3. Point out the essential elements of nationality. Which of them appears to be the most important and why?

'জাতীয়তাবোধ'-এর প্রধান উপাদানগুলি উল্লেখ কর। উহাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় এবং কেন?

4. "Nationalism is a plain highway to internationalism." Discuss the statement.

"জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতাবাদ রূপায়ণের সহজ সরল পথ।" এই উক্তিটি আলোচনা কর।

5. Do you agree with the view that the boundaries of States should coincide with the boundaries of nationalities?

তুমি কি এই মত সমর্থন কর যে, রাষ্ট্রের সীমারেখা জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সঙ্গে এক হওয়া উচিত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

নাগরিক সংজ্ঞা (Definition of a citizen)

সাধারণ অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে যাহারা বাস করে তাহাদের ঐ শহরের নাগরিক বলা হয় ও নাগরিক হিসাবে তাহারা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে 'নাগরিক' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগরিক শব্দটির একটি প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নাগরিক শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বাস করিতেন। এই নগর-রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত না। যে সমস্ত অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও অপর্যাপ্ত সময় ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। সমাজের অবশিষ্টাংশ, যথা, ক্রীতদাস, মজুরশ্রেণী, স্ত্রীলোক প্রভৃতি যাহারা পরনির্ভরশীল বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইত না। এই জাতীয় নিম্নস্তরের লোকগুলিকে সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত না ও সেইজন্য তাহারা নাগরিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত থাকিত। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনাকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই ছিল নাগরিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানকালে নাগরিক শব্দের ব্যবহার আর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নাই। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বহুগুণ বৃহত্তর। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে গেলে আর পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। কোন রাষ্ট্রের সদস্য হইলেই তাহাকে বর্তমানে নাগরিক বলা হয়। যে লোক একটি রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বাস করিয়া সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া

লইয়াছে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের সদস্যরূপে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় এবং অন্যদিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্র ইহার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে কোন কর্তব্যপালনের দাবী করে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি এ কথা মনে করা যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ শুধু কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, রাষ্ট্রসম্পর্কে তাহাদের কোনরূপ কর্তব্যসম্পাদনের বাধ্যবাধকতা নাই তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিয়া উন্নততর সমাজ-জীবন প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সমষ্টিগত জীবন যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা আদর্শ স্তরে উন্নীত হইতে পারে সেইজন্য প্রত্যেক নাগরিকই এরূপভাবে তাহার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান না করিলেও প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাকা চাই। প্রত্যেক নাগরিকই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্নবান্ হইবে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নাগরিকতা হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ—যে সমাবেশে সমাজ জীবন সহজ ও সুগম হয়। এইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল—সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা-দ্বারা-প্রাপ্ত মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ। (Citizenship "is the contribution of one's instructed judgment to public good.") সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এরূপভাবে তাঁহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয়। এইজন্য অবশ্য প্রত্যেক নাগরিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া চাই।

নাগরিক ও বিদেশী (Citizen and Alien)

নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিদেশী ভিন্নদেশবাসী ও ভিন্ন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে বিদেশী কার্যব্যপদেশে

সাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিতে হয় ও সেই দেশের প্রবর্তিত করও তাহাকে দিতে হয়। বিদেশী কতকগুলি পৌর অধিকার ভোগ করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে না; বা সে দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে অসদাচরণের জন্য দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিদেশীকে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। বিদেশী সাময়িকভাবে যে দেশে বাস করে সে দেশ পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে সে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। নাগরিক স্বদেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক, সর্বত্রই তাহার নিজ রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব—এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান—তাহাকে পালন করিতেই হইবে।

পূর্ণ নাগরিক ও অসম্পূর্ণ নাগরিক (Citizen and National)

অনেক সময় ভোটদান-ক্ষমতাকে নাগরিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করা হয়। যাহাদের এই ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় আর যাহারা এই ক্ষমতার অধিকারী নয় তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় না। কিন্তু এ কথা সব সময় সত্য নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটা নির্দিষ্ট বয়সের জনগণ ভোটদানের অধিকারী হয়। ভারতবর্ষে একুশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ভোটাধিকার জন্মে। একুশ বৎসর বয়সের কম কোন স্ত্রী-পুরুষের এই ভোটদানের অধিকার নাই, সুতরাং উপরি-উক্ত মত অনুসারে তাহারা নাগরিক নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্থায়ী অধিবাসী প্রত্যেকেই এই রাষ্ট্রের নাগরিক। একুশ বৎসরের কম বলিয়া তাহাদিগকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়। তাহারা পূর্ণ নাগরিক না হইলেও নাগরিক পদবাচ্য। এইরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক ভোটদান-ক্ষমতাবিহীন নাগরিককে অসম্পূর্ণ নাগরিক (National) বলা হয়।

নাগরিক ও নির্বাচক (Citizen and Elector)

অনেক রাষ্ট্র বিদেশীকে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভোটদান-ক্ষমতা প্রদান করে। বিদেশী ভোটদান করিতে পারে বলিয়া তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা চলে না, আর অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদান ক্ষমতাবিহীন

বলিয়া তাহাকে নাগরিক বলিয়া গণ্য না করা কোন মতে সমীচীন নয়। যাহার ভোটদান ক্ষমতা আছে, তাহাকে নির্বাচন বলা হয়।

নাগরিক ও প্রজা (Citizen and Subject)

নাগরিক ও প্রজা উভয়েই রাষ্ট্রের অধিবাসী। কিন্তু নাগরিক শব্দটির সহিত একটা পদমর্যাদা ও কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত আছে, কিন্তু প্রজাপদবাচ্য লোকের সেইরূপ কোন মর্যাদা বা অধিকারের দাবী স্বীকৃত হয় না। স্বৈরাচারী শাসনে জনগণের উপর শাসক তাহার নিজ ইচ্ছাকে বলপূর্বক কার্যকরী করে। স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। শাসিত শাসকের সম্পূর্ণ পদানত। এই ব্যবস্থায় শাসিতের কোন অধিকার থাকে না আর অধিকার থাকিলেও সেগুলি শাসকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত জনসাধারণকে সাধারণতঃ প্রজা আখ্যা দেওয়া হয়। ইংরাজ শাসনকালে ভারতীয়েরা বৃটিশ রাজ্যের প্রজা বলিয়া অভিহিত হইত। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপে নিকৃষ্ট পদবাচ্য প্রজা শব্দটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Modes of acquisition of Citizenship)

নাগরিক অধিকার দুই উপায়ে পাওয়া যায়:—প্রথম, জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়, অর্জনের দ্বারা। জন্মাধিকার দুই প্রকার—একটি হইল রক্তগত অধিকার (*Jus Sanguinis*), অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (*Jus Soli*)। প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিল সে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশেই হউক না কেন। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সে সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মে জন্মভূমি বিচার করিয়া নাগরিকত্ব স্থির হয়।

যদি কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই দুইটি নীতি প্রয়োগ করিয়া নাগরিকত্ব স্থির করে, তাহা হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া কথা উঠিত পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জাত হউক না কেন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। অপর পক্ষে ভিন্ন দেশের পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত অধিকারের বলে তাহাকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক হইয়া এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে অন্য দেশের নাগরিক হইতে পারে।

স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের স্বামীর নাগরিকত্ব পায়। বৈবাহিক সম্বন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ও সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়া নূতন নাগরিকের অধিকার পাওয়া যায়।

সকল রাষ্ট্রই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইরূপে কোন দেশের জন্মগত নাগরিক যদি ভিন্ন রাষ্ট্রের অর্পিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাহা হইলে তাহাকে অর্জিত নাগরিকত্ব (Naturalized citizenship) বলা হয়। বিবাহ, সম্পত্তি-ক্রয় বা সেনাবিভাগে যোগদান—সবগুলি উপায়ই হইল নাগরিক অধিকার অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অর্পিত নাগরিকত্ব একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশী যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী বিদেশীর সে দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় বসবাস করিতে হয় ও তাহাকে সৎস্বভাবাপন্ন বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়। সে দেশের ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় প্রয়োজন হয়। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে রাষ্ট্র ইহার ইচ্ছামত বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে আবেদন করিতে হইবে এবং কোন বিচারালয় বা শাসন-বিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদন বিচার করিয়া নাগরিকত্ব প্রদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে।

এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জিত হইলে বিদেশীও সেই দেশের জাত নাগরিকদের

সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা আবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলেও তাহাকেও সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে না। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাগরিকত্ব (Citizenship in a Federal State)

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বিবিধ শাসনযন্ত্রের—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়—অস্তিত্ব বর্তমান। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণকে যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। নাগরিকগণ উভয় সরকার-প্রণীত আইন দ্বারা বাধ্য থাকে এবং উভয় সরকার প্রবর্তিত কর তাহাদিগকে প্রদান করিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের এইরূপ দ্বিবিধ নাগরিকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে রাজ্যে বাস করে সেই রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে তাহারা সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া পরিচিত হয় এবং সেই রাজ্য-সম্পর্কিত নির্ধারিত অধিকার ও কর্তব্য দ্বারা তাহাদের পরিচালিত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই দ্বিবিধ নাগরিকত্বের কোন্‌টি মৌলিক ও শ্রেষ্ঠতর? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন আইন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই সংশোধন আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। নাগরিকগণ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে এবং তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়াই যে রাজ্যে বসবাস করে, সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। নাগরিক-গণ এক রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া অন্য রাজ্যের নাগরিক হইতে পারে। শুধুমাত্র বাসস্থান দ্বারাই রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব স্থির হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন করিতে হইলে নির্ধারিত আইনানুযায়ী পদ্ধতিতে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু কোন রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন করিতে কোনরূপ আইনানুমোদিত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ

করিতে হয় না। শুধুমাত্র বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এক রাজ্যের নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া অন্য রাজ্যের নাগরিকত্ব অর্জন করা হয়।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইলে প্রথমে কোন ক্যান্টনের নাগরিক হইতে হয়। ক্যান্টনের নাগরিক হইলেই স্বভাবতই সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হওয়া যায়। সুতরাং সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে ক্যান্টনের নাগরিকত্ব হইল মুখ্য আর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হইল গৌণ।

জার্মানীতে ওয়াইমার শাসনতন্ত্র অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব মৌলিক ও প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও সমগ্র ভারতে মাত্র একদফা ভারতীয় নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যেখানে দ্বিবিধ নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়, সে সমস্ত দেশে ভোটাধিকার ও সরকারী কার্যে লোকনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ নাগরিকগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু ভারতে এক-নাগরিকত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও নাগরিকগণকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সোভিয়েত নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

নাগরিক অধিকারের অবসান (Loss of Citizenship)

নূতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকত্বের অবসান ঘটে। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকের পূর্ব নাগরিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জমি খরিদ বা বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরীগ্রহণ, দীর্ঘকাল স্বদেশে অনুপস্থিতি বা গুরুতর অপরাধে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে।

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় (Hindrances to good Citizenship)

নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে। যে গুণগুলি থাকিলে সু-নাগরিক হওয়া যায় সেগুলি হইল

বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সকল সময়ে নিজের অধিকার ও কর্তব্যসম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। অধিকারসম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহী আর কর্তব্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে নাগরিক জীবন কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সু-নাগরিক নিজের অধিকার সম্বন্ধে যেরূপ সচেতন, অন্যের অধিকার সম্বন্ধেও তাহার অনুরূপ শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত। এইরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম-সুখদুঃখ-বোধের দ্বারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অভাবে নাগরিক জীবন আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দলাদলি ও কলহে লিপ্ত হইয়া উঠে। পূর্ণ-নাগরিক জীবনের যে সকল অন্তরায় আছে তন্মধ্যে উদাসীনতা (Indolence) হইল প্রধান। উদাসীনতার কারণ হইল কর্তব্যবোধের অভাব। নাগরিক জীবন যে শুধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথা প্রত্যেক নাগরিকেরই স্মরণে রাখিতে হইবে। কি সাধারণ নাগরিক কি সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকেরই স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। সাধারণ নাগরিকের হয়ত অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা না থাকিতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ভোটদান করা, রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধানে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া অংশ গ্রহণ করা, বা যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য করা বিষয়ে কোন নাগরিকেরই উদাসীন থাকা উচিত নয়। নাগরিকেরা যদি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে সাহায্য না করে, তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়া নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষুণ্ন করিতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র জনমত ও জনসহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণ যদি এই সহযোগিতা-প্রদানে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (Private Self-interest) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজ জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। নাগরিকগণ অনেক সময় যোগ্যতা বিচার না করিয়া আত্মীয়তা

বন্ধনের জন্য অথবা অর্থলোভে অযোগ্য লোককে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সরকারী চাকুরীতেও অনেক সময়ে যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ না হইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অযোগ্য লোককে নিয়োগ করা হয়। এরূপ স্বার্থপ্রণোদিত কার্যের দ্বারা দেশের ও দশের অনিষ্ট করা হয়। এতদ্ব্যতীত দলগত রাজনীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও (Party spirit) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া দেখা দেয় তখন জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। এই দলীয় স্বার্থের প্রাবল্যে আয়ারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে।

অন্তরায়গুলির প্রতিকার (Remedies)

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ নাগরিক হওয়া যায়। লর্ড ব্রাইস্ এই সম্পর্কে দুইটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন। প্রথম হইল, শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন এবং দ্বিতীয় হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার নৈতিক মানের উন্নয়ন। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটদানে বাধ্য করা, নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করা, অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের শাস্তিবিধান, ইত্যাদি। শাসনব্যবস্থায় এইগুলি বলবৎ করা হইলে লোকের উদাসীনতা, দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজন হইল লোক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা। মানুষের মনে কর্তব্যবোধ জাগরিত করিতে হইবে। কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ যখন কাজ করে তখন তাহার দ্বারা মহৎ অনেক কিছু সম্ভব হয়। মানুষের মধ্যে কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিবার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষার ফলে নাগরিকগণ সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমাজ জীবনকে উন্নততর করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা ফলপ্রসূ হইতে হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার বীজ সমাজদেহে একবার প্রোথিত

হইলে আজই হউক আর কালই হউক রাজনৈতিক জীবনে সোনার ফসল ফলাইবে। ভারতীয় জনগণের নৈতিক মান যে আজ এত নীচু হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

সংক্ষিপ্তসার

নাগরিকতা—একটি রাষ্ট্রের আনুগত্যে বদ্ধ স্থায়ী বাসিন্দাকে নাগরিক বলা হয়। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে; আর তাহাদের কতকগুলি দায়িত্বও আছে।

বিদেশী হইল ভিন্নদেশবাসী। যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে বাস করে সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহার অবস্থানকালে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেও বিদেশী সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায়, কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না।

নাগরিক হইলেই নির্বাচক হওয়া যায় না। অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটদান করিবার অধিকার না থাকিলেও অন্য সকল রকম সুযোগ-সুবিধা তাহারা পায়। আবার বিশেষ আইনের বলে বিদেশীও অনেক সময় নাগরিকদের মত ভোটদান অধিকার অর্জন করিতে পারে। বিদেশী শাসনে বা স্বৈরাচারী শাসনে জনগণের শাসনব্যাপারে বিশেষ কোন অধিকার থাকে না বলিয়া তাহাদের প্রজা বলা হয়।

নাগরিকতা অর্জনের উপায়—পুত্রকন্যাগণ পিতৃত্বের ভিত্তিতে অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন দেশ উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহাতে অনেক অসুবিধা হয়। ইহা ছাড়া, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়। ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন করিয়া নূতন নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। এই পদ্ধতিগুলির দ্বারা পূর্বতন নাগরিকত্ব বিনষ্ট হয় ও নূতন নাগরিকত্ব সৃষ্ট হয়।

পূর্ণ-নাগরিক জীবনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার—নাগরিক জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় হইল সাধারণের কাজে

উদাসীনতা, স্বার্থপরতা ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন ও শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা নাগরিকদের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে পারিলে অন্তরায়গুলি দূর হইয়া সু-নাগরিক গঠন সম্ভব হইবে।

প্রশ্নাবলী

1. Differentiate between People, Citizens, Subjects and Electors.

জনগণ, নাগরিক, প্রজা ও নির্বাচকগণের পার্থক্য কর।

2. Distinguish between a natural-born and a naturalised citizen. What are the elements of good citizenship ?

স্বভাবজাত ও অর্জিত নাগরিকত্বের পার্থক্য কর। সুনাগরিকতার উপাদান কি কি ?

3. What are the hindrances to good citizenship ? How can you remove them ?

সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলি কি কি ? অন্তরায়গুলি কিভাবে দূর করিতে পার ?

4. What do you understand by a citizen ? In what way is the position of a citizen superior to that of an alien ? What important differences concerning the acquisition of citizenship exist in the law of the various states ?

নাগরিক বলিতে কি বুঝ ? বিদেশী হইতে নাগরিকের পদমর্যাদা শ্রেষ্ঠতর কেন ? নাগরিকতা অর্জনে বিভিন্ন দেশের আইনের কি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে ?

5. Explain carefully the rights and duties of citizenship.

নাগরিক অধিকার কর্তব্য সতর্কতার সহিত আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়

স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার

(Liberty, Equality and Right)

স্বাধীনতা—সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছানুসারে আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। অন্যের নির্দেশ পালন করিয়া কেহই পরনির্ভরশীল হইতে চায় না। ব্যক্তির এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সাধারণতঃ স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই 'স্বাধীনতা' শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, এই শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞানির্দেশের পূর্বে কি কি বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, 'স্বাধীনতা' শব্দটি **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty)** অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল প্রত্যেক মানুষের অবাধ কার্যক্ষমতা। প্রাকৃতিক স্বাধীনতাবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষ যখন প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত তখন প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া সেইগুলির দ্বারা তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজ্যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত যে স্বাধীনতার অধিকারী মানুষ ছিল, সেই স্বাধীনতাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলা হয়। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার বা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। সুতরাং এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে সবলের স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না।

দ্বিতীয়তঃ, **পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty)** অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার ভোগ করা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাহার নাগরিকগণকে এই পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ

সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর স্বাধীনতা বলা হয়; প্রত্যেক রাষ্ট্র ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া এই স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা বলিতে **রাজনৈতিক স্বাধীনতা** (Political Liberty)-ও বুঝায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারসমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বয়স্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার ও সরকারের অনুসৃত নীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার অধিকারগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতাপর্যায়ভুক্ত। এই স্বাধীনতা মানুষকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার অধিকার ও দায়িত্বসম্বন্ধে সজাগ করে। সুতরাং এই স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

চতুর্থতঃ, স্বাধীনতা বলিতে বর্তমান যুগে **অর্থনৈতিক স্বাধীনতার** (Economic Liberty)-ও উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা স্বাধীনতার সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। অনশনের ভয় বা বেকার হইবার ভয় থাকিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। পৌর স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা একদিকে যেমন মানুষকে তাহার অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন করে অপর দিকে তদ্রূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তাহার অন্যবিধ স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তোলে। সমাজে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের একটা মান স্থির করিতে হইবে। জীবনধারণের এই নির্ধারিত মান অনুযায়ী যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনযাপন করিতে পারে, রাষ্ট্রের সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার, নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

বলা হয়। কতিপয় দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা শব্দটি **জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)** অর্থেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল ভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারে না। যে স্বাধীনতা অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে সে স্বাধীনতা কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না। বৃটিশ-শাসিত ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সব দিক্ দিয়াই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর ব্যক্তি-স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

স্বাধীনতা সংজ্ঞার মধ্যে দ্বন্দ্ব (Contradiction in the Notion of Liberty)

স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির বিভিন্ন অর্থ সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তির বিভিন্ন পরিচয় বুঝায়। স্বাধীনতার প্রধানতঃ তিনটি রূপ দেখা যায়, যথা, পৌর, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এই প্রত্যেকটি রূপই সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তির কতকগুলি নির্দিষ্ট অধিকার সূচিত করে।

পৌর স্বাধীনতা হইল নিছক ব্যক্তিগত (personal) অধিকার। নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে যে-কোন ব্যক্তি সামাজিক মানুষ হিসাবে এই অধিকার-গুলি ভোগ করিতে পারে। রাজনৈতিক অধিকারগুলি হইল সাধারণ সম্পর্কিত। নাগরিক হিসাবেই এই সুবিধাগুলি পাওয়া যাইতে পারে। শ্রমিক বা কর্মী হিসাবে ব্যক্তি যে অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে, তাহাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। সুতরাং স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির এই তিনটি বিভিন্ন রূপ হইতে ইহার জটিল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ব্যক্তি হিসাবে মানুষ নাগরিক বা কর্মী হিসাবে মানুষ হইতে সব সময়ে পৃথক নাও হইতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির এই বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে ঐক্য থাকিলেও প্রায়শই বিরোধ ঘটে। পৌর, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক সময় একে অন্যের প্রতিকূল আচরণ করে। আইনের সহিত স্বাধীনতার যে বিরোধ তাহা অনেক সময় নিষ্পত্তিযোগ্য। কিন্তু

স্বাধীনতার এই তিনটি রূপের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব নহে। বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সব দেশেই বিবেচিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্রষ্টা ও ধারক শাসন কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে ব্যক্তিগত এই পৌর স্বাধীনতার দ্বারা রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হইতেছে তাহা হইলে সরকার ব্যক্তিগত এই পৌর স্বাধীনতা সংকুচিত অথবা বিনষ্ট করিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সহিত সরকারের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংঘর্ষ ঘটে।

অপর পক্ষে পৌর স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাত ঘটিতে পারে। আধুনিক শিল্প-প্রধান উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ সচরাচর ঘটিয়া থাকে। মালিক পৌর স্বাধীনতার বলে নির্দিষ্ট শর্তে শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারেন। আবার শ্রমিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বলে তাহার মজুরী পরিমাণ ও কার্যের অন্যান্য শর্তাদি সম্পর্কে দর কষাকষি করিতে পারে। এইরূপে পৌর ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। এই বিরোধ যদি উভয় পক্ষের আপস দ্বারা মীমাংসিত না হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভিভাবক সরকারের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। সরকারী হস্তক্ষেপ এই বিরোধ বৃদ্ধি বা আপস করিতে পারে, অথবা সরকার নিজে এই বিরোধে জড়িত হইতে পারেন।

স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক
(True Liberty and its relation to Law and Authority)

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার অবাধ ক্ষমতা। ব্যক্তিগত এই অবাধ ক্ষমতাপ্রয়োগের ফলে সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনতা দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। অধিক বলশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করিতে পারে। এইরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারী হইবে; অপরপক্ষে, দুর্বল ও নিরীহপ্রকৃতির লোকদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হইবে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে,

স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকই এই স্বাধীনতার সম-অধিকারী। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের সুযোগ পায়, সেইজন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের অভিভাবক হিসাবে স্বাধীনতা ভোগ করিবার মত অবস্থা সমাজে সৃষ্টি করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাপ্রয়োগকে কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয়, আর আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়া নিজ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি এই বিধি-নিষেধগুলি দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত না করিত, তাহা হইলে মানব-সমাজের অবস্থা হব্‌স্‌-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থার অনুরূপ হইত। সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা এইরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের অন্য লোকের অনুরূপ স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যাহত না হয়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধাবোধের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে রাষ্ট্র সাহায্য করে। আর এইজন্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনতা অধিকতর বলশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী নয় (Sovereignty and liberty are not contradictory)। আইন হইল রাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র, যাহার দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-সাধনের জন্যই রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করে। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র তিন প্রকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনত

যদি অন্য ব্যক্তির অধিকতর শক্তির জন্য ব্যাহত হয়, তাহা হইলে আইন তাহাকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট না হইতে পারে, সেজন্যও রাষ্ট্র বিশেষ ধরণের আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বারা রাষ্ট্র সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এই স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। এই সুযোগসৃষ্টির জন্যই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুপালন ও শিশুরক্ষা, মাদকদ্রব্য-বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতকর আইন প্রবর্তন করিতেছে। সুতরাং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। আইনের নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা হ্রাস না করিয়া স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও নিরংকুশ করে। একে অন্যের পরিপূরক। এইজন্যই বলা হয় যে, আইন হইল প্রকৃত স্বাধীনতার নির্দেশক (Law is the condition of liberty)।

স্বাধীনতা ও সাম্য (Liberty and Equality)

স্বাধীনতা ও সাম্য—রাজনৈতিক জীবনের এই দুইটি মহান্ আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একটি আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ। সাম্য-নীতি প্রবর্তিত না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা কার্যকরী হইতে পারে না, আর স্বাধীনতার অভাবে সমাজে সাম্যনীতিও প্রবর্তিত হইতে পারে না।

সাম্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল সকল মানুষই সমান। এই নীতি মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না। সুতরাং এই অর্থে ব্যবহৃত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের সমান আয় করিবার ও সমান আচরণ পাইবার অধিকারী হয়। কিন্তু সাম্যের প্রকৃত অর্থ সমানত্ব নয়। বাস্তব-জীবনে দেখা যায় কি শারীরিক, কি মানসিক গঠনে কোন দুই ব্যক্তিই সমান নয়। মানুষ অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। বয়োপ্রাপ্তির পরও তাহাদিগের মধ্যে এই সমানত্বের অভাব থাকিয়া যায়। সুতরাং সাম্যনীতির প্রয়োগ করিয়া শ্রেষ্ঠকে নিকৃষ্টের পর্যায়ে বা নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠের পর্যায়ে পরিগণিত করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে না। সকল ব্যক্তিকেই যে সমান হইতে হইবে বা সমান করিতে হইবে এ অর্থেও সাম্য শব্দটি ব্যবহার করা যায় না। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইল, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বংশ, পদমর্যাদা,

জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে সমান সুযোগ দিতে হইবে। একদিকে যেমন রাষ্ট্র সকলকে তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্ত সমান সুযোগ ও অধিকার দান করিবে, অন্ত দিকে তদ্রূপ ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে পার্থক্য-মূলক সুযোগ দান করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র সকল নাগরিককেই সমান চক্ষে দেখিবে। কোন কারণে কাহাকেও বিশেষ সুযোগের অধিকারী করিবে না, আর কোন কারণে কাহাকেও স্তায্য সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে না। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করা অবশ্ত কর্তব্য। সমান সুযোগ পাইলেই যে প্রত্যেকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া পূর্ণ নাগরিক হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের পথে যে সমস্ত অন্তরায় থাকে, রাষ্ট্র এই সমান সুযোগ দান করিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথের সেই অন্তরায়গুলি দূর করিতে সাহায্য করে। সমান সুযোগ দান করিবার পরও যদি কোন ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের উন্নতি করিতে না পারে সেজন্ত রাষ্ট্র দায়ী হইতে পারে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিরও অসমানত্ব প্রমাণিত হইয়া তাহার যোগ্যতানুযায়ী কাযে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। সমাজ-জীবনে অধিকতর উপযোগী কার্য সম্পাদনের জন্ত মানুষে মানুষে যে পার্থক্য করা হয় একমাত্র তাহাই সমর্থনযোগ্য।

সাম্যনীতির উদ্ভব ও বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ (Origin of the Ideal of Equality and its application to Modern States)

মানুষে মানুষে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন সাম্যের দাবী করে—এই বিষয়টির আলোচনা প্রয়োজন। মানুষের এই সাম্যের দাবী ঐতিহাসিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন মানব-সমাজ—স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ প্রজা, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সময়ের পরিবর্তনে এই নির্যাতিত নিম্ন শ্রেণীর লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সুখ-সুবিধার সম-অংশীদার হইবার দাবী জানাইল ও কালক্রমে উভয় শ্রেণীর পার্থক্য দূরীভূত হওয়ায় তাহারা সমান পর্যায়ে উপনীত হইতে লাগিল।

নৈতিক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও সাম্যের এই দাবী অস্বীকার

করা যায় না। প্রত্যেক মানুষই অল্পবিস্তর বুদ্ধির অধিকারী। এদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে একটি পশুর সঙ্গে একজন মানুষের যে পার্থক্য আছে অন্য একজন মানুষের সঙ্গে সে পার্থক্য নাই। বুদ্ধিজীবী বলিয়া সকল মানুষই সমান ও পশুজগৎ হইতে পৃথক্। সমাজে সকল মানুষের বুদ্ধি সমান হয় না। মানুষে মানুষে বুদ্ধির তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু সমষ্টিগত জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ লোকের কর্তব্য হইল তাহার অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসর প্রতিবেশীকে সাহায্য করা। সমাজে সকলকে সমান স্তরে না আনিতে পারিলে সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। তাই অসমর্থ লোককে সমর্থ করিয়া তোলা সমর্থ ব্যক্তির একটি নৈতিক কর্তব্য বলিয়া সকল সমাজেই পরিগণিত হয়। সুতরাং নৈতিক দিক্ দিয়াও এই সাম্যের দাবী সমর্থিত হয়। সমাজে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শুধু রাজনৈতিক সাম্য অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের সমান ভোটদানক্ষমতা প্রদান করিলেই চলিবে না, সাম্যনীতি সমাজ-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দেশেই সমগ্রভাবে এই সাম্যনীতি প্রবর্তিত হইতে পারে নাই। সমাজব্যবস্থায় যতদিন জাতিভেদ থাকিবে ততদিন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই এই সাম্যভাব কার্যকর হইতে পারে না। ইংলণ্ড দেশে অভিজাত ও সাধারণ সম্প্রদায় থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জন্মগত পার্থক্য খুব কম। ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী দেশ হইতে মানুষে মানুষে এই প্রভেদ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যভাব এখনও প্রায় কোন দেশেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সাম্যনীতির অভাব বিশেষরূপে দেখা যায়। অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে রাজনৈতিক বা সামাজিক সাম্য কার্যকর হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে জনগণ আইনের দিক্ দিয়াও সুবিচার পাইতে পারে না। বিত্তশালী ব্যক্তিগণ অন্যায় করিয়াও অর্থের বলে শাস্তি এড়াইতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তিগণ অর্থের অভাবে সুষ্ঠুভাবে তাহাদের মামলা পরিচালনা না করিতে পারায় অনেক সময় ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সাম্যনীতি প্রবর্তিত না হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজে এই

সাম্যপ্রতিষ্ঠার পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূর করিয়া পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties of Citizenship)

সাধারণ অর্থে নাগরিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা না-করিবার অবাধ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যাহাতে কার্যকরী হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এই নাগরিক অধিকার আর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তস্কর মনে করে চৌর্যবৃত্তিতে তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সমাজ যদি তস্করের এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া উঠিবে। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থায় তস্করের এই অধিকার অনধিকার বলা হয়। রাষ্ট্র তস্করের এই অধিকার স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহা খর্ব করিয়া দেয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আইনের দ্বারা সমাজে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করা যে-পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিয়া সমষ্টিগত জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল অধিকার প্রয়োজন, সেগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহায়ক সেইগুলি প্রকৃত অধিকার, আর যেগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এই অধিকারের দাবীতে। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ রাখে ও পরিবর্তে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক (Correlation of Rights and Duties)

কোন নাগরিক অধিকারই অবাধ বা অসীম নয়। সমাজ-জীবনে প্রত্যেকটি অধিকার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, আর এই গণ্ডির সীমারেখা স্থির হয় অন্য লোকের অধিকারের দ্বারা। নাগরিকের

যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্বও আছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আমার যেমন বাঁচিয়া থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার অধিকার আছে, অন্যেরও সেইরূপ অধিকার আছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই বলিয়া অন্যের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিতে পারি না। আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অন্য সকলেরও সেইরূপ অধিকার আছে এবং অন্যের সেই সকল অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিবার দায়িত্ব আমার রহিয়াছে। আমার অধিকার রক্ষা করা যেমন অন্যের কর্তব্য, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না-করা তেমনি আমার কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ। প্রথমতঃ, বলা যায়, আমার যেটি অধিকার অন্যের পক্ষে তাহা কর্তব্য। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, অপর সকলের কর্তব্য হইল আমার জীবননাশ না-করা। দ্বিতীয়তঃ, অন্যের যাহা অধিকার আমার তাহা কর্তব্য। অন্য লোকের জীবনের অধিকার ক্ষুণ্ন না-করা আমার কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, আমার ও অন্য লোকের অধিকারগুলিকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, যেহেতু রাষ্ট্রই আমাদের অধিকাগুলির স্রষ্টা ও রক্ষক সেই হেতু আমাদের সকলের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, সময়মত কর দেওয়া ও সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা। ব্যক্তির পক্ষে যাহা কর্তব্য রাষ্ট্রের পক্ষে সেগুলি অধিকার। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধিকারগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে অন্যের অধিকার কোনমতে ক্ষুণ্ন না হয়। অধিকারের এইরূপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিয়া সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়।

নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ (Classification of Rights)

যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা করে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হয়। এই

আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও বলা হইয়া থাকে, যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতামাতা পুত্রের দ্বারা পালিত হইবেন —এই অধিকার তাঁহারা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভঙ্গ করিলে আইনতঃ কেহ শাস্তি পায় না। সেইজন্য এইগুলিকে নৈতিক অধিকার (Moral Rights) বলা হয়।

প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights)

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করা হয়, যেগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বা মানুষের স্বভাবজাত অধিকার বলিয়া পরিচিত।

প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি সহজাত, চিরন্তন ও অপরিত্যাজ্য অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং এই অধিকারগুলি সে সমাজ বা রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে উপভোগ করে। মানুষের গাত্রচর্মের বর্ণ ও মানুষের চলৎশক্তি যেরূপ তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রাকৃতিক অধিকারগুলিও তদ্রূপ মানুষের প্রাকৃতর অংশ (They are as much a part of his nature as the colour of his skin and the power of locomotion") মানুষের এই সহজাত ও অপরিত্যাজ্য অধিকারগুলির মধ্যে 'জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সুখের অনুসরণ করিবার অধিকার' উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক দার্শনিকগণের লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ থাকিলেও এই মতবাদ চুক্তিবাদী দার্শনিক হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশো কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়। উপরি-উক্ত তিনজন লেখক রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে এক প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানব-জীবনের সূত্রপাত করেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল, তাহাকে ইঁহারা প্রাকৃতিক বা স্বভাবজাত অধিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হবস্‌ মানুষের যে অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কোন দিক্‌ দিয়াই গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল তাহা শুধু শ্রেষ্ঠতর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত মানুষ এই অধিকারগুলির প্রয়োগ করিত। হবস্‌-বর্ণিত প্রাকৃতিক স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র।

লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারী

ছিল এবং এই স্বাধীনতা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাকৃতিক অধিকার-গুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার যে অসুবিধা ছিল তাহা দূর করিবার নিমিত্তই মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। তাহারা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলিকে—যথা, জীবন, ধন ও স্বাধীনতা—সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবশিষ্ট অধিকারগুলি সমর্পণ করিল।

রুশোর মতেও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যে পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারী ছিল চুক্তি দ্বারা তাহারা সেই অধিকারগুলি সমষ্টিগত ইচ্ছায় (General will) সমর্পণ করিয়া সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রত্যেকে পুনঃপ্রাপ্ত হইল। রুশোর মতে প্রাকৃতিক অধিকারগুলি অপরিত্যাজ্য নহে। সমষ্টিই হইল সকল অধিকারের উৎস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসী দেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় এই প্রাকৃতিক অধিকার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মার্কিন দেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে, স্রষ্টা কর্তৃক মানুষের উপর কতকগুলি অপরিত্যাজ্য অধিকার অর্পিত হইয়াছে ("endowed by their creator with certain inalienable rights")। ফরাসী দেশে স্বাধীনতার ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, সকল মানুষই স্বাধীন ও সমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল মানুষের এই জন্মগত সাম্য ও সমানাধিকার সংরক্ষণ করা। এই অধিকারগুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার এবং অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কালের সমাজ-বিজ্ঞানিগণ এই মতবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে গিডিংস (Giddings) বলেন যে, প্রাকৃতিক অধিকার হইল সেই সমস্ত অধিকার যে অধিকারগুলি সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম দ্বারা প্রযুক্ত সমাজের পক্ষে প্রয়োজনের অধিকার এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, আইনানুমোদিত অধিকারগুলি যদি উপরি-ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক অধিকারগুলির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাহারা স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। সুতরাং গিডিংসের মতে প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সহজাত, চিরন্তন বা অপরিত্যাজ্য হইতে পারে না। সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয়ের

ক্ষেত্রেই একমাত্র এইগুলি প্রযোজ্য। সমাজনীতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এই অধিকারগুলি উপভোগ করা যায়।

সমালোচনা (Criticism)

প্রাকৃতিক অধিকারগুলির বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, 'প্রাকৃতিক' শব্দটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, 'প্রাকৃতিক' শব্দটির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অবর্তমানে কোন্ কোন্ অধিকারগুলি মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার-পর্যায়ভুক্ত তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকারের দাবী সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, চুক্তিবাদী লেখকগণ রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে যে অধিকারগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। সত্য বটে যে, মানুষ জন্মের সময় হইতে কতকগুলি অধিকার লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু অধিকারগুলিকে প্রকৃত অধিকার না বলিয়া শক্তিসম্ভূত কতকগুলি ক্ষমতা বলা অধিকতর সমীচীন। মানুষের এই সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে অধিকারে রূপান্তরিত হয়। মানুষ সামাজিক পরিবেশে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। মানুষের সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়া অধিকারে পর্যবসিত হয় এবং এই অধিকারগুলি যুগপৎ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উৎকর্ষসাধনে সহায়ক হয়। মানুষের সমাজ-জীবনের ধারা পরিবর্তনশীল—সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্বে যাহা অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইত বর্তমানে তাহা শুধু অনধিকার বলিয়া বিবেচিত হয় না—বর্তমানে সেগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। পূর্বে ভূম্যধিকারিগণের কৃষিভৃত্য রাখিবার অধিকার সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে ভূম্যধিকারিগণের এই অধিকার অন্যায় ও অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

উপরি-উক্ত সমালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ-নিরপেক্ষ কোন অবাধ বা চিরন্তন অধিকার মানুষের থাকিতে পারে না। সমাজ হইল সকল অধিকারের উৎস ও রক্ষক। যে সামাজিক পরিবেশে মানুষ

তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনে সক্ষম হয়, সেই পরিবেশের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ হইল রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং প্রাকৃতিক অধিকার হইল সেই অধিকারগুলি, যে অধিকারগুলির সাহায্যে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সমষ্টির কল্যাণের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ব্যক্তিগত কল্যাণসাধন করা সম্ভব হয়।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার

আইনগত অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—পৌর অধিকার (Civil Rights) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)। পৌর অধিকারগুলি মানুষের সভ্য জীবন যাপন করিবার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এগুলির অভাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা মানুষ দেশের শাসন-পরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

পৌর অধিকার (Civil Rights)

নাগরিকগণের যে-সমস্ত পৌর অধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

১। জীবন রক্ষার অধিকার (The Right to Life). ২। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (The Right to personal Freedom). ৩। কাজ করিবার অধিকার (The Right to Work). ৪। সম্পত্তির অধিকার (The Right to Property). ৫। স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার (The Right to Contract). ৬। বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (The Right to Speech, Press and Assembly). ৭। ধর্মাচরণের অধিকার (The Right to Religion and Conscience). ৮। বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার (The Right to Marriage and Family life). ৯। শিক্ষার অধিকার (The Right to Education).

১। **জীবন রক্ষার অধিকার**—বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারই হইল মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অধিকার। অন্যান্য অধিকারগুলির ভোগ এই অধিকারটির উপর নির্ভর করে। এই কারণে আত্মহত্যা করা সর্বদেশে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। আত্মরক্ষা করিবার অধিকারও

জীবন ধারণের অধিকারের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের সম্মান রক্ষার জন্য কোন আততায়ীর জীবন নাশ করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক হত্যাকারী বলিয়া বিবেচিত হয় না। মানবজাতির অস্তিত্ব যাহাতে বজায় থাকে, সেজন্য বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করাও জীবন রক্ষার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক পৈতৃক বা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, রাষ্ট্র সে সমস্ত লোকের বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

২। **ব্যক্তিগত অধিকার**—এই অধিকারটির তাৎপর্য হইল স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা ও দৈনন্দিন জীবনের কার্যসূচী স্থির করিবার অধিকার। মানুষের যদি এই অধিকারটি না থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। এই অধিকারটির মর্ম হইল যে, কোন ব্যক্তিকে আইনসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনভাবে গ্রেপ্তার বা আটক রাখা চলিবে না। শাসনকর্তৃপক্ষ যদি বে-আইনীভাবে কাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে বিচারালয়ের সাহায্যে (Writ of Habeas Corpus) শাসনকর্তৃপক্ষের কাজে বাধা দিবার ব্যবস্থা থাকে। তবে আপৎকালে বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকিতে পারে।

৩। **কাজ করিবার অধিকার**—কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার জীবন রক্ষার অধিকারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমর্থ বেকার লোক সমাজের গলগ্রহস্বরূপ। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমস্ত সমর্থ লোকের হিতকর কর্মসংস্থান সাহায্যে সকলকেই বাঁচিয়া থাকিবার এই প্রাথমিক অধিকারটি দান করা। যে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে এই অধিকার দানে অক্ষম সে রাষ্ট্র নাগরিকগণের আনুগত্য দাবী করিতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক বিন্যস্ত হওয়া উচিত, যে ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের ব্যাপক পার্থক্য দূর হইয়া সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অনুকূল পরিবেশে নির্ধারিত সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ মজুরি পাইবার অধিকারও কাজ করিবার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। বহু দেশে বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও এক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য

কোন দেশে কাজ করিবার অধিকার আইনসঙ্গত অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

৪। **সম্পত্তির অধিকার**—এই অধিকারের বলে লোকে তাহার আয়ত্তাধীন দ্রব্যসমূহ স্বাধীনভাবে ভোগ-ব্যবহার করিতে পারে। সম্পত্তির ভোগ-দখল ব্যতীতও লোকের নিজ সম্পত্তি দান, বিক্রয় ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতাও এই অধিকারটির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকারটি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, যেহেতু এই অধিকারটি সমাজে অসাম্য সৃষ্টি করিয়া শ্রমবিমুখ এক নিষ্কর্মা সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ চিরস্থায়ী করে, সেইহেতু এই অধিকারটির কোন নৈতিক সমর্থন থাকিতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অসদ্ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি সমর্থন-যোগ্য না হইলেও সমাজহিতকর কার্য সম্পাদনের পারিশ্রমিকরূপে যে সম্পত্তি অর্জিত হয়, তাহা সর্বক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। সদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তির ভোগ-দখলের অধিকার স্বীকৃত না হইলে লোকের কাজের অনুপ্রেরণা নষ্ট হইবে এবং গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া বিভিন্ন লোকের বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সম্ভাবনা রহিত হইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন না করিয়া সম্পত্তির ন্যায্য বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এমন কি, সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশেও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তবে এই অধিকারও অবাধ নহে। সরকার কর ধার্য করিয়া সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সম্পত্তির মালিকানা ও ভোগ-দখল সরকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। জাতীয় সংকটকালে সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাময়িকভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

৫। **চুক্তি করিবার অধিকার**—এই অধিকারের ভিত্তিতে লোকে অপরের সহিত সমানভাবে ন্যায়সঙ্গত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। এই অধিকারটি হইল আভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি এবং এই অধিকার সাহায্যেই একটি জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হইতে পারে। কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ বা দাস-ব্যবসায় প্রভৃতি বে-আইনী চুক্তি করিবার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না।

৬। **বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা**—বাক্ স্বাধীনতা সবদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ,

এই অধিকারটি ব্যতীত মানুষের চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইয়া মানুষ পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে না। এই অধিকারটির অবর্তমানে মানুষ চিন্তা ও ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদান দ্বারা উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠন করিতে পারে না, ফলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হইল বাক্-স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা প্রয়োগ করিয়া জনগণ তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা ও সরকারী অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়।

বাক্-স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার তাৎপর্য হইল যে, লোকে যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়াই দেশের এই মতামত অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচারিত হওয়া সম্ভব। এইজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

অনেকের মতে যুদ্ধের সময় এই বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষাকল্পে সংকুচিত বা স্থগিত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু এ যুক্তি শর্তহীনভাবে সমর্থনযোগ্য নহে। কোন সরকার যদি অন্যায় ভাবে বা দলীয় স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অহেতুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল এই সরকারের কার্য প্রতিরোধ করা। কোন ব্যক্তিকে বলপূর্বক সরকারী নীতি বা সরকারী কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিতে বাধ্য করা গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে যুদ্ধাবস্থায়ও নাগরিকগণের এই বাক্-স্বাধীনতায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা সমর্থনযোগ্য নহে।

নানাবিধ সংঘ গঠন করা ও সভা-সমিতিতে একত্রিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সাধারণ স্বার্থের উপরই এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাষ্ট্র শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকল্পে লোকের এই অধিকার সংকুচিত করিতে পারে।

৭। **ধর্মাচরণের অধিকার**—ইহার অর্থ হইল যে, অন্যের ধর্মমতে হস্তক্ষেপ না করিয়া বা শান্তি-শৃংখলা বা প্রচলিত নীতিবোধ লংঘন না করিয়া লোকে যে-কোন ধর্মমত পোষণ বা প্রচার করিতে পারে। ধর্ম হইল

ব্যক্তিগত জীবনের একটি নিজস্ব ব্যাপার এবং এই কারণে রাষ্ট্র সাধারণতঃ লোকের ধর্মীয় জীবনে হস্তক্ষেপ করে না।

৮। **বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার**—পরিবার গঠনের অধিকারের অর্থ হইল বিবাহ করিয়া সন্তান-সন্ততির পিতা হওয়া এবং পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, কারণ পরিবারই হইল সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এই পারিবারিক সম্পর্কের অলংঘনীয়তা ও পবিত্রতার উপর সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃংখলা নির্ভর করে। কিন্তু সামাজিক শান্তি শৃংখলার পরিপন্থী কোন পারিবারিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। এই কারণে রাষ্ট্র অস্থায়ী বিবাহ-বন্ধন (Temporary Marriage) অনুমোদন করে না এবং অনেক রাষ্ট্র বহু-বিবাহ সমর্থন করে না। রাষ্ট্র কতকগুলি পারিবারিক অধিকার স্বীকার করিলেও বিবাহিত জীবনের কতকগুলি বিশেষ করিয়া সন্তান-পালন সম্পর্কে কর্তব্য বলবৎ করে।

৯। **শিক্ষার অধিকার**—শিক্ষা ব্যতীত মানবচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে, তাই বর্তমান যুগে এই অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকাব বলিয়া সভ্যদেশে পরিগণিত হয়। শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক চেতনার উন্মেষ হয় না। তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার সুবিধা দান করা।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনতঃ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করিতে পারে, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকার-গুলির কোনটিই অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে না। প্রত্যেক অধিকারই কর্তব্যের গণ্ডির দ্বারা সীমায়িত। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু আমি যদি অন্যের জীবননাশ করি তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইব। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া মনে করি তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকাব আছে, কিন্তু আমার স্বাধীন মতামত এরূপভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্যের মতামত অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় না হয়, বা অন্যের সুনাম নষ্ট না হয়, বা

সমাজের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকে। সেইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার হইতে আমাকে বাঞ্চত করিতে পারে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাকল্পে সরকার অনেক সময় এই অধিকার-গুলিকে সংকুচিত করিতে পারে। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজ-বিরোধী হিংসাত্মক-কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে বা শান্তি-শৃংখলাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, জনকল্যাণের জন্য সরকার সে অধিকারগুলিও খর্ব করিতে পারে।

বর্তমান যুগে নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, কোন অধিকারই অবাধ বা সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সর্বকালের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এই অধিকারগুলির সংজ্ঞা নির্ণয় করা বা এইগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করা যায় না। যেহেতু এই অধিকারগুলি একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়, সেই হেতু সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অধিকারগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। মানুষের শিক্ষার অধিকার বা জীবিকা অর্জনের অধিকার পূর্বে স্বীকৃতিলাভ করে নাই বা বর্তমান জগতে বহুদেশে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত হয় নাই, কালের বিবর্তনে বহুদেশে এই অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিয়া মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সুতরাং অধিকারগুলি গতিশীল—স্থিতিশীল নহে।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অধিকারগুলি আপেক্ষিক ও প্রত্যেকটি অধিকার অন্যের অনুরূপ অধিকার ও সামাজিক হিতবোধ দ্বারা সীমায়িত—অর্থাৎ প্রত্যেকটি অধিকার ব্যক্তি কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রযুক্ত হইবে। অধিকারগুলি অবাধ, অসীম বা চিরন্তন না হইলেও মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয় এবং এইজন্য এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন ধর্মমত

পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকারগুলি সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অন্য ব্যক্তি বা শাসনকর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাহত না হয় তজ্জন্য অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে একটি অধিকারের সনদ (Bill of Rights) সংযোজনা করা হয়। অধিকারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক অধিকারগুলি—যেগুলির অভাবে কোন মানুষেরই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে না—স্থান পায়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করা হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। যদি কোন কারণে এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা প্রতিবোধ করিবার জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনদ দ্বারা অধিকারগুলি সুরক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে প্রধান বিচারালয়ের বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের উপর এই অধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত না হইলেও সে দেশের প্রচলিত আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে। আইনের দ্বারা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। গ্রেট বৃটেনের জাতীয় জীবনের নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাগরিক অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করিয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলি ব্যাহত হইতে পারে—এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারগুলি সম্পর্কে ব্যক্তি যেরূপ অবহিত ও সচেতন থাকে, অন্যদিকে সেইরূপ শাসনকর্তৃপক্ষও এই অধিকারগুলিকে কোনক্রমে ব্যাহত করিতে বিরত থাকে। এইরূপে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যক্তিগত অধিকার ও শাসনকর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)

নাগরিকগণ নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিয়া থাকেন :—

১। প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার (Right to vote). ২। সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার (Right to hold Public Offices). ৩। সরকারের অনুসৃত নীতি ও কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করিবার অধিকার (Right to criticise the Government).

১। **ভোটদান করিবার অধিকার**—এই অধিকারের অর্থ হইল যে, প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি নির্বাচনকালে ভোটদান করিয়া কোন্ ব্যক্তি সরকারী কার্যে উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে পারিবে। ভোটদান ক্ষমতা হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল নীতি। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়ও এই ভোটদান অধিকার সকল নাগরিকের উপর অর্পিত হয় না। নাবালক, দেউলিয়া, কয়েক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত এবং অনেক দেশে স্ত্রীলোকগণকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ-ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ বা শিক্ষা ও সম্পত্তির মালিকানা-নির্বিচারে এই ভোটদান ক্ষমতা অর্পিত হওয়া উচিত। যে শাসনব্যবস্থায় ভোটদানের অধিকার নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণ ব্যাহত হয়।

২। **সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার**—উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে জাতি, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। সকলকেই এ সম্পর্কে সমান অধিকার দান করিতে হইবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি একজন ধনী ব্যক্তির সমান বিবেচিত হইবে।

৩। **প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার অধিকার**—প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যেরূপ ভোটদান করিবার অধিকার আছে, তদ্রূপ তাহার ভোট পাইবার অধিকারও আছে। আইনসভায় বা স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সভায় প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্বাচিত হইতে পারে। তবে নির্বাচিত হইতে গেলে তাহাদের একটা নির্দিষ্ট বয়স্ক হওয়া চাই ও প্রয়োজনীয় অন্য যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়।

৪। **সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার অধিকার**—নাগরিকগণ অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ও শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য আইন-সঙ্গতভাবে সরকারের কার্যের সমালোচনা করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকবর্গ শেষ পর্যন্ত শাসিতের নিকট দায়ী। সুতরাং শাসক-শ্রেণী শাসিতের ন্যায়সঙ্গত অভাব অভিযোগ উপেক্ষা করিতে পারে না।

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার সার্থক হইতে পারে না। মানুষ যদি সর্বদা অনশন, বেকার ও আশ্রয়হীন হইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তির নিকট ভোটাধিকার বিড়ম্বনা মাত্র।

যোগ্যতা অনুসারে কার্যে নিযুক্ত হইবার, নির্ধারিত সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবার ও উপযুক্ত অবসর লাভের দাবী অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির ভোটদান ক্ষমতা থাকিলেও সে ক্ষমতা সে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে অক্ষম। তাহার পক্ষে জাতীয় বা স্থানীয় আইনসভাগুলিতে সদস্য নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা মূল্যহীন।

অর্থনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সমাজে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সকলের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অভাব পূরণের সামগ্রী না হওয়া পর্যন্ত মুষ্টিমেয়ের জন্য প্রাচুর্য থাকিতে পারিবে না। এরূপ সমাজব্যবস্থায় কোন শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য থাকিতে পারিবে না। অর্থনৈতিক অধিকার-যুক্ত সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শুধু শ্রমের বিক্রেতা ও অপরের আজ্ঞাবহ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এরূপ সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক সমাজ-হিতকর উৎপাদক হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সুতরাং অর্থনৈতিক অধিকারের তাৎপর্য হইল উৎপাদন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রবর্তন। উৎপাদন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবর্তন দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, শ্রমিকগণের কাজ করিয়া উপযুক্ত মজুরি

পাইবার, বিশ্রামলাভের, অসুস্থ, বেকার বা আকস্মিক বিপদ অবস্থায় সাহায্য পাইবার, শ্রমিক সংঘ গঠন করিবার প্রভৃতি অধিকার। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক-গণের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার। শ্রমিকগণের যদি উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার না থাকে তাহা হইলে তাহাদের কর্মে অনুপ্রেরণা নষ্ট হইয়া তাহারা উৎসাহহীন নিস্পৃহ কর্মীতে পর্যবসিত হইবে। যে উৎপাদন ব্যবস্থা অনশন বা বেকার ভয়ে ভীত কর্মিবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত হয়, সে উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই দক্ষ বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থায় মানবিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হইয়া শুধু ক্ষুণ্ণ হয়।

অধিকারের আইনগত ভিত্তি (Legal basis of Rights)

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অর্থাৎ অবাধ ও অসীম ক্ষমতা হইল ব্যক্তিগত অধিকারের একমাত্র উৎস। এই মতবাদে বলা হয় যে, ব্যক্তির অধিকারের অর্থ হইল ব্যক্তির এমন কতিপয় দাবী যাহা বিচারালয়ের নির্দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া ইহার পরিধি ও কার্যক্ষেত্র স্থির করিয়া দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অধিকারগুলি রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত এবং রাষ্ট্র ব্যতীত কার্যকর করা যায় না। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া এই আইনের সাহায্যে অধিকারগুলি ব্যক্তির পক্ষে সহজলভ্য করে। যেহেতু আইনের সাহায্যে অধিকারগুলির সৃষ্টি হয় এবং বলবৎ করা হয়, সেই হেতু আইনের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিলে, অধিকারগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্যের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অধিকারগুলি একান্তভাবে আইনের উপর নির্ভরশীল।

অধিকারের উপরি-উক্ত নিছক আইন-ভিত্তিক ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকারগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। কোন নির্দিষ্ট কালে কোন সমাজে ব্যক্তি যে অধিকারগুলি আইনের বলে কার্যতঃ ভোগ করিতে পারে তাহা নিশ্চয়ই তাহার যে সমুদয় অধিকার ভোগ করা উচিত তাহার সমান নাও হইতে পারে। বর্তমানে শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার বলিয়া সকল সভ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেক সমাজে শিক্ষার এই অধিকার আইনের সাহায্যে সৃষ্টি হয় নাই বা স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সমুদয় অধিকার একান্তভাবে অপরিহার্য তাহা শুধুমাত্র আইন দ্বারা সৃষ্ট ও স্বীকৃত অধিকারের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। ইহা ব্যতীত বলা যায় যে, মানুষ প্রকৃতি ও প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ মধ্যে বহুবিধ সংঘ গঠন করিয়াছে। এই বিভিন্ন সংঘগুলি সম্পর্কেও মানুষের বিভিন্ন অধিকার আছে যে অধিকারগুলিও তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্থিরীকৃত অধিকারগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, অধিকারের ধারণার প্রকৃত উৎস হইল সামগ্রিকভাবে সামাজিক হিতাহিত বোধ। আইন নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক চিন্তাধারার প্রতিবিম্ব মাত্র। সুতরাং অধিকারগুলিও এই সামাজিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তি মাত্র—রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সৃষ্ট নহে।

শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকারের নিছক আইন-ভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নহে। আইন-ভিত্তিক অধিকার ব্যতীতও নৈতিক অধিকার সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় অপরিহার্য।

অধিকারের অর্থনীতিভিত্তিক সংজ্ঞা (Economic View of Rights)

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকার সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অধিকার সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করা হউক না কেন, অধিকার সম্পর্কে প্রধান কথাটি হইল যে, যেহেতু রাষ্ট্র প্রণীত আইন সাহায্যে অধিকারগুলি স্বীকৃত ও বলবৎ করা হয়, সেই হেতু অধিকারগুলির রূপ ও প্রকৃতি আইনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং অধিকারগুলির প্রকৃতি জানিতে হইলে আইনগুলির প্রকৃতি জানা প্রয়োজন।

কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত আইনগুলির কোন সার্বজনীন রূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কার্ল মার্কস প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের মতে আইন হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে রচিত কতিপয় আচরণ-বিধি। যে শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম সেই শ্রেণীর স্বার্থেই আইন রচিত হয়। সাধারণভাবে

বলিলে বলা যায় যে, যে শ্রেণীর হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে। ইহাদের মতে দেশের ধনবণ্টন ব্যবস্থার উপরই আইনের কাঠামো নির্ভর করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা যদি স্বল্প সংখ্যক ভূম্যধিকারী ও ধনিক শ্রেণীর হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে এই শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের শ্রেণীস্বার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। এরূপ ক্ষেত্রে অধিকারের অর্থ হইল শ্রেণীবিশেষের আইন দ্বারা সুরক্ষিত কতকগুলি বিশেষ সুবিধা। এক্ষেত্রে বিত্তহীন শ্রেণীর অধিকার বিশেষভাবে সংকুচিত হয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গঠিত না হইলে সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

অধিকারের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা সাহায্যে ধনবণ্টন ব্যবস্থায় যে গুরুতর বৈষম্য আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায় এবং এই বৈষম্য দূরীভূত না হইলে অধিকারের সার্বজনীন রূপায়ণ সম্ভব নয় তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুগে অধিকার-গুলির স্রষ্টা ও প্রবর্তনকারী আইন শুধু একটি মাত্র শ্রেণীর প্রভাবে রচিত হয় না। আইন প্রণয়নে অল্পবিস্তর পরিমাণে সামাজিক অন্যান্য শক্তিরও প্রভাব দেখা যায়। তাই প্রায় সব দেশেই আইন প্রণয়নে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যায়।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of Citizens)

নাগরিক কর্তব্য বলিতে বুঝায়, যে কর্তব্যগুলি নাগরিকের পক্ষে অবশ্য করণীয়—যেগুলি পালন না করিলে আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি পাইতে হয়। নাগরিক যেরূপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট্রও তদ্রূপ নাগরিকের নিকট কতকগুলি কর্তব্যপালনের দাবী করিতে পারে। এই কর্তব্যগুলি হইল—

আনুগত্য (Allegiance)

প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করা। আনুগত্যের অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া

সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার কার্যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে, অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্র রক্ষা-কার্যে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকেরই গুরুদায়িত্ব বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলা (Obedience to laws)

রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়া চলা উচিত। কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের মতে যদি কোন আইন অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে জনমত সৃষ্টি করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে।

করপ্রদান (Payment of taxes)

আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনহিতকর কার্যসম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনা কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেইজন্য প্রত্যেকের দেয় কর সময়মত রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে। ভোটদান করা শুধু একটা নাগরিক অধিকার নয়, ইহা নাগরিকের পক্ষে একটা গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং সততা ও সুবিবেচনাসহকারে এই দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সমাজ-জীবন যাহাতে উন্নততর হয় সেইজন্য নাগরিকগণের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত। প্রয়োজনমত সরকারী কার্যে সাহায্য করা নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য সর্বদেশে জুরীর বিচার প্রবর্তিত আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কোন কারণে বিপন্ন হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস। রাষ্ট্রের অবর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ্য কর্তব্য।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় (Safeguards of Liberty)

স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়, সেইজন্য সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একটা সুনির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি সুসংবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য দ্বারা ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে ও এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই বা সেখানকার উচ্চ বিচারালয়ের শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্যের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা নাগরিক অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার আইনের প্রাধান্য ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (Rule of Law) বিশেষ কার্যকরী হইয়া নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে। যদি কোন নাগরিক বিনা বিচারে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালয় ঐ ব্যক্তির বিচার করিবার জন্য তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। বিনা বিচারে কাহারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলণ্ডে আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান।

ক্ষমতার বিভাগ করিয়া (Separation of Powers) অনেক সময় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতার এই বিভাগ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়া সর্বক্ষেত্রে গণ্য হইতে পারে না। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডবাসী স্বাধীন।

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা (Independence of the Judiciary) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। বিচারালয়গুলি যদি শাসনবিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে ন্যায়বিচার সম্ভব হয়। ন্যায়বিচারের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ইহা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় (Democracy) ব্যক্তি-স্বাধীনতা সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়। এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী হইয়া স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে। স্বাধীনতা কোন দিক্ দিয়া একটু বিপন্ন হইলে নিজেই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্যই বলা হয় নাগরিকগণের আত্মচেতন ভাবই হইল তাহাদের স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ।

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার

স্বাধীনতা—স্বাধীনতা শব্দটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। তাহা হইলে সমাজে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। এইজন্য রাষ্ট্র কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা সীমায়িত করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনতা প্রয়োগ করা যায় তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেন-না স্বাধীনতা প্রয়োগের এই সীমারেখা স্থির করিয়া রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দেয়। সুতরাং আইন না থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে।

সাম্য—সাম্য বলিতে সকলেই সমান এ কথা বুঝায় না বা সকলকেই সমান হইতে হইবে ইহাও সাম্যের প্রকৃত অর্থ নয়। সাম্যের প্রকৃত অর্থ

হইল, সকলকেই সমান সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করা। সমাজে সাম্যনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপরিচালনায় কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের জন্য কোনরূপ বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সকলকেই সমান চক্ষে দেখিবে। আভিজাত্য, ধর্ম বা বিত্ত প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদ থাকিবে না। একমাত্র সমাজকল্যাণকর অধিকতর যোগ্যতা ব্যতীত মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হইবে না। তাহা হইলেই পূর্ণ-স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বহু রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্যনীতির অভাবে রাজনৈতিক সাম্য কার্যকর হইতে পারে না।

অধিকার—অধিকারের সাধারণ অর্থ হইল ক্ষমতা। কিন্তু অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে বিশৃংখলা আনয়ন করে। সেইজন্য এই ক্ষমতাগুলি কতকগুলি কর্তব্যের দ্বারা সীমায়িত করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে সমাজের অন্য লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। কাজেই ব্যক্তিবিশেষের অধিকারপ্রয়োগ অন্যের প্রতি তাহার কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। এক ব্যক্তির যাহা অধিকার, অন্যের তাহা কর্তব্য। এই পারস্পরিক সম্বন্ধ রাষ্ট্র আইনের দ্বারা অব্যাহত রাখে।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য—অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। জীবন-ধনসম্পত্তির অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রভৃতি পৌর অধিকার। ভোটদান-ক্ষমতা, সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। কিন্তু এই অধিকারগুলির কোনটিই শর্তহীন নয়।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, যথাযথভাবে ভোটদান করা, সময়মত কর প্রদান করা ও প্রয়োজনমত অন্যভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা, নাগরিকদের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই সকল কর্তব্যপালনে উদাসীন হইলে অধিকারের দাবী রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উপায়—লিখিত শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা, আইনের অনুশাসন, ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ প্রভৃতি নাগরিক অধিকার রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই হইল স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায়।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by the concept of Liberty? "Sovereignty and Liberty are not contradictory terms." Examine the proposition.

স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির দ্বারা কি বুঝ? "সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা বিরোধী সংজ্ঞা নহে।" উক্তিটি পরীক্ষা কর।

2. Define the doctrine of natural right.

প্রকৃতিদত্ত অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

3. Explain the concept of Liberty in Political Science. What are the safeguards of Liberty in a modern state?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'স্বাধীনতা' সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর। বর্তমান রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কি কি?

4. Rights imply duties. Duties may be negative or positive. Explain.

অধিকার কর্তব্যের নির্দেশক। কর্তব্যগুলি নেতিবাচক অথবা ইতিবাচক হইতে পারে। এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

5. Explain the concept of Liberty in Political Science. Does the restraint of law mean curtailment of liberty? Give reasons for your answer.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর। আইনের নিয়ন্ত্রণ বলিতে কি স্বাধীনতার হ্রাস বুঝায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্র-সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ

(Union of States and Forms of Government)

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই উপাদানে গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে সরকারের প্রকারভেদ দেখা যায়। এই প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল্। তাঁহার রচনায় দুই প্রকারের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—স্বাভাবিক ও বিকৃত (Normal and Perverted)। জনকল্যাণের জন্য যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেই ব্যবস্থাকে তিনি স্বাভাবিক আখ্যা দেন, আর যেগুলি শুধু শাসকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য পরিচালিত হয়, সেগুলিকে তিনি বিকৃত আখ্যা প্রদান করেন। তারপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ-কারীদের সংখ্যানুসারে তিনি স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে আরও কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন।

অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে:—

সার্বভৌমত্ব পরিচালনাকারীর সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃত
এক ব্যক্তি	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচার
একাধিক ব্যক্তি (একটি সংসদ)	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহু ব্যক্তি (জনসাধারণ)	গণতন্ত্র	বিকৃত গণতন্ত্র

অ্যারিস্টট্‌লের এই শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই শ্রেণীবিভাগ কোন মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শুধু ক্ষমতা পরিচালনাকারীর সংখ্যা অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এ যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক বা কতিপয় ব্যক্তি হইতে পারে না। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগ-নীতি বর্তমান রাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে

প্রকৃতপক্ষে অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসনব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিক লক্ষ্য রাখিয়া অ্যারিস্টট্‌ল এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। যে শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় সেগুলিকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়াছিলেন, আর যেগুলি শাসকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিচালিত হয় সেগুলিকে তিনি বিকৃত আখ্যা দিয়াছিলেন। বার্কারের মতে অ্যারিস্টট্‌লের নৈতিক ভিত্তি বর্তমান যুগেও একেবারে অচল হইয়া যায় নাই। বর্তমান যুগে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচিতির জন্য বিভিন্ন নামকরণ করা হয়, যথা—কল্যাণ রাষ্ট্র, যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র, পুলিশ রাষ্ট্র, বাণিজ্যিক রাষ্ট্র, তখন পরোক্ষভাবে অ্যারিস্টট্‌লেরই নৈতিক মান প্রয়োগ করা হয়।

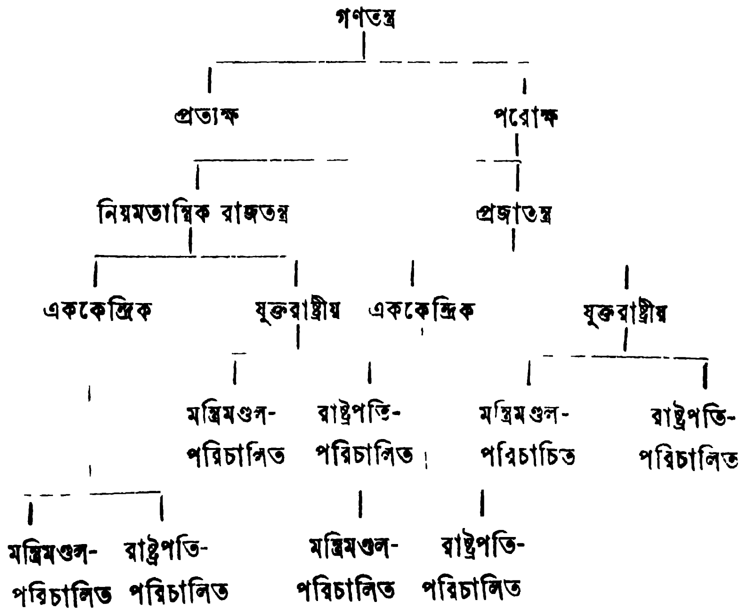
বর্তমানকালে নিম্নলিখিত প্রকারে শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ করা হয়:—

১। রাজতন্ত্র—Monarchy. ২। অভিজাততন্ত্র—Aristocracy.

৩। গণতন্ত্র—Democracy. ৪। আমলাতন্ত্র—Bureaucracy

৫। একনায়কতন্ত্র—Dictatorship

লিকক্ তাঁহার গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে সরকারের প্রকারভেদ করিয়াছেন:—



রাজতন্ত্র (Monarchy)

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসনক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে, সেই শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় রাজাই হইলেন শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয়। রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে। কদাচিৎ রাজা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন। প্রাচীন রোম ও পোল্যাণ্ড দেশে এইরূপ নির্বাচিত রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়।

রাজতন্ত্র দুই প্রকারের হইতে পারে, অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ও নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Constitutional or Limited Monarchy)। অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজতন্ত্রে একমাত্র রাজার ইচ্ছায় শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। এই শাসনব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি রাষ্ট্র', সুতরাং রাজা ও রাষ্ট্রে এই শাসনব্যবস্থায় কোনও ভেদ থাকে না।

অবাধ রাজতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, রাষ্ট্রীয় চরম ক্ষমতা এক হস্তে ন্যস্ত থাকার ফলে শাসনব্যাপারে দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়। রাজা প্রজাবৎসল হইলে তাঁহার স্বকীয় উদ্যমে তিনি প্রজার বহু হিতসাধন করিতে পারেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা জনগণের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিয়া তাহাদিগকে আইনশৃংখলা মানিবার শিক্ষা দিতে পারেন।

কিন্তু এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও একথা বলিতে হইবে যে, শাসনব্যবস্থার যতগুলি প্রকারভেদ আছে তন্মধ্যে এইটিই হইল নিকৃষ্টতম। তাহার কারণ, এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ববিকাশের কোন সুযোগ নাই। রাজা প্রজার সর্ববিধ হিতসাধন করিলেও স্বাধীনতা ও সাম্যের অভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। শাসনকার্যে প্রজাসাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকায় তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক বুদ্ধি পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় সু-নাগরিকের সৃষ্টি হইতে পারে না। আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে জনসাধারণ ক্রীতদাসের পর্যায়ে পরিণত হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন রাজা শাসনব্যবস্থার শীর্ষদেশে অবস্থান করেন সত্য, কিন্তু কার্যত তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নামসর্বস্ব রাজারূপে বিরাজ করেন। তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাজার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এইজন্য এই শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়—রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু তিনি শাসন করেন না।

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)

দেশের শাসনব্যবস্থা যখন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া অ্যারিস্টটল্ এই অভিজাততন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতেন। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সংখ্যা স্বভাবতই কম, সেজন্য অনেক সময় অভিজাততন্ত্রকে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়। অভিজাততন্ত্র গুণবাচক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসনকার্যে গুণ বলিতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ বুঝাইত। অভিজাত বংশে জন্মলাভ, প্রভূত বিত্তের অধিকার, সামরিক খ্যাতি প্রভৃতি নানা গুণের সমাবেশে অভিজাততন্ত্রের সৃষ্টি হয়। অভিজাততন্ত্রের পক্ষে বলা যায় যে, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিগণের হস্তেই এই ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। শাসকবর্গ যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে শাসনকার্যের উন্নতি হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় শাসনব্যাপারে শৈথিল্য বা দ্রুত পরিবর্তনশীলতা আসিতে পারে না। সদ্‌গুণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা জন্মে।

আধুনিককালে আর অভিজাততন্ত্রের স্থান নাই। রাজনৈতিক চেতনা-বৃদ্ধির ফলে মানুষ আর এখন শাসকের প্রাধান্য স্বীকার করিতে চায় না—তাহারা চায় আইনের প্রাধান্য ও আইনের শাসন। তাই গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র সমূলে উৎপাদিত হইয়াছে। সমাজে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদিগকে নির্বাচিত করা সহজ নয়। তাহা ছাড়া, মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে অবাধ ক্ষমতা ন্যস্ত করিলে তাহাদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়া স্বাভাবিক।

অভিজাততন্ত্রের প্রভাব (Influence of Aristocracy)

বর্তমান যুগে অভিজাততন্ত্র অচল হইলেও কোন দেশের শাসনব্যবস্থাই অভিজাততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত নহে। অতীতে ও বর্তমানে সকল দেশের শাসনব্যবস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতীত যুগে রাজার হস্তে সমুদয় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকিলেও শাসনব্যাপারে রাজা তাঁহার মুষ্টিমেয় সামন্ত রাজন্যবর্গের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। শাসনকার্যে অধিকাংশ লোকের অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার তখন ছিল না। সামন্তপ্রথা উচ্ছেদের পরও বহুদিন পর্যন্ত শাসনক্ষমতা সংখ্যালঘিষ্ঠের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহার কারণ হইল ভোটদান-ক্ষমতা প্রবর্তিত হইলেও এই ক্ষমতা সমাজের একটা নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থার এই অভিজাততান্ত্রিক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আইন-প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগেও একদল লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকে—যাহারা সমগ্র জনসংখ্যার এক অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ। অকিঞ্চিৎকর অংশ হইলেও এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই অধিকতর যোগ্যতার দাবীতে তাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করে। এক সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সমর্থনে দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। দলীয় সংগঠন ও দলীয় নীতি এরূপভাবে পরিচালিত হয় যে, সাধারণ লোকের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ খুব কমই হয়। জনসাধারণের অধিকাংশ নানাকারণে ভোটদান-ক্ষমতাবিহীন ভোটদাতৃগণ দলের নির্দেশে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া আইনসভা গঠন করে আর দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্ব-নির্বাচিত পদ্ধতিতে মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যরূপে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া দলের সমর্থন-পুষ্ট হইয়া তাঁহাদের শাসননীতি বলবৎ করেন। গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে উপরি-উক্ত শাসনব্যবস্থা ঈষৎ তারতম্যের সহিত পরিলক্ষিত হয়। মুষ্টিমেয় লোক জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার অভাবের সুযোগ লইয়া অধিকতর যোগ্যতার দাবীতে শাসন-

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো অভিজাততান্ত্রিক হইলেও বর্তমান অভিজাততন্ত্র জনসাধারণের ইচ্ছা-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না।

প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র (Republic)

যে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ও যে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়, তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। গঠনের দিক দিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের একটা প্রভেদ থাকিলেও ক্ষমতার দিক দিক উভয় শাসনব্যবস্থায়ই সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব সূচিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন জন্মগত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রতিষ্ঠিত রাজা থাকেন, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। প্রজাতন্ত্রে নির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রনায়ক থাকেন। ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার বিশাল ক্ষমতা আইনসভার তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গণতন্ত্র (Democracy)

'গণতন্ত্র' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক সরকার বুঝায়। কিন্তু কেহ কেহ আবার গণতান্ত্রিক সমাজ বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং গণতন্ত্র শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য উপরি-উক্ত শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Democratic State)

যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাহাকে সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ব্যাপারে জনগণই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং জনগণই দেশের শাসনপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকে। শাসকশ্রেণীর নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

গণতান্ত্রিক সমাজ (Democratic Society)

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জাতি, বংশ, ধন বা পদমর্যাদা নির্বিচারে সকলের সমানাধিকার। এই ব্যবস্থায় মানুষ হিসাবে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় না। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাই হইল গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল আদর্শ। ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রে কতিপয় মূলনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা-বর্জন ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

গণতান্ত্রিক সরকার (Democratic Government)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি-গণের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ব্যাপারে জনসাধারণের সমানাধিকার ও সাম্যনীতি স্বীকৃত হয়।

উপরি-উক্ত পার্থক্য করা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, গণতন্ত্র এমনই একটি অখণ্ড আদর্শ যে, সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বা শাসনব্যবস্থায় এই আদর্শ কার্যকরী না হইলে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজ-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অ-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হিট্‌লারের সময়ে জার্মানী, স্ট্যালিনের সময়ে রুশ দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অ-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সূচিত করে। অপরপক্ষে ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হস্তে যে সমুদয় বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-বিরোধী বলা যাইতে পারে।

গণতন্ত্র—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (Democracy—Direct and Indirect)

'গণতন্ত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল গণ-শাসন অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। এই শাসনব্যবস্থার স্বরূপ এব্রাহাম লিন্‌কন্ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয় (A government of the people, for the people and by the people)। জনসাধারণকে

লইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ দ্বারা শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হইতে পারে—ইহা চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোম দেশের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিত। তখনকার রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্র ছিল। জনসংখ্যাও ছিল স্বল্প। আর জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক ও মজুর শ্রেণীর লোক। ইহাদের বর্জন করিয়া পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন নাগরিকগণই আইন-সভার সদস্যরূপে রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিত। শুধু নাগরিকদের সম্পর্কে গ্রীক শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা হইত। সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তির রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণ। তাহারা একত্রে মিলিত হইয়া আইন-প্রণয়ন ও কর ধার্য করিত। আধুনিককালে সুইস দেশের চারিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্যাণ্টনে এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলবৎ দেখা যায়। এই শাসনব্যবস্থায় আইনানুগ সার্বভৌম ও রাজনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

বর্তমান রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় নগর রাষ্ট্র হইতে বহুগুণ বৃহত্তর। ইহাদের সমস্যাগুলি অনেক বেশী জটিল। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে একত্রিত হইয়া শাসনপরিচালনা-কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা বর্তমান যুগে সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, সাধারণ নাগরিকদের সেরূপ অপর্যাপ্ত সময়ও নাই, যোগ্যতাও নাই। সেইজন্য আধুনিককালে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। পরোক্ষ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় আইনানুগ সার্বভৌম ও রাজনৈতিক সার্বভৌম, একে অপর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পরোক্ষ গণতন্ত্রে পূর্ণবয়স্ক ও নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী জনগণ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া শাসনব্যবস্থা এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর মতানুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্যে যদি নির্বাচকমণ্ডলী সন্তুষ্ট না হয় তাহা হইলে নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত হইলে নির্বাচকমণ্ডলী নূতন শাসন-কর্তৃপক্ষ গঠন করিতে পারে। এইরূপে জনসাধারণ পরোক্ষভাবে শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং কোন শাসনব্যবস্থাই শুধুমাত্র ভোট

দ্বারা প্রকাশিত জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই গণতন্ত্র আখ্যা পাইতে পারে না। জনগণের এই সম্মতি সক্রিয় ও সদা-জাগ্রত হওয়া চাই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ সক্রিয়ভাবে শাসনব্যবস্থার উপব প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, একমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক আদর্শ সার্থক হয়। বর্তমান গণতন্ত্র সম্পর্কে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন বুঝায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হইলেও এই শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মতামত উপেক্ষিত হয় না। তাহারা নির্ভয়ে তাহাদের আইনসম্মত অধিকার ভোগ করিতে পারে।

গণতন্ত্র—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী (Democracy—Liberty, Equality and Fraternity)

এখন দেখা যাউক গণতন্ত্র কি? বর্তমানে গণতন্ত্রের যে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে জনগণের কল্যাণে জনগণ দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন গণতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী হইল গণতন্ত্রের আদর্শ এবং এই আদর্শত্রয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুইটি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য শর্ত এবং এই দুইটি আদর্শের পূর্ণ পরিণতি হইল মৈত্রী বা ভ্রাতৃভাব।

আধুনিক গণতন্ত্রের শাসন কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি হইল: প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বারা পরোক্ষ গণশাসন প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, দায়িত্বশীল সরকার, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন (alternation of power) এবং ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার সাহায্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

দেশের আইনানুসারে নির্ধারিত প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাগণের দ্বারা আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তাঁহাবা সরকার গঠন করিয়া দলের সমর্থনে শাসনকার্য পারিচালনা করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমত জাগ্রত রাখে। সরকার গঠনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইহার জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের ফলে জনসমর্থন হারাইলে বিরোধী দল পুনঃনির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া বিকল্প সরকার গঠন করে। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল জনসমর্থন

এই শাসনব্যবস্থায় সরকার যে শুধু জনগণ অথবা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নিকট দায়ী তাহা নহে, এই শাসনব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলই দীর্ঘস্থায়ী হইয়া দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও সাবলীল গতি রুদ্ধ করিবার সুযোগ পায় না। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইবার অর্থ হইল গণতন্ত্রের অপমৃত্যু। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন। সুতরাং যত অধিক সংখ্যায় ও অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাসনব্যবস্থার সহিত যুক্ত করা যায়, গণতন্ত্র হয় তত ব্যাপক। গণতন্ত্রের নীতি হইল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power)। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীত নানা স্তরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল করিয়া তোলা। কেন্দ্রীয় পরামর্শ ও কেন্দ্রীয় সাহায্য কাম্য হইলেও এই স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকাই হইল গণতন্ত্র-সম্মত নীতি। মানুষের রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাও সুরক্ষিত করাই হইল প্রকৃত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

উপরে গণতন্ত্রের যে রূপরেখার বর্ণনা দেওয়া হইল তাহা শুধু গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর একটি চিত্র। এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে অ-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, গণতন্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিয়া সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের ও সাফল্যের অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং সমাজব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশের বিচার ব্যবস্থায় যাহাতে স্বাধীনতা ও সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাহায্যে সে পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন প্রতি এক ভোট প্রবর্তিত করিয়া স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না অর্থাৎ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাবিহীন স্বাধীনতা ও সাম্য অর্থহীন।

গণতন্ত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ ও সংগতি নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিসত্তার সমান স্বীকৃতি, মূল্য ও মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং ইহার ফলে আত্ম ও পর অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল এক বলিষ্ঠ মানবগোষ্ঠী জন্মলাভ

করে। সকলেই যদি সমান স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ পায় তাহা হইলে সকলেই পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল হয়। ইহার ফলে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্বভাবজাতভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তাৎপর্য হইল কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার। গণতন্ত্রে সকলেই কাজ করিয়া গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। গণতন্ত্রে ব্যক্তিমাত্রই অনশন, বেকার ও সহানুভূতিহীন মালিকের ভয়মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া সমাজকে উপকৃত করিতে পারে এবং প্রতিদানে সমাজও ব্যক্তিকে তাহার কাজের ন্যায্য মূল্য প্রদান করিতে কার্পণ্য করে না। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র হইল সেই ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার ফলে সমাজে সকলের জন্য পর্যাপ্তের ব্যবস্থা না হওয়ার পূর্বে মুষ্টিমেয় লোক অনাবশ্যক আধিক্যের অধিকারী হইতে পারিবে না। ("There must be sufficiency for all before there is superfluity for the few")

গণতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য শর্ত হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেরই সমভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার পাইবার অধিকার স্বীকৃত ও সুরক্ষিত করা হয়। গণতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থা এরূপভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয় যে, ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অনভিজাত সকলেই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাবান থাকিয়া সমভাবে সুবিচার পাইতে পারে। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় যেন অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় অধিকতর সুবিচার ক্রয় করিতে না পারে।

এতদ্ব্যতীত গণতন্ত্রের আর একটি রূপ আছে যাহার অবর্তমানে গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকে। এই রূপটি হইল ইহার পররাষ্ট্র সম্পর্কিত অথবা আন্তর্জাতিক রূপ। গণতন্ত্র হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্রষ্টা ও রক্ষক। যে গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্রষ্টা ও রক্ষক হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির দাবি রাখে সেই গণতন্ত্রের পক্ষে পররাষ্ট্র সম্পর্কে যুদ্ধবাদ নীতি গ্রহণ করিয়া সভ্যতা বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া মারাত্মক গণতন্ত্র বিরোধী কার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

যে গণতন্ত্র পররাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি উদাসীন সে গণতন্ত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ও সাম্যের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র ও যুদ্ধবাদ পরস্পর-বিরোধী, কারণ গণতন্ত্র হইল সৃষ্টিকামী (creative) আর যুদ্ধবাদ হইল ধ্বংসাত্মক (Destructive)। দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র যেরূপ সাম্যের ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানাধিকার সৃষ্টি করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিতে সাহায্য করে আন্তর্জাতিক জীবনেও তদ্রূপ সাম্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকার সৃষ্টি দ্বারা বিশ্ব-মৈত্রী স্থাপনে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy)

অধুনা গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রথম কারণ হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী শাসিতের নিকট দায়ী থাকে। ইহাতে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ও জনগণের নিকট দায়ী বলিয়া শাসন-কর্তৃপক্ষকেও সর্বদা সতর্ক থাকিয়া সুদক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়

দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়। জনস্বার্থ এই শাসনব্যবস্থায় যেরূপ ভাবে সংরক্ষিত হয়, অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়তা করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবিতে শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অংশ। এই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জনগণ দেশকে ভালবাসিতে শিখে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফলে, তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ সামর্থ্যমত সমষ্টিগত কল্যাণসাধনে সাহায্য করে। ফলে, ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েই লাভবান হয়।

পঞ্চমতঃ, এই শাসনব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষে মানুষে ভেদ দূর করিতে সাহায্য করে। কোন ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের শাসন স্থায়ী হইতে পারে না। লর্ড ব্রাইসের মতে এই শাসনব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, মূঢ় ও মূক জনগণকে ভোটদান ক্ষমতা প্রদানপূর্বক উহা তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া তাহাদের মনুষ্যত্ববিকাশে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রের দোষ (Demerits)

গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহা একেবারে দোষবিমুক্ত নয়। গণতন্ত্রের বিপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, বলা যায়, গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে, গুণের উপর নয়। গণতন্ত্র সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনব্যবস্থায় 'জন প্রতি এক ভোট' এই নীতি প্রবর্তিত হইয়া যোগ্যতার সমাদর হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, এই শাসনব্যবস্থা অক্ষম বিকৃত গণতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাধিক্যের শাসন বুঝায়। আর এই সংখ্যাধিক্য গঠিত হয় অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকের দ্বারা। সুতরাং অক্ষম ও অশিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা কখনই সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোন শ্রেণীবিভাগ স্থান পায় না। সকল মানুষই সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, গণতন্ত্রের কার্য পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় চতুর ও বিবেকবর্জিত লোক দ্বারা। ইহারা ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণের ভোট সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে।

চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, যে সম্প্রদায় বা যে-দল সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে তাহারাই নিজেদের সুবিধার জন্য আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং এইরূপ আইনের দ্বারা সার্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষিত না হইয়া দলগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

পঞ্চমতঃ, মেইন, লেকি প্রমুখ লেখকগণ ইহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গণতন্ত্র অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষের প্রতিকূলতা করে। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেগুলির চর্চা অধ্যাত্ম জীবনগঠনের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমাদৃত হয় না। অজ্ঞলোক পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত জ্ঞান ও গুণের বিকাশ সম্ভব হয় না।

ষষ্ঠতঃ, এই শাসনব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর এই শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে, সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলীর খুশিমত সরকার পরিবর্তিত হয়। স্বল্পকালস্থায়ী সরকার কোন দূরপ্রসারী নীতি বা জনহিতকর গঠনমূলক কার্য করিতে পারে না। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল্ ইহাকে বিকৃত গণতন্ত্র আখ্যা দিয়াছিলেন। আধুনিককালে ওযেল্‌স্ বলেন যে, এই শাসনব্যবস্থা এত ভঙ্গুর যে, ইহাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিনষ্ট করা যায়।

পরোক্ষ গণতন্ত্রব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ
(Methods of Direct Democracy as applied to Indirect Democracy)

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাইতে থাকে। নানাকারণে গণতন্ত্রের ভিত্তি শিথিল হইতে থাকে। প্রথম কারণ হইল, নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কার্য করেন। দ্বিতীয়তঃ, অবস্থার পরিবর্তনে জনমত এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষেও সকল সময়ে জনমতের সহিত সমান গতিতে চলিয়া তাহাদের মতের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাবিস্তারের ফলে জনমতও অনেকটা সুসংবদ্ধ ও সুশিক্ষিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কারণে অনেক দেশেই আইন-প্রণয়নে ও শাসনকার্যে জনগণ যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এই উপায়ে জনগণ শাসনব্যবস্থায় প্রতিনিধিগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া মিলিতভাবে

তাহাদের মতামত কার্যকর করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চারিটি প্রকারভেদ হইতে পারে, যথা—

গণনির্দেশাধিকার (Referendum)

ইহার অর্থ হইল যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনের খসড়াকে চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত করিতে হইলে সে খসড়া-আইন জনগণের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক প্রবর্তিত খসড়া-আইন জনসাধারণের নিকট বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। যদি জনসাধারণ অধিক ভোটে খসড়াটি সমর্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়। আইন-সভার আর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। জনগণের এই নির্দেশ অধিকার বাধ্যতামূলক (Compulsory) বা ঐচ্ছিক (Optional) হইতে পারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে এই নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হইবে শাসনতন্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন, বা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইন, বা অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে এই অধিকার বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ঐচ্ছিক গণনির্দেশ গ্রহণ করা হয় তখনই যখন (ক) একটি নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক এই অধিকার দাবী করে, অথবা (খ) আইনসভার একাংশ ইহার দাবী করে, বা (গ) শাসন-পরিষদ্ এই দাবী করে।

গণ-প্রস্তাব অধিকার (Initiative)

অনেক সময় আইনসভা হয়ত কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক বা উদাসীন থাকিতে পারে। সেজন্য জনগণই আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অগ্রণী হয়। নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের একটা খসড়া আইনসভায় বিবেচনার্থ পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়া নির্বাচক-মণ্ডলীর নিকট বিবেচনা করিবার জন্য পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি জন-সাধারণ সেই খসড়াটি ভোটাধিক্যে অনুমোদন করে তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে। আইন-প্রণয়নের এই সরাসরি অধিকার দুই

প্রকারের হইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী যে খসড়া-আইনটি আইনসভার নিকট পেশ করিবে, সেটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয় অর্থাৎ বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত হয় তাহা হইলে তাহাকে সুপরিকল্পিত গণ-প্রস্তাব বা Formulated Initiative বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণবর্জিত আইনের প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ প্রস্তাব বা Unformulated Initiative বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাপারে উপরি-উক্ত দুই প্রকারের গণ-প্রস্তাব প্রয়োগ করা হয়। পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা মিলিতভাবে যদি শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব করে, আর এই প্রস্তাবটি যদি বিস্তারিত বিবরণ সমন্বিত খসড়া আকারে আইনসভার নিকট পেশ হয় তাহা হইলে ইহাকে সুপরিকল্পিত প্রস্তাব বলা হয়।

গণভোট (Plebiscite)

গণভোট অনেকটা গণনির্দেশাধিকারের অনুরূপ। গণভোট দ্বারা শাসন-কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত জনমত গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ শাসনবিভাগীয় সমস্যার সমাধানকল্পে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে জনমত গ্রহণ করা হয় গণ-নির্দেশাধিকারের মাধ্যমে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবিভাগের সময় আসাম রাজ্যের শ্রীহট্ট জেলা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হইবে, না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা নির্ণয়ের জন্য গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল।

প্রত্যাবর্তনের আদেশ (Recall)

কোন কোন দেশে ভোটদাতৃগণ যদি নির্বাচিত প্রতিনিধির আচরণে সন্তুষ্ট না হন বা নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি তাঁহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ভোটদাতৃগণ তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিতে পারেন। পুনর্বার ভোট গ্রহণ করিয়া এই প্রত্যাবর্তনের দাবী কার্যকরী করা হয়। ঐ প্রতিনিধিকে অপসারিত করিতে হইলে কিছু সংখ্যক ভোটদাতা তাঁহার অপসারণের দাবী করিবেন এবং যদি ভোটদাতৃগণ দ্বিতীয়বার ভোটে তাঁহাকে নির্বাচন না করিয়া অন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পদত্যাগ করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত উপায়গুলি গণতন্ত্রের সাফল্য সূচিত করে। এই উপায়গুলির

মধ্যে গণনির্দেশাধিকার ও গণ-প্রস্তাব-অধিকার গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমধিক সাহায্য করিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক উপায়গুলি সুইস দেশে বহুদিন হইতে কার্যকরী করা হইয়াছে ও সুইস আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অধুনা স্বাধীন আয়ার প্রভৃতি দেশ ইহার অনুকরণ করিয়াছে। গণনির্দেশ ও গণ-প্রস্তাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অন্যটির পরিপূরক। গণ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল অপ্রস্তাবিত আইনের সূচনা করা আর গণনির্দেশের উদ্দেশ্য হইল প্রস্তাবিত আইনকে না-মঞ্জুর করা। আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক, গণ-প্রস্তাব আইনসভাকে সেই জাতীয় আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য করে। অপরপক্ষে জনমতের বিরুদ্ধে যদি আইনসভা কোন আইন জনগণের উপর প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে গণনির্দেশ প্রয়োগ করিয়া সেরূপ আইনকে কার্যকরা করিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং উভয় পদ্ধতিই জনমতের বিজয় ঘোষণা করে।

গণতান্ত্রিক উপায়গুলির গুণাগুণ (Merits and Demerits of the Direct Methods)

গণতান্ত্রিক উপায়গুলির প্রধান গুণ হইল যে, উহারা সাধারণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তিকেও শাসনকার্যে অধিকতর উৎসাহী করিয়া তাহাকে তাহার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সতত সজাগ থাকে, তাহা হইলে আইনসভা বা শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না। কোন কায়েমী স্বার্থ বা দলবিশেষ তাহাদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কোন আইন প্রবর্তন করিতেও পারে না।

কিন্তু এই উপায়গুলি সম্পূর্ণ দোষবিমুক্ত নহে। আইন-প্রণয়নে বা শাসনকার্যে এই উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে আইনসভার বা শাসন-কর্তৃপক্ষের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। আইনসভা একটি বিতর্কসভায় পরিণত হয়, ফলে আইন-প্রণয়নে অনেক গলদ থাকিয়া যায়। বর্তমানকালে শাসনব্যবস্থায় এত বিভিন্ন প্রকারের জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে যে, সে সমস্যাগুলির সমাধান করিবার মত শিক্ষা, বুদ্ধি ও জ্ঞান সাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায় না। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও সূক্ষ্ম জ্ঞানের

প্রযোজন হয। সেইজন্য কি শাসনব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়নে অভিজ্ঞ ও কর্মপটু লোকের প্রয়োজন। গণপ্রবর্তিত আইন সকল সময়ে জনহিতকর নাও হইতে পারে। ক্ষুদ্রকায় সুইস দেশে এই পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হইযাছে বলিয়া বৃহদায়তনের অন্য দেশেও যে কার্যকরী হইবে তাহার আদৌ কোন নিশ্চয়তা নাই।

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান (Conditions essential for the success of Democracy)

গণতন্ত্র একটি বিশেষ প্রকারের শাসনব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা সার্বজনীন অধিকারেব ভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত। রাজতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে বা একনাযকতন্ত্রে এক ব্যক্তির হস্তে অথবা মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, কিন্তু গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয জনসাধারণের দ্বারা। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য যে জনসাধাবণের বিচারবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও কর্মদক্ষতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে একথা সহজেই অনুমেয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য তিনটি বিষযের উপর নির্ভর করে: প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণের শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার মত সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে জনসাধারণের সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণকে তাহাদের নাগরিক কর্তব্য পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দৃঢ়সংকল্প ও কর্তব্য-পালনে তৎপরতা—এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে। নাগরিকগণ যদি তাহাদের কর্তব্য-পালনের কথা ভুলিযা গিয়া শুধু অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র কার্যকর হইতে পারে না। অপরপক্ষে, নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে যদি তাহারা সতর্ক না হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে অভিজাততন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হইতে পারে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য জনগণের অধিকার রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ও কর্তব্য-পালনের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। যেখানে জনগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন

এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে, সেখানে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব। এই মনোভাবের অবর্তমানে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। জাতি-ধর্ম-ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলকেই সাধারণ হিতার্থে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। গণতন্ত্রের সাফল্যের আর একটি আবশ্যিক উপাদান হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও আপসমূলক মনোভাব। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যদি এইরূপ মনোভাব দ্বারা পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের মূল আদর্শ ব্যাহত হয়। এজন্য চাই বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক। সু-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত সু-নাগরিকের সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যে কর্তব্যবুদ্ধি ও বিচারবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমত। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা জনমতকে সুসংবদ্ধ ও শিক্ষিত করিতে পারিলে গণতন্ত্র পরিচালনার আর অন্তরায় থাকিতে পারে না।

বর্তমান যুগে ল্যাস্কি প্রমুখ অনেক লেখকের মতে অর্থনৈতিক সাম্যের অভাব গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়। ধনবণ্টন-ব্যবস্থায় অত্যধিক বৈষম্য থাকিলেও গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র যাহাতে সফল হইতে পারে সেজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy)

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে নানা কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যুদ্ধোত্তরকালীন অবস্থায় কোন দেশেই জাতীয় জটিল সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই। সেজন্য কোন কোন দেশে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। অপরপক্ষে, কোন কোন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ গণ-প্রস্তাব, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি অধিকারগুলি

সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত কারণে লোকের মনে স্বভাবতঃই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু উপরি-উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে। একনায়কতন্ত্র একটা সাময়িক পরিবর্তন মাত্র। কোন দেশেই একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আধুনিককালে জার্মানি ও ইতালী ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্র অনেকদিন হইতে জনকল্যাণের অনুকূল বলিয়া আজও পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে স্বৈরতন্ত্র, আভিজাততন্ত্র, ধনতন্ত্র, প্রভৃতি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মানুষের সাধারণ অধিকারগুলি যেভাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় নাই। সত্য বটে গণতন্ত্র এখনও পর্যন্ত মানুষকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে এই শাসনব্যবস্থা পূর্বতন শাসনব্যবস্থাসমূহ হইতে নানাদিক দিয়া উৎকৃষ্টতর। বার্ণস্ তাঁহার 'Democracy' নামক পুস্তকের একস্থলে বলিয়াছেন যে, মোটরগাড়ী সব সময়ে ভাল কাজ করে না বলিয়া গো-যান ব্যবহার করা যেরূপ নির্বোধের কার্য, আধুনিক গণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিহার করিয়া ভিন্ন জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা তদ্রূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আসল কথা হইল আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া ইহার প্রকৃত সার্বজনীন রূপ কার্যকর করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের মূল কথা হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যদি গণতান্ত্রিক নীতি প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'জন প্রতি এক ভোট' নীতির দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং সমাজ-জীবন মহত্তর করিবার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের সাফল্য একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছে

যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই ব্যক্তিত্ববিকাশের চরম সুযোগ প্রদান করিতে পারে। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য গণদাবী উত্থিত হইয়াছে। এই দাবী প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং গণতন্ত্রের জয় অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

প্রাচীনকালের গণতন্ত্র ও আধুনিক গণতন্ত্র (Ancient and Modern Democracies)

প্রচীন যুগেও গণতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমকগণের গণতন্ত্রা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের গণতন্ত্র প্রাচীনকালের গণতন্ত্র হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্।

প্রথমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন নাগরিকগণ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমান যুগের গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। পূর্ণবয়স্ক নাগরিকগণ বর্তমান যুগে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি ছিল ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্র। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বর্তমান রাষ্ট্র অপেক্ষা সেগুলি বহুগুণে ক্ষুদ্রতর ছিল। নাগরিকগণ যাহাতে শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য জনসংখ্যা নির্ধারিত করা হইত। বর্তমান রাষ্ট্র আয়তনে ও লোক-সংখ্যায় বিশালকায়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্রের আয়তন বা লোকসংখ্যা সংকুচিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয়তঃ, প্রাচীনকালের রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় বিশ্রামভোগী, পরজীবী অভিজাতসম্প্রদায় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত ও তাহারাই নাগরিক সুখ-সুবিধার অধিকারী ছিল। স্ত্রীলোক, মজুর-সম্প্রদায় ও ক্রীতদাসগণ পরনির্ভরশীল বলিয়া নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল। বর্তমান গণতন্ত্রে মানুষে মানুষে এতটা ভেদ দেখা যায় না। সকলেরই সমান নাগরিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

চতুর্থতঃ, প্রাচীনকালের গণতন্ত্রে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়া হইত। ব্যক্তি রাষ্ট্রের একটি অকিঞ্চিৎকর অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত।

সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রবেদীমূলে বলি দেওয়া হইত। রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু রাষ্ট্রের জনকল্যাণ-ক্ষমতার দ্বারাই সমর্থিত হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না। বর্তমান যুগে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট। এখন সরকার শুধু রাষ্ট্রপ্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রগুলিকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায় না। যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী একটি নিকৃষ্ট স্তরের জীব বলিয়া পরিগণিত হইত, যে শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না, তাহাকে বর্তমান গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্তমানে গণতন্ত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের সকল স্থায়ী অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয় ও বর্তমান গণতন্ত্র সর্ববিধ উপায়ে নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে তৎপর থাকে।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র সমধর্মী। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা নয়। একনায়কতন্ত্রের আলোচনা করিলে এই সত্যটি উপলব্ধি করা যাইবে। বিগত প্রথম মহাসমরের পরবর্তী কালে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়। যুদ্ধোত্তরকালে ইয়ুরোপের কয়েকটি দেশের পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটে যে, ঐ সমস্ত দেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্র বেকার-সমস্যা, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-অধিকার প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধানে তৎকালীন সরকারগুলির অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত অনেক দেশে বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁহাদের দলীয় নীতি বিসর্জন দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য একমত হইতে পারেন না। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে,

জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। লোকের ধারণা জন্মে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আর অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম নয়। দেশের এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। যুদ্ধোত্তরকালে অনেক দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এত দ্রুত অবনতি ঘটে যে, একনায়কতন্ত্র একান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠে।

একনায়কতন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা সামরিক (Military), সাম্যবাদী (Communist) ও ফ্যাসিবাদী (Fascist)। সামরিক একনায়কতন্ত্র বহু পুরাতন হইলেও বর্তমান যুগেও এই শাসনব্যবস্থা লোপ পায় নাই। যখনই সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক সৈন্যগণের সাহায্যে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তখন এই শাসনব্যবস্থাকে সামরিক একনায়কতন্ত্র বলা হয়। ফরাসী দেশে নেপোলিয়নের শাসন, বর্তমানে স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসন ও অতি আধুনিককালে পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি হইল একজাতি, একরাষ্ট্র ও একনায়ক। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একক নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় ও রাষ্ট্রের সকল কার্যকলাপ একক নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে যে-কোন উপায়েই হউক একত্রিত করিয়া দেশকে একটা উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে একনায়কতন্ত্র সাহায্য করে। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটিমাত্র দল থাকে ও নেতা হইলেন দলের সর্বময় কর্তা। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয়া হয় না—বলপ্রয়োগ করিয়া অন্য দলগুলিকে বিনষ্ট করা হয়।

অবাধ দলীয় কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রের অধীনে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান নাই। ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়।

একনায়কতন্ত্র-অনুসারে রাষ্ট্র সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং ব্যক্তির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

কোন অভিযোগ দূরের কথা, কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়। রুশিয়ায় সাম্যবাদী, ইতালীতে ফ্যাসিবাদী ও জার্মানীতে নাৎসীবাদী সিদ্ধান্তের উপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রুশিয়ার এই সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র ইহার গঠনমূলক কার্য দ্বারা পৃথিবীর বহুদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (Democracy and Dictatorship)

গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল স্বাধীনতা ও সাম্য। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এই নীতির কোন স্থান নাই। গণতন্ত্রে একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্ভবপর, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটিমাত্র দল থাকে। অন্য দলের অস্তিত্ব আদৌ বরদাস্ত করা হয় না। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্মতি, সুবিধা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একনায়কতন্ত্র হইল দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য একনায়কতন্ত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু দলগত এই দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে শুধু দলগত স্বার্থের হানি হয় তাহা নয়, সমস্ত জাতীয় জীবন এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিপর্যস্ত হইতে পারে। রুশীয় একনায়কতন্ত্রে এবং নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কার্যতঃ যাহাই হউক না কেন, রুশীয় একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল ধনিক শ্রেণীকে নির্মূল করিয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করা। অপরপক্ষে, নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল কোন সম্প্রদায়কে উৎখাত না করিয়া সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক জাতীয় স্বার্থকে পরিপুষ্ট করা। কার্যক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী বা নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র এবিষয়ে কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, তাহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ।

একনায়কতন্ত্রের গুণ (Merits of Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে সকলেই স্বভাবতঃ একটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকিলেও একনায়কতন্ত্রের যে কোন গুণ নাই, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

একনায়কতন্ত্রের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এই শাসনব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে যে দল বা উপদলের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়া জনমতের প্রাধান্য প্রমাণ করা হয়, তাহা বহুক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয় এবং দলগত বিরোধ জাতীয় স্বার্থকে অনেক সময়ে ক্ষুণ্ন করে। প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশেই জনগণ দলের নেতাকে অন্ধভাবেই অনুসরণ করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি শেষ পর্যন্ত নেতার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। একনায়কতন্ত্র জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান করিতে পারে, যাহা গণতন্ত্রে সকল সময়ে সম্ভব হয় না। জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে অধিকতর কার্যকরী হয়। মানুষের নৈতিক উৎকর্ষসাধনেও একনায়কতন্ত্রের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। রুশ দেশে এই একনায়কতন্ত্র জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তাহাদের আত্মত্যাগ দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার শিক্ষা দিয়াছে। একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তাহা বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে জার্মানী, ইতালী ও বিশেষ করিয়া রুশিয়া একনায়কতন্ত্রের অধীনে অতি অল্পকালের মধ্যে যে উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহা গণতন্ত্রে কোথায়ও সম্ভব হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্ত্র পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য কখনই নয়। বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। একনায়কতন্ত্রের কার্যাবলী যদি ক্রমাগত জনস্বার্থবিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচার একার্থবোধক হইতে পারে না।

দোষ (Demerits)

একনায়কতন্ত্রের পক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক না কেন, তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, এই শাসনব্যবস্থা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের সুবিধা দান যদি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রেই একনায়কতন্ত্র সমর্থনযোগ্য নয়। একনায়কতন্ত্র যে শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা অস্বীকার করা

যায় না। মানুষ আইনের শাসন মানিতে চায়, কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের প্রতি স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। একনায়কতন্ত্র এই ব্যক্তিবিশেষের শাসনই প্রতিষ্ঠিত করে, সুতরাং জনকল্যাণকর হইলেও এই শাসনব্যবস্থা কাম্য নহে। অনগ্রসর ও অপরাধপ্রবণ জনগণ শাসনের পক্ষে সহায়ক হইলেও একনায়কতন্ত্র জ্ঞানী, গুণী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমূহের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময় এই একনায়কত্ববাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর কর্তৃক স্থাপন করিতে ব্যগ্র হয়। সুতরাং একনায়কতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলে। জার্মানী ও ইতালির একনায়কতন্ত্রের এই ছিল প্রধান দোষ। এই দোষের জন্যই তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালিত হয় স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের দ্বারা। এই কর্মচারীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতা স্থির করিয়া সরকারী কার্যে নিয়োগ করা হয়। একটা নির্দিষ্ট বয়স হইতে কার্য আরম্ভ করিয়া একটা নির্দিষ্ট বয়সে তাঁহাদের শাসনকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহারা ভরণপোষণের জন্য ভাতা পান। এই সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের বাঁধা নিয়মে দিনের পর দিন কাজ করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রেই ধরাবাঁধা নিয়মের গণ্ডির বাহিরে আর কোন কিছুই করিতে রাজী হন না। সরকারী কার্যে নিযুক্ত বলিয়া তাঁহারা নিজেদের বিশিষ্ট পদমর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন ও সেজন্য সাধারণ লোকের সহিত তাঁহাদের প্রায়ই যোগাযোগ থাকে না। ফলে, সরকারী কর্মচারী হইলেও তাঁহাদের জনগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি থাকে না। তাঁহারা এক বিশেষ আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া জনসাধারণ হইতে সকল সময়ে তাঁহাদের পার্থক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হন। শাসনকার্যে দীর্ঘসূত্রতা আমলাতান্ত্রিক সরকারের আর একটি প্রধান দোষ। সম্ভব হইলেও ইহারা নিয়মবহির্ভূত কোন কার্য করিতে নারাজ। এইজন্য আমলাতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে মিল্ বলিয়াছেন যে, এই সরকার অস্বাভাবিক-

রূপে নিয়মানুবর্তী ও এই রোগেই ইহার মৃত্যু ঘটে। এই অস্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতার জন্য অনেক সময় জনস্বার্থও ব্যাহত হয়।

দীর্ঘসূত্রী ও অত্যধিক পরিমাণে নিয়মানুবর্তী হইলেও আমলাতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘদিনের সরকারী কার্যের অভিজ্ঞতাব ফলে ইহাদের সরকারী কার্যের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানে এই জাতীয় কর্মচারীরা সিদ্ধহস্ত। অনেক সময় মন্ত্রিপরিষদ্, কি আইন-প্রণয়নে আর কি নীতিনির্ধারণে, এই কর্মচারীদের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। আমলাতন্ত্রের উপর মন্ত্রি-পরিষদের এই নির্ভরশীলতা অনেক দেশে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের বিশেষ দোষ হইল দায়িত্ববোধের অভাব। স্ব-শাসন ব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ববোধ এই দুইটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। আমলাতন্ত্র কর্মদক্ষ, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জনগণের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণের স্বার্থসম্পর্কে একটু অবহিত হইলে আমলাতন্ত্র আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমলাতন্ত্রের গঠন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের শ্রেণীবিভাগ—অ্যারিস্টট্‌ল গুণবাচক ভিত্তির উপর সরকারকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাহার পর শাসকের সংখ্যানুসারে উক্ত দুই শ্রেণীর ছয়টি বিভিন্ন নামকরণ করেন। জনকল্যাণের জন্য যে শাসন পরিচালিত হয়, তাহাকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়াছিলেন এবং স্বাভাবিক সরকারকে সংখ্যানুসারে রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র এই তিন আখ্যা দিয়াছিলেন। বিকৃত শ্রেণীকেও সংখ্যানুসারে তিনটি ভাগ করিয়াছিলেন: যথা—স্বৈরাচার, ধনিকতন্ত্র ও বিকৃত গণতন্ত্র। এই প্রকার শাসনের উদ্দেশ্য হইল শাসকশ্রেণীর স্বার্থ পরিপুষ্ট করা।

বর্তমানকালে নিম্নলিখিত শাসনব্যবস্থাগুলি দেখা যায়:

রাজতন্ত্র—জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তির শাসনকে রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে যখন অবাধে ক্ষমতা পরিচালনা

করেন, তখন তাহাকে অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অবাধ রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজার ক্ষমতা যখন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু নামসর্বস্ব রাজা হিসাবে অবস্থান করে, তখন তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা হয়।

অভিজাততন্ত্র—স্বল্পসংখ্যক গুণী ও জ্ঞানী লোকের দ্বারা যখন শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র নাম দেওয়া হয়। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের হস্তে শাসনকার্যের ভার থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু প্রকৃত যোগ্য লোক নির্বাচন করা কষ্টসাধ্য।

প্রজাতন্ত্র—রাষ্ট্রের প্রধান যখন রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইয়া থাকেন, তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। এই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছাই পরোক্ষভাবে কার্যকরী।

গণতন্ত্র—এই শাসনব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। তাহারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বৃহৎ বলিয়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকর করা সম্ভব নয়। সেইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রবর্তন হইয়াছে। গণতন্ত্র সফল করিবার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য অপরিহার্য।

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। এই শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিত্ববিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। গণতন্ত্র কার্যকর করিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়।

অধুনা গণতন্ত্রকে বিশেষভাবে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনে গণপ্রস্তাব-অধিকার, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

একনায়কতন্ত্র—প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের কতকগুলি দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্য দলগুলিকে বলপ্রয়োগে নির্মূল করিয়া একটি মাত্র দল শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই দলের নেতাই হইলেন সর্বশক্তিমান্ পুরুষ, যাঁহার নির্দেশে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। নেতার পশ্চাতে দলের সমর্থন থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালি, জার্মানী ও রুশিয়ায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

একনায়কতন্ত্র সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু আংশিকভাবে কার্যকরী হইলেও বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না।

আমলাতন্ত্র—প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন স্থায়ী কর্মচারী লইয়া আমলাতন্ত্র গঠিত হয়। জনসাধারণের সহিত বিশেষ কোন সংযোগ না থাকার দরুণ এই কর্মচারিবৃন্দ আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ইহারা অত্যধিক পরিমাণে ধরাবাঁধা নিয়মের দাস হইয়া পড়েন, সেজন্য সরকারী কার্য সম্পাদনে বিলম্ব অনিবার্য। আমলাতান্ত্রিক সরকার সাধারণতঃ সুদক্ষ হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. How would you classify forms of government?

তুমি কিভাবে সরকারের শ্রেণী বিভাগ করিবে?

2. Discuss the merits and defects of dictatorship.

একনায়কতন্ত্রের গুণ ও দোষ আলোচনা কর।

3. Distinguish between democracy and dictatorship. Which do you prefer, and why?

'গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র'—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। তোমার মতে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য এবং কেন?

4. What are the conditions essential for the success of democracy as a form of government? Do you think that democracy will survive?

সরকারের অন্যতম রূপ হিসাবে গণতন্ত্রের সাফল্যের মূলে কি কি উপাদান আছে? গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা পোষণ কর?

একাদশ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Unitary and Federal Governments)

শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদি একটিমাত্র উচ্চতম কর্তৃপক্ষের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। অপরপক্ষে সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদি বিভক্ত হইযা একাধিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায় :—

১। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল সরকারের ক্ষমতাসমূহের কোনরূপ ভাগ করা হয় না। সমুদয় ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। শাসনকার্যে সুবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রাদেশিক সরকারে ভাগ করা হয়। কিন্তু এই প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলির কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র অধিকার বা দায়িত্ব কিছু থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে ইহারা কার্য পরিচালনা করে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে স্থানীয় সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ১৯৩৫ সালের পূর্বে ভারত শাসনব্যবস্থা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রদেশ বা রাজ্যে বিভক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে কতকগুলি নির্ধারিত বিষযের উপর স্বাধীন ক্ষমতা অর্পিত হয়। দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। অপর পক্ষে, স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনা করিবার ভার থাকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলির হস্তে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সরকারগুলি স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে। স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনব্যাপারে কেন্দ্রীয়

সরকার সাধারণতঃ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুইটি ক্ষমতাবিশিষ্ট সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলি এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার স্থানীয় সরকারগুলির মত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন প্রতিনিধি মাত্র নয়। ইহাদের নিজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ ক্ষমতা থাকে।

২। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সর্বেসর্বা—সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি—উভয়েই শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট হয় এবং শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত বা অলিখিত, নমনীয় বা অনমনীয় হইতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সর্বদা লিখিত ও অনমনীয় হয়।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রই হইল উভয়বিধ সরকারের ক্ষমতার উৎস। সেইজন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত সর্ববিধ মতভেদের নিষ্পত্তি হয়। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন উচ্চ বিচারালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব (Marks or Characteristics of a Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা ইহাকে এককেন্দ্রীয় সরকার হইতে সহজে পৃথক্ করা যায়। ডাঃ ফাইনার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিয়াছেন :—

১। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহ-অবস্থান (Co-existance of two Governments)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার থাকে আর স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জন্য কতকগুলি স্থানীয় সরকার থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে তাহাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ও শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলির উপর পরস্পরের প্রভাব-মুক্ত হইয়া উহারা শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলি সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকে।

২। সরকারের ক্ষমতাসমূহের বিভাগ ও বণ্টন (Division and Distribution of Powers)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা ভাগ করিয়া একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। সাধারণত: জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয়, আর স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ভার দেওয়া হয় আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর। উভয় সরকারই তাহাদের নির্ধারিত এলাকায় পরস্পরের প্রভাব-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution which is Written and Rigid)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। এই বণ্টনকার্য শাসনতন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ভবিষ্যতে ক্ষমতার ভাগ লইয়া যাহাতে উভয় সরকারের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ বা কলহ সৃষ্টি না হয়, সেজন্য ক্ষমতার বিভাগ সুস্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকে। অলিখিত শাসনতন্ত্র অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল বলিয়া অনেক সময় শাসনব্যাপারে

নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিতে পারে, একের ক্ষমতা যাহাতে অন্যের দ্বারা নষ্ট না হয়, সেজন্য শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে উভয় সরকারের ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত হইলেই হয় না, এই শাসনতন্ত্র অনমনীয় হওয়াও একান্ত আবশ্যক। সহজ-পরিবর্তনীয় হইলে উভয় সরকার বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাহার শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতার বলে নিজ ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে যে-কোন সময়ে নির্ধারিত ক্ষমতাবণ্টনের পরিবর্তন করিতে পারে। যদি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ভিন্ন একটি সরকারের ইচ্ছা অনুসারে ইহার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়।

৪। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন উচ্চ বিচারালয়ের অবস্থিতি (Existence of an independent and impartial Supreme Court)

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য হইল যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রধান বিশেষত্ব। শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির শাসনতন্ত্র নির্ধারিত পারস্পরিক সম্পর্ক যাহাতে কোনক্রমে ব্যাহত না হয়, সেজন্য উচ্চ আদালত শাসনতান্ত্রিক আইনসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করে। অপরপক্ষে, শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ শাসনতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপ দ্বারা যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে, সেজন্য উচ্চ আদালত শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের নির্দেশগুলিকে অনেক সময় বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। এক কথায় উচ্চ আদালতকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

৫। দ্বিনাগরিকত্ব (Double citizenship)

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারেরই আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকগণের দ্বিবিধ আইন মান্য করিতে

হয়। যে যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে, সেই সেই বিষয়গুলির জন্য প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় ও স্থানীয় ব্যাপারগুলির জন্য নাগরিকগণ যে প্রদেশের অধিবাসী, সেই প্রাদেশিক সরকারের আইন মানিতে বাধ্য থাকে। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ভারতের অধিবাসীদের শুধু একনাগরিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের নাগরিকত্ব ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই।

৬। রাজস্বের বণ্টন-ব্যবস্থা (Separate allocation of revenues)

যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলি সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে অর্থাৎ স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাহারা স্বায়ত্তশাসনশীল সরকার বলিয়া পরিগণিত হয়। সেইজন্য ক্ষমতাবণ্টনের সঙ্গে রাজস্বও বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি তাহাদের নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে।

৭। আনুগত্য ও ব্যবচ্ছেদ (Allegiance and Secession)

আঞ্চলিক সরকারসমূহের সম্মিলিত ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্র একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকার থাকিলেও তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয় না। সুতরাং প্রত্যেক আঞ্চলিক সরকারকেই মূল রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শুধু আনুগত্য স্বীকার করে তাহা নয়, কোন আঞ্চলিক সরকারই যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। কোন আঞ্চলিক সরকারের এই দাবী স্বীকৃত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার বলপ্রয়োগে আঞ্চলিক সরকারের এই প্রচেষ্টা দমন করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইজারল্যাণ্ডে আঞ্চলিক সরকারের এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইবার প্রচেষ্টা বলপ্রয়োগে দমন করা হয়। একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে

আঞ্চলিক সরকারগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

১। অবিমিশ্র ঐক্য হইল এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করে সেই নবগঠিত রাষ্ট্রে অবিমিশ্র ঐক্য বা সমরূপতা থাকে না। এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সর্বত্র একই আইন ও একই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কতিপয় বিষয়ে সমরূপতা থাকিলেও অনেক বিষয়ে আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

২। যে সমস্ত রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেই সেই সমুদয় আঙ্গিক রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা লোপ পাইয়া তাহারা নবগঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই জাতীয় শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। একদিকে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার, অপরদিকে রাজ্য সরকারগুলি নির্ধারিত ক্ষেত্রে স্ব স্ব শাসনকার্য পরিচালনা করে।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ ব্যাপারগুলির শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির শাসন রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রাকৃতিক বিবর্তনে আপনা হইতে গড়িয়া উঠে না, প্রয়োজনমত মানুষ ইহা সৃষ্টি করে। সুতরাং ইহার গঠনতন্ত্র লিখিত থাকে।

৬। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক উভয় সরকারের ক্ষমতাই ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। কোন সরকারই নির্ধারিত পদ্ধতির সাহায্যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ব্যতীত নিজ ইচ্ছানুযায়ী অন্যের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

৭। শাসনতন্ত্রের সংশোধনপদ্ধতি শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করা থাকে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলিয়া পরিগণিত হয়।

৮। যুক্তরাষ্ট্র হইল আঞ্চিক রাজ্যগুলির একটি স্থায়ী সমবায়। সন্ধি-সমবায় বা সন্ধিবন্ধন রাষ্ট্রগুলির মত অস্থায়ী নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী (Formation of Federation)

দুইটি ভিন্ন পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অনেক সময়ে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অথবা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্বসম্মতিক্রমে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে তাহারা সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (Residuary Powers) আঞ্চলিক সরকার-গুলির কর্তৃত্বাধীনে রাখে। এইরূপে বহু রাষ্ট্রের স্থলে একটি মাত্র জাতি-সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিকে কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Process of Centralisation) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। আদি তেরটি উপনিবেশ কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও নবগঠিত আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার-গুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা সাধারণতঃ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়; অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে থাকে। এই পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Process of Decentralisation) বলা হয়। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত হয়। ক্যানাডায় একটি এক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। এই এককেন্দ্রীয় সরকারকে নয়টি পৃথক্ প্রাদেশিক সরকারে ভাগ করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের শাসন-পরিচালনা করিবার ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে প্রধানতঃ

দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে সেখানে বিকেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইজন্য সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলির নির্দিষ্ট গণ্ডি স্থির করিয়া আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়। আবার ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বজায় রাখা হয়। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাফল্যের উপায় (Conditions essential to the success of a Federal Union)

যে পদ্ধতিতেই গঠিত হউক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একটি হইল কেন্দ্রীভাব (Centripetal tendency), অপরটি হইল বিকেন্দ্রীভাব (Centrifugal tendency)। একটিতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে, অপরটিতে তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে। পরস্পর-বিরোধী এই দুইটি শক্তির প্রকৃত সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সাফল্যের জন্য কতকগুলি বাহ্যিক পরিবেশ ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical contiguity) থাকা একান্ত আবশ্যক। ভৌগোলিক নৈকট্যের অবর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি দূরত্বের দ্বারা যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে না। ফলে জাতীয়তাবোধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অংশগুলি বিচ্ছিন্ন থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী-নির্বাচন-ব্যাপারেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এক অঞ্চলের লোক দূরত্বের জন্য অপর অঞ্চলে গিয়া, জাতীয় ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। পূর্বতন পাকিস্তান

রাষ্ট্রে এই অসুবিধা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই রাষ্ট্রের পূর্ব অঞ্চল রাজধানী-সমন্বিত পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সহস্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এইজন্য ভৌগোলিক নৈকট্যের অভাবে শাসনব্যবস্থার নানাবিধ জটিল সমস্যা দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উপর। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণ ভাষা, ধর্ম বা সংস্কৃতির ঐক্য সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধ দ্বারা যদি অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, এই জাতীয়তাবোধ নির্ভর করে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা ভাবগত ঐক্যের উপর। সুতরাং উপরি-উক্ত ঐক্যগুলি বিশেষ করিয়া ভাবগত ঐক্য যুক্তরাষ্ট্রগঠনে একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক অধিকারের সমতা থাকা একান্ত অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আয়তন ও সম্পদের সমতা সব সময়ে কার্যকরী করা সম্ভব হয় না, কিন্তু প্রদেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা (Political equality) বা অন্ততঃপক্ষে আনুপাতিক সমতা রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রদেশগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায়, ক্ষুদ্র হউক, আর বৃহৎ হউক, জাতীয় ব্যাপারে তাহাদের সমান অধিকার থাকা চাই। এই সমতার অভাব হইলে একাধিক বৃহৎ প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে এই রাজনৈতিক সমতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ প্রুসিয়া ভোটাধিক্যের বলে সমগ্র জার্মান দেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। সমতার অভাবেই জার্মান যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ক্যানাডায় প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সরকারকে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়তন, সম্পদ বা জনসংখ্যা নির্বিচারে প্রত্যেকটি প্রদেশ জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের উচ্চপরিষদ্‌ সিনেট সভায় দুইজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। ক্যানাডার সিনেট সভা প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কোন প্রাদেশিক সরকারকেই

সংখ্যাধিক্যের বলে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী করা যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের প্রধান অন্তরায়।

পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই আদর্শ হইল ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠন। জাতীয়তাবোধ ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের মধ্যে যাহাতে সংঘর্ষ না হয়, সেজন্য জনগণের মধ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা ও সহনশীলতা থাকা চাই। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা জটিল ও নানা সমস্যাপূর্ণ। নাগরিকগণেরও যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য যে অনেক পরিমাণে নাগরিকদের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও রাজনৈতিক চেতনার উপর নির্ভর করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদানগুলি কি ভারতে বর্তমান (Are those conditions present in India ?)

এই সম্পর্কে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদানগুলি কি বর্তমান আছে ? ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম-পর্যায়ভুক্ত ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে সিকিমসহ রাজ্যসংখ্যা হইল ২২টি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইল ৯টি। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হইল যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ভৌগোলিক ঐক্য। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আমিনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য প্রধান অংশগুলির মধ্যে এই ভৌগোলিক ঐক্য বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেকটি অংশের সহিত অপরাপর অংশের ঘনিষ্ঠ যোগ-সূত্রের ফলে ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ ও আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছে। অধিকন্তু এই ভৌগোলিক ঐক্যের জন্য ভারত তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের দ্বিতীয় উপাদান হইল অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি-গত, ভাষাগত, ধর্মগত, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত ঐক্যের অবস্থিতি। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে এরূপ

কোন ঐক্য নাই। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বহু জাতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাস করে। এই ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ অনেক সময় যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অপরপক্ষে এই বিভিন্ন জাতিগুলি এরূপ মিশ্রভাবে পরস্পরের সহিত একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে যে, এই বিভিন্ন জাতিগুলিকে একত্র সমাবেশ করিয়া ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করাও সম্ভব নহে।

কিন্তু এই বিভেদ থাকা সত্ত্বেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিভিন্ন জাতিগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একই ভৌগোলিক পরিবেশে পরস্পরের সন্নিকটে বাস করিবার ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, চিন্তাধারা এবং অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে এক নাগরিকত্ব প্রবর্তন করিয়া এবং ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া এই অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যদি এক জাতীয়তা-বোধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের ক্ষেত্রে এক জাতীযতাবোধ বৃদ্ধি না পাইবার কোন সংগত কারণ নাই।

ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয়তাবোধ যে নাই, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বৃটিশ শাসকগণ কর্তৃক অনুসৃত দুষ্ট বিভেদমূলক শাসন-নীতির (Divide and rule) ফলে এই জাতীয়তাবোধ এখনও পর্যন্ত দুর্বল, কিন্তু এই জাতীয়তাবোধ ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারতের বিভিন্ন অংশগুলি বুঝিতে পারিয়াছে যে, একতাই তাহাদের প্রধান বল এবং বিভেদই হইল তাহাদের ধ্বংসের কারণ। একতাবৃদ্ধির জন্য বর্তমান ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক মতভেদ ও বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন ও প্রায়শই রাজ্যগুলির শাসনকর্তাদের সম্মিলিত বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর হইয়া সহযোগিতামূলক মনোভাব

সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমন কি সুদূর আন্দামান দ্বীপে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচায়ক। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আজ সর্বভারতীয় সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তরাষ্ট্রসুলভ জাতীয় ঐক্য নাই একথা বলা আদৌ সমীচীন নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমতা বা অন্ততঃপক্ষে আনুপাতিক সমতা থাকা একান্ত আবশ্যক। ভারতের ক্ষেত্রে এই সমতার একান্ত অভাব দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলি আয়তনে লোকসংখ্যায় ও সম্পদে অন্যান্য রাজ্যগুলি হইতে শুধু বৃহত্তর নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ভারতের পার্লামেণ্ট সভায় এই রাজ্যগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং এই রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অভিমতকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হইল আঙ্গিক রাজ্যগুলির সমানাধিকার এবং এই সমানাধিকার নীতি স্বীকৃত না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য অসম্ভব। ভারতের ২২টি আঙ্গিক রাজ্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও মার্কিন বা ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ন্যায় ইহাদের সমান প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত হয় নাই প্রতিনিধিত্বের দিক দিয়া শুধুমাত্র আনুপাতিক সমতা রক্ষিত হইয়াছে।

পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য নাগরিকগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা, দায়িত্ববোধ ও কর্মপটুতা একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া, যেহেতু আঙ্গিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সম-অংশীদার সেই হেতু প্রত্যেকেরই সমান কর্মদক্ষতার অধিকারী হওয়া চাই। যুক্তরাষ্ট্র একটা জটিল শাসনব্যবস্থা নাগরিকগণ যদি জটিল শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকার্যে অনভিজ্ঞ হন তাহা হইলে এই শাসনব্যবস্থা সাফল্যলাভ করিতে পারে না। ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর কিছু দিন পর্যন্ত অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ শাসকের অভাবে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে

দেশরক্ষা বিভাগে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী আজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। শাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, প্রভৃতি বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণই পরিচালনা করিতেছেন। শুধু মূলধনের মালিক ও যন্ত্র-বিশেষজ্ঞরূপেই বর্তমানে বিদেশীয়গণের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও কর্মপটুতা ইতিমধ্যেই শিশুরাষ্ট্র ভারত তাহার আয়ত্তাধীন করিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য সুনিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ক্ষমতাবণ্টনের নীতি ও পদ্ধতি (Principle and Method of Distribution of Powers in a Federal Union)

নীতি

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষমতাবণ্টনের মূলনীতি হইল যে, জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি এবং যে-সকল বিষয় সম্পর্কে একই রকমের আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ের ভার সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। অপরপক্ষে, শুধু স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন আইন-কানুন ও পরিচালনা-ব্যবস্থা দরকার সেই সব বিষয়ের ভার আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর দেওয়া হয়। এই নীতি অনুসারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, ডাক ও তার বিভাগ, যুদ্ধ ও শান্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দেওয়া হয় এবং শিক্ষা, সমবায়, কৃষি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

এই রীতি অনুযায়ী সকল যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন করা হইলেও কোন্ বিষয়টি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট আর কোন্ বিষয়টি স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেউলিয়া ও শ্রমিকসংঘ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত আছে, কিন্তু ক্যানাডায় এই বিষয়গুলির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের

উপর দেওয়া হইয়াছে। ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি হইয়া আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাদেশিক সরকারগুলি তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা পৃথকভাবে প্রাদেশিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের সহিত বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানেও ইহাদের পৃথক্ প্রতিনিধি আছে।

পদ্ধতি

উপরি-উক্ত ক্ষমতাবণ্টনের নীতি বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকরী করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনে সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসৃত হয়।

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কোন্ কোন্ বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে তাহার উল্লেখ থাকে। প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে অবশিষ্ট অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলির অধিকারী করা হয়। এই প্রণালীতে ক্ষমতার বণ্টন কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা সূচিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনের এই প্রণালী কার্যকরী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্যানাডায় অন্য প্রণালীতে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে। এই প্রণালী অনুযায়ী স্থানীয় সরকারগুলিকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী করিয়া অবশিষ্ট অনুল্লিখিত বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ফলে, এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর শক্তিশালী হয়।

অধুনা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবণ্টনে এক তৃতীয় প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে

সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত থাকে। ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে কতকগুলি যুগ্ম বিষয়ের (Concurrent List) উল্লেখ থাকে, যে বিষয়গুলির উপর উভয় সরকার একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কিন্তু উভয় সরকারের প্রণীত আইন পরস্পর-বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা বলবৎ হইয়া প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থা বাতিল হয়। ক্যানাডার কৃষি ও দেশান্তরে বাসের নিয়ম (Immigration) যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি, শ্রমিকসংঘ, বিদ্যুৎ, ছাপাখানা, সংবাদপত্র প্রভৃতি সাতচল্লিশটি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব (Federal Control over Local Governments)

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। সকল যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর আধিপত্য সমান হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলিতে প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা বলবৎ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। অন্তর্বিপ্লব বা প্রাদেশিক বিদ্রোহ নিরোধ করিবার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ক্যানাডা ও ভারতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসকপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উভয় দেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইনগুলি কেন্দ্রীয় শাসকপ্রধানের সম্মতিসাপেক্ষ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক রচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিধিগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিসাপেক্ষ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে আইন বলবৎ ও রাজস্ব আদায় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, আবার জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে উপরি-উক্ত বিষয়গুলির জন্য অনেক সময় প্রাদেশিক সরকারগুলির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক প্রবণতা (Modern Tendencies in Federations)

যুক্তরাষ্ট্র বলিতে দেশের সাধারণ সম্পর্কিত কাজের জন্য কেন্দ্রে অবস্থিত একটি জাতীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন-সম্পর্কিত কাজের জন্য কিছু সংখ্যক স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের এক সঙ্গে অবস্থিতি বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র কর্তৃক উভয় সরকারের কার্যক্ষেত্র সুনির্ধারিত থাকিলেও বর্তমানে মার্কিনী, ক্যানাডীয় বা মিশ্র—সকল যুক্তরাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থায়ই একদিকে যেরূপ কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারের ক্ষমতার প্রাবল্য দেখা যায় অপর দিকে তদ্রূপ স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির গুরুত্ব হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ ইহা নহে যে, তাহারা প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা হরণ করিয়া অধিকতর শক্তিশালী অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীতও নূতন ক্ষমতা পাইয়া শক্তিশালী হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, কালক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পর্যবসিত হইবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিণতি ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয় না। প্রায় কোন যুক্তরাষ্ট্রই এ পর্যন্ত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয় নাই। জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল যে, এই সরকারগুলি ইহাদের শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি বিশেষভাবে সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র কিছু নূতন ক্ষমতা পাইয়াও অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অধ্যাপক হুওয়ার (Prof. Wheare) চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ (War), অর্থনৈতিক সংকট (Economic depression), রাষ্ট্রের সমাজসেবামূলক কার্যের প্রসার (Growth of social services) এবং শিল্প ও পরিবহন জগতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন (Mechanical revolution in transport and industry)।

বর্তমান যুদ্ধ হইল সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই জাতীয় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ এক-নিয়ন্ত্রণাধীন করা একান্ত আবশ্যক এবং জাতীয় সরকারই হইল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা সাফল্যের সহিত এই কার্য করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক যুদ্ধগুলি এত ব্যয়সাধ্য যে, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে সক্ষম। উপরি-উক্ত কারণে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আধুনিক যুগে প্রায় কোন দেশই অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব-মুক্ত নহে। অর্থনৈতিক সংকটকালে একমাত্র কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারই জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সংকটমুক্ত হইতে পারেন। এ কারণে জাতীয় সরকারের প্রাধান্য ও ক্ষমতাবৃদ্ধি স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

সমাজসেবামূলক কার্য বলিতে সাধারণতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কার্যগুলিকে বুঝায়। প্রায় প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে এই কার্যগুলি স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এই সমাজসেবামূলক কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারগুলির জাতীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ও উপদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। মার্কিন, সোভিয়েত, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে সমাজসেবামূলক কার্যের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলি জাতীয় সরকারগুলির নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পায়। এই ব্যবস্থার দ্বারাও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আন্তঃরাজ্য ভৌগোলিক বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়াছে। আন্তঃরাজ্য নানা জাতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত সংস্থা গঠিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি স্থানীয় সমস্যা হইতে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে এবং এই কারণে এই সমস্যাগুলির স্থানীয় স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে সমাধান করিবার প্রয়োজন হয়। তাই স্থানীয় ব্যাপারেও জাতীয় সরকারের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান রাষ্ট্রগুলি হইল সমাজসেবামূলক সংগঠন এবং এই কার্য একান্তরূপেই পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত

হয়। পরিকল্পনার (Planning) সাফল্য কেন্দ্রীকরণ, সংযোগ ও বিভিন্ন অংশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। এ কারণেও কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু জাতীয় সরকারের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয় যে, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রাদেশিক সরকারের পর্যায়ে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় সরকারগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা ক্রমশঃই অপহরণ করিতেছে। আসল কথা হইল যে, প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপরাপর সমবায় রাষ্ট্রের পার্থক্য
(Distinction between a Federation and other forms of Composite State)

সন্ধি-বন্ধন (Alliance)

যখন একাধিক রাষ্ট্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাষ্ট্রসমবায়কে সন্ধি-বন্ধন বলা হয়। সন্ধি-বন্ধন হইল কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাব। একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হয় ও একযোগে নির্দিষ্ট বিষয়ে কার্য সম্পাদন করে। সম্পাদিত চুক্তি তাহাদের মধ্যে ঐকমত্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু চুক্তির ফলে কোন নূতন জাতি বা নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হয় না। সন্ধিবদ্ধ প্রত্যেকটি রাষ্ট্র অন্যান্য সকল বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখে। সন্ধি-বন্ধনে উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ গঠিত হয় না। সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ সদস্য রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছামত সন্ধি বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রেও সন্ধি-বন্ধন এক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয় না। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে বা অন্য কোন কারণে সন্ধি-বন্ধনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং সন্ধি-বন্ধনকে একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সাময়িক

সহযোগিতার মনোভাব বলা যাইতে পারে। এই সহযোগিতার মনোভাবের স্থায়িত্ব খুব কম বলিয়া সন্ধি-বন্ধনকে সমবায় রাষ্ট্রের দুর্বলতম প্রকাশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র সংঘবদ্ধ হইয়া একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকে এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র একটিমাত্র রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি সন্ধি-বন্ধনের সদস্যগুলির ন্যায় ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারে না। সন্ধি-বন্ধন অস্থায়ী; যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থায়ী।

ব্যক্তিগত বন্ধন (Personal Union)

একাধিক রাষ্ট্র যখন একজন রাজার অধীনে সম্মিলিত হইয়া ইহাদের শাসনকার্য রাজার নামে পরিচালিত করে, তখন এই রাষ্ট্রসমবায়কে ব্যক্তিগত বন্ধন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র ইহার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র ঐক্যসূত্র হইল সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এক রাজা। একটি রাষ্ট্রের রাজা যদি নাবালক হন, তাহা হইলে তাঁহার সাবালক না হওয়া পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের রাজাকে সাময়িকভাবে শাসন-বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। অনেক সময় চুক্তিসম্পাদন দ্বারা বা উত্তরাধিকারের বলে একাধিক রাষ্ট্র একজন রাজার অধীনে সাময়িকভাবে মিলিত হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি একজাতি বা একরাষ্ট্রে পরিণত হয় না। ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে সে যুদ্ধকে অন্তর্বিপ্লব না বলিয়া আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বলা হয়। ১৭১৪ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও হ্যানোভার ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

প্রকৃত বন্ধন (Real Union)

প্রকৃত বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে মিলিত হয়, কিন্তু প্রকৃত-বন্ধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন হইলেও বৈদেশিক ব্যাপারে ইহাদের কোন পৃথক্ সত্তা থাকে না,

সুতরাং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রসমবায় একটি মাত্র রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রকৃত বন্ধনের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে সে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয় না, সে যুদ্ধকে অন্তর্বিপ্লব বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকালে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি দেশ দুইটি প্রকৃত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

সন্ধি-সমবায় (Confederation)

যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য সমবায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সন্ধি সমবায় হইল সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সংগঠন। একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সন্ধি-সমবায়ের উৎপত্তি হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তির উপর সন্ধি-সমবায় প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত বা অন্য কোন ব্যাপকতর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সন্ধি সমবায়ের সৃষ্টি হয় এবং এই সমবায়কে শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি লইযা একটি কেন্দ্রীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়। সন্ধি-সমবায় অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। সুতরাং সন্ধি-সমবায়কে যুক্তরাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক স্তর বলা যায়। সন্ধি সমবায়, সন্ধি-বন্ধন বা ব্যক্তিগত বন্ধন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী সমবায় রাষ্ট্র বলিযা পরিগণিত হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, যে রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তাহারা তাহাদের স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়া একটিমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয। সন্ধি-সমবায়ে প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র ইহার স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব বজায় রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অনেকগুলি জাতি ও রাষ্ট্রের সম্মিলনে এক নূতন জাতি ও নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সন্ধি-সমবায়ে কোন নূতন একাত্মবোধ-সম্পন্ন জাতির বা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসমষ্টি থাকে। এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাধে প্রযুক্ত হয়। সন্ধি সমবায়ের এরূপ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ বা জনসমষ্টি থাকে না। প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রের পৃথক্ ভৌগোলিক সীমা থাকে ও এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার বাহিরে ইহার ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্র একটা লিখিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসনতন্ত্র সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিশেষত্ব হইল ক্ষমতা বিভাগ। অপরপক্ষে সন্ধি-সমবায় হইল একটা আন্তর্জাতিক চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি একটি পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের সমস্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির সমাধান করে। সুতরাং সন্ধি-সমবায়ে সরকারের ক্ষমতাবিভাগের কোন প্রশ্ন উঠে না।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতার বিভাগ করা হয় বলিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু সন্ধি-সমবায়ে শাসন-ক্ষমতার কোনপ্রকার ভাগ হয় না বলিয়া উচ্চ বিচারালয়ের আদৌ কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের অধিবাসী সমস্ত নাগরিকের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার-প্রবর্তিত আইন সকল অঞ্চলে সকল অধিবাসীর উপর প্রত্যক্ষভাবে বলবৎ করা হয়। কিন্তু সন্ধি-সমবায়ের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য কোন আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই। সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাগরিক ব্যতীত সন্ধি-সমবায়ের নিজস্ব কোন খাস নাগরিক থাকে না। সুতরাং সন্ধি সমবায়ের কেন্দ্রীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানের কোন নির্দেশ কার্যকরী করিতে হইলে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মারফতে করিতে হয়।

সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র একটি স্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠন, সুতরাং আঞ্চলিক সরকারগুলি কোনক্রমেই যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। তাহাদের বিচ্ছিন্ন হইবার প্রচেষ্টা বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হয় ও বলপ্রয়োগে এই বিদ্রোহ দমন করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে, সন্ধি-সমবায় অস্থায়ী। সদস্য রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজেদের কতকগুলি সাধারণ স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। উদ্দেশ্য সাধন হইলে অথবা অন্য কোন কারণে ইহারা ইচ্ছামত সন্ধি-সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন

হইতে পারে। আবার, অনেক সময় মার্কিন দেশ ও সুইজারল্যাণ্ডের মত সন্ধি-সমবায় যুক্তরাষ্ট্রেও পরিণত হইতে পারে।

জার্মান ভাষায় যুক্তরাষ্ট্র একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র (Bundestaat) বলিয়া পরিচিত, আর সন্ধি-সমবায়কে বলা হয় রাষ্ট্রের সম্মেলন বা সমবায় (Staatenbund)। যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন একটিমাত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সূচিত করে, আর সন্ধি-সমবায়ে পৃথক্ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন বহুসংখ্যক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র ও সন্ধি-সমবায়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণ (Merits of Unitary Government)

এককেন্দ্রীয় ব্যবস্থায়, কি শাসনব্যাপারে বা কি আইন-প্রণয়নে, কেন্দ্রীয় সরকারের অবাধ আধিপত্য থাকে। সেইজন্য দেশের সর্বত্র একই প্রকারের আইন প্রচলিত হয়; শাসনপদ্ধতিতেও সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হয়। সুতরাং অখণ্ডতার জন্যই এককেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য-পরিচালনায় বা বৈদেশিক ব্যাপারে এককেন্দ্রীয় সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয় না। জরুরী ব্যাপারে তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত করা এককেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। তৃতীয়তঃ, দেশে একটিমাত্র শাসনব্যবস্থা চালু থাকার জন্য কোন বিষয়ে মতভেদ বা অনৈক্যের সম্ভাবনাও কম থাকে। চতুর্থতঃ, দেশের শাসনকার্য একটিমাত্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বলিয়া ব্যয়সংকোচ করা সম্ভব হয়।

অপগুণ (Demerits)

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এককেন্দ্রীয় সরকারের উপযোগিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শকে কার্যকর করা সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের জন্য আঞ্চলিক সরকার-গুলির আদৌ কোন ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং স্থানীয় ব্যাপারগুলির শাসনপরিচালনায়ও স্থানীয় লোকের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকে না। ফলে,

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দোষ হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার দূরে অবস্থিত বলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলগুলির নানাবিধ স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। শাসনব্যাপারে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুণ জনগণও রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহ বোধ করে না। তৃতীয়তঃ, শাসন পরিচালনার সমস্ত ভার একটিমাত্র সরকারের হস্তে ন্যস্ত বলিয়া ইহার উপর অত্যধিক পরিমাণে কার্যের চাপ পড়ে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব (Merits of Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই শাসনব্যবস্থা দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেশকে একত্রিত করা সম্ভব হয়, অথচ এই একত্রীকরণের দরুণ বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ হানি হয় না। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করিয়াও বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিরাট নানা ভাষাভাষী ও নানা জাতি-অধ্যুষিত দেশকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করিয়া আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেদের প্রয়োজনমত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারে। এইজন্য তাহাদের দূরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর করিবার একমাত্র পন্থা হইল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার শাসনকার্যে জনগণকে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকতর সুযোগ দেয়। এই সুযোগের ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। তাহারা শাসনব্যাপারে উৎসাহী হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র

ব্যবস্থায় শাসনকার্যের নানাবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাগ হওয়ার দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর শাসনকার্যের সমস্ত ভার থাকে না। এইরূপে শাসনব্যাপারে গুরুভার-মুক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলিতে অধিকতর মনোযোগ দিয়া সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা (Demerits)

যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান দুর্বলতা হইল যে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শাসনব্যবস্থা চালু থাকার নিমিত্ত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল ও ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাবিভাগের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে, ফলে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ও বিশেষ করিয়া বৈদেশিক ব্যাপারে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সমস্ত আঞ্চলিক সরকারগুলির মত অনুসারে সর্বসম্মত নীতি নির্ধারণ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলেও কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চল একত্রিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিতে পারে। এই দল ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যে বাধা দিতে পারে। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পৃথক হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়াসও পাইতে পারে।

উপরি-উক্ত দুর্বলতাগুলি থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা দিন দিন জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। উল্লিখিত দুর্বলতাগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে কোথায়ও সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হইয়া উঠিতে দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার উদাহরণ আধুনিক কালে বিরল। পরন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হইল একমাত্র শাসনব্যবস্থা, যাহার দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা—এই দুইটি বিপরীত শক্তির সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হইয়াছে। মার্কিন দেশে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে সে দেশ আজ জগৎসভায় এত উচ্চ আসনের অধিকারী হইতে পারিত না। সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্যাণ্টনগুলি একত্রিত না হইলে ইয়ুরোপ মহাদেশের শান্তি আরও বহুবার বিঘ্নিত হইত।

ক্যানাডায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত না হইলে ইংরাজ ও ফরাসী জাতি আজ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়া সুখে ও সম্প্রীতিতে বাস করিতে পারিত না। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, যেদিন বিশ্বরাষ্ট্রসমূহকে এই যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হইবে সেদিন জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Form of Government)

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের শাসনবিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিসভাই এই সমুদয় ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থায় আইনতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন নামসর্বস্ব রাজা কিংবা নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি। রাজা বা রাষ্ট্রপতির নামে সমস্ত কার্য পরিচালিত হইলেও তাঁহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। মন্ত্রিসংসদই শাসন পরিচালনা করেন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারা মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিসভার কার্য যদি আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল, শাসনবিভাগীয় ও আইনবিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় না। মন্ত্রিগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হয়। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করিতে পারেন ও শাসনবিভাগীয় সমুদয় কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আইনসভা যদি মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর হয় পদত্যাগ করিতে হয় নতুবা আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই নূতন নির্বাচনের ফলের উপর মন্ত্রিসংসদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। নূতন নির্বাচনে যদি বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের পদত্যাগ বাধ্যতামূলক হয়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ মন্ত্রিসংসদ

প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকেন—এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) বলা হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের উৎপত্তি হয় ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশসমূহ ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে প্রয়োজন অনুসারে এই শাসনব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রবর্তন করিয়াছে। ফরাসী দেশ, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের পর আইনসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল মন্ত্রিসংসদ গঠন করে। দলের প্রধান নেতা প্রধান মন্ত্রিরূপে পরিচিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর সংহতি বজায় রাখেন। মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন ও আইনসভা কর্তৃক তাঁহাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া এই সরকারকে আইনসভা-প্রধান (Parliamentary Government) বলা হয়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার (Presidential or Non-Parliamentary Government)

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার একজন রাষ্ট্রনায়ক নির্দিষ্ট কালের জন্য পরিচালনা করেন। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র অনুসারে আইনসভার কর্তৃত্বাধীন নহে। অপরপক্ষে, আইনসভাও শাসন-কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়া কার্য পরিচালনা করে। এই শাসনব্যবস্থা ক্ষমতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে নামমাত্র যোগাযোগ থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহার এই চারি বৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারে না। তাঁহার সহকারী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে

তিনি নিয়োগ করেন এবং বরখাস্তও করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারী। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ব্যতীত তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমত বা দায়িত্ব কিছুমাত্র নাই। রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র নাই। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন ও আইন-প্রণয়নে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। এক কথায়, রাষ্ট্রপতিকে গ্রেট্ বৃটেনের মন্ত্রিসংসদের ন্যায় আইনসভার উপর নির্ভর করিতে হয় না। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার শাসনতন্ত্রানুমোদিত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। এইজন্য আইনসভার নিকটে তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। অপরপক্ষে, আইনসভার কার্যেও রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নাই।

মন্ত্রিসংসদ চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের পার্থক্য (Points of difference between Parliamentary and Presidential Forms of Government)

১। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় নামসর্বস্ব বংশানুক্রমিক একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। ইনি শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কার্যতঃ ইনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন। ইংলণ্ডের রাজা, ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, রাষ্ট্রপতি শুধু নামসর্বস্ব শাসক-প্রধান নহেন, পরন্তু তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

২। মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রিসংসদ। মন্ত্রিসংসদের নির্ধারিত কার্যকাল থাকিলেও তৎপূর্বে আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে ইহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি ও কার্যকালের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা

নির্ধারিত হয়। বিশেষ বিচারব্যবস্থা ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না।

৩। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল—যতদিন তাঁহারা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে আইনসভা-নিরপেক্ষ ও আইনসভার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া তাঁহার শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত কার্যকাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। আইনসভার আস্থা বা অনাস্থা প্রস্তাবে তাহার পদমর্যাদা বা কার্যকাল ক্ষুণ্ণ হয় না।

৪। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবর্গের দ্বারা গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী এই নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইলেও প্রধানমন্ত্রিসহ সমুদয় সদস্য সমপর্যায়ভুক্ত সহকর্মী। মন্ত্রিসংসদের সিদ্ধান্তগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় একমাত্র রাষ্ট্রপতিই হইলেন শাসনক্ষমতার অধিকারী—সুতরাং তাঁহার মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ অধস্তন কর্মচারী মাত্র। এক রাষ্ট্রপতি স্বয়ং ব্যতীত দলের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী অন্যান্য নেতৃবর্গ সাধারণতঃ আইনসভার সদস্য থাকেন—কদাচিৎ তাহাদের মন্ত্রণাসভায় দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন ও রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্তগুলি একমাত্র রাষ্ট্রপতির মতামতের উপর নির্ভর করে।

৫। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার কোন স্বাতন্ত্রীকরণ পরিদৃষ্ট হয় না। মন্ত্রিসংসদের সমুদয় সদস্যকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন-প্রণয়ন, নীতি-নির্ধারণ ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ইহারা আইনসভার নিকট ইহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন—আবার আইনসভার সহিত মতভেদ হইলে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি

আইনসভার সদস্য নহেন। তিনি যে সরকারী সদস্যের সাহায্য ব্যতীত আইন-প্রণয়ন কার্যে যোগদান করিতে পারেন না বা প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না বা আইনসভাও বিশেষ বিচারপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Cabinet Government)

মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল যে, শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শাসনকার্য বিনা বাধায় সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট তাঁহাদের কাযের জন্য দায়ী থাকেন বলিয়া শাসনব্যবস্থায় কোনরূপ শৈথিল্য বা স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রিসভা যে শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহা সংখ্যাধিক্যের বলে আইনসভার অনুমোদন লাভ করে। দলগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদের সর্বদাই দলের নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনরূপ কার্য করিলে ভবিষ্যতে ইহারা জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইতে পারেন—এইজন্য জনস্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা বা জনমত উপেক্ষা করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আলাপ-আলোচনার দ্বারা মতভেদ দূর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলিয়া এই শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় হয়। পঞ্চমতঃ, মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার সহজেই প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যায় বলিয়া জরুরী অবস্থায় ইহা বিশেষ কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধকালে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না।

উল্লিখিত সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি দেখা দেয়। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ যদি একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা পদে পদে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা

থাকে। বিশেষ করিয়া আপৎকালে এই ঐকমত্যের অভাবে শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে, সে সমস্ত দেশে মন্ত্রিমণ্ডলী পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের ফলে শাসনব্যবস্থায় কোনরূপ প্রকৃত প্রগতিশীল নীতি অনুসৃত হইতে পারে না। ফরাসী মন্ত্রিসভার এইটি ছিল প্রধান ত্রুটি। দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দলগঠনের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলেই মন্ত্রিসভার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থার বিশেষ কোন স্থায়িত্ব নাই। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা দুই দিক দিয়া প্রকটিত হয়। ইংলণ্ডে এই শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিসংসদের বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। মন্ত্রিসংসদের আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকায় আইনসভা বর্তমানে একটি তাঁবেদার আইন-সভায় পরিণত হইয়াছে। ফলে, মন্ত্রিসংসদ সর্ববিষয়ে অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়াছে। ফরাসী দেশে আবার আইনসভার হস্তে মন্ত্রিসংসদকে ইচ্ছামত অপসারিত করিবার ক্ষমতা থাকায় সেখানে কোন মন্ত্রিসংসদই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Presidential Government)

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ঐ সময় পর্যন্ত তিনি নিজের নীতি অনুসরণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় বা জটিল পরিস্থিতিতে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক সেখানে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার অধিকতর উপযোগী। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীকে আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না, সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডলী একাগ্রচিত্তে শাসন পরিচালনা কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারেন। ইহাতে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়। চতুর্থতঃ, আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারেও আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়া দেশের প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের জন্য ইহারা সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করিতে পারে না। কোন কারণে যদি শাসনকর্তৃপক্ষের সহিত আইনসভার মতবিরোধ বা সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। ফলে, জাতীয় স্বার্থের হানি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ দায়িত্বহীন হইয়া পড়িতে পারে। যে নির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যের জন্য কাহারও নিকট তাঁহার কার্যকালে দায়ী নহেন। জনগণ বা আইনসভা বা মন্ত্রিসংসদ তাঁহার কার্যের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহার খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র না থাকার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হইয়া দলীয় ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া শাসনকার্য অনেক পরিমাণে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে।

বিকেন্দ্রন বা বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation)

বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্ত হইতে কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা। বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই নীতি অনুসারে প্রশাসন ও আইন প্রণয়ন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত বিষয়ে ক্ষমতা স্থানীয় সরকারগুলিকে হস্তান্তরিত করে এবং হস্তান্তরিত ক্ষমতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোন হস্তক্ষেপ করে না। কেন্দ্রীকরণ (centralisation) ব্যবস্থায় ইহার বিপরীত ঘটে। সরকারের সমগ্র ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। স্থানীয় সরকারগুলি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। ইহাদের কোন স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীয়

সরকারগুলি যেরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল (autonomous) হয়, কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলি সেরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল নহে—ইহারা সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই দুইটি বিপরীতমুখী প্রবণতা পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। শাসনব্যবস্থাকে সুদক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। আবার শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামো অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে কোথায়ও বা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অবলম্বন করা হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় এই উভয় নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে, অপর পক্ষে দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েৎরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা (Need for Decentralisation)

আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ব্যাপকতা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কোন একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সর্ববিষয়ে পুংখানুপুংখরূপে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যাপার পরিচালনা করা সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। এজন্য তিনটি কারণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় তথাকথিত নেতাগণের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে অধিকাংশ লোকই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া শাসন ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়ে। এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সরকারের প্রতি যে আনুগত্য দেখা যায় তাহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইতে পারে না। যে আনুগত্য সহযোগিতামূলক নহে তাহা কখনই সৃজনশীল হইতে পারে না। বিকেন্দ্রীকরণ সাহায্যে অধিকসংখ্যক লোককে প্রশাসনিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে অধিকারপ্রাপ্ত জনগণের মধ্যে আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে তাহারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সুনাগরিকে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান পরিচালনা দ্বারা কার্যকর ফল পাওয়া সম্ভব হয়। কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার সমরূপতার (uniformity) পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনমত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সর্ববিধ আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করা একান্তরূপে অসম্ভব। এইজন্য বিকেন্দ্রীকরণ সাহায্যে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত ও সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকারগুলির হস্তে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা ক্ষমতা ন্যস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার সাহায্যে একদিকে যেরূপ কেন্দ্রীয় সরকারকে গুরু কার্যভার মুক্ত করা সম্ভব হয় অপরদিকে তদ্রূপ জনসাধারণকে প্রশাসনিক ব্যাপারের সহিত যুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় ও প্রসারিত করা সম্ভব হয়।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার অসুবিধা (Difficulties of Classification of Governments)

অ্যারিষ্টটলের সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শাসনব্যবস্থাগুলিকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা বর্তমান যুগে কতদূর প্রযোজ্য সে সম্পর্কে আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে। শুধু শাসনব্যবস্থার গঠনরূপ বা শাসনব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ভিত্তি করিয়া যে-কোন শ্রেণী বিভাগ করা হউক না কেন এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ত্রুটিহীন নহে। সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার বহু অসুবিধা আছে।

উপরি উক্ত অসুবিধা সম্পর্কে তিনটি শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটি হইল আধুনিক কালের বহু-পরিচিত এবং বহু-বিতর্কিত সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা। সাধারণতঃ প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ নীতি অনুযায়ী সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান (Federal Parliamentary) শাসনব্যবস্থা বলিয়া কথিত হয়। শুধু শাসনব্যবস্থার কাঠামোর দিক দিয়া দেখিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা বলিয়া মনে হইলেও সমগ্রভাবে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা বলা যায় না। এই শাসন-

ব্যবস্থার একদলীয় শাসন এবং শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে এই একটি দলের সীমাহীন প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থার মূলনীতি-বিরোধী। সুতরাং সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা এক অভিনব শাসনব্যবস্থা যাহাকে প্রচলিত কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

দ্বিতীয় উদাহরণ হইল প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্মভূমি বহু-প্রশংসিত সুইজার-ল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রটির সংবিধানগত নামকরণ হইল সুইস্ সন্ধি সমবায় (Swiss Confederation), সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র (Swiss Federation) নহে। ক্যাণ্টনগুলির স্বাধীনতা ও আংশিক সার্বভৌমিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে এই নামকরণ করা হইয়াছে। পার্লামেণ্ট-প্রধান বৃটিশ শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি-প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এই উভয়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সুইস্ শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত এই শাসনব্যবস্থার অভিনবত্ব হইল অন্যান্য দেশের একজন সর্বোচ্চ শাসনকর্তৃপক্ষের স্থলে সাতজন সদস্য-সমন্বিত এক সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষের অবস্থিতি। সুতরাং সুইস্ শাসনব্যবস্থাকেও প্রচলিত কোন নীতি অনুযায়ী কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

তৃতীয় উদাহরণ হইল বর্তমান ফরাসী শাসনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থা ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৮৭৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের শাসন কাঠামোকে এককেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান (Unitary Parliamentary) বলা যাইতে পারে। বহু রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি সত্ত্বেও তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা সাধারণভাবে বলিতে গেলে বৃটেনের পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপভাবেই পরিচালিত হইত। কিন্তু ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র (Fifth Republic) প্রবর্তিত হইবার পর এবং বিশেষ করিয়া জেনারেল দ্য গল রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার ফলে ফরাসী শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতীতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে পারিতেন—তিনি জাতীয় পরিষদ (National Assembly) ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপে ফরাসী শাসনব্যবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়। সুতরাং ফরাসী শাসনব্যবস্থাকেও পার্লামেণ্ট-প্রধান বা রাষ্ট্রপতি-প্রধান

শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ভারত ও নবগঠিত বাংলা দেশের শাসনব্যবস্থা দুইটিকে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা ও বিচার করিলে প্রচলিত কোন শ্রেণীভুক্ত করা সুকঠিন।

সুতরাং শাসনব্যবস্থার সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ আদৌ সহজসাধ্য নহে। এই কারণে শুধু শাসন-কাঠামোর ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ না করিয়া সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার (Political System) ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে।

সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,

১। **উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Liberal Democratic Systems)**

২। **একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Totalitarian Systems)**

৩। **স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Autocratic Systems)**

১। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল, এই ব্যবস্থাপনায় বাক্‌স্বাধীনতা, চলা-ফেরার স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত ও সুরক্ষিত হয় এবং সাধারণভাবে বলিতে গেলে বিচার বিভাগও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে কোন বাধা নাই। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সরকার অনুসৃত নীতির সমালোচনা করা যায়। সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের একচেটিয়া আয়ত্তে থাকে না। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, ভারত প্রভৃতি দেশগুলির শাসনব্যবস্থাগুলিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা গেলেও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হইল পূর্ব-উক্ত চারিটি দেশেই এই বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্য দেখা যায়।

২। একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হইল যে, জনজীবনের বিভিন্ন দিক কার্যতঃ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থাপনায় একটি বিস্তারিত আদর্শ থাকে এবং এই আদর্শই রাষ্ট্রের সমগ্র রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করে। একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার অধীনে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল হইল

আইনতঃ ক্ষমতার অধিকারী এবং এই ব্যবস্থাপনাকে একটি গণতান্ত্রিক রূপ দিবার অভিপ্রায়ে নানা উপায়ে জনসাধারণকে এই ব্যবস্থাপনার সমর্থক করিয়া তোলা হয়। ইহা ছাড়া, বিচারবিভাগ ও জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রও রাষ্ট্র কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

স্টালিন শাসনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, হিট্লারের নেতৃত্বে জার্মানী ও মুসোলিনি শাসিত ইতালী হইল একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থাপনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একনায়কতন্ত্রী হইলেও এই তিনটি দেশের বিশেষ করিয়া সোভিয়েত ও জার্মান-ইতালীও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল এবং এই পার্থক্যের জন্য এই তিনটিকে সঠিকভাবে এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের পর একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থাপনার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একজন নেতার অবিসংবাদী নেতৃত্বের পরিবর্তে দলীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থাপনার কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই ব্যবস্থাপনায় শাসকবর্গ ঐক্য ও আনুগত্য আদায় করিবার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বলপ্রয়োগ নীতি গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অর্থাৎ দল গঠন ও নির্বাচনের ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। এই ব্যবস্থাপনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থাপনার অনুরূপ ইহার কোন আদর্শ নাই। তবে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সময় সময় জাতীয়তাবাদ বা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির অবতারণা করা হয়। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমাজের একদল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করিয়া থাকেন এবং নাগরিক অধিকার ও জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমেই প্রত্যক্ষভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সময় আবার এই স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থাপনা সেনাদল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ইথিওপিয়া, নেপাল, আলজিরিয়া প্রভৃতিকে এই শ্রেণী-ভুক্ত করা গেলেও ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত অপরটির মূলগত পার্থক্য আছে

সুতরাং দেখা যায় যে, উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে অধিকন্তু এই শ্রেণীবিভাগেরও ত্রুটি আছে। তবে এই শ্রেণীবিভাগের সপক্ষে বলা যায় যে, এই শ্রেণীবিভাগ সমগ্র শাসনব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত (System analysis) এবং শুধুমাত্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত (Institutional analysis) উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

সংক্ষিপ্তসার

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—এককেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার কোনরূপ ভাগ হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার হইল সরকারের সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। স্থানীয় সরকারগুলি হইল কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্ট আজ্ঞাবহ সংগঠনমাত্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা হয়। একটি লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয়। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য নহে এবং কোন উচ্চ বিচারালয়ের প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন ও উভয় সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখিবার জন্য একটি উচ্চ আদালত অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলির অবস্থিতি (২) ক্ষমতার বিভাগ, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ের অবস্থিতি, (৫) রাজস্বের বণ্টন ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী—১। কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া তাহাদের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়া একরাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ২। দ্বিতীয়তঃ, একটি এককেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপায়—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল। এইজন্য ইহার সাফল্য কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। অবস্থাগুলি হইল—১। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক নৈকট্যের অবস্থিতি। ২। অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিদ্যমানতা। ৩। কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও ঐতিহ্যগত ঐক্যের বিদ্যমানতা।

৪। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা। ৫। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও পারস্পরিক সহনশীলতা।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনের নীতি ও পদ্ধতি—জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি, যথা, বৈদেশিক ব্যাপার, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি, যথা, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি আঞ্চলিক সরকারগুলির হস্তে ন্যস্ত থাকে। দেশভেদে এই বণ্টন-নীতির পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ড অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অবাধ ক্ষমতা থাকে ও এইজন্য আঞ্চলিক সরকারগুলিকে মূল রাষ্ট্রীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও সন্ধি-বন্ধন—সন্ধি-বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে আবদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মত তাহারা তাহাদের পৃথক্ সত্তা বিসর্জন দিয়া একটিমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় না।

ব্যক্তিগত-বন্ধন—ব্যক্তিগত-বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে সম্মিলিত হইলেও তাহাদের পৃথক্ সত্তা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখে।

প্রকৃত-বন্ধন—একাধিক রাষ্ট্র যখন একই রাজার অধীনে মিলিত হইয়া পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারে তাহাদের স্বাধীন পৃথক সত্তা লোপ করিয়া একরাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন তাহাকে প্রকৃত-বন্ধন বলা হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহাদের স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে।

সন্ধি-সমবায়—সন্ধি-সমবায়ে একাধিক রাষ্ট্র একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শাসনসংগঠন সৃষ্টি করিয়া সম্মিলিত হয়। কিন্তু এই সম্মেলনের ফলে তাহাদের স্বাধীন সত্তা লোপ পাইয়া কোন নূতন জাতি বা নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছামত এই সম্মেলন হইতে সম্পর্ক ছেদ করিতে পারে।

এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের গুণাপগুণ—এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হইল ইহার অখণ্ডতা, এবং এই অখণ্ডতার জন্য ইহা অধিকতর শক্তিশালী

হইয়া আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ও বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বেসর্বা বলিয়া এই শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও তদ্দ্বারা লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাপগুণ—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুসারে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একটি অখণ্ড জাতিসংগঠনে ইহা সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর স্থানীয় শাসনপরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গুরু শাসনভার হইতে মুক্ত হইয়া দেশের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহের উন্নতিসাধনে অধিকতর তৎপর হইতে পারে।

কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, শাসনক্ষমতা-বিভাগের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক ব্যাপারে দুর্বল হইয়া পড়ে। বৃহত্তর আঞ্চলিক সরকারগুলির সংঘবদ্ধ হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিতে পারে ও বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টাও দেখা দিতে পারে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার ও ইহার গুণাপগুণ—মন্ত্রিসংসদ্-চালিত সরকার-ব্যবস্থার শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইনসভার মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। আইনসভার ও শাসন-কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ না থাকার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। দলীয় শাসনের ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবারও সম্ভাবনা থাকে।

রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার ও ইহার গুণাপগুণ—রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় আইনসভা

ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র থাকে না, সুতরাং প্রত্যেক বিভাগই পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য কবিবার সুযোগ পায়। আইনসভার প্রভাবমুক্ত হইয়া স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে ও জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। কিন্তু দায়িত্বশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। আর ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের ফলে সহযোগিতার অভাবে গুরুতর মতদ্বৈধ ঘটিয়া শাসনকার্যে অচল অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

বিকেন্দ্রীকরণ—বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্ত হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা। এই ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষভাবে কার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুভার মুক্ত হয়। অধিক সংখ্যক লোক সক্রিয়ভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহাদের সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত কার্যে উৎসাহ জন্মে এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। গণতান্ত্রিক আদর্শ সফল করিতে হইলে শাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য।

প্রশ্নাবলী

1. Explain the nature of a Federal Union and distinguish a Federal Union (a) from a Confederation and (b) from a Unitary State.

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর এবং যুক্তরাষ্ট্র ও (ক) সন্ধি-সমবায় এবং (খ) এককেন্দ্রীয় ব্যবস্থার পার্থক্য কর।

2. Explain the chief features of Federation and point out its merits and defects.

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণ ও দোষ দর্শাও।

3. Distinguish between Unitary and Federal Governments and point out the advantages and disadvantages of the Federal form of government.

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

4. Distinguish between Parliamentary and Presidential Governments. What are the elements of strength and weakness of Parliamentary Government?

সংসদশাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। সংসদশাসিত সরকারের গুণাগুণ কি কি?

5. Discuss the chief features of a Federation. Under what conditions is Federation necessary and desirable?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। কোন্ কোন্ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়?

6. What are the characteristic features of a Parliamentary form of government? Discuss, in brief, the merits and defects of this type of government.

মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য কি কি? এই ধরণের সরকারের দোষ ও গুণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১)

(Organs of the Government)

আইনসভা (The Legislature)

সরকারের সমুদয় কার্য সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় ও এই তিনটি কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রত্যেক সরকারই তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত হয়। বিভাগ তিনটি হইল—আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। অনেক লেখক আবার নির্বাচকমণ্ডলীকে সরকারের চতুর্থ বিভাগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী আইনসম্মতভাবে সরকারের দৈনন্দিন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া সাধারণতঃ ইহাকে সরকারের একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত হয়। আইনসভার কার্যের বিশদ আলোচনা করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আইনসভার কার্য (Functions of the Legislature)

আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। আইনসভাকে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় আইনসভার মাধ্যমে। আইনসভা-প্রণীত আইন অনুসারে শাসনবিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং বিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে ও সেই অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং আইনসভার কার্য হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভা অনুপযোগী পুরাতন আইনগুলিকে বাতিল করিতে পারে, বা পুরাতন আইনগুলির সংশোধন করিতে পারে এবং দেশের প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নূতন আইন প্রবর্তন করিতে পারে।

আইনসভা বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন আইন অনুমোদন করে না। শাসনকর্তৃপক্ষের মত আইনসভা কোন বিষযে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। এইজন্য আইন-প্রণয়নকার্য একটি জটিল ও দীর্ঘ পদ্ধতির মধ্য দিয়া সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে। আইন কার্যকর হইলে জনস্বার্থের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক না করিয়া কোন আইনই বলবৎ করা যায় না। বিরোধিদলের মতামত, জনমত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণপূর্বক নানা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত আইন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারের একটা প্রধান অঙ্গ হইল বিশেষ বিচার বিবেচনা করা (Deliberation)। এইজন্য বিশেষরূপে বিচার বিবেচনা করা আইনসভার আর একটি কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সরকারী আয়-ব্যয়ের আলোচনা ও মঞ্জুরী করা আইনসভার আর একটি প্রধান কার্য। সরকারের আয় কি পরিমাণে হইবে, কি কি কর ধার্য করা হইবে এবং করপদ্ধতি কি হইবে ও কিভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্য আদায়ীকৃত রাজস্ব ব্যয় করা হইবে, এই সকল বিষয় আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। এক কথায়, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য নানাভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আহরণ করা হয়। অর্থের অপচয় ও ব্যয়বাহুল্য রদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় সকল দেশের আইনসভা সরকারী আয় ব্যয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সরকারী আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আইনসভা শাসনবিভাগীয় নীতি ও বিভিন্ন কার্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত করে।

ইংলণ্ডে সরকারী হিসাব সংস্থা (Public Accounts Committee), ব্যয়ের হিসাব সংস্থা (Estimates Committee) এবং হিসাব পরীক্ষক প্রধান সংস্থা (Office of the Comptroller and Auditor General) সাহায্যে পার্লামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ কার্য বলবৎ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কংগ্রেস সভা প্রয়োজনীয় কর আহরণ ব্যবস্থা ও ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি যে পরিমাণ অর্থ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য দাবী করেন

কংগ্রেস সাধারণতঃ তদপেক্ষা কম পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর করে। উদ্দেশ্য হইল যে, সরকারকে পুনরায় অর্থের জন্য আইনসভার দ্বারস্থ হইতে হইবে এবং এইরূপে ব্যয়ের পরিমাণ পুনরায় আইনসভা কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে। কংগ্রেসের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সাধারণতঃ সাধারণ হিসাব সংস্থা (General Accounting Office) দ্বারা পরিচালিত হয়।

ভারতেও বৃটিশ ব্যবস্থার অনুরূপভাবে সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। এখানেও সরকারী হিসাব সংস্থা, ব্যয়ের হিসাব সংস্থা এবং হিসাব পরীক্ষক প্রধান সংস্থার মাধ্যমে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কার্য বলবৎ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ প্রত্যক্ষভাবে ইহার শাসনকার্য ও শাসননীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ত্রিসংসদকে অপসারিত করিতে পারে। প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ও অন্য নানা উপায়ে আইনসভা শাসন কর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা পরোক্ষভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগগুলি সিনেট সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। উভয় পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যুদ্ধঘোষণ করিতে পারেন না।

অনেক দেশে আইনসভার হস্তে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার অধিকার ন্যস্ত থাকে। ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সভার শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকিলেও পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা আছে।

আইনসভা অনেক ক্ষেত্রে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনায় কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় সরকারী চাকুরীতে রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন তাহা উচ্চ পরিষদের অনুমোদন-সাপেক্ষ। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিও উচ্চ পরিষদের অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয় না ও সেগুলিকে বলবৎ করা যায় না। অনেক দেশে আইনসভা নির্বাচনক্ষমতার অধিকারী থাকে

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনসভার নির্বাচিত সদস্যবর্গের ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হইযা থাকেন।

ইহা ছাড়া আইনসভার কিছু বিচারবিভাগীয় কার্যও সম্পাদন করিতে হয়। মন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে অভিযুক্ত করিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা আইনসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিযা তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার হস্তে দেওযা হইয়াছে। সুতরাং আইন প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভার আরও নানাবিধ কার্য করিতে হয়।

আইনসভার সংগঠন (Organisation of the Legislature)

আইনসভা এক-কক্ষ অথবা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইতে পারে। যে সমস্ত দেশে দ্বি-কক্ষ অর্থাৎ দ্বি-পরিষদ্‌বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত আছে, সে সমস্ত দেশে একটি পরিষদ্‌কে উচ্চ পরিষদ্ (Upper House or Second Chamber) বলা হয়, অন্যটিকে নিম্ন পরিষদ্ (Lower House or Popular Assembly) বলা হয়। প্রায় সকল দেশেই নিম্ন পরিষদ ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উচ্চ পরিষদের সংগঠন পদ্ধতি সর্বত্র সমান হয় না। উচ্চ পরিষদের সংগঠনে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব জাপান ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে উচ্চ পরিষদ্ উত্তরাধিকার-সূত্রের (Hereditary principle) দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে অবশ্য এই উত্তরাধিকার-সূত্র ব্যতীত অন্য নীতিরও প্রয়োগ দেখা যায়। ক্যানাডার উচ্চ পরিষদ্ মনোনয়ন-নীতির (Principle of Nomination) উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে উচ্চ পরিষদের সমস্ত সদস্যই ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক আজীবন সদস্যরূপে মনোনীত হইয়া থাকেন। ফরাসী, ভারত প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদের সদস্যবৃন্দ জনগণ কর্তৃক পরোক্ষ-ভাবে নির্বাচিত (Indirect election) হইয়া থাকেন। জনগণ কর্তৃক

নির্বাচিত রাজ্য আইনসভাগুলি উচ্চ পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ্ সিনেট সভা ভোটদাতৃগণ-কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত (Direct election) প্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদ্ মনোনয়ন ও নির্বাচন (Partly elected and partly nominated) এই দুইটি নীতির সমন্বয়ে গঠিত হইত। উচ্চ পরিষদের কিয়দংশ সদস্য শাসনকর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত, এবং অপর অংশ জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারে।

এক-কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা (Unicameral Vs. Bicameral Legislature)

আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট না দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইবে এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে, সেগুলিকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। অপরপক্ষে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন-সভার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, তাহা এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে অধিকাংশ সভ্যদেশের আইনসভাই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য দ্বিপরিষদ আইনসভা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বি-কক্ষের সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয় :—

লেকি তাঁহার *Democracy and Liberty* নামক গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলিয়াছেন যে, যত প্রকারের শাসনব্যবস্থা আছে বা হইতে পারে তাহাদের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক-কক্ষ আইনসভাবিশিষ্ট সরকার হইল নিকৃষ্টতম। এই ব্যবস্থায় আইনপরিষদের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহা পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার এই স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধা দিবার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন অপরিহার্য। দ্বিতীয় কক্ষের অবর্তমানে এক-কক্ষ আইনসভা অসংযত ও পক্ষপাতমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা দুইটি পরিষদ্ লইয়া গঠিত হইলে প্রত্যেকটি আইন উপযুক্তভাবে বিবেচিত হইতে পারে। একটিমাত্র কক্ষ থাকিলে বিশেষ বিচার-বিবেচনাহীন ও দ্রুত আইন রচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আইন-সভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে সাময়িক উত্তেজনার বশে বা সতত পরিবর্তনশীল জনমতের চাপে কোন আইন-প্রণয়ন সম্ভব হয় না। দুইটি পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে কোন আইন বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং একটি পরিষদ্ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব আনয়ন করিলেও অপর কক্ষ তাহাকে বাধা দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন হইল জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু এই বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য সময়ের প্রযোজন। আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে আইনের প্রস্তাব ও শেষ অধ্যায়ের মধ্যে এত অবসর পাওয়া যায়, যাহাতে প্রত্যেকটি প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, আইনসভা দুইটি পরিষদ্ দ্বারা গঠিত হইলে একটি পরিষদ্ দ্বারা আনীত আইনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি অপর পরিষদ্ কর্তৃক সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। একটি পরিষদ্ থাকিলে অনেক সময় আইনের প্রত্যেক প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত সময় বা যোগ্যতা সেই পরিষদের না থাকিতে পারে। কিন্তু আইনসভা দ্বি-কক্ষ হইলে অপর পরিষদ্ প্রস্তাবিত আইন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া ইহার গলদ দূর করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হয়। প্রায় সকল দেশেই এমন সমস্ত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা নির্বাচনব্যাপারে বীতস্পৃহ অথচ শাসন-পরিচালন কার্যে তাঁহাদের এরূপ যোগ্যতা আছে যে, তাঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশ জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হয়। উচ্চ পরিষদ্ থাকিলে এই সকল যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বারা উচ্চ পরিষদের সদস্য করা যাইতে পারে। ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া উচ্চ পরিষদ্ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চ পরিষদ্ বিভিন্ন 'অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি লইয়া

গঠিত হয় বলিয়া আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও স্বার্থসংরক্ষণে ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে পারে। ল্যাস্কি প্রভৃতি অনেক প্রগতিশীল লেখক ইহার সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে আইন-প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদ্ই যথেষ্ট। উচ্চ পরিষদ বাহুল্যমাত্র। আধুনিককালে কোন আইনই দ্রুত ও বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া প্রণয়ন করা হয় না। এইজন্য আইন প্রণয়নের পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই জটিল ও দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য একটি উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চ পরিষদ্ কার্যকরীভাবে নিম্ন পরিষদের আইন-প্রণয়নকার্যে বাধা দিতে পারে না। প্রায় সকল দেশেই নিম্ন পরিষদ্ অধিক ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং নিম্ন পরিষদ্ ইচ্ছা করিলে উচ্চ পরিষদের আপত্তি সত্ত্বেও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে উচ্চ পরিষদের কোন সার্থকতা নাই। তৃতীয়তঃ, উচ্চ পরিষদ্ থাকিলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বারা উচ্চ পরিষদের সদস্য করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের জন্য পৃথক্ নীতি অনুসৃত হয়। সেইজন্য মনোনয়ন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চ পরিষদ্ অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বিচারালয়ের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। উচ্চ পরিষদ্ কোনক্রমেও আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা সংরক্ষণে সাহায্য করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেও উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ ভোটদান দ্বারা তাঁহাদের নিজ প্রদেশ অপেক্ষা দলীয় নির্দেশের প্রতি অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। পঞ্চমতঃ, দুইটি পরিষদ্ ব্যয়সাপেক্ষ। ষষ্ঠতঃ, দুইটি পরিষদ থাকিলে অনেক সময় উভয়ের মধ্যে বিরোধের ফলে কার্যে অযথা বিলম্ব হয়। সপ্তমতঃ, উচ্চ পরিষদ কিভাবে সংগঠিত হইবে সে সম্বন্ধেও এখন পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক নীতি উদ্ভাবিত হয় নাই। উভয়

পরিষদের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের ব্যাপারেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এই সমস্ত কারণে ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ে (Abbe Seieyes) বলেন, উচ্চ পরিষদ্ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত একমত হয় তবে তাহা বাহুল্যমাত্র, আর উচ্চপরিষদ্ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে তাহা অত্যন্ত হানিকর। উচ্চ পরিষদ্ যতই কার্যকরী হউক না কেন, জনগণের প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত নিম্ন পরিষদের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিতে পারে না। উল্লিখিত কারণগুলির জন্য দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উপযোগিতা অনেকে অস্বীকার করেন।

উচ্চ পরিষদের সংগঠন ও কার্যকলাপ (Organisation and proper functions of Second Chambers)

অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, উত্তরাধিকার-সূত্র ব মনোনয়ন বা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা সংগঠিত উচ্চ পরিষদ্ আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন যে, উচ্চ পরিষদের অধিকাংশ সদস্য নিম্ন পরিষদ্ দ্বারা নির্বাচিত হওয়া উচিত, আর কিছুসংখ্যক সদস্য যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত।

উচ্চ পরিষদ্ যদি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা যায় তবে উচ্চ পরিষদের উপর নিম্নলিখিত কার্যগুলির ভার দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির গলদ দূর করা। দ্বিতীয়তঃ, যে আইনগুলি সম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না, সে জাতীয় আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা। তৃতীয়তঃ, সাময়িক উত্তেজনায় বশবর্তী হইয়া নিম্ন পরিষদ্ যাহাতে দ্রুত আইন প্রণয়ন করিতে না পারে সেজন্য আইন-প্রণয়নে সাময়িক বাধা সৃষ্টি করিয়া জনমতকে সজাগ রাখা উচ্চ পরিষদের একটি প্রধান কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রেট বৃটেনে লর্ড সভা বর্তমানে এক বৎসরকাল পর্যন্ত সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বাধা দিতে পারে। চতুর্থতঃ, উচ্চ পরিষদের আর একটি কার্য হইল প্রস্তাবিত আইনগুলির বিশদ আলোচনা করিয়া সেগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করা। কিন্তু উচ্চ পরিষদের কার্যকলাপ

এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে নিম্ন পরিষদের ইচ্ছা কোনক্রমে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

ভারতের রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা (Utility of Second Chamber in the Indian States)

নূতন সংবিধান অনুসারে ভারতে ছয়টি রাজ্যে—বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ—দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার প্রবর্তন করা হইয়াছিল। রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে বর্তমানে মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য দুইটির আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ২৭নং বিধান পরিষদ্ আইন অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ও বর্তমানে নূতন মহারাষ্ট্র রাজ্যের জন্য দ্বি-পরিষদের ব্যবস্থা হইয়াছে। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য দুইটির উচ্চ পরিষদ লোপ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে দ্বি-পরিষদের উপযোগিতা থাকিলেও রাজ্য সরকারের ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল কার্যতঃ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্য সরকারগুলির এরূপ বিশেষ কোন দায়িত্ব নাই, যে জন্য বিশেষ বিচার-বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন হইতে পারে। পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দেশবিভাগের ফলে এই রাজ্যগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা এত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র রাজ্য দুইটির পক্ষে একটি অতি-ব্যয়সাপেক্ষ উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। একটি উচ্চ পরিষদ্ পোষণের গুরু ব্যয়ভার জনসাধারণকে অনর্থক বহন করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ পরিষদ্ ১৯৬৯ সালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

খসড়া আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Bills)

আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত আইনের প্রস্তাবকে খসড়া আইন বলা হয়। খসড়া আইনকে উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা, সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট খসড়া আইন (Public Bills) ও বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট খসড়া আইন (Private Bills)। সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট আইনের প্রস্তাব সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হইলে তাহাকে সরকারী খসড়া আইন

(Government Bills) বলা হয়, আর বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত হইলে তাহাকে বে-সরকারী সদস্য-প্রস্তাবিত খসড়া আইন (Private Members' Bills) বলা হয়। সরকারী খসড়া আইনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়: সাধারণ স্বার্থবিষয়ক প্রস্তাব (Ordinary Bills) ও অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব (Money Bills)। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সাধারণতঃ শাসন-বিভাগীয় কোন সরকারী সদস্য ব্যতীত আইনসভার বে-সরকারী সদস্যগণ উত্থাপন করিতে পারেন না। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির দুইটি শ্রেণী আছে। ব্যয়বরাদ্দের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব আনীত হয় তাহাকে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর বিল (Appropriation Bills) বলা হয়, আর কর ধার্য করিবার প্রস্তাবগুলিকে রাজস্ব বিল (Finance Bills) বলা হয়।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি (Process of Law-making)

আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। আইন প্রণয়নে আইনসভাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বিচার-বিবেচনাপূর্বক আইন প্রণয়ন করিতে হয়। এইজন্য প্রত্যেক দেশে আইন-প্রণয়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রণয়ন-পদ্ধতিও জটিল এবং দীর্ঘ হয়।

খসড়া আইনকে আইনে পরিণত করিবার পূর্বে কয়েকটি নির্ধারিত পর্যায়ে উহার বিশদ-আলোচনা করা হয়। আইনসভার যে সদস্য আইনের প্রস্তাব আইনসভায় আনয়ন করিতে ইচ্ছুক, প্রথমে তাঁহাকে নিজে অথবা অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে খসড়াটি প্রস্তুত করিতে হয়। আইন-প্রণয়নে শব্দবিন্যাসে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। খসড়াটি প্রস্তুত হইলে আইন-সভায় উহা পেশ (Introduction) করিতে হয়। পেশ করিবার পর প্রথম পর্যায়ে আইনের প্রস্তাবক সভাপতির অনুমতিক্রমে খসড়াটির শিরোনামা মাত্র পাঠ করেন, জরুরী আইন না হইলে পাঠের পর কোন প্রকারের আলোচনা হয় না। ইহাকে আইনের প্রথম পাঠ (First Reading) বলা হয়। তারপর খসড়াটি মুদ্রিত হইয়া সদস্যগণের মধ্যে বিলি করা হয় ও একটি নির্ধারিত দিনে খসড়াটির দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) হয়। দ্বিতীয়বার পাঠের সময় খসড়াটির মৌলিক নীতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের অনুষ্ঠান চলে, কিন্তু খসড়াটির ধারা-উপধারা সম্পর্কে

কোনরূপ বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। খসড়াটি যদি সংখ্যাধিক্যের অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে ইহা একটি বিশেষ সংস্থার (Committee) নিকট প্রেরিত হয়। এই সংস্থা কর্তৃক খসড়াটির ধারা-উপধারা প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হয়। সংস্থা ইচ্ছামত খসড়াটির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। এই ব্যবস্থাকে Committee Stage বলা হয়। সংস্থা যদি খসড়াটির কোন পরিবর্তন করে তবে পরিবর্তিত আকারে খসড়াটি আইনসভায় প্রেরিত হয় (Report Stage)। শেষ পর্যায়ে খসড়াটির তৃতীয় পাঠ (Third Reading) হয়। এই পর্যায়ে খসড়াটিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে হয় নতুবা সমগ্রভাবে ইহাকে বাতিল করিতে হয়—এই পর্যায়ে খসড়াটির কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না।

নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে খসড়াটি উচ্চ পরিষদে বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। উচ্চ পরিষদেও একই পদ্ধতিতে খসড়াটির আলোচনা হয়। উচ্চ পরিষদ্ পুনর্বিবেচনার জন্য খসড়াটিকে নিম্ন পরিষদে ফেরৎ পাঠাইতে পারে। উভয় পরিষদের মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশন হয়, অথবা মতবিরোধ দূর করিবার অন্য পন্থা সকল দেশেই আছে। সাধারণতঃ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের ইচ্ছাই সর্বত্র বলবৎ হয়। উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলে রাজা, রাষ্ট্রপতি বা শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অনুমোদন লাভ করিয়া খসড়াটি আইনে পরিণত হয়। এইরূপে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া আইনসভার মাধ্যমে জনগণের সমবেত ইচ্ছা আইনরূপে মূর্ত হইয়া উঠে।

সার্বভৌম ও অ-সার্বভৌম আইনসভা
(Sovereign and Non-Sovereign Law-making Bodies)

আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার দিক দেখিতে গেলে আইনসভাগুলিকে সার্বভৌম আইনসভা ও অ-সার্বভৌম আইনসভা—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা, কিন্তু এই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার তারতম্যের ভিত্তিতে আইনসভাগুলিকে উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

সার্বভৌম আইনসভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, (১) এই আইনসভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে স্বৈর ও আদিম ক্ষমতার অধিকারী। ইহার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে উদ্ভূত নহে। (২) দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন আইন নাই যাহা এই সার্বভৌম আইনসভা প্রণয়ন করিতে পারে না। (৩) তৃতীয়তঃ, এমন কোন আইন নাই যাহা এই সভা সংশোধন বা বাতিল করিতে পারে না। এক কথায়, আইন-প্রণয়নে এই আইনসভা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী। (৪) চতুর্থতঃ দেশের মধ্যে এরূপ কোন আইনগ্রাহ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ থাকে না যে বা যাহারা এই আইনসভা প্রণীত আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই আইনসভা কার্যতঃ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সর্বেসর্বা এবং ইহার দ্বারা প্রণীত আইনগুলি দেশের সর্বত্র প্রযোজ্য।

অপরপক্ষে অ-সার্বভৌম আইনসভার বৈশিষ্ট্য হইল যে, (১) এই আইনসভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা অন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে উদ্ভূত—ইহার আদিম বা স্বৈর ক্ষমতা থাকে না। (২) দ্বিতীয়তঃ, এই আইনসভা সর্বপ্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে না বা সব আইন সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারে না। (৩) তৃতীয়তঃ, এই আইনসভা প্রণীত আইন শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নাকচ করিতে পারে বা বিচারবিভাগ ইহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভা হইল সার্বভৌম আইনসভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা এতই দুর্ভেদ্য যে, এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট সভা একমাত্র নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ও পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ব্যতীত আর সবই পারে। পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা স্বৈর—ইহা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডের কোন কর্তৃপক্ষেরই বা কোন বিচারালয়ের নাই। পার্লামেণ্ট সভা সকলপ্রকার আইনই—কি সাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক—প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করিতে পারে। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য।

পার্লামেণ্ট সভার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসকে

অ-সার্বভৌম আইনসভা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা আদিম নহে—ইহা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতর আইন অর্থাৎ শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত ও এই শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কংগ্রেসের আইন-প্রণয়নক্ষমতা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস-প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনসাপেক্ষ। তিনি ইহা নাকচ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস-প্রণীত আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী আইন বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এইরূপ বে-আইনী ঘোষিত আইন কার্যকর হয় না। পরিশেষে বলা যায় যে, কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা বিভিন্ন রাজ্যগুলির স্বাধীন আইন-প্রণয়নক্ষমতার দ্বারাও সংকুচিত হইয়াছে। এইজন্য বলা হয় যে, মার্কিন দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (কংগ্রেস) দুই দিক দিয়া সীমাবদ্ধ (Doubly restricted), কিন্তু ইংলণ্ডের আইনসভা (পার্লামেণ্ট) আদৌ সীমাবদ্ধ নয়।

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নীতিগতভাবে পার্লামেণ্ট সভার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ বর্তমানে পার্লামেণ্ট সভাকে আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা সমীচীন নহে। পার্লামেণ্ট বলিতে রাজা-সহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা বুঝায়। বর্তমানে রাজা ও লর্ড সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বর্তমানে কমন্স সভার প্রাধান্য সূচিত করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কমন্স সভা হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সুতরাং পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বলিতে কেবিনেটেরই প্রাধান্য বুঝায়। ইহা ব্যতীত, অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসন-বিভাগ কর্তৃক আইন-প্রণয়ন ও বিচার-বিভাগ কর্তৃক আইন-ব্যাখ্যাকালীন পরোক্ষ আইন-প্রণয়ন দ্বারাও পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা বহুলাংশে সংকুচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইনগুলির বিরোধী কোন আইনও পার্লামেণ্ট সভা প্রণয়ন করিতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, পার্লামেণ্ট-প্রণীত কোন আইনই ডোমিনিয়নগুলির বিনা সম্মতিতে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং দেখা যায় যে, পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বর্তমানে একটি নিছক কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে।

অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন (Delegated Legislation)

আইন প্রণয়ন করা একমাত্র আইনসভার কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু আইনসভা যখন এই আইন প্রণয়ন কার্য শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে হস্তান্তরিত করে, তখন শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত আইন অর্পিত ক্ষমতা বলে প্রণীত আইন বলিয়া কথিত হয়। আইন প্রণয়ন করা শাসনকর্তৃপক্ষের মৌলিক ক্ষমতা নহে—ইহা উদ্ভূত বা প্রাপ্ত (derivative) ক্ষমতা মাত্র। সুতরাং শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইনকে প্রয়োজনীয় কিন্তু অপ্রধান আইন বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় এইরূপ আইন প্রচলিত আছে। এই আইনগুলি মন্ত্রিগণ কর্তৃক নিয়ম (Rules), বিধি (Regulations) ও উপ-বিধি (Bye-laws) প্রভৃতি আকারে প্রণীত হয়।

অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা (Need for Delegated Legislation)

নানা কারণে এই ধরনের আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, বর্তমান যুগে কল্যাণ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা ও কার্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। নিত্য নূতন আইন-প্রণয়নের বর্ধিত চাহিদা একটিমাত্র আইনসভা পূরণ করিতে পারে না—কারণ ইহার সেরূপ পর্যাপ্ত সময়ও নাই ও যোগ্যতাও নাই। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনসভা আইনের পরিধি-রেখা (outline) অংকন করে, বিশদ বিবরণ সন্নিবেশ করিতে পারে না। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে যে তথ্য-সংক্রান্ত ও প্রায়োগিক জ্ঞান প্রয়োজন তাহা আইনসভার নাই। এই কারণে রচিত আইনকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ করা প্রয়োজন হয়। এই পূর্ণাঙ্গ করিবার ভার শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ নানা নিয়ম, বিধি, উপ বিধি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া প্রয়োগযোগ্য করে। পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের এই পূর্ণাঙ্গকরণ কাজকে অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রণয়ন বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন একটি জটিল কার্য। ইহার জন্য বিশেষ বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রতিনিধিমূলক আইনসভা আইনের নীতি

ও গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হইলেও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অধিকারী নহে। সুতরাং যাহারা এই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, সেই শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে আইন-প্রণয়নের জটিল অংশ অর্পণ করা হয়।

তৃতীয়তঃ, বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন। আইনসভা সমরূপ (uniform) আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় অবস্থা অনুসারে আইন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনেক সময় স্থানভেদে আইনের কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। নূতন নিয়ম, বিধি বা উপ-বিধি প্রণয়ন সাহায্যে শাসনকর্তৃপক্ষ এরূপক্ষেত্রে আইন প্রয়োগযোগ্য করে। ইহাতে আইনের নমনীয়তাও বৃদ্ধি পায়।

অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আইনসভার সময়ের মিতব্যয়িতা হইয়াছে। আইনের বিশদ তথ্য বা জটিল বিষয়ের আলোচনায় সময়ক্ষেপ না করিয়া আইনসভা এখন আইনের নীতি ও গুণাগুণ বিচারে অধিক সময় ব্যয় করিতে পারে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়াও সম্ভব।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়নের প্রধান অসুবিধা হইল যে, শাসনকর্তৃপক্ষ তাহাদের নির্ধারিত ক্ষমতা লংঘন করিয়া আইন প্রণয়ন করিবার নীতিও নির্ধারণ করে। ইহার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। শাসনকর্তৃপক্ষের সাধারণতঃ জনসাধারণের সহিত কোন যোগাযোগ থাকে না। সুতরাং শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন জনস্বার্থ-বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া, এই অপ্রধান আইনগুলি যখন বিচারালয়ের আওতা-মুক্ত হয়, তখন এই আইনগুলি বিপজ্জনক হয়।

আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস (Decline of the Legislature)

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ আইনসভা-প্রণীত আইনই হইল শাসন ও বিচার বিভাগদ্বয়ের কার্যাবলীর পথনির্দেশক। এতদ্ব্যতীত শাসন ও বিচার—এই দুইটি বিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়বরাদ্দের উপর নির্ভর করিতে হয়।

কিন্তু বর্তমান যুগে আইনসভার প্রাধান্য ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে, অপর দিকে শাসনবিভাগের গুরুত্ব অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সমস্ত কারণে আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পাইতেছে তাহা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের ফলে দলের তথা দলীয় নেতার ক্ষমতা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দলীয় সংহতি একরূপ কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় যে, দলের সদস্যগণকে অন্ধভাবেই দলীয় নির্দেশ পালন করিতে হয়। দলের সদস্যপদ গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া আইনসভায় ভোটদান ব্যাপার পর্যন্ত সমস্ত কিছুই দলীয় নির্দেশে পরিচালিত হয়। সুতরাং আইনসভার সদস্যগণের কোন অনুপ্রেরণা বা ব্যক্তিত্ব থাকে না। যে আইনসভার কোন সদস্য নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে আলাপ-আলোচনা বা কাজ করিতে পারে না, সে আইনসভা শুধুমাত্র ভোটদান যন্ত্রে পরিণত হয়। এরূপ নিষ্ক্রিয় আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভার সদস্যগণ প্রধানতঃ কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের ধারক বলিয়া নির্বাচিত হন। তাঁহাদের কোন বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বর্তমানে আইন-প্রণয়ন কার্য যে শুধু জটিল হইয়াছে তাহা নহে, এই কার্যে অনেক সময় বিশেষ বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আইনসভার অধিকাংশ সদস্যই এই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী নহেন, সেইজন্য সদস্যগণ আইন-প্রণয়ন কার্য রূপায়ণের ভার শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করেন। আইন-প্রণয়ন কার্যে আইনসভার এই অক্ষমতা জনিত ঔদাসীন্যের ফলেও ইহার প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, প্রায় সব দেশেই দলের নেতৃবর্গ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। দলীয় অনুশাসন অমান্য করিলে দল হইতে বহিষ্কার এবং আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা নেতৃবর্গ আইনসভার দলীয় সদস্যগণকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ফলে আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের তাঁবেদারে পরিণত হয়।

চতুর্থতঃ, অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রণয়ন (Delegated Legislation) প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার ফলেও আইনসভা আরও ক্ষমতাহীন হইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইনসভার প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার বিচার বিভাগীয় পুনর্বিচার (Judicial Review) দ্বারাও কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস বিশেষরূপে দেখা যায়। পার্লামেণ্ট আজ আর শাসন করে না বা শাসন করা ইহার উদ্দেশ্য বলিয়াও পরিগণিত হয় না। শাসনকর্তৃপক্ষ-কেবিনেট্ সব ক্ষমতাই আত্মসাৎ করিয়াছে। ভারতে আইনসভার প্রাধান্য কোনদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা ছাড়া, পার্লামেণ্ট সভায় বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বহুদলের অবস্থিতির জন্য পার্লামেণ্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজেই ক্ষমতাসীন শাসনকর্তৃপক্ষই পার্লামেণ্টের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সভার উপর শাসনকর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভিটোক্ষমতা, বাণী প্রেরণ, প্রেস সম্মেলন, টেলিভিসন বক্তৃতা এবং কংগ্রেস সভায় তাঁহার দলের সাহায্যে আইন-সভার কাজ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। এতদ্ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা আইনসভার প্রাধান্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

আইনসভার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইলেও বলিতে হইবে যে, আইন-সভা জনমতের প্রতিনিধি ও জনমত জাগ্রত করিতে সাহায্য করে। ইহার বিভিন্ন কমিটিগুলির মাধ্যমে এই সভা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। যুগের চাহিদা মিটাইবার জন্য আজ আইনসভা ইহার পূর্ব ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ—(১)

আইনসভা—আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ—সরকারের এই তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভা সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হয়।

আইনসভার কার্য—১। পুরাতন আইন সংশোধন করা ও নূতন আইন প্রণয়ন করা। ২। বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা। ৩। আয়-ব্যয়ের তদারক ও মঞ্জুর করা। ৪। শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করা। ৫। বিচার-বিভাগীয় কিছু কার্য সম্পাদন করা।

আইনসভার সংগঠন—আইনসভার নিম্ন পরিষদ্ সাধারণতঃ নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা গঠিত হয়। উচ্চ পরিষদের গঠন-প্রণালী সর্বত্র সমান নহে। উত্তরাধিকার-সূত্র, মনোনয়ন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচন প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা উচ্চ পরিষদ্ সংগঠিত হয়।

এক কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা—বর্তমানে প্রায় সকল দেশে দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হইয়াছে। দ্বি-কক্ষের সপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান হয়।

সপক্ষে যুক্তি—১। উচ্চ পরিষদ্ বর্তমান থাকিলে নিম্ন পরিষদ্ যথেচ্ছ-ভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। ২। নিম্ন পরিষদের বিবেচনাহীন ও দ্রুত আইন-প্রণয়নে বাধা দিয়া উচ্চ পরিষদ্ জনমত জাগ্রত করিতে পারে। ৩। আইন-প্রণয়নে নিম্ন পরিষদের ভুলত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। ৪। বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দ্বিতীয় পরিষদ্ অপরিহার্য।

বিপক্ষে যুক্তি—১। আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি বর্তমান যুগে এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, কোন আইনই দ্রুত পাস করা যায় না। আর নিম্ন পরিষদ্ অধিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইচ্ছা করিলে যে-কোনও আইন পাস করিতে পারে, তাহাতে উচ্চ পরিষদ্ বাধা দিতে পারে না। ২। উচ্চ পরিষদে বিশেষ স্বার্থ ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। ৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ আদালতই আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকারের রক্ষাকবচের কার্য করে, সেজন্য উচ্চ পরিষদের কোন আবশ্যকতা নাই। ৪। উচ্চ পরিষদের সর্ববাদিসম্মত কোন সংগঠন-প্রণালী আজও পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। ৫। ক্ষমতাবণ্টনের দিক দিয়াও উচ্চ পরিষদ্ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত

একমত হয় তাহা হইলে ইহা বাহুল্যমাত্র, আর যদি নিম্ন পরিষদের কার্যে বাধা দেয় তাহা হইলে ইহা ক্ষতিকর।

উচ্চ পরিষদের প্রকৃত কার্য হইল নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের ভুলত্রুটি সংশোধন, মতবিরোধহীন আইনের প্রস্তাব আনয়ন ও উপযুক্তভাবে প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাব বিবেচনা করা।

ভারতে রাজ্য-সরকারের ক্ষেত্রে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা—পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই ছয়টি রাজ্যে প্রথমে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হইয়াছিল—ইহার বিপক্ষে বলা হয় যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং কেন্দ্রে দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও রাজ্যসরকারগুলিতে ইহার আবশ্যকতা খুব কম। অনেক রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়াছে—তাহাদের পক্ষে দ্বি-কক্ষ আইনসভা পোষণ করা ব্যয়সাপেক্ষ।

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি বর্তমানে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। আইনের প্রস্তাবককে খসড়া আইন প্রণয়ন করিয়া আইনসভায় পেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রথম পাঠ হয়। তাহার পর দ্বিতীয় পাঠ। দ্বিতীয় পাঠের পর বিশেষ একটি সংস্থার বিবেচনার্থ আইন সেই সংস্থার নিকট পাঠান হয়। সংস্থা খসড়াটিকে পরিবর্তিত আকারে বা পরিবর্তন না করিয়া পুনরায় আইন-পরিষদে প্রেরণ করে। তখন তৃতীয় পাঠ হয়। তৃতীয় পাঠের পর খসড়াটি অন্য পরিষদে প্রেরিত হয়। অন্য পরিষদ একই পদ্ধতিতে খসড়াটি বিবেচনা করে। অন্য পরিষদের সমর্থন লাভ করিলে রাজ্য বা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া খসড়াটি আইনে পরিণত হয়।

অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন

আইনসভা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন এই নামে অভিহিত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইন নিয়ম, বিধি, উপবিধি আকারে বলবৎ করা হয়।

ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বহু আইন প্রচলিত দেখা যায়।

আইনসভার সময় স্বল্প। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আইন পূর্ণাংগরূপে প্রণয়ন করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব নয়। আইনসভার সদস্যগণের সেরূপ বিশেষ জ্ঞানও নাই। তাই নানা বিধি, উপবিধি সংযোজন দ্বারা আইনসভা প্রণীত আইনকে পূর্ণাংগ করিবার ভার শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থার সাহায্যে প্রত্যেকটি আইনকে স্থান ও কালের ভিত্তিতে রূপায়িত করিয়া অধিকতর উপযোগী করা সম্ভব। আইনসভারও সময়ের মিতব্যয়িতা হয়। কিন্তু অনেক সময় শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত আইন জনস্বার্থ বিরোধী হয়। এইরূপ আইন বিচারালয়ের আওতামুক্ত হইলে আরও বিপজ্জনক হয়।

আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার অগ্রাধিকার স্বীকৃত হইলেও বর্তমানে নানা কারণে আইনসভার এই প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। আইনসভার প্রভাব ও ক্ষমতা আজ দলীয় নেতৃত্বের চাপে অবরুদ্ধ। দলীয় নির্দেশ পালন করা ব্যতীত আইনসভার সদস্যগণের আর কোন কর্তব্য নাই। দল হইতে বহিষ্কার ও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলীয় নেতৃবর্গ আইনসভাকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করিয়াছে। অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় পুনর্বিচার প্রবর্তন ফলেও আইনসভার অগ্রাধিকার ও মর্যাদা বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the functions of a modern legislature ?

আধুনিক আইনসভার কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।

2. Discuss the merits and demerits of bi-cameralism.

আইনসভার দ্বি-কক্ষ ব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা কর।

3. Examine the case for and against bi-cameralism.

আইনসভার সংগঠনে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (২)

শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগ (The Executive and the Judiciary)

ব্যাপক অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশবিভাগের অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বুঝায়। আইন-পরিষদ্ ও বিচারবিভাগ ব্যতীত সরকারী কার্যে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীই শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত হয়। সংকীর্ণ অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনবিভাগের নীতি ও কার্যক্রমনির্ধারক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ্ বুঝায়।

শাসনকর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ ও নিয়োগ-পদ্ধতি (Classification and Appointment of the Executive)

শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক একজন রাজা অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন।

বংশানুক্রমিক রাজা (Hereditary King) অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি (Elected President) নামসর্বস্ব (Nominal) শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে পারেন। ইংলণ্ডের বংশানুক্রমিক রাজা ও ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন শাসনকর্তৃপক্ষের আইন-সভার সহিত যোগসূত্র থাকে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আইনসভা-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ (Parliamentary Executive) বলা হয়। ইংলণ্ডে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। শাসনকর্তৃপক্ষের যদি আইনসভার সহিত কোন প্রকার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র না থাকে এবং আইনসভাও যদি শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ (Non-Parliamentary Executive) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন-

ব্যবস্থা চালু দেখিতে পাওয়া যায়। শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যখন একটিমাত্র ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তখন তাহাকে একক শাসনকর্তৃপক্ষ (Single Executive) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি শাসন-পরিষদের সর্বাধিনায়ক থাকেন ও পরিষদের অপর সদস্যগণ তাঁহার নির্দেশে পরিচালিত হইয়া থাকেন। একনায়কতন্ত্রে ও রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। শাসনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সহকারী নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু সহকারিবৃন্দ তাঁহার নিম্নতম কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসনবিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে তিনিই নিয়োগ করেন ও সদস্যগণ তাঁহার নির্দেশেই পরিচালিত হন। নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিবাদী ইটালীতে এক নায়কতন্ত্র ব্যবস্থায় একব্যক্তিই সমস্ত ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকারী ও সমস্ত দায়িত্ববহনকারী বলিয়া পরিগণিত হইত।

শাসন-পরিষদ্ যদি একব্যক্তি দ্বারা গঠিত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হয় এবং শাসনকার্য যদি একাধিক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে শাসন-পরিষদকে সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ (Plural Executive) বলা হয়। মন্ত্রিসংসদ্-চালিত শাসনব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তি যৌথ-ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায়ও একজন নেতা বা প্রধানমন্ত্রী থাকেন। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম হইলেও অনেক বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমষ্টিগত শাসন পরিষদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুইজারল্যাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। সুইস্ শাসন-পরিষদ্ (Federal Council) সাতজন সমক্ষমতাবিশিষ্ট সদস্য লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে একজন এক বৎসরের জন্য সভাপতি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিলে এই সভাপতি অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা উচ্চতর বা কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। শাসন-পরিচালনায় ক্ষমতা ও দায়িত্ব শাসন-পরিষদের সাতজন সদস্যই সমভাবে বহন করেন।

একক শাসন-পরিষদ্-ব্যবস্থায় একজন মাত্র ব্যক্তি শাসনক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় বলিয়া অবস্থা অনুসারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। শাসনক্ষমতা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হইলে দৃঢ়তার সহিত কোন কার্যকরী পন্থা

অবলম্বন করা যায় না, সুতরাং শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। একক শাসন-পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, শাসনকর্তৃপক্ষ অন্তনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় কার্যসমূহ সময়মত সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু একহস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

সমষ্টিগত শাসন-পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, একাধিক ব্যক্তির আলাপ-আলোচনা ও ভাববিনিময়ের দ্বারা শাসনব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত হইতে পারে। সময়সাপেক্ষ হইলেও আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থিরীকৃত নীতি অধিকতর কার্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। ক্ষমতা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত থাকার ফলে ইহার স্বৈরপ্রয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলা হয় যে, শাসনক্ষমতা যদি একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা শুধু দুর্বল হইয়া পড়ে তাহা নয়, শাসকগণের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানেরও অভাব হইতে পারে। এইজন্য মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ-দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং একজন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিসংসদ্ পরিচালিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডে এই সমষ্টিগত শাসন-পরিষদ্ সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিলেও অন্যত্র এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নাই।

শাসনবিভাগীয় কার্য (Functions of the Executive)

শাসনবিভাগীয় কার্য পাঁচটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

১। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Administrative Power)

শাসন বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনসমূহ প্রয়োগ করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং দেশে যাহাতে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেজন্য জনসাধারণকে আইন মানিতে বাধ্য করা। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে পুলিশবাহিনী পরিচালনা করিতে হয় এবং আইনভঙ্গকারীদের বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত কারাবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়।

২। কূটনৈতিক ক্ষমতা (Diplomatic Power)

বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নানা কারণে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক হইবে

তাহা শাসনবিভাগ স্থির করে। বৈদেশিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত দূতবিনিময় করে ও এই দূতের মাধ্যমেই রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক শক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদন করা ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় কার্য শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

৩। সামরিক ক্ষমতা (Military Power)

পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধকার্য পরিচালনা করা শাসন-বিভাগের আর একটি প্রধান ক্ষমতা। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শাসনবিভাগ স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের পরিচালনা করে। যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতাও শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করা বা যুদ্ধ পরিচালনা করিবার ব্যয়ের জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে আইন-পরিষদের অনুমোদন লাভ করিতে হয়।

৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative and Ordinance-making Power)

শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও থাকে। মন্ত্রি-সংসদ্-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদের প্রত্যেকটি সদস্য আইনসভার সদস্য হিসাবে আইনসভায় আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব করিতে পারেন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারাই মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করেন। সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইনগুলি সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনে আইনে পরিণত হয়। অনেক সময় আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিসংসদ্ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ পরোক্ষ উপায়ে আইন-প্রণয়নকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বাতিল করিতে বা স্থগিত রাখিতে পারে। আপৎকালে শাসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রবর্তন করিতে পারে।

৫। বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Power)

শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচারবিষয়ক ক্ষমতাও থাকে। অধিকাংশ দেশে উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষের দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতাও থাকে।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (Permanent Civil Service)

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ হইল শাসনবিভাগের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রত্যেক দেশেই এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ লইয়া শাসনবিভাগ গঠিত হয়। শাসন-বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ স-মন্ত্রিপরিষদ্ রাজা বা রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রিপরিষদ্ নির্ধারিত কালের জন্য নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং নির্দিষ্ট কাল অন্তে কার্যভারমুক্ত হন এবং নূতন শাসকগণ নিযুক্ত হন। উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন এবং তাঁহারা নির্ধারিত নীতি ও কার্যের জন্য পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। এইরূপে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকগণ শাসিতের নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম স্থির করাই শাসন পরিচালনার একমাত্র কাজ নহে। নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমকে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য আর এক দল দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন। এই কর্মচারিগণের শুধু দক্ষ ও কর্মকুশল হইলেই চলে না—তাঁহাদের কার্যের স্থায়িত্বও থাকা আবশ্যক। নতুবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তনের সঙ্গে এই কর্মচারিবৃন্দের পরিবর্তন ঘটিলে শাসনবিভাগের কার্য একেবারেই অচল হয়। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর শাসক দেখা যায়—প্রথম শ্রেণীর শাসকগণ শাসনবিষয়ক নীতি নির্ধারণ করিলেও নির্ধারিত কার্যকালের জন্য নিযুক্ত হন। দক্ষতা অপেক্ষাও দায়িত্বশীলতা হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসকগণ দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত হন। দায়িত্বশীলতা অপেক্ষা কর্মকুশলতাই হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহারা নির্দিষ্ট বয়সে নিযুক্ত হইয়া একটা নির্দিষ্ট বয়সে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর কর্মচারিগণ যাহাতে

নিরপেক্ষভাবে দক্ষতার সহিত সরকারী কার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ইহাদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বেতন প্রভৃতি একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ সংসদ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। সুশাসনব্যবস্থা দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে এবং শাসনবিভাগের এই দুইটি অঙ্গের সুসামঞ্জস্যের উপর শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে।

বিচারবিভাগ ও ইহার কার্য (The Judiciary and its Functions)

লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে, কোন দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণ করা যায় একমাত্র সেই দেশের বিচারব্যবস্থার উৎকর্ষ দ্বারা। একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই উক্তিটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ভার থাকে বিচারকদের উপর। বিচারপতিগণ শুধু যে আইনগুলি প্রয়োগ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন তাহা নয়, প্রয়োজনমত তাঁহারা প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এরূপভাবে প্রয়োগ করেন যাহাতে দোষী ব্যক্তি যথাযথভাবে দণ্ডিত হয় ও নির্দোষ ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। বিচারকার্য একটা লৌকিক ব্যবস্থামাত্র নহে। অপরাধীর উদ্দেশ্য ও অপরাধের গুরুত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করিয়া শাস্তিবিধান করা উচিত। বিচারব্যবস্থা এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে, একাধিক অপরাধী অব্যাহতি লাভ করুক, কিন্তু একজনও নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায়। সুতরাং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রক্ষাকল্পে ন্যায় বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হয়।

বিচারপতিগণ আইনের প্রয়োগ করেন ও আইনের কি ব্যাখ্যা হওয়া উচিত তাহা স্থির করেন। এইরূপে ব্যাখ্যাত আইনগুলি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। একাধিক বিচারক যখন তাঁহাদের পূর্ববর্তী বিচারক-কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইন অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন, তখন এই নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা নূতন আইন সৃষ্টি হয়। বিচারকগণ অন্য আর এক প্রকারে আইন সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি কোন বিরোধের বিষয় প্রচলিত আইনের গণ্ডির মধ্যে না পড়ে, তাহা হইলে বিচারকগণ তাঁহাদের বিবেক ও

ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণকে আর এক প্রকারের কার্য সম্পাদন করিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করা। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা আঞ্চলিক সরকারগুলির শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অপরের কার্যক্ষেত্রে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের উভয় সরকারের কার্যকলাপ শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা থাকে।

বিচারকগণ নির্দিষ্টক্ষেত্রে প্রয়োজনমত আইন-পরিষদ্ ও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় উচ্চ বিচারালয়ের অভিমত জানিবার জন্য যে-কোন বিষয় উপস্থিত করিতে পারেন।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা (Independence and Impartiality of the Judiciary)

স্বাধীনতা ও সাম্য হইল গণতন্ত্রের আদর্শ। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই অপরিহার্য দুইটি উপাদান সুরক্ষিত করা হইল গণতন্ত্রের প্রধান কার্য। এই কার্য বহুলাংশে দেশের বিচার বিভাগ সংগঠন, বিন্যাস ও বিচার বিভাগের শুচিতা, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে শাসন বিভাগ ও আইনসভার সহিত বিচার বিভাগের পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণে বিচার বিভাগের রাজনৈতিক মত-নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়।

ন্যায়বিচার করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা বিচারকের পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃত হয়। বিচারকগণ যাহাতে আইন অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, বিচারকগণ আইন প্রয়োগ করিয়া দোষী ও নির্দোষ স্থির করেন ও অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তিবিধান করেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারক যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হন, তাহা হইলে হয়ত

নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইতে পারে ও দোষী অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ন্যায়ধর্ম অনুসারে বিচারকের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, শাসনকর্তৃপক্ষের বে-আইনী কার্যকলাপের হস্ত হইতে নাগরিক অধিকারগুলি রক্ষা করা বিচারকগণের আর একটি গুরু দায়িত্ব। যে ক্ষেত্রে বিচারকগণের আইনসভা বা শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বিচারপতিগণের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হয়। যথা, (১) বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি, (২) অপসারণ পদ্ধতি, (৩) বিচারপতিগণের কার্যকাল, (৪) যোগ্যতা, (৫) বেতন পরিমাণ ও (৬) শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ।

(১) বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি (Mode of Appointment of the Judges)

বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বহুল পরিমাণে তাঁহাদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশে বিচারক নিয়োগে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যেহেতু মার্কিন শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত, সেই হেতু বিচারক নিয়োগ ব্যাপারে দলীয় প্রভাব কার্যকর হইয়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগে অনেক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডে প্রধান বিচারালয় লর্ড সভার বিচারপতিগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রকৃত পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড চ্যান্সেলর বিচারপতিগণের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করেন।

ভারতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি করেন তবে তিনি এই সমুদয় নিয়োগ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিগণের ও রাজ্যগুলির উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের কিছু সংখ্যকের সহিত তাঁহার ইচ্ছামত পরামর্শ করিতে পারেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সমুদয় বিচারপতি নিয়োগক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অবশ্যই সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেনই। ভারতের রাজ্য উচ্চবিচারালয়-গুলির বিচারপতিগণ ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাজ্য উচ্চবিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য উচ্চবিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির সহিতও পরামর্শ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যের বিচারপতিগণ গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং কিছু সংখ্যক রাজ্যে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

সুইস্ ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সুতরাং বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে সাধারণতঃ তিনটি নীতি অনুসৃত হয় —প্রথমটি হইল শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনয়ন। দ্বিতীয়টি হইল জনগণ দ্বারা নির্বাচন আর তৃতীয়টি হইল আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন। এখন প্রশ্ন হইল যে, কোন্ পদ্ধতিটির দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ সম্ভব ?

ডঃ গার্ণারের মতে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা বিচারপতি-গণের নিয়োগ হইল সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণ দলাদলির ও জনপ্রিয়তা লাভের উর্ধ্বে থাকিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। যুক্তির দিক দিয়া আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য হইলেও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারপতি মনোনয়ন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মনোনয়ন অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণ এই মনোনয়ন করিয়া থাকেন। সর্বক্ষেত্রে যে তাঁহারা ব্যক্তিগত

মতামতের উর্ধ্বে থাকিয়া কঠোরভাবে একমাত্র যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করেন তাহা সত্য নহে। ইংলণ্ডে রাজা ও ভারতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারপতিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত হইলেও উভয় দেশেই এই নিয়োগ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রিগণের প্রভাব অনতিক্রমণীয় এবং এই উভয় দেশের প্রধান মন্ত্রী বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের নেতা। সুতরাং বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে তাঁহাদের কতদূর দল-নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব তাহা বিতর্কের বিষয়।

আইনসভা কর্তৃক বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে বহুলোক তর্ক-বিতর্কের দ্বারা যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ আইনসভা প্রণীত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেন। সুতরাং শাসনকর্তৃপক্ষ অপেক্ষা বিচার বিভাগ আইনসভার সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত। সেই হেতু আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুইস্ দেশে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সোভিয়েত দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকার ফলে এই পদ্ধতি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় বিচারপতিগণ দলাদলির সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। বিচারপতিগণ তাঁহাদের নির্বাচন ও পদের স্থায়িত্বের জন্য দলীয় স্বার্থে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

একই কারণে জনসাধারণের হস্তে বিচারপতি নিয়োগের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হওয়া উচিত নয়। যোগ্য বিচারক নির্বাচন করিবার অনুরূপ বুদ্ধি বা যোগ্যতা সাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায় না। অপরপক্ষে বলা যায় যে, ভোটদাতাগণ যদি আইনসভার সদস্যগণকে নির্বাচন করিতে পারেন তাহা হইলে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের অযোগ্য বিবেচনা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ভুল করিতে পারে কিন্তু অসংখ্য ভোটদাতা সমবেতভাবে সাধারণত ভুল করে না। ইহা ছাড়া বলা যায় যে, ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচন অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত নীতি।

সুতরাং দেখা যায় যে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে তিনটি পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। শেষ পর্যন্ত বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও শিক্ষার উপর নির্ভর

করে। যে দেশে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেই পদ্ধতির উপর যদি বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলেই সেই দেশে সেই পদ্ধতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা যায়।

(২) অপসারণ পদ্ধতি (Mode of Removal)

বিচারপতিগণ যাহাতে ভীতি বা প্রলোভনের দ্বারা কর্তব্য সম্পাদনে পরিচালিত না হন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সামান্য কারণে পদ হইতে অপসারণ না করা যায় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কাহারও খুশীমত যখন তখন অপসারণের ভয় থাকিলে বিচারপতিগণ ন্যায়বিচার করিতে পারেন না। এই কারণে একবার বিচারপতি নিযুক্ত হইলে কোন দেশেই সহসা তাঁহাদের পদচ্যুত না করিবার ব্যবস্থা থাকে। ইংলণ্ডে বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী থাকেন (during good behaviour) ততদিন পর্যন্ত (একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত) তাঁহাদিগকে অপসারণ করা যায় না। কোন বিচারককে পদচ্যুত করা হউক এই মর্মে যদি পার্লামেণ্ট সভা রাজার নিকট আবেদন করে তাহা হইলে একমাত্র সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারককে পদচ্যুত করা যায়। সুতরাং ইংলণ্ডের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে একমাত্র অভিশংসন পদ্ধতি (Impeachment) ব্যতীত রাষ্ট্রপতি নিজে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কোন বিচারপতিকে অপসারণ করিতে হইলে নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ অভিযোগ আনয়ন করিবে ও উচ্চকক্ষ সিনেটসভা সেই অভিযোগের বিচার করিবে। ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে কোন বিচারপতির অসদাচরণ বা অযোগ্যতা সম্পর্কে প্রস্তাব পাস করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত হইলে তিনি অপসারণের আদেশ দান করিবেন। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণ ছয় বৎসরের জন্য আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইলেও তাঁহাদের পুনর্নির্বাচনে কোন বাধা নাই—তাঁহারা ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন।

(৩) কার্যকাল (Tenure of office)

কার্যকালের স্থায়িত্ব না থাকিলে কোন লোকই কোন কাজ নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতে পারে না। বিচারকগণের গুরু দায়িত্বের জন্য তাঁহাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন। কারণ বিচারপতিগণ যত অধিক দিন স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ততই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বা আইনের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভারতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত ও উচ্চ বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর পর্যন্ত বিচারপতির কার্য করিতে পারেন।

(৪) যোগ্যতা (Qualifications)

বিচারকের যোগ্যতা আইনসভার বা শাসনকর্তৃপক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বিচারপতিগণের আইনবিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যিক এবং বিচারপতিগণ রাজনীতি-নিরপেক্ষ হইবেন ও সদা-পরিবর্তনশীল জনমত দ্বারা প্রভাবিত হইবেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারা সদাচারী ও নিষ্ঠাবান হইবেন। এই কারণে অনেক দেশে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে বিশিষ্ট আইনজীবিগণের মধ্য হইতে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। যাঁহারা অন্তত পাঁচ বৎসর কোন উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতির কাজ করিয়াছেন অথবা রাষ্ট্রপতির মতে যে ব্যক্তি আইনসম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ভারতে তাঁহাদিগকেই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। সুইস্ দেশে শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইবার জন্য কোন আইনগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। জাতীয় সভায় নির্বাচনের যোগ্যতাসম্পন্ন যে-কোন সুইস্ নাগরিক উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু কার্যতঃ উচ্চমানের আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই বিচারপতিপদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

(৫) বেতন পরিমাণ (Salaries)

উপযুক্ত যোগ্যতা-সমন্বিত ব্যক্তিগণকে বিচারকার্যে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বেতন পরিমাণ যদি

তাঁহাদের পদমর্যাদা, দায়িত্বভার ও উচ্চমানের জীবনযাত্রার সহিত সংগতিপূর্ণ না হয় তাহা হইলে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। তাঁহাদের বেতন পরিমাণ এরূপ হওয়া চাই যাহাতে তাঁহারা প্রলোভনের উর্ধ্বে থাকিয়া নির্ভয়ে ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। তাঁহাদের কার্যকালের মধ্যে বেতন পরিমাণ পরিবর্তন করাও কাম্য নহে। বেতন পরিমাণ উপযুক্ত না হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিচারপতিপদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন অথবা গ্রহণ করিয়া কিছুদিন পর পদত্যাগ করেন।

(৬) শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকিকরণ (Separation of the Judiciary from the Executive)

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও সংরক্ষিত করিবার একটি অপরিহার্য শর্ত হইল বিচারবিভাগের শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকা। এই নিয়ন্ত্রণ মুক্তি না থাকিলে বিচারবিভাগ নির্ভীকভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ নিরোধ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। বহুদিন পূর্বে ফরাসী লেখক মণ্টেস্কু বিচারবিভাগের এই স্বাধীনতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বৃটিশ শাসনকালে ভারতে বিচারবিভাগের এ স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ধীরে ধীরে বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুপ্রীম কোর্টের কার্যপ্রণালী ও কর্মী নিয়োগ প্রধান বিচারপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট পরিচালনাব্যয়ও আইনসভার বাৎসরিক সম্মতি-নিরপেক্ষ করিয়া এই ব্যয়কে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়-বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পার্লামেণ্ট সভায়ও এই বিচারালয়ের কোন কার্য বা ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা হইতে পারিবে না।

আইনসভার সহিত শাসনকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক (Relation between the Legislature and the Executive)

সরকারের বিভিন্ন কার্য তিনটি পৃথক্ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইলেও প্রশাসনিক দক্ষতা অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত এই তিনটি বিভাগের সম্পূর্ণ

পৃথকীকরণ সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। প্রত্যেক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ়তর ও সদক্ষ করিতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দেশেই আইনসভার সহিত শাসন-বিভাগের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যোগসূত্র বর্তমান।

প্রথমতঃ, গ্রেট বৃটেন, ফরাসী দেশ বা ভারত, যেখানে পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে, সেখানে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রি-পরিষদের সমুদয় সদস্যই আইনসভার সদস্য এবং যতদিন তাঁহারা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন তাঁহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। নিছক নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার উপর নির্ভরশীল হইলেও কার্যতঃ বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কি নীতিনির্ধারণে, কি আইন-প্রণয়নে—সর্ববিষয়েই মন্ত্রিপরিষদ্ হইল সর্বেসর্বা। কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিতে পারেন। ফরাসী দেশের পূর্বতন পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিযাছিল। সেখানে আইনসভার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত এবং আইনসভা ইচ্ছামত মন্ত্রিপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত। এইজন্য ফরাসী মন্ত্রিপরিষদ্ অতিমাত্রায় আইনসভার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার স্থায়িত্ব গড়ে তিনমাসের অধিক হইত না। ভারতে আইনসভার সহিত মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক বহুল পরিমাণে গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ করিয়া গঠিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সেখানে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক চরম কর্মবিভাগ-নীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। উভয় বিভাগই পারস্পরিক প্রভাব হইতে যথাসম্ভব মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্য পরিচালিত করে। তবে রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার বিশেষ করিয়া উচ্চকক্ষ সিনেট সভার কিছু সম্পর্ক বিদ্যমান।

তৃতীয়তঃ, সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন করিয়া

শাসনব্যবস্থাকে যুগপৎ স্থায়ী ও দক্ষ করিয়া গঠন করা হইয়াছে। সুইস্ শাসনকর্তৃপক্ষের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা একাধিক সম-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি লইয়া গঠিত এবং আইনসভা কর্তৃক তাঁহাদের নীতি বা কার্যক্রম গৃহীত না হইলেও তাঁহারা আইনসভার মতের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

আইনসভার সহিত বিচারবিভাগের সম্পর্ক (Relation between the Legislature and the Judiciary)

অনেক লেখক বিচারবিভাগকে সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মর্যাদা না দিয়া আইনসভারই একটি প্রশাসনিক অংশ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু এরূপ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়—কারণ বিচারবিভাগ শুধু আইনসভা-প্রণীত আইনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ অন্য নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা ও তাহাদের বিবেক, বুদ্ধি ও ন্যায়বোধ প্রয়োগ করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি দ্বারা আইনসভা-প্রণীত আইনগুলিকে পরিপুষ্ট করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের উচ্চ বিচারালয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করে এবং শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু গ্রেট বৃটেন বা ফরাসী দেশের বিচারবিভাগ শেষোক্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে।

অপরপক্ষে আইনসভার উচ্চকক্ষ আপীল মামলার প্রধান বিচারালয়রূপে কায করে—যথা, গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা। এতদ্ব্যতীত ইহা শাসনকর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের অপরাধ বিচার করিবার অধিকারী। সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। গ্রেট বৃটেন ও ভারতে বিচারপতিদের অপসারিত করিতে হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের রাজা বা রাষ্ট্রপতিসকাশে যুক্ত আবেদন করিতে হয়।

শাসনকর্তৃপক্ষের সহিত বিচারবিভাগের সম্পর্ক (Relation between the Executive and the Judiciary)

বিচারবিভাগ যাহাতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে ইহার কার্য পরিচালনা

করিতে পারে, তজ্জন্য এই বিভাগকে শাসনকর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ করা হয়। অনুরূপ কারণে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকেও বিচারবিভাগের প্রভাবমুক্ত রাখা হয়। রাজা, রাষ্ট্রপতি বা গভর্ণরগণ সাধারণ বিচারালয়ের ক্ষমতাবহির্ভূত বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ফরাসী দেশে শাসনবিভাগীয় কর্মচারিগণের শাসন-সংক্রান্ত অপরাধের জন্য সাধারণ বিচারালয়ে বিচার হইতে পারে না। শাসন সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য পৃথক বিচারালয় আছে।

কিন্তু উভয় বিভাগের মধ্যে উপরি উক্ত স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও উভয় বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র বর্তমান। প্রথমতঃ, শাসনকর্তৃপক্ষ অনেক দেশে বিচারক নিযুক্ত করেন ও কিছু বিচারবিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন, যথা, প্রাণদণ্ড মকুব করা। অপরপক্ষে, বিচারবিভাগও অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসনবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচারপতিগণ তাঁহাদের বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সংকোচ বা সম্প্রসারণ করিতে পারেন।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ

শাসনকর্তৃপক্ষ—শাসনকার্যে নিযুক্ত কর্মচারিসমূহকে লইয়া শাসন-বিভাগ গঠিত হয়। শাসনকার্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদকে সাধারণতঃ শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়।

শাসনকর্তৃপক্ষীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক রাজা অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন। এইরূপ ব্যক্তি নামসর্বস্ব প্রকৃত ক্ষমতাশূন্য অথবা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভা-প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি-প্রধান হইতে পারে। সাধারণতঃ শাসনকর্তৃপক্ষ একক হয়। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শাসনকর্তৃপক্ষ হইল সমষ্টিগত। এরূপ ক্ষেত্রে শাসন-ক্ষমতা একহস্তে ন্যস্ত না হইয়া একটি সংসদের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়।

সুইজারল্যাণ্ডে সাফল্যমণ্ডিত হইলেও সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ-ব্যবস্থা অন্যত্র সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

শাসনবিভাগীয় কার্য—১। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রভৃতি শাসনবিভাগীয় কার্য, ২। বৈদেশিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করিবার জন্য কূটনৈতিক কার্য; ৩। যুদ্ধ পরিচালনা ও শান্তিস্থাপনের জন্য সামরিক কার্য, ৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা, ৫। বিচার-বিষয়ক কার্য।

বিচারবিভাগ ও ইহার কার্য—১। বিচারকগণ আইন প্রয়োগ করিয়া আইন-ভঙ্গকারীদের শাস্তি প্রদান করেন, ২। আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া নূতন আইনের সৃষ্টি করেন, ৩। অনেক সময় তাঁহাদের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াও নূতন আইন প্রণয়ন করেন, ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা তাঁহাদের আর একটি প্রধান কার্য।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা—প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা ও নিরপরাধকে অব্যাহতি দিয়া বিচারকগণ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করেন, এজন্য বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ছয়টি উপায় দ্বারা বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা যায়, ১। নিয়োগ পদ্ধতি, ২। কার্যকালের স্থায়িত্ব, ৩। উপযুক্ত বেতন, ৪। অপসারণ পদ্ধতি; ৫। যোগ্যতা ও ৬। শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ।

বিচারক নিয়োগ-পদ্ধতি—(১) জনগণ কর্তৃক অথবা (২) আইন সভা কর্তৃক বিচারকগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা দ্বারা বিচারপতিগণের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেজন্য (৩) শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ-পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Detail the powers of the Government which are embraced in the Legislature and the Executive. State the objection to the election of the Chief Executive by the Legislature.

আইনসভা ও শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত সরকারের ক্ষমতাসমূহের বিশদ বিবরণ দাও। আইনসভা কর্তৃক শীর্ষস্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের নির্বাচনের আপত্তিগুলি বর্ণনা কর।

2. What are the political, administrative and legislative functions of the Executive ?

শাসনকর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক, শাসনসম্পর্কিত ও আইনপ্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা কি কি ?

3. Explain the role of the judiciary in a modern state, and indicate the factors on which the independence of the judiciary depends.

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর এবং যে উপাদানগুলির উপর বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে তাহা দেখাও।

4. Discuss the principles of organisation of the judiciary in modern states.

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগ বিন্যাস নীতির আলোচনা কর।

5. Point out the importance and functions of the Judiciary in a modern state.

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের গুরুত্ব ও কার্যাবলী দর্শাও।

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি

(Theory of Separation of Powers)

রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রান্তর্গত জনসমষ্টির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। এই কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে সমাজ-মধ্যে এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে, যে পরিবেশে ব্যক্তিমাত্রই স্বীয় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। এইজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তিকে কতকগুলি অধিকার অর্পণ ও কর্তব্যের নির্দেশ দান করে। রাষ্ট্র-নির্ধারিত আইনের সাহায্যেই এই অধিকার ও কর্তব্য বলবৎ করা যায় ; সুতরাং আইন-প্রণয়ন, আইন বলবৎ ও পক্ষপাতশূন্যভাবে আইন প্রয়োগ করা হইল রাষ্ট্রের কার্য।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা (Necessity for Separation of Powers)

সরকারের কার্যাবলীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, আইনবিষয়ক, শাসনবিষয়ক ও বিচারবিষয়ক। এই তিন শ্রেণীর কার্য তিনটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। শাসনবিভাগ এই আইনগুলিকে বলবৎ করে, এবং বিচারবিভাগ আইনগুলির ব্যাখ্যা করে ও বিচারার্থ আনীত বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির জন্য আইনগুলির প্রয়োগ করে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগ স্বীয় কার্য পরিচালনার ব্যাপারে অপরের প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকারী হয়। যদি একাধিক ক্ষমতা অথবা তিনটি ক্ষমতাই একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তিসংসদের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচারের উদ্ভব হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

মতবাদের উৎপত্তি (Development of the Theory)

প্রাচীনকালে রাজা একাধারে এই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

তিনি আইন প্রণয়ন করিতেন, আবার শাসক হিসাবে জনগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন এবং বিচারকশ্রেষ্ঠ হিসাবে রাজাই আইনের প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে বিচারব্যবস্থা প্রহসনে পর্যবসিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার কবল হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই মতবাদ প্রবর্তিত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল ও রোমক দার্শনিকদের লেখার মধ্যে অস্পষ্টভাবে এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়। এই মতবাদকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া প্রথম প্রবর্তন করেন ফরাসী লেখক মণ্টেস্ক। মণ্টেস্ক তাঁহার *'L'Espirit De Lois'* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মূল নীতি বলিয়া প্রচার করেন। মণ্টেস্ক বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সরকারী সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহা হইলে নাগরিক জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। স্বৈরাচারের সম্ভাবনা রহিত করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনার অধিকারী হওয়া উচিত। সুতরাং মণ্টেস্ক ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মণ্টেস্কের পর ইংলণ্ডে ব্ল্যাক্‌স্টোনও এই মতের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি বিভাগকে বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ও স্বাধীন করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই নীতি অনেক দেশের শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী করা হইয়াছিল। বিপ্লবের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়, তাহাতে এই নীতির প্রযোগ বিশেষভাবে বলবৎ দেখা যায়। মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণও এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া শাসনব্যবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই নীতির উপর আর পূর্বের মত বাস্তব গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

সমালোচনা (Criticism)

সরকারী ক্ষমতা ও কার্যসমূহ তিনভাগে ভাগ করিযা তিনটি পৃথক্ বিভাগের মধ্যে বণ্টন করিযা দেওয়া হইয়াছে একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া

লওয়া হইলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক হইতে দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। সরকারের প্রত্যেক বিভাগেরই অন্য দুইটি বিভাগ-সংক্রান্ত কিছু-না-কিছু কার্য করিতেই হয়। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা এত জটিল যে, কোন বিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কার্য করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু আইনসভা একাদিক্রমে দুই-তিন মাস অধিবেশন পরিচালনা করিয়া কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে। তাহার পর পুনরায় দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। আইনসভার এই দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী কালে জরুরী প্রয়োজনে শাসনকর্তৃপক্ষই সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। বিচারবিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনের প্রয়োগ করা। কিন্তু অনেক সময় বিচারকগণ আইনের নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা বা আইনের অস্পষ্টতার জন্য নিজেদের ন্যায়বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন। অপরপক্ষে, আইনসভাকেও অনেক সময় বিচার-বিষয়ক কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কর্তব্যের ত্রুটি হইলে সাধারণতঃ আইনসভার উচ্চ পরিষদ্ এই বিচারকার্য করিয়া থাকে। শাসনকর্তৃপক্ষেরও অনেক সময় বিচারবিষয়ক কার্য সম্পাদন করিতে হয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই দুইটি বিভাগের কার্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি মন্ত্রিসংসদ চালিত শাসনব্যবস্থায় এই দুইটি বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দেখা যায় না যেখানে সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করা সম্ভব হইয়াছে। কি মন্ত্রিসংসদ্-চালিত শাসনে, কি রাষ্ট্রপতি শাসনে, সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার কার্যকারিতা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে উপরি-উক্ত উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অনুযায়ী তিনটি বিভাগ দ্বারা

সরকারের তিনটি প্রধান কার্য পরিচালিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রেট বৃটেনে শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সর্বাপেক্ষা কম অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রিসংসদের সদস্যগণ সকলেই আইনসভার সদস্য ও আইন-প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার আছে। মন্ত্রিমণ্ডলী আবার শাসনকার্যের প্রকৃত পরিচালক। লর্ড সভা আইনসভার একটি অংশ, কিন্তু ইহার কিছু কিছু বিচারক্ষমতাও আছে। ইংলণ্ডের রাজা শাসনকার্যের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনি আবার আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁহার কিছু বিচারক্ষমতাও আছে। লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড সভার সভাপতি, মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য ও ইংলণ্ডে প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। তিনি একাধারে তিনটি বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইংলণ্ডে কর্মবিভাগের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, অধিকন্তু অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক্। রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন বা প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখানেও তিনটি বিভাগের মধ্যে কিছু যোগসূত্র রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন, কিন্তু বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আইনসভার আইন বাতিল করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন ও পররাষ্ট্রের সহিত যে সমস্ত সন্ধি স্বাক্ষর করেন সেগুলি আইনসভার উচ্চপরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হওয়ার ফলে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদল একই রাজনৈতিক দলভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে সরকারের কর্মবিভাগ নীতি কিছু পরিমাণে কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শাসনপরিচালনা ব্যবস্থায় ক্ষমতার সংমিশ্রণ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে তিনি অর্ডিন্যান্স নামে অভিহিত বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন ও প্রাণদণ্ড-মকুব প্রভৃতি কয়েকটি বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকার তাঁহার আছে। ভারতের আইনসভা ও মন্ত্রি-মণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যদের আইনসভার সদস্য হইতে হইবে ও তাঁহাদের শাসনকার্যের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। অপরপক্ষে, মন্ত্রিসভার নির্দেশে রাষ্ট্রপতি আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইনসভাকে আহ্বান করা ও সাময়িকভাবে আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতে জিলার শাসনব্যবস্থায় কর্মবিভাগ নীতির অভাব বিশেষ-ভাবে দেখা যায়। জিলাশাসক একাধারে জিলার শাসনব্যাপারে সর্বময় কর্তা ও তিনি ফৌজদারী মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন বিচারপতি। শাসনবিভাগের কর্তা হইলেও জিলাশাসকের বিচারক্ষমতা আছে। বর্তমানে অবশ্য এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিতেছে। ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইন-সভার মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি প্রযুক্ত না হইলেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ যাহাতে শাসনকর্তৃপক্ষ-নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বিচারপতিগণের যে বেতন ও অন্যান্য ভাতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা আইনসভার বাৎসরিক অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না। নির্দিষ্ট বেতনে বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পর তাঁহাদের কার্যকালে (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) তাঁহাদের নির্ধারিত বেতনের পরিমাণ পরিবর্তন করা যায় না। পার্লামেণ্ট সভার প্রত্যেক কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যের আবেদনে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিচার-বিষয়ক কর্তব্যসম্পাদন বিষয়ে কোন আইনসভায় কোনপ্রকার আলোচনা চলিতে পারে না। এইরূপে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র বিচারবিভাগকে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ও নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি প্রকাশ্যতঃ অস্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং শাসনব্যবস্থায় এই নীতি কোন স্থান পায় নাই। সাম্যবাদী নেতৃবর্গ এই তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পুঁজিপতিদলের জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার একটি রাজনৈতিক কৌশল বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী দল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বিত্তহীনদের নানাভাবে শোষণ করে এবং এই পুঁজিপতিদল রাষ্ট্রের প্রকৃত ধনতান্ত্রিক রূপকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদের অবতারণা করেন। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের শাসনব্যবস্থায়ই এই নীতি কার্যতঃ প্রযুক্ত হয় নাই। মুষ্টিমেয় লোক এই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী।

সাম্যবাদিগণ এই নীতিতে আস্থাহীন। তাঁহারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া বিত্তহীন শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প। সুতরাং সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থায় তিনটি ক্ষমতাই প্রকাশ্যতঃ দলীয় নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সোভিয়েত দেশের শাসনব্যবস্থা বা পূর্বতন নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহার সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র সাম্যবাদী দল ক্ষমতার অধিকারী। এই দলের পলিট্ ব্যুরো নামক সংস্থা বিভিন্নভাবে সমগ্র শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সভার সংগঠন ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই নীতিতে আদৌ আস্থাবান্ নহেন এবং সেই কারণে তাঁহারা প্রকাশ্যতঃ এই নীতি বর্জন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত। কোন জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেরূপ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া কর্মক্ষম থাকিতে পারে না, তদ্রূপ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা চলে না। অত্যধিক পরিমাণে কর্মবিভাগের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া শাসনকার্যে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। ইহাতে শাসনকার্য ব্যাহত হয়।

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যের অবর্তমানে স্বৈরাচারী শাসন-

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এ যুক্তি সত্য নয়। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই কম অনুসৃত হইয়াছে, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অত্যধিক পরিমাণে কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের অপেক্ষা কম স্বাধীনতার অধিকারী নয়। গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যবিধানের উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীরা কখনই স্বাধীনতার অধিকারী হইতে পারিত না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হইল জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার আন্তরিক প্রয়াস ও আত্মসচেতনভাব।

পঞ্চমতঃ, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সম-ক্ষমতার অধিকারী হইতে হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই তিনটি বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বিভাগকে সম-ক্ষমতাবিশিষ্ট করাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশে আইনসভাই হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ অনেক বিষয়ে আইনসভার উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি বিভাগ সর্বোচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন না হইলে শাসনকার্য বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য আইনসভার নির্দেশ সর্বত্র চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতির চূড়ান্ত প্রয়োগের ফলে বিচারবিভাগ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিচারবিভাগকে আইনসভা ও শাসন-বিভাগের প্রভাবমুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যের বিচারপতিগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত বিচারকগণ যোগ্যতা অপেক্ষা জনপ্রিয়তার জোরেই নির্বাচিত হন। এইরূপে নির্বাচিত বিচারকেরা পুনর্নির্বাচনের জন্য জনমতকে খুশি করিবার উদ্দেশ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। নির্ভীক পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচার এইরূপে নির্বাচিত বিচারকদের নিকট হইতে আশা করা দুরাশা মাত্র। একটি রাজনৈতিক মতবাদকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগকে পঙ্গু করা হইয়াছে।

উপসংহার (Conclusion)

উল্লিখিত সমালোচনাগুলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নিছক নীতি হিসাবে অথবা শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী শক্তি হিসাবে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলবৎ হইলে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, অপরপক্ষে, ক্ষমতার একত্রীকরণে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইবে। সুতরাং ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের প্রকৃত তাৎপর্য কি?

বর্তমানে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগগুলি সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের নীতি বা প্রয়োগ বুঝায় না। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বর্তমানে দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, ক্ষমতার আংশিক স্বাতন্ত্র্য-করণ ও দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগগুলির কার্যাবলীর পৃথকীকরণ, কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী বা প্রয়োগকারীর পৃথকীকরণ অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয় না।

শাসনকার্যে সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী বিভিন্ন ধরনের। আইনসভার কার্য হইল সাধারণ ধরনের। আইনসভার সদস্যের কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হইলেও চলিতে পারে। সাধারণ জ্ঞান ও দায়িত্বসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তি আইনসভার সদস্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের ও বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগের সদস্যদের কোন কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া একান্ত আবশ্যক। শাসনকর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণে তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ধীর ও স্থির, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন এবং আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকটি বিভাগের কার্যেই কিছু বিশেষত্ব আছে এবং সেইজন্য একই ব্যক্তির দ্বারা এই তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। বিচারকের কার্য আইনসভার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না, কেন না বিচারপতিদের যে যোগ্যতা থাকা দরকার আইসভার সদস্যদের সেই জাতীয় যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। তিনটি কার্য বিভিন্ন বলিয়া এই কার্যগুলি বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিসংসদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই উচিত। কিন্তু এই পৃথকীকরণেরও একটা সীমা আছে। একটি যন্ত্র যেরূপ কতকগুলি প্রাণহীন অংশবিশেষের সমাবেশ, সরকারকে সেইরূপ কতকগুলি

ব্যক্তির সমষ্টি বলিয়া মনে করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। একটি ব্যাপক ও মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সরকার গঠিত হয় ও সরকারের কার্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি কার্য প্রত্যেকটি বিভাগ কর্তৃক একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে যোগসূত্রের অভাবে দেহের বিনাশ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্রের অবর্তমানে সরকারেরও বিনাশ সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। এই যোগসূত্রের জন্য বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকা একান্ত আবশ্যক। যাহারা নীতিগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সেই সমস্ত অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। এইরূপ কর্মবিভাগের দ্বারা কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও সরকারী কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানকে ধনবিজ্ঞানের শ্রমবিভাগ নীতির একটি প্রয়োগ বলা যাইতে পারে।

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার যুগে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যকরণ দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত করিবার প্রয়োজন আর নাই। বর্তমান যুগে সরকারের কার্যাবলী এত জটিল হইয়াছে যে, সরকারের সমুদয় কার্যই একব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। সেহেতু বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা অপেক্ষাও সরকারের কার্য যাহাতে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় সেইজন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন। কিন্তু এই কর্মবিভাগ এইরূপভাবে সাধিত হইবে যে, বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র, সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা বিনষ্ট না হয়।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা (Modern Interpretation of the Theory of Separation of Powers)

রাষ্ট্র-সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের পরিবর্তন অনুভূত হইতেছে।

ক্ষমতার আধার রাষ্ট্র বর্তমান যুগে কল্যাণ-রাষ্ট্রে রূপান্বিত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রের শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বর্তমানে রাষ্ট্রের জনহিতকর কার্যকলাপের উপব অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রধানতঃ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিছক শক্তি-ভিত্তিক রাষ্ট্র জনকল্যাণ সাধন করিতে পারে না। কল্যাণ রাষ্ট্রের সহিত পশুবলের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। সুতরাং উপরি-উক্ত নীতিটিকে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নামে অভিহিত না করিয়া বাষ্ট্রের কল্যাণকর কার্যকলাপের স্বাতন্ত্র্যবিধান নামে অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি বর্তমান রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের এই কল্যাণসাধন কার্য বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা আংশিকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না—এই কল্যাণসাধনের নিমিত্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে সমগ্রভাবে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সমুদয় কার্যকলাপই একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী সম্পাদিত হয়। পরিকল্পনার মূল নীতি হইল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে এক নিয়ন্ত্রণাধীনে একত্রিত করিযা পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সমষ্টির মঙ্গল সাধন করা। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ পৃথকীকরণনীতি অপেক্ষা সহযোগিতার উপর অধিকতর নির্ভরশীল। এইজন্য আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপে উপরি-উক্ত নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

কিন্তু তাই বলিযা শাসনব্যবস্থায় যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমান যুগে সর্বদেশে সর্ববিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসনকর্তৃপক্ষকে সংযত রাখিবার জন্য বিচারবিভাগীয় নির্দেশ (Judicial review) ও নিযমতান্ত্রিক বিধিনিষেধ বলবৎ থাকা একান্ত আবশ্যক।

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান—সরকারের তিনটি প্রধান কার্য আছে ও এই তিনটি কার্য তিনটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা সাধারণতঃ পরিচালিত হয়। আইনসভার কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। শাসনকর্তৃপক্ষ আইন বলবৎ

করে এবং বিচারবিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করিয়া বিরোধের মীমাংসা করে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অনুসারে সরকারের এই তিনটি কার্য পৃথক্‌ভাবে ভাগ করিয়া তিনটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। নতুবা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অপরিহার্য।

অ্যারিস্টটল প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদের লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ থাকিলেও ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্ককে এই মতবাদের জন্মদাতা বলা যায়। তিনি ও তৎপরবর্তী ইংরাজ লেখক ব্লাকস্টোন ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগেরই অন্য বিভাগের কিছু কার্য করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবক্ষেত্রে কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধান না থাকিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোনরূপ হানি হয় নাই। পরন্তু ইংলণ্ডের নাগরিকগণ এই বিষয়ে অন্য দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে সেখানে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয় ও এই নীতির প্রবর্তনে সেখানকার প্রাদেশিক বিচারবিভাগের অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমতঃ, জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে যেরূপ সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, সরকারের কর্মবিভাগের মধ্যেও সেইরূপ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে পরিমাণে কর্মবিভাগ প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সরকারের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কার্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the value and limitation of the Theory of Separation of Powers.

ক্ষমতা বিভাজন নীতির মূল্য এবং ত্রুটি আলোচনা কর।

2. "A rigid theory of separation of powers is neither possible nor desirable."

Discuss the statement with illustration.

"কঠোর ক্ষমতা বিভাজন নীতি সম্ভবও নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়।" উদাহরণ সহকারে এই উক্তিটি আলোচনা কর।

3. Discuss, in brief, the theory of separation of powers. What are the main limitations of the theory ?

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। এই মতবাদের প্রধান সীমাবদ্ধতা কি কি ?

———

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ

(Ends and Functions of the State)

প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম পরিণতি ব উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তি রাষ্ট্রগঠনের উপাদানমাত্র ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত স্বার্থ রাষ্ট্রবেদীমূলে অনায়াসে বলি দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা রাষ্ট্রবিহীন মানুষকে অতিমানব অথবা অতি নিম্নস্তরের জীব বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা সমগ্র মানব-জীবনের উপর রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রাষ্ট্র শুধু অপরাধ-নিবারণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গঠিত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত এক মনুষ্যসমাজ মাত্র নহে—ইহার আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানব-জীবনের নৈতিক উৎকর্ষসাধন করা যাহাতে মানুষ স্বাধীন ও সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং গ্রীক দার্শনিকদের মতে ব্যক্তি স্বাধীনতার একমাত্র উৎস ছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ব্যতীত ব্যক্তির অন্য কোনপ্রকার মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। গ্রীক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হইলেও রোমকগণ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর ধর্মযাজকগণ মানুষের ধর্মজীবনকে রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। টিউটন জাতি অতিমাত্রায় স্বাধীনতা-প্রিয় ছিল। তাহারা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। ফলে মানব-জীবনের উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব হ্রাস পাইয়া রাষ্ট্রসম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আর মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা চরম পরিণতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্তমান রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির একটা প্রধান সহায়ক বা উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়

রাষ্ট্র মানুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ রাষ্ট্রের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বর্তমানে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য (True end of State)

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি—এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। যতদিন পর্যন্ত বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল এবং রাষ্ট্র বংশানুক্রমিক শাসকগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন স্থায়ী মতবাদ গঠিত হইতে পারে নাই। শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থসাধনই ছিল রাষ্ট্রপরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল রাজনীতির অবসান ঘটিয়া ক্রমশঃ উদারনৈতিক রাজনীতির প্রবর্তন হয়। ফলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পাইয়া নানারূপ মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে।

রাষ্ট্রমধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নিয়মিত ব্যবস্থা করা, অথবা প্রগতিমূলক কার্য করা, অথবা ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করাকে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া অনেক লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। আবার মানুষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা অথবা জনহিতকর কার্য করা অথবা জাতীয় শক্তি বা মানব সমাজের সভ্যতা বৃদ্ধি করাকেই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। জার্মান লেখক ব্লুনৎস্লির মতে জনসাধারণের কল্যাণসাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। হিতবাদী (Utilitarian) দার্শনিকদের মতে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা বলেন যে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকার্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অধুনা অনেক লেখক রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটা সমাজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জনস্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি নানারূপ সমাজহিতকর কার্য করা।

কিন্তু বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির কোনটিই রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

সম্পর্কে ঐগুলি আংশিকভাবে সত্য হইলেও রাষ্ট্র যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সংগঠিত হইয়াছে, উপরি-উক্ত মতবাদগুলির কোনটির দ্বারাই সেই মহান্ উদ্দেশ্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। ডাঃ গার্ণার ও অধ্যাপক বার্জেস্ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—প্রাথমিক উদ্দেশ্য (Primary end), মাধ্যমিক উদ্দেশ্য (Secondary end) ও শেষ বা চরম উদ্দেশ্য (Ultimate end)। রাষ্ট্রের প্রাথমিক বা আপাত উদ্দেশ্য হইল শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ন্যায়পরতার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়তা করা। কিন্তু একমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষসাধনের সহায়তার দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সমষ্টিগত জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনের সাহায্য করা রাষ্ট্রের মাধ্যমিক উদ্দেশ্য। সমষ্টির উন্নতি ব্যতীত এককভাবে ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রকে সমাজের কল্যাণসাধন করিতে হইবে। ব্যক্তি যেরূপ সমাজদেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও ব্যক্তিগত উন্নতি যেরূপ সামাজিক উন্নতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কোন একটি জাতির জীবনও তদ্রূপ সমগ্র মানবসমাজের অংশ-বিশেষ ও জাতীয় জীবনের উন্নতিও তদ্রূপ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির উপর নির্ভরশীল। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে সমগ্র মানবসমাজের হিতকর কার্য করা রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের মধ্যে কোনরূপ সংঘাত না ঘটে।

জনকল্যাণ নীতি বা কল্যাণ-রাষ্ট্রের ভিত্তি (Welfare Theory or the basis of the Welfare State)

রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে একদিকে যেরূপ রাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে অপর দিকে তদ্রূপ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আকারে যেরূপ বৃহৎ, উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও তদ্রূপ ব্যাপক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরবর্তী কাল হইতে বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি সম্পর্কে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বতন রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণী-বিশেষ,

বিশেষ করিয়া শাসকশ্রেণীর স্বার্থসাধন করা। কোন রাষ্ট্রই জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং জনকল্যাণের জন্য কোন রাষ্ট্রই বিশেষ কোন প্রয়াস পায় নাই। কিন্তু জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থার ধারণা জনসমাজে বদ্ধমূল হইবার পর হইতেই জনকল্যাণ নীতি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু স্বীকৃতি লাভ করিলেও কোন দেশেই এই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে রূপদান করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইল এই জনকল্যাণ নীতি কী? জন বলিতে রাষ্ট্রান্তর্গত সমগ্র জনসমষ্টিকে বুঝায়, কল্যাণ বলিতে এই জনসমষ্টির সামগ্রিক মঙ্গল বুঝায়। যে রাষ্ট্র মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির পার্থিব, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য করে, সেই রাষ্ট্রকে **কল্যাণরাষ্ট্র** (Welfare State) বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ জনকল্যাণ সাধন করাই হইল সে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথায় বলিতে হয়, জনকল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সকল মানুষকে সুখী করা (To make all men happy)।

জনকল্যাণ নীতি যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রকর্ম পরিধির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নয়। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন রাষ্ট্র তাহাই করিবে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কোন ক্ষেত্রে জনকল্যাণের প্রতিকূল বিবেচিত হইলে রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মসম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতেই বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশগুলির সরকারী কর্মসূচী এই জনকল্যাণ নীতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির প্রচারমধ্যে ভারতে এই কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State) গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। জনকল্যাণ-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ নানারূপ আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রও এরূপ নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন

করিতেছে। অস্পৃশ্যতা বর্জন, জমিদারী প্রথার বিলোপ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি নানা বিষয়ে জনকল্যাণমূলক আইন প্রবর্তিত হইতেছে।

কল্যাণরাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে সমস্ত অন্তরায় দূর করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যাহাতে আদর্শ স্তরে উন্নীত হয়, সেজন্য সচেষ্ট থাকে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষা করে। দস্যু-তস্কর বা বিদেশী আক্রমণ হইতে জনগণকে রক্ষা করা কল্যাণরাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নহে। সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সুষম ব্যবস্থা করা, সুশিক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা কল্যাণরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বৃদ্ধাবস্থায়, বেকার অবস্থায় বা আকস্মিক বিপদকালে অসহায় নর-নারীগণকে সাহায্য করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

কল্যাণরাষ্ট্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই রাষ্ট্র শিক্ষাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ধিত হইবার সুযোগ দান করে। যে রাষ্ট্র শিক্ষা-প্রসারের অজুহাতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারী কুক্ষিগত করিয়া সরকারী নীতির সমর্থক করিতে চায়, সে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষের কৃষ্টিগত জীবনের উন্নয়ন কল্যাণরাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে কল্যাণরাষ্ট্র গ্রন্থাগার, নাট্যশালা, চলচ্চিত্র, যাদুঘর প্রভৃতি স্থাপনে সাহায্য করে এবং লেখক ও শিল্পী সম্প্রদায়কে পরোক্ষভাবে সরকারের স্তাবকে পর্যবসিত না করিয়া নানাভাবে তাহাদের সৃজনীশক্তি বৃদ্ধির সাহায্য করে।

দেশে ধনী-দরিদ্র থাকিলে উৎকট ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং এই ধনবৈষম্য হইল অশান্তির মূল কারণ এবং জাতীয় প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কল্যাণরাষ্ট্র সুষম কর ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সাহায্যে ধনবৈষম্য হ্রাস করিতে চেষ্টা করে।

কল্যাণরাষ্ট্র কৃষি, শিল্প, খনি, পরিবহণ, যোগাযোগ প্রভৃতি আর্থিক আয়ের উৎসগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণ সাহায্যে জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ সুগম করে। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মিশ্র অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, কল্যাণরাষ্ট্র হইল শ্রেণী স্বার্থের উর্ধ্বে। এই রাষ্ট্র ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিচালিত হয় না। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুবিধা সৃষ্টি করিয়া সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করা।

নীতি হিসাবে জনকল্যাণ নীতি গৃহীত হইলেও ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এই নীতি যদি নিছক এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা নির্ধারিত হয়—জনসাধারণকে এই নীতি নির্ধারণে কোন বক্তব্য না দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই নীতি শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীগত স্বার্থের দ্বারা দুষ্ট হইবে। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-প্রণীত আইন বা কোন কর্মসূচী জনসাধারণ যদি পীড়াদায়ক ও জনস্বার্থ-বিরোধী বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত হইলেও এরূপ নীতিকে 'জনকল্যাণ নীতি' বলা যায় না এবং এরূপ নীতি-নির্ধারক রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ট্র বলা চলে না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা নিহিত আছে।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of State Function)

রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে লেখকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সুদূরবিস্তারী হইবে, না ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে—এ সম্পর্কে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র-কর্তব্য সম্বন্ধে যে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহারা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—১। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ২। সমাজতন্ত্রবাদ। এই দুইটি মতবাদ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্র (Anarchism)

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ রাষ্ট্রের উপযোগিতা আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র মানব-জীবনের একটি প্রধান অভিশাপ। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্রের

কর্তৃত্ব নিছক পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পশুবল প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্র-মানুষকে তাহার বিবেকবুদ্ধিসম্মত কার্যে বাধা প্রদান করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নিজের হিতসাধনে সমর্থ। সুতরাং মানুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন নাই। তাই তাঁহারা যে-কোন উপায়েই হউক না কেন রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিয়া পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ দুই দলে বিভক্ত—দার্শনিক অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী (Philosophical Anarchist) ও বিপ্লবপন্থী অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী (Revolutionary Anarchist)। উভয় দলই রাষ্ট-বিরোধী ও যথাসম্ভব শীঘ্র রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু দার্শনিক অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রের বিনাশসাধন করিতে চাহেন না। তাঁহারা শিক্ষা দ্বারা জনমতকে রাষ্ট্রের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের বিলোপসাধনের পক্ষপাতী। রুশীয় দার্শনিক টল্‌স্টয় এই মতের একজন প্রধান সমর্থক। বাকুনিন্, ক্রোপট্‌কিন প্রভৃতি দার্শনিকেরা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আদৌ বরদাস্ত করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির দ্বারা রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিতে বদ্ধপরিকর।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—একথা স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না। রাষ্ট্রবিহীন সমাজে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগ-মানুষের হিতাহিতবোধের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু কার্যতঃ মানুষ এতটা হিতাহিতবোধসম্পন্ন নহে। সুতরাং মানুষকে সংযত ও ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া সমাজ-জীবনকে সফল করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অ-রাষ্ট্রতন্ত্রবাদের একটি মার্জিত সংস্করণ মাত্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি অভিশাপ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীদের মতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই। তাঁহাদের মতে মানুষের যতদিন স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের

অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রবণতা থাকিবে, ততদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে। মানুষ যেদিন নিষ্পাপ ও নিরহঙ্কার হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হইবে, সেদিন আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদীদের মতে রাষ্ট্র একটি অপরিহার্য পাপ। যতদিন মানব-সমাজে দুষ্কার্য থাকিবে ততদিন রাষ্ট্র একান্ত অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন যে, রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি যতই কম হয়, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের কার্যকলাপ কমাইয়া ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা। এতদতিরিক্ত কোন কার্যই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারিবে না। অন্য সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিবার পক্ষপাতী।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ শক্তিশালী মতবাদ বলিয়া অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিশারদগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়া রাষ্ট্র কর্তৃত্বের অত্যধিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ দেখা দেয়। উপরি-উক্ত লেখকগণ উৎপাদন ও বিনিময়ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিলোপ করিয়া শ্রমিক ও মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল্‌ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। মতামত-প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়াও মিল্ ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র নিছক ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটাইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ অভিরুচি অনুযায়ী কার্য করিবার সুযোগ দান করিলে প্রত্যেক মানুষ প্রকৃত সুখের সন্ধান পাইবে। মিল্ ব্যক্তিস্বাধীনতার একটিমাত্র সীমারেখার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা যদি অপরের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য ব্যক্তিগত আচরণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মিল্-প্রদত্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ডারউইন্-প্রদত্ত বিবর্তনবাদের সমন্বয়-

সাধন করিয়া প্রসিদ্ধ লেখক হার্বার্ট স্পেনসার্ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁহার মতে সমাজ-জীবনে মানুষ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় রত। এই প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া থাকে, আর যাহারা দুর্বল ও অক্ষম তাহারা অপসারিত হয়। জীবনযুদ্ধের এই স্বাভাবিক পরিণতিকে স্পেন্সার সমাজ-জীবনের অগ্রগতির সহায়ক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে আর্ত ও অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদান করিয়া এই স্বাভাবিক নিয়মকে ব্যাহত করা রাষ্ট্রের পক্ষে দূষণীয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Individualism)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতবাদের সমর্থনে অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহাদের প্রথম যুক্তি সহজাত ন্যায়পরতার (Ethical argument) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা বলেন, মানুষ হিতাহিত-বোধসম্পন্ন জীব। স্বীয় ইষ্ট সম্বন্ধে মানুষ সর্বদা সচেতন। সুতরাং রাষ্ট্রকর্তৃত্ব-বিমুক্ত হইলে মানুষ নিজের অভিরুচি অনুযায়ী কার্য করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা ও সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ফলে মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও কর্মক্ষমতা বিনষ্ট হয়। সুতরাং সুস্থ ও সবল ব্যক্তিত্ব-বিকাশের নিমিত্ত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অবসান হওয়া ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক।

দ্বিতীয়তঃ, ডারউইন-প্রদত্ত বিবর্তনবাদ (Biological argument) প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন জীবনযুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি হইল যোগ্যতমের জীবনধারণ ও দুর্বলের মৃত্যুবরণ। সুতরাং এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যোগ্যতমের বাঁচিয়া থাকা ও অক্ষমের মৃত্যুবরণ করা সমাজ-জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক। রাষ্ট্রের সাহায্য না পাইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে শুধু যোগ্যতম ব্যক্তিরা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিবে, অযোগ্য ব্যক্তিগণ অপসারিত হইবে। ফলে সামাজিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক যুক্তির (Economic argument) অবতারণা করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করেন। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা

অপেক্ষা প্রতিযোগিতার উপর তাঁহারা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষসাধন ও মূল্যহ্রাস হইবে। দ্রব্যমূল্য, মজুরির হার ও সুদের হার প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া স্বাভাবিক স্তরে থাকিবে।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা অতীতের অভিজ্ঞতার (Argument based on experience) দ্বারা তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র যে ব্যক্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে নাই, ইতিহাস তাহার প্রধান সাক্ষ্য। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই সরকারী প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাই তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ না করিয়া ব্যক্তিকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে তাহা হইলে ব্যক্তি রাষ্ট্রনিরপেক্ষ হইয়া আত্মবিকাশের চরম সুযোগ লাভ করিতে পারে।

পরিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের অক্ষমতার (Argument of State incompetency) উল্লেখ করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার অপরিহার্যতা প্রমাণিত করেন। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থ যতটা সুরক্ষিত হইতে পারে, রাষ্ট্র কর্তৃক সেরূপ সুরক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাষ্ট্রের উপর অত্যধিক পরিমাণে কার্যের ভার অর্পিত হইলে রাষ্ট্র কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারে না। ফলে, সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণের সম্ভাবনা অধিক হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যে সীমিত করিয়া মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলে তাহার চিত্তবৃত্তিগুলির চরম বিকাশ সম্ভব হইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Individualism)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অসারতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে অনেক যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি পাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ-কথা প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্র-

প্রবর্তিত কোন কোন নীতি বা কার্যক্রম ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য রাষ্ট্রের অবসান দাবী করা আর সময় সময় এরোপ্লেন-দুর্ঘটনা হয় বলিয়া এরোপ্লেনকে বাতিল করা একই মনোভাবের পরিচায়ক। রাষ্ট্র মানবজীবনের অগ্রগতিকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে নাই বলিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা আর পুত্র কর্তৃক দরিদ্র পিতার পিতৃত্বদাবী উপেক্ষা করা একই মনোভাবের পরিচায়ক। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রগতিতে রাষ্ট্রের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। সকল দেশের ইতিহাসেই এই সাক্ষ্য প্রদান করে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তিই তাহার নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সকল সময়ে অবহিত নহে। কোন্‌টি স্বার্থের অনুকূল ও কোন্‌টি স্বার্থের প্রতিকূল মানুষ সর্বদা তাহা স্থির করিতে পারে না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দূষিত খাদ্য ও অনিষ্টকর আমোদ-প্রমোদের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে অশিক্ষিত ও অজ্ঞলোকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও অনেক সময় পরিণাম চিন্তা না করিয়া অনেক আত্মঘাতী কার্যে লিপ্ত থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের অজুহাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় না। ব্যক্তির প্রকৃত সুখের জন্যই ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকা উচিত।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ যত অধিক হয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা সেই পরিমাণে হ্রাস পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থনযোগ্য নয়। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। রাষ্ট্র-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দুর্বল, অসহায় ব্যক্তির দাসত্বের কারণ হইয়া পড়ে। সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান ঘটাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে সহায়তা করে।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিবর্তনবাদের সাহায্যে তাঁহাদের মতবাদ-সমর্থনের যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও বর্তমানে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে যাহাতে শুধু যুদ্ধক্ষম যোগ্য ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারে ও অক্ষম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য তাঁহারা দুর্বল ও অক্ষমের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তস্করকে শাস্তি দেওয়া যদি রাষ্ট্রের

অবশ্যকরণীয় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে দুর্বলকে সাহায্য দ্বারা সবল করিয়া তোলা রাষ্ট্রকর্তব্য হিসাবে কি কারণে পরিগণিত হইবে না—ইহার কোন সদুত্তর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা দিতে পারেন না। সামাজিক সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য শুধু দুষ্টের দমনে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না—শিষ্টের পালনও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

পঞ্চমতঃ, তাহারা অনাবশ্যকরূপে সরকারী কার্যের ভুল-ত্রুটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু রাষ্ট্র-কার্যকলাপের দ্বারা এযাবৎ মানব-সমাজের যে অপরিসীম উন্নতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ও নীরব থাকেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থা এরূপভাবে গঠিত যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত স্বার্থসংরক্ষণ সম্ভব নয়। বাস্তবক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে প্রায় সকল দেশেই কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ গঠনমূলক কার্য সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

পরিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, সুযোগ-সুবিধার অভাবে অধিকাংশ লোক তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সকল সময় সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয় বলিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির স্বার্থসংরক্ষণ ও হিতসাধনের জন্য সর্ববিধ কার্যে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলি তাহাদের কার্যকলাপ দ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহা দ্বারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আধুনিক ব্যাখ্যা (Modern Individualism)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়ারূপে রাষ্ট্রের যে আদর্শবাদ (Idealism) ও সমষ্টিবাদের (Collectivism) সৃষ্টি হয় তাহার ফলে ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এই আদর্শবাদ ও সমষ্টিবাদের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। সুতরাং প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বর্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জন্মলাভ করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পুনরভ্যুত্থানের প্রথম ও প্রধান কারণ হইল হেগেল প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণের প্রবর্তিত আদর্শবাদ—যাহার ফলে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক ও অতিমানবীয় অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া রাষ্ট্র এক সর্বশক্তিমান্ ও চরম ক্ষমতার অধিকারী সংগঠনের মর্যাদা লাভ করে। ফলে, ব্যক্তিগত জীবনের প্রাথমিক অধিকারগুলিও রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন হয়। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে গণতন্ত্রের নামে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তথা রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের সংখ্যালঘু দলের উপর অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার আরম্ভ হইল, তাহাতে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের অধিকার রক্ষায় তৎপর হয়। তৃতীয়তঃ, প্রথম বিশ্ব-মহাসমরের ফলে জীবন ও ধনের ব্যাপক অপচয় লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণ রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠে,—এমন কি রাষ্ট্রের উপযোগিতা সম্পর্কেও জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়। চতুর্থতঃ, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। মানুষের সামাজিক, ধর্মসম্পর্কীয়, কৃষ্টিগত বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পাদন করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত বিশাল আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্রের অভ্যুত্থানে ব্যক্তিস্বাধীনতা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। উপরি-উক্ত কারণগুলির সমন্বয়ে বর্তমান রাষ্ট্রগুলি যে সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

আধুনিক যুগে নরম্যান্ এঞ্জেল, গ্রাহাম্ ওয়ালেস্, মিস্ ফলেট্ প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ এই মতবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। নরম্যান্ এঞ্জেল তাঁহার 'Great Illusion' নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রকে একটি শাসনযন্ত্র-বিশেষ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, যখনই বর্তমান শাসনযন্ত্র অপেক্ষা কোন অধিকতর উপযোগী শাসনযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে তখনই বর্তমান ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে। প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বর্তমান রাষ্ট্র মানুষের কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হয় নাই বা নাগরিক জীবনের উপর বর্তমান রাষ্ট্রের যে দাবী তাহা কোন

নৈতিক বা ঐশ্বরিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। রাষ্ট্রভুক্ত জনসমূহের ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন পৃথক্ অতিমানবীয় অস্তিত্ব বা ইচ্ছা নাই। গ্রেহাম ওয়ালেস্ পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রথাকে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার একটি কৌশলমাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিসমষ্টি লইয়া গঠিত সমাজস্থিত নানা জাতীয বিশেষ করিযা অর্থ নৈতিক সংঘগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, বর্তমান যুগের বিশালায়তন ও বিশাল জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা একরূপ অসম্ভব। সেইজন্য প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংঘগুলি প্রথমতঃ, ব্যক্তিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহারা ইহাদের সদস্যগণের বিশেষ চিন্তাধারা ও স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের সহায়তা করে। সুতরাং রাষ্ট্র অপেক্ষা এই সংঘগুলিই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অধিকতর সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি লইয়া গঠিত সংঘ ও রাষ্ট্র—এই তিনের সম্পর্কের সামঞ্জস্যবিধানের উপর প্রত্যেকটির স্থায়িত্ব ও অধিকার নির্ভর করে। বহুত্ববাদিগণ (Pluralists) সংঘগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু মিস ফলেট্ প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে এই তিনটির কোনটিরই গুরুত্ব কম নহে। মানুষের মধ্যে যে অগ্রগতির ও মনুষ্যত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা আছে, তাহা একমাত্র সমষ্টিগত জীবনের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তি ও সমষ্টি—কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। ("Man discovers his true nature, gains his true freedom only through the group.")

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপসম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাহারা রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষলাভের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং এই কারণে

তাঁহারা রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সকল সময় ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য সমাজের অধিকাংশ লোক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পূর্ণ-সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সমস্ত ব্যক্তির আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক কল্যাণসাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই ব্যক্তিগত জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না, তাই তাঁহারা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী। অপরপক্ষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তিগত ক্ষমতায় আস্থাবান্, তাই তাঁহারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন। সুতরাং ব্যক্তির সর্ববিধ কল্যাণ-বিধান করাই হইল উভয় দলের উদ্দেশ্য। কিন্তু একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও কার্যক্রমের দিক দিয়া উভয় দলের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা মূলতঃ নির্দিষ্ট কার্যক্রমসমন্বিত একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া ইহা একটি রাজনৈতিক মতবাদ বলিয়া পরিগণিত হয়।

অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, প্রধানতঃ তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমি-জায়গা, কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হওয়ার ফলে সমাজে যে ধনবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ দেখা দেয়, সমাজতন্ত্রবাদীরা সর্বসাধারণের হিতার্থে তাহা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার অবসান ঘটাইতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। ব্যক্তিগত মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সম্পদ্-উৎপাদন ও বণ্টনের যে ব্যবস্থা

বর্তমানে সমাজে প্রবর্তিত আছে, সমাজতন্ত্রবাদীরা তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রচলিত করিয়া সামাজিক প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া ধনবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইলে মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য বর্তমানে যে অধিকাংশ লোককে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহার অবসান ঘটিবে। পরন্তু অর্থনৈতিক জীবনে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হইবে, যাহার ফলে সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের পরিবর্তে সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-সমিতি সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে। ফলে, প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি, বাণিজ্যচক্র, বেকারসমস্যা প্রভৃতি ব্যক্তিগত মালিকানা-পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইয়া অর্থনৈতিক জীবনে অপেক্ষাকৃত স্থিতাবস্থা আনীত হইবে। রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জাতীয় জীবনে যে অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহার ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই এই মতবাদ অল্পবিস্তর পরিমাণে প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ (Different Forms of Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদীরা একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং কার্যপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে সমাজতন্ত্রবাদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

১। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ (Utopian Socialism)

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি 'রিপাব্লিক' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। প্লেটো কর্তৃক পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক বন্ধনমুক্ত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। শাসকশ্রেণী যাহাতে আপন-পর-ভেদবুদ্ধি-মুক্ত হইয়া অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ

করিতে পারেন সেজন্য প্লেটো তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক বিবাহবন্ধন দ্বারা পরিবার-সংগঠন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দ্বারা পরবর্তী যুগের যে সমস্ত লেখক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে টমাস্ মূরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর তাঁহার 'ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মূরের পরবর্তী কালে ফরাসী লেখক সেণ্ট সাইমন, ইংরাজ লেখক রবার্ট ওয়েন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা-বর্জিত নিছক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া এই দার্শনিকদের কাহারও পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই।

২। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Scientific or Marxian Socialism)

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ মুখ্যতঃ কার্ল মার্কস্-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মার্কস্ 'দাস ক্যাপিটাল' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রবাদের এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পরবর্তী যুগের সমাজতন্ত্রবাদীরা মার্কসীয় নীতি দ্বারা বহুল পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানতঃ তিনটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হইল উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্র (Theory of Surplus Value); দ্বিতীয়টি হইল ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of History) এবং তৃতীয়টি হইল শ্রেণী-সংগ্রাম মতবাদ (Theory of Class Struggle)।

মার্কসের মতে একটি সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে উহা উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় করা হইয়াছে তাহার উপর। যে সামগ্রী উৎপাদন করিতে অধিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার উৎপাদন-ব্যয় হয় অধিক এবং সেইজন্য তাহার বিনিময়মূল্যও হয় অধিক। অপরপক্ষে, স্বল্প পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময়মূল্য কম। সুতরাং মার্কসের মতে সামগ্রীমূল্যের একমাত্র নির্ধারক হইল সমগ্র-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ। কিন্তু শ্রমিকেরা যে-পরিমাণ মজুরি পায় তাহা তাহাদের প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম অর্থাৎ একটি

সামগ্রী বাজারে যে মূল্যে বিনিময় হয় তদপেক্ষা শ্রমিকেরা কম হারে মজুরি পায়। সামগ্রীর বিনিময়মূল্য, যাহা প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরির পরিমাণ এই উভয়ের পার্থক্যকেই মার্কস্ উদ্বৃত্ত মূল্য আখ্যা দিয়াছেন। উৎপাদিত সামগ্রীর এই উদ্বৃত্ত মূল্য অন্যায়ভাবে মালিকগণ আত্মসাৎ করিয়া শ্রমিকদের তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্তমান থাকার জন্য মালিকগণ উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি, যথা—বিভিন্ন কৃষি-জাত ও খনিজ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতির উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উৎপাদনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি ব্যতীত উৎপাদন অসম্ভব এবং এই উপাদানগুলি মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর করায়ত্ত বলিয়া শ্রমিকগণ মালিকশ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শ্রম দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মূল্যের সামান্য একটি অংশ মালিকগণ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ তাহারা মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করিয়া থাকে। মার্কসের মতে মুনাফা আইনসিদ্ধ চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা দ্রব্যমূল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের উপর। যাহারা এই শ্রম প্রয়োগ করে, মালিকেরা তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রযুক্ত শ্রমের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রদান করে। উৎপাদনের এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে নূতন আকারে এক নূতন দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করিয়া অধিকতর ধনবান্ হইতেছে ও শ্রমিকগণ ক্রমশঃই অধিকতর নির্ধন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এরূপ অসম ব্যবস্থা সমাজ-জীবনে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে সমাজ-জীবনে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, যাহার ফলে পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়া নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। ইতিহাসে এরূপ নজির দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য মার্কস্ ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মার্কস্ বলেন, মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন তাহার অর্থনৈতিক জীবনের একটা প্রতিবিম্বমাত্র অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক

জীবনের কাঠামো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে-কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাসমাত্র। এই **শ্রেণী-সংগ্রাম-ই (Class War)** হইল মার্কস-প্রদত্ত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার ভিত্তি। মার্কস্ বলেন, প্রত্যেক দেশে যে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীভেদ ছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রাচীন রোমে প্যাট্রিসীয়, প্লিবীয় ও ক্রীতদাস শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। মধ্যযুগে ভূম্যধিকারী অভিজাত ব্যারনশ্রেণী ও ভূমিহীন কৃষি ভৃত্যশ্রেণী দেখা যায়। বর্তমান যুগে মালিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত। অতীত যুগে যেরূপ প্যাট্রিসীয় ও ব্যারনশ্রেণী সমাজের সমস্ত সুখ-সুবিধার অধিকারী ছিল, বর্তমানেও সেইরূপ মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী আধিপত্য ভোগ করে। বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক রূপ হইল ধনতান্ত্রিক; ফলে, সমাজ-জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনের কাঠামোও সেইরূপে গঠিত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় ধনিক মালিক তাহাদের অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন সমাজের সকল শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য পরিচালিত না হইয়া মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর মুনাফাবৃদ্ধিকল্পে পরিচালিত হইতেছে। ফলে, সমাজ-জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে অন্যায়, অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। এইরূপে যুগে যুগে শ্রেণীতে শ্রেণীতে অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে। মার্কস্ আশাবাদী ছিলেন। তাই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার ধ্বংসের বীজ উপ্ত আছে। কালক্রমে বিত্তবান্ ও বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইবে তখন বিত্তহীনেরা সংঘবদ্ধ হইয়া বিত্তবানের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে চরম আঘাত হানিবে সেই আঘাতের ফলে ধনতন্ত্রের বিনাশ ঘটিবে।

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Marxian Socialism)

মার্কসীয় মতবাদের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। সমালোচনাগুলির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ তাহার উদ্বৃত্ত-

মূল্য-সূত্রের অসারতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন, 'শ্রম' শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট। কারণ একরূপ বিভিন্ন ধরণের শ্রম আছে যাহাদিগকে এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া এক মাপকাঠিতে তাহাদের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যদি বলা হয় যে, সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন শ্রমই হইল প্রকৃত শ্রম, তাহা হইলেও এই জাতীয় শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়, কারণ অধিকতর সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন হইলেও চাহিদার তীব্রতা না থাকিলে সে শ্রমের মূল্য অধিক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণে যোগান বা সরবরাহের প্রভাব আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। দ্রব্যের সরবরাহ দ্রব্যটির সহজ-প্রাপ্যতা অথবা দুষ্প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। যে দ্রব্য যত অধিক দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান্, তাহা যে অধিক শ্রমপ্রয়োগের দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহা সকল সময় সত্য নয়। সুতরাং একটি দ্রব্য-সরবরাহ যে-সমস্ত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, সেগুলিকে মার্কসীয় সূত্র সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। তৃতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য যে সম্পূর্ণরূপে দ্রব্য-উৎপাদনের প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, ইহাও গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিযোগিতার হ্রাস-বৃদ্ধি, মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ, উৎপাদনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণ প্রভৃতি নানা বিষয় মূল্যনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।

মার্কস্-প্রবর্তিত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা যে একমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, এ কথা বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়। মানুষ শুধু তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জীবনধারণ করে না, আরও মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত মানুষ যুগে যুগে বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। মার্কস্ মানব-ইতিহাসের শুধু দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দিকটাই দেখিয়াছেন, কিন্তু মানুষ এই দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া কিরূপভাবে গঠনমূলক কার্য দ্বারা ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মহাপুরুষগণের আবির্ভাব, ধর্মসংগঠনের অভ্যুত্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা মানবজাতির ইতিহাসের ধারা যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে ইহা অনস্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত মার্কস্ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ

অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই বা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবার প্রয়োজনও নাই। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি দেখা যায়, সে সমস্ত দোষ-ত্রুটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ দ্বারা বহুল পরিমাণে দূর করা সম্ভব হইয়াছে এবং অনেক দেশে নিছক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা নিছক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে উভয়ের সমন্বয়ে প্রয়োজনানুরূপ মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তনে অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, মার্কসীয় নীতিতে পূর্ণ আস্থাবান্ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হয় নাই।

মার্কসীয় মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হইলেও এ-কথা সত্য যে, মার্কস্ তাঁহার উদ্বৃত্ত-মূল্যতত্ত্ব প্রচার দ্বারা শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করেন। মার্কসের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তথাপি এ-কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের অর্থনৈতিক প্রযোজনজনিত কর্মপ্রচেষ্টা মানুষের ইতিহাসের গতিকে অনেক পরিমাণে সুনির্দিষ্ট করিয়াছে। শ্রমিকেরা যে মালিকগণ কর্তৃক পূর্বে শোষিত ও নির্যাতিত হইত এবং শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া এই নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধ করিতে বর্তমানে সমর্থ হইয়াছে, ইহাও অনস্বীকার্য।

মার্কসের পরবর্তী সমাজতন্ত্রবাদিগণ মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও টীকা করিয়াছেন। তাহার ফলে মার্কসীয় নীতি নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা প্রধানতঃ দুই জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে, যথা—**বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Evolutionary Socialism) ও বিপ্লবপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ (Revolutionary Socialism)**। বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকগণ সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী ও রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া পরিচিত; অপরপক্ষে বিপ্লবপন্থীদের অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদী, সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদী বলা হয়।

৩। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (Collectivism)

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত-

করণ দাবী করেন। ইঁহারা বলপ্রয়োগ নীতি পরিহার করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। ইঁহাদের মতে উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে; অপরপক্ষে বিনিময় ও ভোগব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হইবে। তাঁহাদের মতে সমাজে বিশেষ সুবিধা-ভোগী কোন শ্রেণী থাকিতে পারিবে না। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীরা আইনসভা-প্রধান গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়াই তাঁহারা বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিসাধন করিবার পক্ষপাতী।

৪। রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism)

জার্মান লেখকগণ সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদকে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মূলতঃ, উভয় মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। শ্রমিকেরা তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণ করিতে অক্ষম, সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রকেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রধান রক্ষক বলিয়া বিবেচনা করেন। এইজন্য তাঁহারা উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণ-রূপে রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। বৃদ্ধবয়সের ভাতা, শ্রমিক-জীবনবীমা, কারখানা-সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি শ্রমিক-কল্যাণকর নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিয়া শ্রমিকের কল্যাণসাধন করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন।

৫। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ (Fabian Socialism)

জর্জ বার্ণাড শ' প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ মনস্বীর হস্তে সমাজতন্ত্রবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীদের মত ইঁহারাও জবরদস্তিমূলক উপায় দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যপ্রচারের মধ্য দিয়া জনমতকে সুশিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অধিকতর সমীচীন। এইজন্য ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদীরা নূতন এক ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়া এই অভিযানের ফলে ইংলণ্ডের জনমত কিছু পরিমাণে

ধনতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদীরা অবশ্য সাহিত্যের মারফত প্রচারকার্য ছাড়া সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন নাই। ইংলণ্ডের শ্রমিকদল ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদী কর্তৃক প্রবর্তিত অনেকগুলি নীতি কার্যকরী করিয়াছেন।

৬। খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Christian Socialism)

খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থার প্রধান কারণ হইল প্রতিযোগিতা। তাই তাঁহারা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকদের মধ্যে সমবায়-পদ্ধতিতে উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন।

৭। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism)

এই মতবাদ তিনটি মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, শ্রমই হইল ধনোৎপাদনের একমাত্র উপাদান। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানার অধিকারী হইল শ্রমিকেরা। তৃতীয়তঃ, এই মালিকানাস্বত্ব লাভের জন্য ধর্মঘট প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্য ন্যায়সঙ্গত। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীরা শ্রমিকসংঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির দ্বারা বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকসংঘের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর। ইহারা রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় আদৌ বিশ্বাসী নহেন, সেইজন্য ইহারা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পুনঃপুনঃ সর্বাত্মক ধর্মঘট চালাইয়া রাষ্ট্রসংগঠনকে বিপর্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন করিয়া ইহারা মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে একমাত্র শ্রমিকসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই মতবাদ ফরাসী দেশে প্রাধান্য লাভ করে।

৮। সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism)

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়সাধন করিয়া সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা

প্রদান করিয়াছেন। তাহারা রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় আদৌ আস্থাবান্ না হইলেও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীদের মত রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিতে চাহেন না। তাঁহারা সমাজস্থিত বিভিন্ন সংগঠনগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা উৎপাদনব্যবস্থার জাতীয়করণ স্বীকার করিলেও রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার অভাবের নিমিত্ত উৎপাদনব্যবস্থা রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত না করিয়া শ্রমিক, পরিচালক ও কারিগর লইয়া গঠিত সমিতিগুলির হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সংগঠিত সমিতিগুলি ছাড়াও ইঁহারা সমাজের অন্য নানাবিধ সমিতিগুলির উপযোগিতা স্বীকার করেন। তাহারা বলেন, অর্থনৈতিক সমিতিগুলির এবং সামাজিক অন্যান্য সমিতি-গুলির সহযোগিতায় মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভব হয়। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের হস্তে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে অর্থনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও অযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এইজন্য তাহারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা বণ্টন করিয়া সমিতিগুলির হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছুক। জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই সমিতিগুলির কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এইরূপে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা তাঁহারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

৯। সাম্যবাদ (Communism)

সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের পরিকল্পিত নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপেক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সাম্যবাদিগণ তাহাদের দল পুষ্ট করিবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে সাম্যবাদী দল গঠন করিয়া ধীরে ধীরে সমাজের সর্বক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন। এরূপে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিবার পর তাঁহারা বলপ্রয়োগপূর্বক ধনিক ও মালিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক প্রভৃতি বিত্তহীনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সাম্যবাদিগণ ধনিক মালিকশ্রেণীকে নির্মূল করিয়া সমস্ত বিরোধিতার অবসান ঘটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর। ইহার

ফলে এমন এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র প্রভৃতির কোন পার্থক্য থাকিবে না। শ্রেণীহীন যে নূতন সমাজব্যবস্থা গঠিত হইবে তাহাতে কি উৎপাদনে, কি ভোগে কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকিবে না। প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত পরিশ্রম করিবে, কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। মানুষের সমগ্র জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসাবে তাহার নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করিবে ও রাষ্ট্রনির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট মান অনুসারে তাহার খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। সন্তানসন্ততিগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বেকারসমস্যা, বাণিজ্যচক্র বা শ্রমিক মালিক বিরোধের চিরতরে অবসান ঘটিবে। এরূপ ব্যবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কোনরূপ বিনিময়ের প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভূত হইবে না। অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে মানুষ আর মুনাফার লোভে ধনোৎপাদন করিবে না। এইরূপে সমাজব্যবস্থায় পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সাম্যবাদী ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইলে রাষ্ট্রসংগঠন বিলীন হইবে।

শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলেও সাম্যবাদিগণ অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীদের ন্যায় রাষ্ট্রকে অচিরাৎ ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। সাম্যবাদিগণ মনে করেন, বর্তমান রাষ্ট্রসংগঠনের শক্তির সাহায্যে সাম্যবাদী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে মানুষ যখন পূর্ণ-সমাজচেতনাসম্পন্ন হইবে, তখন রাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিলুপ্ত হইবে। মানুষ হিতাহিত-জ্ঞানসম্পন্ন হইলে বহির্নিয়ন্ত্রণের আর কোন প্রয়োজন অনুভূত হইবে না। সমাজতন্ত্রবাদিগণ শুধু উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, কিন্তু সাম্যবাদিগণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের উগ্র সমর্থক। সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবন উভয়েরই বিনাশসাধন করিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদেবতার বেদীমূলে উপহার দিবার পক্ষপাতী।

মার্কসীয় মতবাদ ও পরবর্তী কালে লেনিন-প্রদত্ত মার্কসীয় মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই উভয় চিন্তাবীরই সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাকে দুইটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল বিপ্লব যুগ (Revolutionary Stage) এবং দ্বিতীয়টি হইল বিপ্লবোত্তর যুগ (Post-Revolutionary Stage)। বিপ্লব যুগে ধনিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শ্রমিকগণ ধনিকশ্রেণীর নিকট হইতে বলপূর্বক সমুদয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবে। এই অবস্থায় প্রকৃত কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রক্ষক হইবে। কাজ অনুসারে বেতন নির্ধারিত হইবে এবং নির্ধারিত বেতন অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিবার ফলে এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ তাহার পরিশ্রমলব্ধ আয় হইতে বঞ্চিত হইবে না। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনব্যবস্থা কোন শ্রেণী-বিশেষের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বজনের হিতার্থে পরিচালিত হইবে। এই শ্রেণীহীন অবস্থাকে বিপ্লবোত্তর যুগ বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রত্যেকে সামর্থ্যানুসারে কাজ করিবে ও প্রয়োজনানুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় অর্থের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদানের প্রথা বিলুপ্ত হইবে। এইরূপে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে লোপ পাইবে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদ (Bolshevism or Communism in the U. S. S. R.)

একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অভিব্যক্তি দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মার্কস-প্রবর্তিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উদ্বৃত্তমূল্যের সূত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া মার্কস্ সমাজতন্ত্রবাদের যে অভিনব রূপ দিয়াছিলেন, রুশীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ নির্বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া সাম্যবাদের গোড়াপত্তন করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর রুশীয় সাম্যবাদিগণ পূর্বতন সমাজব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করিয়া এক অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁহারা বল-

প্রয়োগে জারতন্ত্রের সহিত সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া যে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা মানুষের আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পাইল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর রুশীয় সাম্যবাদিগণ মার্কস্-প্রবর্তিত নীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জমি জায়গা, কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে কিছুদিনের পরে দেশের উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গেল, কারণ কৃষকশ্রেণী তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ শস্য উৎপাদনে বিরত থাকিল। ইহা ছাড়া, নবগঠিত সরকার পূর্বতন সংগঠক ও কারিগরদের সহযোগিতা-লাভে বঞ্চিত হইল। বিদেশ হইতেও প্রয়োজনের অনুরূপ উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী আমদানি করিবার সম্ভাবনা রহিল না। ফলে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যে, সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের অনুসৃত নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক নববিধান প্রবর্তন করিয়া একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রবর্তন করিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রুশীয় সাম্যবাদের এক নতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীনে অতিকায় বহরে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য বৃহদায়তনের যৌথ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কৃষকদের আপত্তি সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে নির্মমভাবে তাহাদিগের জমি-জায়গা ও গৃহপালিত পশু-পক্ষিসহ এই যৌথ-কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিতে বাধ্য করা হয়। এইরূপে পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা সাম্যবাদিগণ কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিয়া দেশকে বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন। দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে বেকার-সমস্যা, বাণিজ্যচক্র, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য কুফলগুলি দূর হইয়া জাতীয় জীবনের মান অনেক পরিমাণে উন্নত হইল। বহুদিনব্যাপী অন্যায়, অত্যাচার, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে রুশ

জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; সাম্যবাদিগণ রাষ্ট্রপ্রবর্তিত সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার করিয়া জাতীয় চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। শিক্ষাবিস্তারের ফলে জাতীয় জীবন যখন কুসংস্কারমুক্ত হইয়া স্বাধীন ও সাবলীল হইল তখন সাম্যবাদিগণ এই নতনভাবে অনুপ্রাণিত জনগণের সাহায্যে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্যবিদ্যা, খেলাধুলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে এরূপ অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিলেন যে, শত্রু মিত্র সকলেই চমৎকৃত হইল। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন করিবার উদ্দেশ্যে সাম্যবাদিগণকে অনেক নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করিতে হইয়াছে। সাম্যবাদী নীতিতে আস্থাহীন বিরোধী পক্ষকে বর্বরোচিত পদ্ধতিতে অপসারিত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক বিবেচিত হইলে যে-কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রচলিত লোকধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া সাম্যবাদিগণ জাতীয় জীবনে যে নতন অধ্যায়ের সূচনা করিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির পর সাম্যবাদিগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় জীবন যখন নানাভাবে সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন তখন জনসাধারণ ধীরে ধীরে সাম্যবাদের মূল নীতির প্রতি আস্থাবান্ হইয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করিল। যৌথ কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিতে প্রথমতঃ কৃষকগণ আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু যৌথ কৃষিক্ষেত্রের উপযোগিতা যখন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল তখন তাহারা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইহাতে যোগদান করিল। এইরূপে একদিকে বলপ্রয়োগ ও অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা সাম্যবাদিগণ জনসাধারণকে যে শুধু রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা নয়, পরন্তু জনসাধারণের মধ্যে এক স্বাভাবিক সমাজচেতনা ও গভীর দেশাত্মবোধের উন্মেষ করিয়া সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব করিয়াছেন।

মার্কসীয় নীতি ও রুশীয় সাম্যবাদী নীতির পার্থক্য (Difference between Marxian Socialism and Russian Communism)

মার্কসের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও পরবর্তী কালে রুশীয় সাম্যবাদিগণ বাস্তবক্ষেত্রে মার্কসের নীতিকে বহুল পরিমাণে বর্জন করিতে

বাধ্য হইয়াছেন। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পারিবারিক সংগঠনকে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে পারেন নাই। বিনিময়ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রমের মজুরি নির্ধারিত হয় প্রযুক্ত শ্রমের দুষ্প্রাপ্যতা ও দক্ষতার দ্বারা। সাধারণ শ্রমিক জীবনধারণের উপযোগী একটা নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইলেও পারিশ্রমিকের পার্থক্য সোভিয়েত রাষ্ট্র হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সাম্যবাদিগণ বলেন যে, সাম্যবাদের প্রথম পর্যায়ে যোগ্যতানুসারে পারিশ্রমিকের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রবর্তিত হইয়া উৎপাদন যখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠিত হইয়া যখন জনগণের মধ্যে ভেদাভেদ তিরোহিত হইবে, তখন আর পারিশ্রমিকের পার্থক্য থাকিবে না। প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কায করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরি পাইবে। মজুরির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্যবাদী ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা সম্ভব নয় বা অনুপার্জিত আয় ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। নিজে পরিশ্রম না করিয়া পরজীবী হিসাবে সমাজে কেহ বাস করিতে পারে না।

মার্কসীয় মতবাদ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে মার্কস্ জগতের সকল দেশের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। রুশীয় সাম্যবাদিগণ পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র তাহাদের নিজ দেশে এই নীতি কার্যকরী করিতেছেন। স্ট্যালিন কাজের লোক ছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের অসুবিধা বুঝিতে পারিয়া মার্কসীয় নীতি পরিহার করেন। রুশীয় সাম্যবাদ বর্তমানে কার্যতঃ জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হইয়াছে।

সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়ে রুশীয় সাম্যবাদিগণ প্রচলিত লোকধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে বর্জন করিয়া রাষ্ট্রকে যে শুধু সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ করিয়াছিলেন তাহা নয়, রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অনেকক্ষেত্রে ধর্মসংগঠনগুলিকে ধ্বংসও করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের বর্তমান নীতি

হইল সহনশীলতা। জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছামত ধর্মসংগঠনে যোগদান করিতে পারে বা ধর্মের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারকার্য চালাইতে পারে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও বর্তমানে বহুলাংশে পাশ্চাত্ত্য অন্যান্য দেশের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ হইয়া গঠিত হইয়াছে। পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে অন্যান্য দেশগুলির সহিত নানা প্রকারে আদান-প্রদান করিতেছে। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের সময় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিরূপে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সোভিয়েত নেতৃবর্গ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ-প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা বর্তমানে স্বদেশের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সোভিয়েত সাম্যবাদের মূল্যনির্ধারণ (Evaluation of Soviet Communism)

সোভিয়েত সাম্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে এত অধিক প্রচারকার্য হইয়া থাকে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রচারকার্য দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক,—বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর পর্যন্তও বিদেশী পর্যটকেরা অবাধে সোভিয়েত দেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা পাইত না। বর্তমানে এ বিষয়ে সরকারী বিধিনিষেধ অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েত দেশে পর্যটকের যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, সোভিয়েত সরকার তাঁহাদের পূর্বতন তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বিদেশী গুপ্তচরদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ রহিত করিবার জন্যই এই গণতন্ত্র-বিরোধী বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সোভিয়েত সাম্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি পরস্পর-বিরোধী মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত সাম্যবাদের অনুরক্ত ভক্তগণ সোভিয়েত দেশকে মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি যাহা-কিছু মানবজীবনে শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার সব-কিছুই সোভিয়েত

দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, সোভিয়েত সাম্যবাদের উগ্র বিরুদ্ধবাদীরা সোভিয়েত দেশকে নরকের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সোভিয়েত দেশে বিভীষিকার রাজত্ব বর্তমান ; সাম্য, মৈত্রী দূরের কথা, সেখানে মানুষের কোন বিষয়েই স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই। এই উভয় মতবাদই অজ্ঞতা ও অশিক্ষাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই চরম সাধুবাদ বা নিন্দাবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হইয়াও বর্তমানে সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা সোভিয়েত সাম্যবাদ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

বহু ভাষাভাষী, বহু জাতি-সমন্বিত সোভিয়েত দেশকে একটি উপ-মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এই বিশাল আয়তনের, বিপুল জনসংখ্যা দ্বারা অধ্যুষিত উপ-মহাদেশ একটিমাত্র রাজনৈতিক অর্থাৎ সাম্যবাদী দল দ্বারা শাসিত হয়। এদেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না—জবরদস্তিমূলক উপায়ে অন্য দলগুলিকে উৎসাদিত করিয়া সাম্যবাদী দল তাঁহাদের একাধিপত্য অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। সাম্যবাদী নেতৃগণ তাঁহাদের নীতি সমর্থনের জন্য বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ধনিক ও মালিকশ্রেণী-পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রমিকরাজের পরিবর্তে কার্যতঃ দলীয় অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র সক্রিয়ভাবে সাম্যবাদী দলে যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোককেই এই সাম্যবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। সাম্যবাদী দলব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুষ্টিমেয় লোক সাম্যবাদী দল পরিচালনা করিয়া দলের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যতদিন ষ্ট্যালিন জীবিত ছিলেন ততদিন সাম্যবাদী দল বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। আর সাম্যবাদী দলের নেতা ষ্ট্যালিন এই বিশাল জনসংখ্যার ভাগ্যনিয়ন্তারূপে এক-নায়কত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেরূপ কঠোর ও নির্মম উপায়ে সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের দলীয় সংহতি ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন তাহা মানবধর্মবিরোধী বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। উদ্দেশ্য মহৎ

হইতে পারে, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত হীন ও অমানুষিক পন্থা অবলম্বন করা কোনরূপ যুক্তি দ্বারাই সমর্থনযোগ্য নয়। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত মালিকানা, ধর্মসংগঠন নানাবিধ প্রথা ও আচার সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিগুলির বিরুদ্ধ সমালোচনা না করিয়াও এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের অনুসৃত নীতি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া সমষ্টির অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। বাক্ স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অনেকাংশে রুদ্ধ করিয়াছেন। ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া সমষ্টির উৎকর্ষসাধন কতদূর সম্ভবপর সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু সাম্যবাদী কার্যক্রম একমাত্র চীন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ না করিলেও কোন দেশই সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে।

উপরিউক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্যবাদিগণ তাহাদের অনুসৃত কার্যক্রম দ্বারা সমগ্র সোভিয়েত নাগরিকদের নৈতিক ও সংস্কৃতিগত জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জার-শাসনের সময়ে দেশের জনসংখ্যার শতকরা আশী জন লোক ছিল নিরক্ষর। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এমন অনেক জাতি ছিল যাহাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না। সাম্যবাদিগণ ক্ষমতাগ্রহণের পর নিরক্ষরতার বিরুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করিয়া নেহাৎ অসমর্থ বৃদ্ধ ব্যতীত সমগ্র জনসংখ্যাকে লিখন-পঠন পটু করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী এমন কোন ক্ষুদ্র জাতিও দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাদের নিজস্ব জাতীয় লিপি ও জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে সাম্যবাদিগণ বিজ্ঞান-বিষয়সমূহে যে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব হয় নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক ও কার্যকরী বিষয়সমূহে সোভিয়েত নাগরিকগণের ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিদেশী বিপক্ষমনোভাবাপন্ন পর্যটকেরাও তাহার স্তুতিগান না করিয়া পারেন নাই। নানাপ্রকার দুষ্কার্যের নিমিত্ত শাস্তিপ্রাপ্ত অসাধু ব্যক্তিদের চরিত্র সংশোধন

করিয়া তাহাদের সু-নাগরিক করিবার জন্য সোভিয়েত সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে লক্ষ লক্ষ পতিত মানব পুনর্জীবন লাভ করিয়া সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে সাম্যবাদিগণ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই। পতিতাবৃত্তি নিরোধ করা সোভিয়েত সরকারের অন্যতম প্রধান কীর্তি। সোভিয়েত রাষ্ট্রে স্ত্রীজাতি আজ পুরুষের সমানাধিকারের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সমস্যাগুলি সোভিয়েত সরকার এরূপ নিপুণভাবে সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, সংখ্যালঘু জাতিগুলি আজ রাষ্ট্রের প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংস্কৃতিগত জীবনের উৎকর্ষসাধন ব্যতীত অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন-ক্ষেত্রে সোভিযেত সরকারের প্রচেষ্টা অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পে সোভিয়েত সরকার যে অভাবনীয় উন্নতিসাধন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনকার্যে নিযোজিত করিয়া তাঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু-পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচুর্য না হইলেও জনসাধারণকে অনশনের ভয় হইতে মুক্ত করিবা তাহাদের জীবনধারণোপযোগী জীবিকার একটা নির্দিষ্ট মান স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রে আজ বেকার সমস্যার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। কৃষি, শিল্প ও উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে যৌথ-পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সোভিযেত সরকার অর্থনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছেন। কৃষি ও শিল্পের যৌথ পরিচালনা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষক ও শ্রমিকগণ আত্মসচেতন হইয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে সজাগ হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব, সোভিয়েত দেশে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সমাজচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত নাগরিকগণের দেশাত্মবোধও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোভিয়েত সরকার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহার পিছনে মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী আছে—এ কথা

অনস্বীকার্য। এই বিরাট সাফল্য অর্জনের জন্য যে কত নির্মম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কত শত লোক জীবন দান করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যায়, অত্যাচার ও রক্তপাতের কাহিনী পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ভারত, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া আয়ারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিকে যে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহাও মনুষ্যমানবের কার্যকলাপের নিদর্শন হিরোশিমা ও নাগাসাকি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্ত্য জাতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধ্বংসাত্মক কার্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসিগণের উপর পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্যের সহিত রুশ জাতির অত্যাচারের উদ্দেশ্যের তুলনা করিলে রুশ জাতিকে বোধ হয় বিশেষ হীন প্রতিপন্ন করা যায় না। রাশিয়া অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির প্রতিবেশী রাষ্ট্র, সুতরাং সমধর্মী।

চৈনিক সাম্যবাদ (Chinese Communism)

বর্তমানে একমাত্র মহাচীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর অত্যাচারে এই অতি-প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। সোভিয়েত সাম্যবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই মৃতকল্প জাতি নবজীবন লাভ করিয়া তাহার 'মহাচীন' নাম সার্থক করিতে চলিয়াছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর পুরাতন জাতীয় সরকারের উচ্ছেদসাধন করিয়া, চীনে সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ফরমোজা ও আর কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ব্যতীত মূল ভূখণ্ডের সহিত মহাচীনের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে আজ সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার স্বল্পকালের মধ্যে গ্রেট বৃটেন ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি একুশটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিতে মহাচীন সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই নবগঠিত সরকার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সোভিয়েত সাম্যবাদীদের মত চৈনিক সাম্যবাদিগণ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা জাতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তে তাঁহারা চাষীপ্রধান ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা তাঁহাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। চৈনিক সাম্যবাদিগণ নিজেদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করেন, তাই তাঁহারা শান্তিকামী জাতিগুলির সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। কিন্তু চীনের বর্তমান আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্র নীতি তাহার সহ-অবস্থান নীতিকে অসার প্রমাণিত করিয়াছে। সোভিয়েত সাম্যবাদের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইলেও মহাচীন তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছেদ করে নাই। প্রধানতঃ, সাম্যবাদী দল কর্তৃক সরকার গঠিত হইলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয় নাই বা পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে একেবারে বিতাড়িত করা হয় নাই। বর্তমান সরকার দেশের সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা দ্বারা সার্বজনীন উন্নতিসাধন করিতে চান।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদিগণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মতের সারবত্তা প্রমাণ করেন। তাঁহারা বলেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী অধিকতর ধনশালী হয়, অপরপক্ষে শ্রমজীবীরা ক্রমশঃই দরিদ্রতর হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে দরিদ্রের স্বার্থ যথোচিতভাবে সংরক্ষিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে অনেক ক্ষতি ও অপচয় ঘটে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের পরিবর্তে প্রয়োজনের অনুরূপ সহযোগিতামূলক উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন ও কম মূল্যে বিক্রয়জনিত ক্ষতি ও অপচয় দূরীভূত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদিগণের মত ও তাঁহাদের অনুসৃত নীতি ন্যায়ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। জমি-জায়গা, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ্গুলি ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত না হইয়া জনসাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। এই ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের স্বার্থ অধিকতরভাবে সংরক্ষিত হইবে।

চতুর্থতঃ, তাঁহারা বলেন মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একমাত্র সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভবপর। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারাই এই সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষসাধন অধিকতর সহজসাধ্য হয়।

পঞ্চমতঃ, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করা সম্ভব। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বিফল হইবে। মানুষ যদি ভয় ও অভাবমুক্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। অন্যনিরপেক্ষভাবে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে অভাবমুক্ত করিয়া তাহার অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ সুগম করিয়া দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া মানুষের সহজাত সমাজচেতনাকে দৃঢ়তর করে। সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা সকল দেশেই প্রসারলাভ করিয়া উৎপাদনক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি হইল 'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'। সুতরাং ইহা একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলির কার্যক্রম লক্ষ্য করিলে সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্য প্রমাণিত হয়। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিয়া জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয় তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি হইল যে, সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর

অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্ট্র মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট একটি সামাজিক সংগঠনমাত্র। কোন মানবীয় প্রতিষ্ঠানই নির্ভুল বা ত্রুটিহীন হইতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান্ বিবেচনা করিয়া মানবজীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করিয়া রাষ্ট্র মালিকানা প্রবর্তিত হইলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা অন্তর্হিত হইবে। মানুষ যদি ইচ্ছানুযায়ী কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া সেই পরিশ্রমলব্ধ ফল স্বাধীনভাবে উপভোগ করিতে না পারে তাহা হইলে সে কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে না। ফলে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তির অভিরুচি অনুযায়ী পরিচালিত না হইয়া পদে পদে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইবার ফলে সমগ্র সমাজ-জীবন বৈচিত্র্যহীন হইয়া নিয়মানুবর্তী সৈনিকজীবনে পরিণত হইবে।

চতুর্থতঃ, সমাজতন্ত্রবাদিগণ সাধারণ মানুষকে যতটা সমাজচেতনাসম্পন্ন ও পরার্থপর বলিয়া মনে করেন কার্যতঃ তাহা নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্রত্যেক লোকের যে পরিমাণ পরার্থপর হইতে হয়, সাধারণ মানুষের নিকট তাহা আশা করা দুরাশামাত্র। মানবচরিত্রের এই সহজাত স্বার্থবুদ্ধির আধিক্যহেতু সোভিয়েত সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির আংশিক পুনঃপ্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অবশেষে বলা যায় যে, এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহার আদৌ কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। এই মতবাদের দ্বারা কর্মবিমুখতা, অযোগ্যতা ও দারিদ্র্য প্রশ্রয় পায়। অপরপক্ষে, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম-ক্ষমতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি সদগুণগুলি সংকুচিত হয়।

সত্য সিদ্ধান্ত (Correct view)

উপরি-উক্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নিছক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বা নিছক সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ পরিচালিত

হইতে পারে না। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। অপরপক্ষে, মানুষের বহুমুখী জীবনের একমাত্র নিয়ামক হিসাবেও রাষ্ট্র পরিগণিত হয় না। বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ কোন একটা নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় না। বর্তমানে দেশের অবস্থা বা প্রয়োজনানুসারে রাষ্ট্রের কর্তব্য স্থির হয়। অনগ্রসর দেশগুলিতে, যেখানে জনসাধারণ অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেখানে রাষ্ট্রকেই নানাবিধ প্রগতিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়া জনসাধারণের অগ্রগমনে সহায়তা করিতে হয়। অপরপক্ষে, যে সমস্ত দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত ও সমাজচেতনাসম্পন্ন, সেখানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণশক্তির পরিধিও কম। ইংলণ্ডে সামাজিক জীবনের নানাবিধ প্রগতির জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সাধারণতঃ কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত সম্ভব হয় নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সীমা দেশের অবস্থা বা প্রয়োজন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়ে যদি কোন নূতন মতবাদ গঠন করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রকর্তব্য এই মিশ্র মতবাদ দ্বারা অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হইতে পারে।

বর্তমান রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি (Proper Sphere of the Modern State)

সমাজতন্ত্রবাদ কোথাও সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হইলেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কার্যকলাপের দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ-প্রবণতা সূচিত হয়। আধুনিক অধিকাংশ রাষ্ট্রই খনি, রেলপথ, যোগাযোগব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালনা প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, অহিফেন ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থা লক্ষ্য করিলেও এই সমাজতন্ত্রবাদ-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক ও অন্যান্য বিত্তহীন শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখানা ও প্রজাস্বত্ব-সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত সমাজব্যবস্থা-সংস্কারের

উদ্দেশ্যে আধুনিক অনেক রাষ্ট্রই নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিতেছে। ভারত সরকার অস্পৃশ্যতা বর্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন। ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা ধর্ম-সম্পর্কীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র কখনই হস্তক্ষেপ করিবে না—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এই মতবাদ আধুনিক রাষ্ট্রগুলি গ্রহণ করে নাই। বর্তমান যুগে সামাজিক ব্যবস্থা এত জটিলতাপূর্ণ যে, কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ না করিয়া রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়াও জনগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা আধুনিক রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সমাজহিতকর এরূপ অনেক আইন প্রণয়ন করে যদ্দ্বারা মানুষের নৈতিক জীবনের মান উন্নীত হয় অথবা নৈতিক জীবনের উন্নয়ন-পথে যে অন্তরায় থাকে তাহা দূরীভূত হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক উপদেশ দান করিয়া জনসাধারণকে মদ্যপানে বিরত করা সম্ভব নয়, কিন্তু মদ্যবিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া রাষ্ট্র মদ্যপানের প্রলোভন হইতে জনগণকে রক্ষা করিতে পারে। সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে নাগরিক জীবনের নৈতিক মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য রাষ্ট্রকে সমাজব্যবস্থায় এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যেখানে উন্নত নৈতিক জীবনযাপনের পক্ষে সকল বাধা দূরীভূত হইয়া নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব হইবে। এইজন্যই আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, মদ্যপান, অশিক্ষা প্রভৃতি প্রগতিবিরুদ্ধ যে সমস্ত কু-প্রথা প্রচলিত আছে সেগুলি আইনের দ্বারা দূর করিয়া প্রগতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপের পরিধি লক্ষ্য করিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, রাষ্ট্র অহেতুক ব্যক্তিগত জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতেছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্যাসীবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা ক্রমবর্ধমান বলিয়া অনুভূত হয়। ইংলণ্ড, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলিতেও উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্তের অধীন হইতেছে। সুতরাং পূর্বতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ যে পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাস্তবক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের এই ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের প্রধান কারণ হইল গণতান্ত্রিক আদর্শের বহুল প্রসার। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক কালে রাষ্ট্র আর অসীম ক্ষমতার আধার বলিয়া বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কার্যের দ্বারাই সমর্থিত হয়। যে রাষ্ট্র জনকল্যাণ সাধন করিতে অসমর্থ, সে রাষ্ট্র জনসমর্থন-লাভেও বঞ্চিত। সমগ্র জনসংখ্যার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন হইল বর্তমান রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্যই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State) বলিয়া দাবী করে। সেই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত সমগ্র মানবজীবনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রকর্তব্যের সীমারেখা স্থির করা সম্ভবপর নয়।

রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের শ্রেণীবিভাগ (Classification of the State Functions)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সেই দেশের অবস্থা বা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুলি কার্য অত্যাবশ্যকীয় বা প্রাথমিক (Essential or Primary) বলিয়া বিবেচিত হয; আর কতকগুলি কার্য আছে যেগুলি অবশ্যকরণীয় নয়, প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্র এইগুলি করিয়া থাকে। এইগুলিকে প্রয়োজনানুযায়ী বা ইচ্ছামূলক (Non-essential or Optional) কার্য বলা হয়।

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশেরক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই প্রাথমিক বা অবশ্যকতব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের এই কার্য সম্পাদন করিতে হয়। নতুবা কোন রাষ্ট্রই বাঁচিতে পারে না। শান্তি

শৃংখলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা ছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্রের আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক কর্তব্য আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থির করিয়া নিজস্ব অস্তিত্বকে নিরাপদ রাখা বর্তমান রাষ্ট্রের একটা প্রধান কর্তব্য। পারিবারিক সম্পর্ক স্থির করিয়া অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতা মাতা ও সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া পারিবারিক জীবনকে স্থিতিশীল করা রাষ্ট্রের আর একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া উৎপাদন ও বিনিময়কার্যে সাহায্য করা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট-পরিমাপের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা রাখা অবশ্যকর্তব্য। এইজন্য রাষ্ট্র পুলিশ, বিচার ও জেল বিভাগগুলি প্রবর্তন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন-সংক্রান্ত বিষয়গুলিও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

যে কার্যগুলি রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় নয় অর্থাৎ রাষ্ট্র যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে করিয়া থাকে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক বা ইচ্ছাকৃত কার্য বলা হয়। এই ইচ্ছাকৃত কার্যগুলির মধ্যে কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিচালনা অনেক রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করে। লবণ, তামাক, মুদ্রা, রেলপথ প্রভৃতি অনেক শিল্পব্যবসায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করিয়া থাকে। আবার অনেক সময় রাষ্ট্র শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া সেগুলিকে বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক কল্যাণমূলক বহুবিধ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ডাক, তার ও টেলিফোন-ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিয়াছে। পূর্তকার্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি, বেতার প্রচারকার্য, ট্রাম, বাস প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ এবং সর্বোপরি শিক্ষাবিস্তারকার্যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধ ও পঙ্গু লোকদের সাহায্যদান-কার্যও বর্তমান রাষ্ট্রগুলি স্বহস্তে

গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আধুনিক কালে রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য ও ইচ্ছাকৃত কর্তব্যের মধ্যে সীমারেখা ক্রমশঃই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের সীমা (Limits to State intervention over individual life)

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যের পরিধি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, রাষ্ট্রকর্তব্যের কোন সীমা নাই—মানবজীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহার উপর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করাই যদি রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এইরূপ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সাহায্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ কতদূর সম্ভবপর, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, সে সমস্ত কার্যকলাপ কখনই রাষ্ট্রকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, জনমত নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে দূষণীয় কার্য। জনমত যদি ভ্রান্ত পথেও পরিচালিত হয়, তাহা হইলেও এই জনমত যত সময় পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত হইবে তত সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র এই জনমত দমনের চেষ্টা করিবে না। জনমত হইল জনগণের নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তাশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। জনমত দমন করার তাৎপর্য হইল মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিতে বাধা সৃষ্টি করা। যে মানুষ তাহার চিন্তা প্রকাশ করিতে পারে না, সে মানুষ চিন্তা করিতে শিখে না। আর যে মানুষ চিন্তা করিতে পারে না, সে মনুষ্যপদবাচ্য নহে। সুতরাং স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও চিন্তার বিষয় ব্যক্ত করাই হইল মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল মানুষের এই স্বাধীন চিন্তাশক্তির উৎকর্ষসাধনে সাহায্য করা। যে রাষ্ট্র নাগরিকগণের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অন্তরায় সৃষ্টি করে, সে রাষ্ট্রকে কখনও কল্যাণ রাষ্ট্র বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সাধারণতঃ সমাজে প্রচলিত নানাবিধ আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিবে না। কারণ, এই সামাজিক আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলি দীর্ঘকালব্যাপী জনমতের সমর্থনপুষ্ট হইয়া রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে প্রবর্তিত থাকে। এগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিলে জনমত ক্ষুব্ধ হয়

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এ মত সব সময়ে গ্রহণযোগ্য নহে। প্রত্যেক সমাজেই এমন কতকগুলি কু-প্রথা, আচার ও অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে যেগুলি দূর না করিলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ বাধাহীন করা সম্ভব নয়। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল যে, সামাজিক অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সামাজিক আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধন করা। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া প্রভৃতি জনমত-সমর্থিত প্রথা হইলেও কোনও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রথাগুলি মানিয়া লওয়া রাষ্ট্রকর্তব্য নহে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ অতিমাত্রায় বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র সাধারণতঃ মানুষের রুচিবোধ ও প্রচলিত অভ্যাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে। রাষ্ট্র কখনও মানুষের খাদ্য বা পরিধেয় সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করিবে না। কারণ, এই অভ্যাসগুলি বহুদিন ধরিয়া মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যুবকগণের মধ্যে প্রয়োজনের তাগিদে ধুতির পরিবর্তে প্যাণ্টালুন ব্যবহৃত হইতেছে। এজন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী যে পোশাক ব্যবহার করেন, তাহা জনসাধারণের ভাল লাগিলে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্যবহার করিবে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করেন বলিয়া উক্ত পোশাক জনসাধারণের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা সমীচীন নহে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র এরূপ একটি সংগঠন যাহা শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—সুতরাং রাষ্ট্র মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস পাইবে না। মানুষের ধর্মমত ও নীতিবোধের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

নূতন মতবাদ (New Theories)

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার নিমিত্ত প্রচলিত আরও দুই-একটি মতবাদের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বাস্তব-

ক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র পূর্বনির্ধারিত একটি নীতির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি বিশেষ নীতি বা মতবাদ দ্বারা রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়া থাকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ছাড়াও ধনতন্ত্রবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি নূতন কতকগুলি মতবাদের আবির্ভাবে রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের আবির্ভাব হয়। প্রথম পর্যায়ে গান্ধীবাদ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলেও বর্তমানে এই মতবাদ ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারলাভ করিতেছে।

ধনতন্ত্রবাদ (Capitalism)

মানুষের সমাজব্যবস্থায় বিত্তশালী ও বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব আদিমকাল হইতে পরিদৃষ্ট হইলেও ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি আধুনিককালে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে ইহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পূর্ববর্তী যুগে পাওয়া যায় না। ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি বর্তমান যুগে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যে ব্যবস্থাকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার সমুদয় ত্রুটির জন্য দায়ী করা হয়। সুতরাং বর্তমানে ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি একটি তিরস্কার বা অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় তাহার ফলে উৎপাদনব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনীত হয়। ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প-গুলির পরিবর্তে বিরাট আকারে উৎপাদনের নিমিত্ত যন্ত্রপরিচালিত কারখানা প্রবর্তিত হয়। বিরাট পরিমাণ উৎপাদনের নিমিত্ত বহু মূলধনের প্রয়োজন। সাধারণ মজুরশ্রেণীর এই মূলধন না থাকার জন্য অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি তাহাদের মূলধনের সহায়তায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রমিকদের শ্রম অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে দাস শ্রেণীতে পরিণত করিয়া কালক্রমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হইল, তাহাই সাধারণতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া পরিচিত। অর্থনৈতিক

ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই ক্ষমতার বলে তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া শাসনব্যবস্থায় তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ফলে, সমগ্র সমাজজীবনের উপর এই ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আদর্শ হিসাবে ধনতন্ত্রবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে ব্যক্তিগত লাভের জন্য স্বাধীনভাবে উৎপাদনকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ওয়েবস্ ধনতন্ত্রবাদের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধনতন্ত্রবাদ বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এমন একটি সমাজব্যবস্থা, যেখানে শিল্প ও অন্যান্য আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি স্তরে উন্নীত হয় যে, অধিকাংশ শ্রমজীবী উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা হইতে বঞ্চিত হইয়া দিনমজুরে পরিণত হয় এবং তাহাদের জীবনধারণের সংস্থান, নিরাপত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা—ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত জমি-জায়গা ও কল-কারখানার মালিক ও অগণিত শ্রমিকের পরিচালক মুষ্টিমেয় লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ও উপভোগের সমগ্রীগুলি যে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের এইগুলির উপর মালিকানা স্বীকৃত হয়। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানগুলি বংশপরম্পরাক্রমে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। ফলে, ভূমি ও শিল্পের মালিকগণ ধনবান্ হইতে অধিকতর ধনবান্ হইতে থাকেন ও সাধারণ লোক দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হয়। এইরূপে কালক্রমে সমাজে বিত্তবান্ ও বিত্তহীন—এই দুই শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া পারস্পরিক স্বার্থসংঘর্ষের সূত্রপাত করে। এই ব্যবস্থায় যে-কোনও ব্যক্তি যে-কোনও উৎপাদনকার্যে স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। যে-কোন লোক ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া নিজ সম্পত্তি পরিচালনা করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদক যেরূপ অবাধ

প্রতিযোগিতা করিবার অধিকারী, উপভোগের ক্ষেত্রে ক্রেতা বা উপভোগকারী সেইরূপ অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী। ক্রেতা তাহার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতার এই অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইয়া চাহিদা ও যোগানের সমতা আনয়ন করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও উপভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না। উৎপাদন, বিনিময়, উপভোগ প্রভৃতি দ্রব্যমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হইয়া অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিরাট পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থায় ঝুঁকি ও দায়িত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা উৎপাদনকার্যের জন্য মূলধন সরবরাহ করে তাহারা সাধারণতঃ এই ঝুঁকি বহন করে, কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করিতে তাহারা অসমর্থ। সুতরাং বিরাট পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার নিমিত্ত নূতন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহাদিগকে সংগঠক বা পরিচালক বলা হয়। সংগঠকেরা ঝুঁকি বহন করেন না বলিয়া উৎপাদনক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁহারা ভ্রান্ত নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতা, বিক্রেতা ও শ্রমিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলেও অনেক সময় শ্রেণীস্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত ইহারা একতাবদ্ধ হয়। এই একতার ফলে শ্রমিকসংঘ, ক্রেতাসংঘ ও নানাজাতীয় উৎপাদকসংঘের আবির্ভাব হইয়াছে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল (Merits of Capitalism)

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন, এই ব্যবস্থায় উৎপাদকেরা ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া পারস্পরিক অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে, উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস হয়। প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র যোগ্য উৎপাদক টিকিয়া থাকে। ক্রেতাগণ স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্য পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় ক্রেতাগণ তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। দ্রব্যক্রয়-ব্যাপারে ক্রেতার পূর্ণ-স্বাধীনতার ফলে

উৎপাদকগণ ক্রেতার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করিতে বাধ্য হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার এই স্বাধীন ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদনকার্য বিশেষ বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে হয়। দক্ষ পরিচালনার ফলে উৎপাদনে কম অপচয় হয়।

চতুর্থতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানতঃ মূল্যনিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যক্তিগত মুনাফা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় দুর্নীতি, অযোগ্যতা, পক্ষপাতিত্ব বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি প্রশ্রয় পায় না। কি ধনতান্ত্রিক, কি গণতান্ত্রিক সকল ব্যবস্থায়ই সমর্থ পরিচালকের প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে, যাহারা যোগ্যতম তাহারা টিকিয়া থাকে ও পুরস্কৃত হয়। যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কারলাভকে গণতন্ত্র-বিরোধী আদর্শ বলা সমীচীন নহে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল (Evils of Capitalism)

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল, ইহাতে সমাজে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। ফলে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ধনীর ক্রীতদাসে পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধনবৈষম্যের ফলে সাধারণ লোক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উপযোগী সমান সুযোগ পায় না। সমান সুযোগের অভাবে যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারায় দরিদ্র ব্যক্তির জীবনধারণোপযোগী জীবিকা-অর্জনেও অন্তরায় ঘটে। তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতার যে স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়, কার্যক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। নানাজাতীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের দ্বারা ক্রেতার ক্রয়স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে উৎপাদকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে ও উচ্চমূল্য নির্ধারণ করিয়া ক্রেতাকে দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য করে। চতুর্থতঃ, প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ ব্যক্তিগত মুনাফার পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজের অধিকাংশ

লোকের যাহা প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত দ্রব্য সব সময়ে উৎপাদিত হয় না। যে সমস্ত দ্রব্য যেভাবে উৎপাদন করিলে উৎপাদকের ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনকার্য ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হয়। ফলে উৎপাদনকার্যে নানাবিধ অপচয় ঘটে। পঞ্চমতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বেকারসমস্যা, বাণিজ্য-চক্র ও শ্রমিক মালিক বিরোধ আবির্ভূত হয়। ফলে সামাজিক শান্তি ও প্রগতি ব্যাহত হয়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমটি হইল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু অনেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ প্রবর্তন সমর্থন করেন না। দ্বিতীয়টি হইল, মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত না করিয়া কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রবর্তন ও প্রয়োজনমত অন্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন দ্বারা ধনবৈষম্য প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অনেক রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ও মৃত্যুকর এবং অনিষ্টকর দ্রব্য-উৎপাদনের উপর কর ধার্য করিয়াছে। বেকারসমস্যা, বাণিজ্যচক্র ও শ্রমিক-মালিক বিরোধ অবসানকল্পে অনেক রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ফলে রাশিয়া ও চীনদেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়াছে। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ধর্মঘট ব্যতীত এখনও পর্যন্ত অন্য কোন গণ-অভ্যুত্থান হয় নাই। তথাপি এই সমস্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয়ে মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতেছেন।

ফ্যাসীবাদ (Fascism)

প্রথম বিশ্বমহাসমরের অব্যবহিত পরে ইতালী দেশে ফ্যাসিষ্ট মতবাদের অভ্যুত্থান হয়। ফ্যাসিষ্ট মতবাদের প্রবর্তক ও ফ্যাসিষ্ট দলের একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন বেনিটো মুসোলিনী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালীতে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সে সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে তৎকালীন ইতালীয় গণতান্ত্রিক সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় ও জনসাধারণ

সরকারের ক্ষমতায় ক্রমশঃ আস্থাহীন হইয়া পড়ে। রুশ-বিপ্লবের অনুকরণে ইতালীয় কৃষক ও মজুরশ্রেণী জমি ও কল-কারখানা দখল করিতে আরম্ভ করে। ইতালী দেশ যখন ক্রমশঃ সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন মুসোলিনী ইতালীয় জনসাধারণের নিকট এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ প্রগতি-মূলক কর্মসূচী উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের ফ্যাসিষ্ট মতবাদে দীক্ষিত করিতে সাফল্যলাভ করেন। এইরূপে মুসোলিনীর প্রভাবে ইতালী সাম্যবাদনীতি গ্রহণ না করিয়া ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। এই সময়ে ইতালীতে একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন ছিল। মুসোলিনী তাঁহার অল্পসংখ্যক অনুচরের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি ও বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালীর নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন।

ফ্যাসীবাদ শব্দটি একটি রোমান শব্দ হইতে উদ্ভূত। এই শব্দটির অর্থ হইল 'একসঙ্গে একখানি কুঠারসহ আবদ্ধ কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড'। ইহাই ছিল প্রাচীন রোমে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের নিদর্শন। ইতালীয় ফ্যাসিষ্ট দলও এই প্রতীকচিহ্ন গ্রহণ করে।

ফ্যাসিষ্ট মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ হইতে অভিন্ন এক সর্বাত্মক সংগঠন। রাষ্ট্ররূপ সংগঠন হইল সর্বশক্তির আধার—ইহার বিনাশ নাই। ফ্যাসীবাদিগণ সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিগত জীবনের উত্থান-পতনে জাতীয় জীবনের গতি কোনক্রমে ব্যাহত হয় না। ফ্যাসীবাদীরা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার করেন না। ফ্যাসীবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন, সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাহীন। তাঁহারা নেতৃত্বে বিশ্বাসী ও সেইজন্য ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রের কাঠামো মূলতঃ অভিজাততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী। ফ্যাসীবাদীরা গণ সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে জাতীয় স্বার্থের একমাত্র রক্ষক হইল রাষ্ট্র, আর এই রাষ্ট্র সর্বতোভাবে জনসাধারণকে পরিচালনা করিবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালিত হইবে মুষ্টিমেয় যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা।

ফ্যাসীবাদিগণ শান্তিবাদের উগ্র বিরোধী। ফ্যাসীবাদের জন্মদাতা মুসোলিনীর মতে যুদ্ধ করা জাতীয় জীবনের একটি স্বাভাবিক কর্তব্য। যুদ্ধ

বর্জন করিলে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে। ফ্যাসীবাদ সাম্যবাদেরও বিরোধী। ফ্যাসীবাদীরা শ্রেণীসংগ্রাম বিশ্বাস করেন না বা একটিমাত্র দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, ইহাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ফ্যাসীবাদীরা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সমর্থন করেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়-সাধন করিয়া উভয় ব্যবস্থার সুবিধাগ্রহণের পক্ষপাতী। এইজন্য মুসোলিনী জমি-জায়গা প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্তে আনয়ন না করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়, তজ্জন্য কঠোর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা ব্যাহত হয় নাই, অপর দিকে সেইরূপ শ্রমিক ও ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া হয় নাই।

মুসোলিনীর কর্তৃত্বাধীনে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অতি অল্পকালের মধ্যে ইতালী অনেক প্রগতিমূলক কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইতালী তাহার নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু জাতীয় জীবনের নানাদিকে নানা উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইলেও ফ্যাসীবাদ আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইতালীয় জনসাধারণ এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে সমষ্টির উন্নতিসাধন সম্ভবপর নয়। ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া একমাত্র পশুবলের উপর মহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় না। ফ্যাসীবাদ সম্পূর্ণরূপে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই যেরূপ আকস্মিকভাবে ইহার অভ্যুত্থান হইয়াছিল ততোধিক আকস্মিকভাবে এই নীতিজ্ঞান-বিরোধী মতবাদের অবসান ঘটিল।

নাৎসীবাদ (Nazism)

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানীর জাতীয় জীবনে যে দুঃখ, দৈন্য ও গ্লানি দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতিবিধানকল্পে নাৎসীবাদের আবির্ভাব হয়।

সুতরাং ইতালীয় ফ্যাসীবাদ ও জার্মানীর নাৎসীবাদ এবং এই উভয় মতবাদের জন্মদাতাদ্বয়ের মধ্যে যে একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। নাৎসীবাদ মূলতঃ ফ্যাসীবাদের সমধর্মী হইলেও ইহার একটা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নাৎসীবাদের জন্মদাতা হের হিট্লার, জার্মান জাতি যে বিশুদ্ধ আর্যবংশ-সম্ভূত—ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার মতবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নাৎসীবাদ অতি অল্পকালের মধ্যে জাতীয় জীবনে অনেক পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ফ্যাসীবাদের মত নাৎসীবাদও ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের একাধিকার বিস্তারের পক্ষপাতী। একদলীয় শাসন ও দলীয় নেতার হস্তে সর্বময় কর্তৃত্ব সমর্পণ, ইহাই হইল নাৎসীবাদের মূলমন্ত্র। নাৎসী রাষ্ট্রে ব্যক্তির কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ামক, সর্বক্ষমতার আধার নাৎসীনায়ক হইলেন জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। নাৎসীবাদ সর্বদিক দিয়াই ফ্যাসীবাদের অনুরূপ। নাৎসীবাদ ফ্যাসীবাদের মতই এই সত্য প্রমাণিত করিয়া গেল যে, নীতিজ্ঞান-বিরোধী কোন মতবাদই স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না।

গান্ধীবাদ (Gandhism)

গান্ধীবাদ ভারতে তথা সমগ্র জগতে এক নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে বহু পূর্ব হইতেই রাজনীতি ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়াছিল। গান্ধীবাদ মানুষের সহজাত ন্যায়বুদ্ধিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে মহত্তর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। গান্ধীবাদ মূলতঃ ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় আদর্শের মূল কথা হইল অহিংসা। কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক জীবনে মানুষ হিংসা দ্বারা কখনও তাহার শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ এই অহিংসানীতির উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। গান্ধীবাদ অনুসারে প্রকৃত গণতন্ত্র কখনও হিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গান্ধীজীর মতে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে যে

তথাকথিত গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, সেগুলি ধনিকশ্রেণী কর্তৃক দরিদ্রশ্রেণীকে পোষণ করিবার যন্ত্রবিশেষ মাত্র। এইরূপ অন্যায় ও হিংসাত্মক ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। হিংসাত্মক কার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়। কারণ, হিংসাত্মক কার্য দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে জনসাধারণ এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং গান্ধীবাদে ক্ষমতাপ্রয়োগের কোন স্থান নাই। এইজন্য গান্ধীজী সমাজকে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ করিয়া গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। অরাষ্ট্রতন্ত্রীদের মত গান্ধীবাদ রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে আস্থাহীন। তাই গান্ধীবাদ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণমুক্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বাধীন মানুষের স্বাধীন সমাজগঠনের পক্ষপাতী। গান্ধীজীর মতে কোন রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। সাম্য ও মৈত্রীভাব মানুষের সহজাত ন্যায়বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কখনও স্থায়ী হয় না।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনব্যবস্থার পক্ষপাতী। আধুনিককালে জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে অতিকায় কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে মানুষ এই যন্ত্রদানবের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য গান্ধীজী যন্ত্রবিরোধী ছিলেন। যন্ত্রবিরোধিতা গান্ধীবাদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও উৎপাদনকার্যে যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজী অস্বীকার করেন নাই। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি মানুষের দৈহিক শ্রমের লাঘব করে এবং যেগুলি শ্রমিকগণ অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারে, সেগুলির ব্যবহার গান্ধীবাদ অনুমোদন করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির উৎপাদনের নিমিত্ত ইস্পাত ও লৌহশিল্পের বড় কারখানা থাকা প্রয়োজন। এই জাতীয় দু-চারটি বড় আকারের শিল্পসংগঠন গান্ধীজীর অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বড় আকারের কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রয়োজনীয়তাও গান্ধীবাদ সমর্থন করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলি দূর করিয়া এরূপ একটা সহজ ও সরল উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল, যে ব্যবস্থায় যন্ত্র ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু যন্ত্রের মালিক ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞগণ ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির জন্য যেন মানুষকে

শুধু ভোগের উপকরণ-উৎপাদনের উপাদানে পর্যবসিত করিতে না পারে। বড় বড় কল-কারখানায় যে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদিত হয়, তাহাতে শিল্পী মজুরী পাইলেও সৃষ্টির আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকে। যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় শিল্পী যন্ত্রের একটি ক্রীড়নক হইয়া উৎপাদনের একটি গৌণ উপাদানে পরিণত হয়, সেরূপ উৎপাদনব্যবস্থা কখনও সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পারে না। জনগণের অর্থনৈতিক তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই হইল উৎপাদনের উদ্দেশ্য। কিন্তু যে উৎপাদনব্যবস্থা ভোগের উপকরণ উৎপাদন করিবার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে, গান্ধীবাদ কখনই তাহাকে সমর্থন করে না।

গান্ধীবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। অহিংস আদর্শবিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে গেলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপরিহার্য। যন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ শিল্পসংগঠনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। সুতরাং যন্ত্রসহযোগে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্র শিল্পব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল দূর করা যায়। এইরূপে গান্ধীবাদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের মধ্য দিয়া চিন্তাধারার উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে নূতন এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হইয়াছে। এদেশের প্রধান সমস্যা হইল অর্থনৈতিক দুর্গতি। এই দুর্গতি দূর করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার পক্ষে গান্ধীবাদ কতটা সহায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অন্য দেশ দূরে থাকুক, এমন কি তাহার স্বদেশ ভারতও উৎপাদনব্যবস্থায় গান্ধীবাদ গ্রহণ করে নাই। যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতীত অধিক উৎপাদন সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনোৎপাদন না হইলে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়।

গান্ধীবাদ রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া ব্যক্তিগত উন্নতি কতটা সম্ভব তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

বাস্তবক্ষেত্রে গান্ধীবাদ কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, গান্ধীজী এই হিংসাকুটিল ও সতত স্বার্থসংঘাতে লিপ্ত মানবসমাজে এক শান্তিময় জীবনযাত্রার বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। রণোন্মত্ত মানুষের কানে শান্তির সে বাণী না পঁহুছিতে পারে, কিন্তু মানুষ যেদিন রণক্লান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িবে, সেদিন গান্ধীবাদ—'মা হিংসীঃ'—একমাত্র সত্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমগ্র মানবজাতি হিংসার পথ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইবে। নতুবা সমগ্র মানবসমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

রাজনীতির শেষ সমস্যা (Ultimate Problem of Politics)

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ তাহার রাজনৈতিক জীবনে যে চরম সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে এবং আজ পর্যন্ত যে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে নাই, সে সমস্যাটি হইল—ব্যক্তি-স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সমন্বয়সাধন (Reconciliation between Individual Liberty and State Authority)। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সহিত রাষ্ট্রের সংঘাত চলিয়াছে এবং এই সংঘাতকে কেন্দ্র করিয়া উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিন্তাধারা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত নানাভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নানা মতবাদ এবং নানা প্রকার শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দেশেই এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নাই।

এই সমস্যার সহিত দুইটি প্রশ্ন জড়িত আছে। প্রথমটি হইল—কে বা কাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিবে? দ্বিতীয়টি হইল—কি পরিমাণ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করিতে দেওয়া যাইতে পারে? প্রথম প্রশ্নটি রাষ্ট্রীয় সংগঠন-সম্পর্কিত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা-বণ্টনের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়টি হইল—রাষ্ট্রীয় কার্যাবিধি-সম্পর্কিত এবং ব্যক্তির পৌর অধিকারের প্রকৃতি ও বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা ব্যক্তিগত অধিকার

এই দুইটির যে-কোনটির আধিক্য ঘটিলে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটে, অপরপক্ষে অত্যধিক রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্বৈরাচারে পরিণত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। গ্রীক দার্শনিক য়্যারিষ্টট্‌ল এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং এই সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। হব্‌স ও লক্‌ এই সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কারণ হব্‌সের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রকর্তৃত্বের আধিক্যের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়; আর লক্‌ প্রবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার আধিক্যের ফলে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের স্থায়িত্ব দুর্বল হয়। ফরাসী দার্শনিক রুশো নীতিগতভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে রুশো কর্তৃক বর্ণিত উপায়ে এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আইনবিদ্‌গণ, হিতবাদী ও আদর্শবাদী দার্শনিকগণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদিগণ, বহুত্ববাদী, সাম্যবাদী ও ফ্যাসীবাদিগণ নিজ নিজ নীতি অনুযায়ী এই সমস্যা-সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কোন দেশের রাজনৈতিক জীবনে আজ পর্যন্ত এই দুইটি আপাতবিরোধী শক্তির সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বাস্তবক্ষেত্রেও এই সমস্যার সমাধানকল্পে লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি নানা শাসনতান্ত্রিক উপায় সাহায্যে একদিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানির্ধারণ এবং অপরদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থিরীকরণের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উভয় শক্তির মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় সংগঠন এরূপভাবে পরিকল্পিত হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকারের আধিক্যহেতু শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে জনতা-শাসনে পর্যবসিত না হয়, আবার রাজনৈতিক অধিকারের স্বল্পতা-হেতু শাসনব্যবস্থা যাহাতে স্বৈরাচারে পরিণত না হয়।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে, ব্যক্তির পৌর অধিকারগুলি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইবে যাহাতে পৌর অধিকারগুলির আধিক্য রাষ্ট্র-

কতৃত্ব দুর্বল করিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করিতে না পারে। আবার পৌর অধিকারগুলির স্বল্পতা-হেতু যাহাতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার ন্যায্য দাবী ক্ষুণ্ন না করে। এ সম্পর্কে কোন স্থায়ী বিধি-নিষেধ আরোপ করা সম্ভব নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখিযা রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ—গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম পরিণতি বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহাদের মতে মানুষ রাষ্ট্রের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, রাষ্ট্র মানুষের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহারা ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিযা রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। বর্তমানে এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের সহায়ক বলিয়া রাষ্ট্রের উপযোগিতা স্বীকৃত হয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক বিবিধ কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করা, মানব-সমাজের হিতসাধন করা প্রভৃতি নানা কার্য রাষ্ট্রের করণীয় বলিয়া বিভিন্ন লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ডাঃ গার্ণারের মত অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের কার্য হইল—১। ব্যক্তির উন্নতিসাধন করা, ২। জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধন করা ও ৩। সমগ্র মানবসমাজের হিতসাধন করা।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

অ-রাষ্ট্রতন্ত্র—মানবজীবনে রাষ্ট্রের যে আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র কৃত্রিম বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়া মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং তাঁহারা রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিয়া স্বাধীন মানবসমাজ গঠন করিবার পক্ষপাতী।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীদের মতই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা রাষ্ট্রকে অচিরাৎ ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। যতদিন মানবসমাজে নানাজাতীয় অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হইবে। মানুষ যখন দোষবিমুক্ত হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হইবে তখন আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। এইজন্যই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ বর্তমানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত অবাধ স্বাধীনতা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র শুধু অপরাধ নিবারণ করিবে, মানুষের অন্যবিধ উন্নতির জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা করিবে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সপক্ষে যুক্তি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে বলা হয়—১। মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝে, সুতরাং, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা দান করে। ২। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম টিকিয়া থাকে, দুর্বল মৃত্যু বরণ করে। ৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধিত হয় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস হইয়া ক্রেতার সুবিধা হয়। ৪। অতীতের অভিজ্ঞতাও রাষ্ট্র-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পরিচায়ক। ৫। রাষ্ট্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম, সুতরাং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারাই ব্যক্তিগত স্বার্থের সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

বিপক্ষে যুক্তি—১। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও বহু-ক্ষেত্রে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ২। মানুষ সর্ব সময়ে তাহার স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ নয় বলিয়া রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য। ৩। রাষ্ট্রের অবর্তমানে সমাজে আইন-শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। আইন-শৃঙ্খলার অবর্তমানে সমাজে প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বৈরাচারের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। ৪। জীবনসংগ্রামে যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাই একমাত্র যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার দ্বারা অক্ষম ব্যক্তিকে সক্ষম করিতে পারিলে সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর। ৫। সমান সুযোগ-সুবিধার অভাব অনেক সময় ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার দ্বারা সমান

সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সক্ষম হয়। এইরূপে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রে মানুষের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ—সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের একটি পরম হিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে। এই মত অনুসারে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারাই মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সম্ভবপর। তাই তাঁহারা সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বাস করেন না, তাই তাঁহারা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিতে বদ্ধপরিকর।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ—সমাজতন্ত্রবাদ অতীতে ও বর্তমানে নানাপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, যথা—১। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ, ২। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ, ৩। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, ৪। রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, ৫। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ, ৬। খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ, ৭। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ, ৮। সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, ৯। সাম্যবাদ।

আধুনিক যুগে সাম্যবাদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পৃথিবীব্যাপী ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই মতবাদ মার্কসীয় নীতি—'উদ্বৃত্ত মূল্য'-সূত্র ও ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে রুশীয় সাম্যবাদিগণ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁহাদের অনুসৃত সাম্যবাদী নীতি বহুলাংশে পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রথম পর্যায়ে ধ্বংসাত্মক কার্য দ্বারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া পরবর্তী কালে সাম্যবাদিগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় জীবনের অনেক উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাশিয়ার অনুকরণে মহাচীনেও সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি—১। সমাজতন্ত্রবাদ মুষ্টিমেয় ধনিক-শ্রেণীর সুবিধার পরিবর্তে সর্বশ্রেণীর সুবিধা প্রতিষ্ঠা করে। ২। প্রতিযোগিতা-মূলক উৎপাদনব্যবস্থার অপচয় নিরোধ করিয়া সহযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ফলে, অর্থনৈতিক জীবনে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। উৎপাদনের উপাদানগুলি জাতীয়করণের দ্বারা সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ৪। সমাজতন্ত্রবাদ সমষ্টিগত জীবনের উন্নতি দ্বারা ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যবস্থা করে। ৫। অর্থনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপায় হইল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।

বিপক্ষে যুক্তি—১। রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভবপর নয়, কারণ রাষ্ট্রও ভুল করিতে পারে। ২। ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত মুনাফা না থাকিলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা নষ্ট হইবে। ৩। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মানুষ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশ করিতে পারিবে না। ৪। অত্যধিক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ফলে সমাজে কর্মদক্ষতা লোপ পাইয়া কর্মবিমুখতা দেখা দিবে।

সত্য সিদ্ধান্ত—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ উল্লিখিত কোন একটিমাত্র নীতি অবলম্বনে পরিচালিত হয় না। দেশের প্রয়োজনানুসারেই প্রত্যেক দেশে রাষ্ট্রকর্তব্য নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়সাধন করিতে পারিলে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একটা সুনির্ধারিত মতবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

বর্তমান রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি—বর্তমান যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতীতে রাষ্ট্রকে মানুষ শুধু একটি ক্ষমতার আধার বলিয়া মনে করিত। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। বর্তমান রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য হইল জনকল্যাণসাধন। শুধু শাসকশ্রেণী বা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে এখন আর রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয় না। গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই আজ শক্তির ধারক অতীতের পুলিশ-রাষ্ট্র কল্যাণরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং জনকল্যাণের জন্য যাহা অপরিহার্য তাহা রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্তমান কালের রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপে কোন সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নয়। মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিবার জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন তাহার সব-কিছুই রাষ্ট্র করিতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের শ্রেণীবিভাগ—রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দুইটি কার্য সম্পাদনের উপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে বলিয়া এই কার্যগুলিকে প্রাথমিক বা অবশ্যকর্তব্য বলা হয়। ইহা ছাড়াও বর্তমান রাষ্ট্রগুলি আরও অনেক কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ২। ইচ্ছামূলক কার্য অর্থাৎ যে কার্যগুলি না করিলেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হয় না, যথা, কৃষিশিল্পের উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি।

নূতন মতবাদ—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও কয়েকটি নূতন মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে, যথা, ধনতন্ত্রবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ ও গান্ধীবাদ।

প্রশ্নাবলী

1. "Socialism proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed." Discuss the statement.

সমাজতন্ত্রবাদ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতের বিরোধী নয় বরঞ্চ পরিপূরক।

2. Discuss the philosophical foundation of individualism.

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কর।

3. What is the meaning of socialism? Explain the different types of socialism.

সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ কি? ইহার বিভিন্ন রূপগুলি ব্যাখ্যা কর।

4. Discuss the merits and defects of Individualism.

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গুণাগুণগুলি আলোচনা কর।

5. What, in your opinion, should be the proper sphere of the state?

তোমার মতে রাষ্ট্রের পরিধি কি হওয়া উচিত?

ষোড়শ অধ্যায়

শাসনতন্ত্র

(Constitution of the State)

শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of a Constitution)

প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা শাসক-শাসিতের আইনগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র-উৎপত্তির আরম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অতীত যুগে এই সম্পর্ক শুধু শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হইত। সম্পর্কনির্ণয়ে শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান ছিল না। বর্তমানে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্তমান যুগে মানুষ আর কোন উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট মানুষ দ্বারা শাসিত হইতে চায় না। এখন প্রবর্তিত হইয়াছে আইনের শাসন। এই শাসনব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছা শুধু যে কার্যকরী হইয়াছে তাহা নয়, শাসিতের ইচ্ছানুসারেই বর্তমান যুগে শাসনব্যবস্থা গঠিত হয়; পূর্বযুগের ক্ষমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসক-শাসিত সম্পর্ক বর্তমান যুগে শাসিতের ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশে এই শাসক-শাসিত সম্পর্ক যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে ও শাসকশ্রেণী স্বৈরাচারী হইতে না পারে, সেজন্য কতকগুলি মৌলিক বিধিনিষেধ দ্বারা শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মৌলিক বিধিনিষেধগুলিই বর্তমান যুগে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী রাখে।

সংজ্ঞা (Definition)

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটা নিজস্ব শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেরূপ কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কার্যকলাপও তদ্রূপ কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা সীমায়িত। এই বিধিনিষেধগুলির অবর্তমানে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পারে। শাসনতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি

কতকগুলি প্রয়োজনীয় আইন-কানুন এবং কতকগুলি বিধিনিষেধ ও প্রথা, যেগুলি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্র শাসনকার্য পরিচালিত করে। রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করে সরকার। শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারিত করিয়া শাসনব্যবস্থা চালু রাখে—সরকারের কি কি ক্ষমতা থাকিবে ও কি-ভাবে সেই ক্ষমতাসমূহ শাসনকার্যে প্রয়োগ করা হইবে, কি নিয়ম অনুসারে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে ও সর্বোপরি শাসক ও শাসিতের কি কি অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে। সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অলিখিত আইনের সমষ্টি, যেগুলির দ্বারা একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ অপরদিকে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কোন দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই দেশের রাষ্ট্রগঠনকালীন মূল শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাসনতন্ত্রের সংশোধন—এই উভয়ের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বলা হয়।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions)

পূর্বতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শাসনতন্ত্রের দুইটি ভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল **অ-লিখিত** (Unwritten), অপরটি হইল **লিখিত** (Written)। অলিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। আইনসভা বা কোন প্রতিনিধিমূলক সংসদ্ দ্বারা রচিত আইন এই শাসনতন্ত্রে খুব কমই দেখা যায়। এই শাসনতন্ত্র কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ্ দ্বারা রচিত হয় না। ইহা ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই শাসনতন্ত্র কতকগুলি প্রথা এবং বিধিব্যবস্থা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের সমষ্টিমাত্র। যে প্রথা ও বিধি-ব্যবস্থাগুলি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, অ-লিখিত হইলেও সেগুলি লিখিত আইনের মতই কার্যকর হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকে। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ্ দ্বারা রচিত

হয়। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক এই শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থাকে। লিখিত শাসনতন্ত্র একটিমাত্র বৃহৎ আইনের দ্বারা গঠিত হইতে পারে, যেমন আমাদের ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র, অথবা ইহা বিভিন্ন সময়ে রচিত আইনের সমষ্টিও হইতে পারে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, ভারত, সোভিয়েত প্রভৃতি দেশে এই লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয় (Distinction between a Written Constitution and an Un-written one—not well-marked)

শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞানসম্মতও নয়। প্রথমতঃ বলা যায় যে, কোন অ-লিখিত শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ অ লিখিত হইতে পারে না। অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে অনেক লিখিত অংশ থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত নয়। ম্যাগ্‌না কার্টা, অধিকারের সনদ (Bill of Rights) প্রভৃতি কতকগুলি লিখিত অংশ এই অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, লিখিত শাসনতন্ত্রেও অ-লিখিত অংশ থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-নীতির পরিবর্তন প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক নিয়মগুলি অ-লিখিত প্রথার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশের ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সকল শাসনতন্ত্রই লিখিত ও অ-লিখিত বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ বেশী, অ-লিখিত অংশ কম। আবার কোন শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ বেশী, লিখিত অংশ কম। সুতরাং ইহাকে মূলগত পার্থক্য বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে পরোক্ষভাবে এই ভুল ধারণা জন্মিতে পারে যে, যে-দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসনব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানকার উচ্চ আদালত আইনসভা-রচিত আইন শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ-কথা সত্য নয়। ফরাসী দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্তু সে-দেশের উচ্চ আদালত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, অ লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত করা যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের লিখিত প্রকৃতির উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে না। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অ-লিখিত, তাহা সত্ত্বেও বৃটিশ জাতি স্বাধীন, আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর লিখিত শাসনতন্ত্র হিট্লারের শাসনসময়ে জার্মান জাতির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই।

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে না বা হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। শাসনতন্ত্র যদি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। জাতীয় জীবন-ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনদর্শন ও আদর্শ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়া জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়। সুতরাং জাতীয় জীবনের প্রয়োজনেই শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিপুষ্ট ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Un-written Constitution)

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করা যায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া উহা জাতীয় অগ্রগতির পথ সুগম করে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া ইহার সংস্কার সকল সময়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হইতে পারে।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার কোন

স্থায়িত্ব থাকে না। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনেও সাধারণের দাবীতে ইহা পরিবর্তিত হইতে পারে। ফলে, শাসনতন্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার বিধিনিষেধগুলি সুস্পষ্ট হইতে পারে না। স্পষ্টতার অভাবের দরুণ শাসকগণ তাঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন ও সেজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক সময় ব্যাহত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অ-লিখিত শাসনতন্ত্র একেবারেই অনুপযোগী।

লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Written Constitution)

লিখিত শাসনতন্ত্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে লিখিত থাকে বলিয়া ইহাতে কোন বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই সুস্পষ্টতার জন্য শাসকবর্গ ও জনসাধারণ তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিয়া এই লিখিত শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী।

লিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক সময় জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির পথে ইহা বাধা সৃষ্টি করিয়া দেশে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে।

নমনীয় ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and Right Constitution)

শাসনতন্ত্রের লিখিত ও অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অলীক ও অবাস্তব বলিয়া লর্ড ব্রাইস্ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি সহজ কি জটিল এই

পার্থক্যের ভিত্তির উপর এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। যদি শাসনতন্ত্র সহজেই পরিবর্তন করা চলে অর্থাৎ দেশের আইনসভা সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্র-বিষয়ক আইনও ভোটাধিক্যে যদি পরিবর্তন করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের আইনসভা উভয়বিধ আইন পরিবর্তনের অধিকারী হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন পরিবর্তন-পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিও পরিবর্তন করিয়া থাকে। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না ও রাজা-সহ পার্লামেণ্ট সভা উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন ও পরিবর্তনের পূর্ণ-অধিকারী।

অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। এই শাসতন্ত্রের যদি একটি সামান্যতম পরিবর্তনও করিতে হয় তাহা হইলে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আইনসভা সাধারণ আইন-পরিবর্তন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। মার্কিন দেশে শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত জটিল পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। কংগ্রেস-সভার দুই পরিষদের মোট সদস্যদের $\frac{২}{৩}$ অংশকে এই পরিবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, বিকল্পে পঞ্চাশটি রাজ্যের $\frac{২}{৩}$ রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে। এইরূপে সমর্থিত পরিবর্তনের প্রস্তাব $\frac{৩}{৪}$ রাজ্যের আইনসভা কিংবা আহূত সভায় উপস্থিত $\frac{৩}{৪}$ সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। এই পদ্ধতি সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা বহু গুণে জটিল। সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এযাবৎ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সংখ্যা অতি অল্প। যে-দেশে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি সাধারণ আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Flexible Constitution)

নমনীয় শাসনতন্ত্রের অনেকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা নাই বলিয়া জাতীয় প্রগতির সঙ্গে ইহার সমন্বয় সম্ভব করা যায়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া বিনা রক্তপাতে শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করা যায়। সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া জনমতের দাবী পূরণ করা যায় ও তাহাতে জনমত শান্ত থাকে। লোকে ইচ্ছা করিয়া শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে না।

স্থায়িত্বের অভাব হইল এই শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি। সদা-পরিবর্তনশীল জনমতের প্রভাবে এই শাসনতন্ত্রও পরিবর্তিত হইতে পারে। নিয়ত পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র জনমতের আস্থাভাজন হইতে সক্ষম হয় না। নাগরিক অধিকার ও স্বার্থ এইরূপ পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠে।

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ও অপগুণ (Merits and Demerits of Rigid Constitution)

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন শুধু জনমতের প্রভাবে হয় না। এই শাসনতন্ত্রের আইনগুলি লিখিত বলিয়া ইহা স্পষ্ট এবং ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা কম। দ্রুত ও সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া জনগণের অধিকার ও স্বার্থ ইহা দ্বারা অধিকতরভাবে সুরক্ষিত হয় ও সেজন্য শাসনতন্ত্রে জনগণের আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র অতীব উপযোগী।

কিন্তু ইহার ত্রুটি হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া জাতীয় অগ্রগতির পথে উহা অনেক সময় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের সামঞ্জস্যবিধান না করা যায়, তাহা হইলে সে শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্রের আধুনিক প্রবণতা (Modern Tendencies in Constitutions)

শাসনতন্ত্রকে যেরূপ লিখিত ও অ-লিখিত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা

যুক্তিসংগত নয়, তদ্রূপ নমনীয় ও অ-নমনীয়রূপে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা কতদূর যুক্তিসংগত তাহা বিচারসাপেক্ষ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে। শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। মানুষের চিন্তাধারা, প্রয়োজন ও আদর্শ ক্রমশঃ নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনও জাতীয় জীবনে অনস্বীকার্য। যেখানে এই পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শাসনতন্ত্রের মর্যাদাহানি হইবার সম্ভাবনা বর্তমান থাকে। তাই প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রে,—কি লিখিত বা অ-লিখিত, কি নমনীয় বা অ-নমনীয়,—পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকা অতীব প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। যে শ্রেণীরই শাসনতন্ত্র হউক না কেন, সকল শাসনতন্ত্রই অল্পবিস্তর তিনটি উপাদানের সমাবেশে গঠিত হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, প্রত্যেক শাসনতন্ত্রে অল্পবিস্তর পরিমাণে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইন স্থান পায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত প্রথা ও বিধিবিধান দ্বারা শাসনতন্ত্রের অনেকাংশ পরিপুষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, বিচারালয়গুলির সিদ্ধান্ত শাসনতন্ত্রের পরিবর্ধনে ও পরিবর্তনে অনেক সহায়তা করে। বৃটেন ও মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রে পার্থক্য থাকিলেও এই উভয় শাসনতন্ত্রই শেষোক্ত উপাদানটির দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাসনতন্ত্রের উপর উপরি-উক্ত তিনটি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর নাও হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হইলেও প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। অপরপক্ষে, বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত আইনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়।

সাধারণতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পার্থক্য মূলগত পার্থক্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অতি সহজেই সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক পরিবর্তিত

হইতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক্ একটি জটিল পদ্ধতি ব্যতীত পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অন্য পন্থা আছে ও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এ-কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, জাতীয় রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেল্ফিয়ায় রচিত ও ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে গৃহীত আদি শাসনতন্ত্র হইতে বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইল, এই অসংখ্য পরিবর্তন শাসনতন্ত্রের অ-নমনীয়তা সত্ত্বেও কিভাবে সম্ভব হইল? নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মাত্র ২৫টি সংশোধন হইয়াছে। অবশিষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব হইয়াছে প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে। প্রথাগত বিধির দ্বারাই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস-সভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা ধীরে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা কল্পনা করিতে পারিতেন না। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গঠনপ্রকৃতি ও তাৎপর্য উভয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি বা পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যেখানে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজ নয় সেখানে অন্য উপায়ে—প্রথা বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য করা হয়। শাসনতন্ত্র কোনক্রমে স্থাণুর মত থাকিতে পারে না। সুতরাং সকল শাসনতন্ত্রই পরিবর্তনশীল। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বৃটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কম নমনীয় নহে।

বর্তমান যুগে নানাকারণে শাসনতন্ত্রগুলি অ-নমনীয়তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এমন কি সর্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় বৃটিশ শাসনতন্ত্রও ক্রমশঃই অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকল্পে জনসাধারণ বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে ও

সেইজন্য অ নমনীয় শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ সহসা ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ নমনীয় শাসনতন্ত্রের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রাদেশিক সরকারগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত রাখে।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Constitutional Amendment)

শাসনতন্ত্র লিখিত হউক আর অ-লিখিত হউক, নমনীয় হউক আর অ নমনীয় হউক, জাতীয় অগ্রগতির জন্য ইহার পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু এই পরিবর্তনের পদ্ধতি সকল দেশে একপ্রকারের নয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনে কোনরূপ জটিলতা নাই। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত আইনসভাই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে—যেরূপভাবে ইংলণ্ডে পরিবর্তিত হয়।

কিন্তু অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্য সমগ্র ভোটদাতার সম্মতির প্রয়োজন হয়। সুইস্ দেশে ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই নিয়ম অনুসারে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব $\frac{3}{4}$ রাজ্য দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। অষ্ট্রেলিয়া ও সুইস্ দেশেও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য ছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, অনেক দেশে সাধারণ আইনসভা একটা নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার উভয়কক্ষের $\frac{2}{3}$ অংশ সভ্যের সম্মতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধন একটা খসড়া

বিলের আকারে আইনসভায় পেশ করাইয়া সমগ্র সদস্যসংখ্যা ও উপস্থিত সদস্যসংখ্যার নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদন করাইতে হইবে। তারপর ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে ইহা কার্যকরী হইবে।

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু (Contents of Constitution)

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু কি এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্র কি শুধু সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া বিবেচিত হইবে, না শুধু ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত হইবে—ইহাই বিচার্য বিষয়। শাসনতন্ত্রের প্রধান কার্য হইল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ সুগম করিয়া দেওয়া। এইজন্য শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত বিধিনিষেধগুলি স্থান পায়।

প্রথমতঃ, শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া তাহাদের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয়। শাসনতন্ত্র একদিকে যেমন সরকার কি কি কার্য করিবে তাহা স্থির করিয়া দেয়, অপরদিকে সেইরূপ সরকার কি কি কার্য করিতে পারিবে না তাহাও নির্ধারিত করিয়া সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার উৎস। সমাজজীবনে নাগরিকগণ অন্য ব্যক্তির ও সরকারের সম্পর্কে কি পরিমাণ অধিকার ভোগ করিতে পারে শাসনতন্ত্র তাহা স্থির করিয়া পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে। শাসনতন্ত্র অন্যের ও সরকারের সম্পর্কে নাগরিক কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়া দেয়।

তৃতীয়তঃ, সরকারের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেইজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক শাসনতন্ত্র স্থির করে। বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা পরস্পর-বিরোধী না হইয়া কিভাবে পরিচালিত হইলে শাসনকার্য উন্নততর হইতে পারে, শাসনতন্ত্র সে নির্দেশ দেয়।

চতুর্থতঃ, সরকারী কার্যে লোক নিয়োগ করিবার জন্য কতকগুলি মৌলিক আইন শাসনতন্ত্রে সন্নিবদ্ধ করা হয়। এই আইনানুসারে গঠিত একটি সাধারণ নিয়োগ-সংসদ্ (Public Service Commission)-গঠনের ব্যবস্থা থাকে। এই নিয়োগ-সংসদ্ যোগ্যতানুসারে পরীক্ষা করিয়া বা অন্য পন্থায় সরকারী কর্মী নিয়োগ করিয়া থাকে।

পরিশেষে প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি স্থিরীকৃত থাকে, যে পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। কোন্ কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন বা কি পদ্ধতিতে সংশোধন করা যাইবে—সকল বিষয় স্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্র—স্থায়িভাবে আইনের ভিত্তির উপর শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হইল শাসনতন্ত্রের কার্য। শাসনতন্ত্র ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না।

সরকারের কার্য কিভাবে পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক হইবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে—শাসনতন্ত্র এইগুলি স্থির করে। সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া শাসনতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ—শাসনতন্ত্রকে সাধারণতঃ লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে ভাগ করা হয়। যে শাসনতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশদভাবে লিখিত থাকে এবং পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি প্রতিনিধি-সংসদ্ দ্বারা ইহা রচিত হয় তাহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। আর যে শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির দ্বারা গড়িয়া উঠে তাহাকে অ লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। ইহা কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ্ দ্বারা গঠিত হয় না।

শাসনতন্ত্রের এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে না। লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে (যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেও অনেকক্ষেত্রে অ-লিখিত প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে), আবার অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকিতে পারে (যেমন, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের সনদ প্রভৃতি লিখিত অংশ স্থান পাইয়াছে)।

লিখিত শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ইহা অপরিহার্য।

কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইল যে, সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া লিখিত শাসনতন্ত্র অনেক সময় জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ করে।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কিন্তু ইহা অস্থায়ী ও অস্পষ্ট।

শাসনতন্ত্রকে অন্য দিক দিয়া নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়, যেমন বৃটিশ শাসনতন্ত্র। রাজা-সহ পার্লামেণ্ট সভা একই পদ্ধতিতে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা জটিলতর ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহাকে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয় না—বিনা রক্তপাতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। জনমতের চাপে সদাসর্বদা ইহার রদবদল হইতে পারে।

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া উহা জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায় হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রের স্বরূপ—সকল দেশের শাসনতন্ত্রই প্রধানতঃ তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত হয়: নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত আইন, বিভিন্ন প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত। যে সমস্ত দেশের শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা দুরূহ, সেখানে প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে; উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যাইতে পারে। আবার বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধুনা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথার আবির্ভাবের ফলে ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সকল দেশের শাসনতন্ত্রই অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে।

শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি—নমনীয় শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনে কোন জটিলতা নাই। সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু অ নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতিতে প্রভেদ দেখা যায়। সাধারণ আইনসভা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, বা প্রতিনিধি-সংসদ্ আহ্বান করিয়া, কিংবা নির্বাচক-মণ্ডলীর সমর্থন দ্বারা, কিংবা যুগপৎ আইনসভার সমর্থন ও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্যের সমর্থন দ্বারা, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়।

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু—শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। সুতরাং ইহাতে থাকে—(ক) শাসকের ক্ষমতা ও ক্ষমতার সীমা, (খ) শাসিতের অধিকার, (গ) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, (ঘ) শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার নির্ধারিত পদ্ধতি।

প্রশ্নাবলী

1. Distinguish between a rigid and a flexible constitution. Are the constitutions of (*a*) U. S. A. (*b*) England, and (*c*) India rigid or flexible ? Give reasons for your answer.

অ-নমনীয় ও নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কর। (ক) ইংলণ্ড, (খ) মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও (গ) ভারতের শাসনতন্ত্র অ-নমনীয় বা নমনীয়? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

2. "Constitutions grow and are not made." Criticise the doctrine with reference to the Constitution of India.

'শাসনতন্ত্র বর্ধিত হয়, তৈয়ারী হয় না'। ভারতের সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে উক্তিটির সমালোচনা কর।

3. An American Writer has said that the constitution of the U. S. A. is more flexible than the British one. How would you justify his view-point ?

জনৈক মার্কিন-লেখক বলিয়াছেন যে "মার্কিন শাসনতন্ত্র বৃটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষা সুপরিবর্তনীয়"। তুমি কি এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন কর?

4. Distinguish between rigid and flexible constitutions What are the merits and defects of a rigid constitution ?
(C. U. 1974-Old Syllabus)

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পার্থক্য দেখাও। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ ও গুণ কি কি?

সপ্তদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল ও জনমত

(Political Party and Public Opinion)

রাজনৈতিক দল (Political Party)

বর্তমান সভ্য রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আধুনিক গণতন্ত্রগুলিকে প্রতিনিধি-পরিচালিত গণতন্ত্র বলা যাইতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সকলে একমতাবলম্বী হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক একই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোক লইয়া এক-একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত যতই যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তাহা এককভাবে কার্যকর হইতে পারে না। সেজন্য এক নীতিতে আস্থাবান্ অধিকসংখ্যক লোক যদি একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে সেই সংঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। দল-গঠন ব্যাপারে মানব চরিত্রের দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রত্যেক মানুষের একটি স্বকীয় মত থাকে এবং সেইজন্য মানুষে মানুষে মতভেদ হয়। কিন্তু এই মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ সামাজিক জীব এবং সংঘবদ্ধভাবে সং জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মতানৈক্য দূর করিয়া যথাসম্ভব ঐকমত্য প্রতিষ্ঠি করিতে প্রয়াস পায়। দ্বিতীয়তঃ, একই নীতিতে বিশ্বাসী জনসমূহ সুসংবদ্ধ ভাবে তাহাদের নির্ধারিত নীতিকে রূপায়িত করিতে প্রয়াস পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল—একতাই বল। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে। জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন হইল রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দল গঠিত হইলে সে দল আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কুচক্রী দলে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া কার্য পরিচালনা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু দলীয় শাসন

ঈশ্বরানুমোদিত—এই কথা প্রচার করিয়া কোন রাজনৈতিক দলই বর্তমান যুগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। দলীয় শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকা চাই।

রাজনৈতিক দল গঠন করিতে নিম্নলিখিত চারটি উপাদান একান্ত অপরিহার্য :—

১। দলগঠনের প্রাথমিক উপাদান হইল যে, যে-সমস্ত লোক লইয়া রাজনৈতিক দল গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে বিস্তারিত কার্যক্রমে মতভেদ থাকিলেও দলীয় মূলনীতিতে সকলেরই আস্থা ও সমর্থন থাকা চাই। এই মূলগত ঐক্যের অভাবে রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে না।

২। রাজনৈতিক দলের প্রধান বল হইল একতা। সুতরাং দলের সদস্যবর্গকে সুসংবদ্ধ হইয়া তাহাদের নির্ধারিত নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। দলীয় সংগঠন যদি সুসংবদ্ধ না হইয়া শিথিল হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক দল একটি অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত জনতায় পর্যবসিত হয়।

৩। রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে উহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে চায়। যে দল বলপ্রয়োগে বা অন্য কোন অসৎ উপায়ে ক্ষমতা অধিকার করিবার প্রয়াস পায়, তাহা কখনই রাজনৈতিক দল পদবাচ্য হইতে পারে না। একমাত্র জনসাধারণের ভোট দ্বারা সমর্থনের উপরই রাজনৈতিক দলের অধিকার নির্ভর করে।

৪। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করা। একমাত্র এই উদ্দেশ্যের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলিকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক্ করা যায়। যখন কোন দল এই মহান্ আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়া ইহার দলীয় স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট হয়, তখন তাহাকে কুচক্রী দল (Faction বা Coteri) বলা হয়।

রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions of Political Parties)

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের মত

কার্যকর করিতে কৃতসংকল্প হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। জাতীয় সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হইল সেই নীতিকে নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অনুকূল করিয়া গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক এই প্রচারকার্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দলীয় নীতিতে আস্থাবান্ হয়, দলের সমর্থকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়। আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সাধারণ নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য। নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোটসংগ্রহের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে জোর প্রচারকার্য চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের নেতৃগণ মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করিয়া শাসন-কার্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপে নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষমতালাভের পর সেগুলিকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যে দলগুলি আইনসভায় অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক আসন দখল করে, তাহারা বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধী দল আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত রাখে। মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিলে বিরোধী দল জনমত জাগ্রত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে ইহাদের মতের পার্থক্য অনুসারে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়—উগ্র বামপন্থী (Extreme Left), বামপন্থী

Left), দক্ষিণপন্থী (Right) ও উগ্র দক্ষিণপন্থী (Extreme Right)। উগ্র বামপন্থী দল সব-কিছুরই আমূল পরিবর্তনসাধন করিয়া নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে চান। বামপন্থীরা প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার প্রগতিমূলক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। দক্ষিণপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান অবস্থাকে বজায় রাখা তাঁহারা সমীচীন মনে করেন। উগ্র দক্ষিণপন্থী দল অতিরিক্তমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁহারা অধুনালুপ্ত পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা অতীব প্রয়োজন। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কাযকারিতা বহুলাংশে ইহাদের নীতি ও কার্যসূচীর উপর নির্ভর করে। যে দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম সময়োপযোগী করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে না, সে দলের পক্ষে স্থায়িত্ব-লাভ করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়। দলের নীতি ও কার্যক্রম যদি জাতীয় অগ্রগতির সমান পর্যায়ে না চলিতে পারে, তাহা হইলে দলীয় শাসনব্যবস্থা অসাড় ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। এইজন্য কি রক্ষণশীল, কি উদার-নৈতিক—সব দলেরই নীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশেই রাজনৈতিক দল শাসনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত বা সমর্থিত হয় না। সকল দেশেই রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ শাসনতন্ত্র বহির্ভূত সীমায় সীমাবদ্ধ (Extra-legal growth)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে যেখানে শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সমস্ত দেশেও রাজনৈতিক দলগুলির শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত কোন অস্তিত্ব নাই—অথচ সরকার-গঠনে এবং সরকারী কার্য-পরিচালনায় দলীয় সংগঠন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দলীয় সংগঠন শাসনতন্ত্রের কঠোরতা প্রশমিত করিয়া শাসনতন্ত্রকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করিতে সহায়তা করিয়াছে। দলীয় সংগঠনের অবর্তমানে মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট শাসনব্যবস্থা চরম ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যবিধানের জন্য পঙ্গু হইয়া পড়িত।

আধুনিক কালে কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক দল শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও বর্তমান বাংলা দেশের সংশোধিত শাসনতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দলকে (সরকারী দল) স্বীকৃতি দান করিয়া দলীয় প্রাধান্য বর্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও স্বাধীনভাবে কার্য করিবার সহজাত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে মানুষের মতানৈক্যের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। সাময়িক উত্তেজনা বা লঘু কারণে মানুষের মধ্যে যে মতভেদ হয় তজ্জন্য স্থায়ী কোন দল গঠিত হইতে পারে না। উত্তেজনা প্রশমিত হইলে মতভেদও দূর হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ভোগ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের ধারণার মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি প্রধানতঃ এই অর্থনৈতিক সমস্যা-সম্পর্কিত মূলগত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক সময় আবার ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল বিরল, কিন্তু ভারত প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবে এখনও পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল দেখিতে পাওয়া যায়।

দলীয় শাসনের গুণ (Merits of Party Government)

বর্তমান যুগে দেশের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণতঃ জনসাধারণের কোন সুস্পষ্ট অভিমত থাকে না বা থাকিলেও সেই অভিমত কার্যকর করিতে পারে না। রাজনৈতিক দল এই অসংবদ্ধ জনমতকে সুসংবদ্ধভাবে গঠন করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলে। এই উদ্দেশ্যে দলগুলি নানা প্রকারে প্রচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জনসাধারণকে ঐ সমস্ত বিষয়ে সচেতন করিবার প্রয়াস পায়। প্রচারকার্যের মধ্য দিয়া দেশবাসী ঐ সমস্ত জাতীয় সমস্যা ও তাহাদের সমাধান প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ জন্মে ও তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের মধ্য দিয়া জনশিক্ষা বিস্তারলাভ করে।

সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া

শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব সফল করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু আইনসভার সদস্যগণ যদি তাহাদের দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে সহায়তা না করিয়া তাঁহাদের খুশিমত ভোট দেন, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। দলের সদস্যগণের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাবে শাসনকর্তৃপক্ষ স্থায়িভাবে কোন শাসননীতি প্রবর্তন করিতে পারে না। দলের সমর্থন ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিয়া দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সফল করিতে পারে না।

দলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন না হইলে শাসনকার্যের কোনরূপ উৎকর্ষ-সাধন হওয়া সম্ভবপর হইত না। ক্ষমতার অধিকারী দল নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া যাইত। একমাত্র বলপ্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতার অধিকারী দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হইত না। বর্তমান যুগে দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সুযোগ পায় এবং এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে তাহারা জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করিতে সাহসী হয় না। আইনসভার বিরুদ্ধ দলগুলির সদাজাগ্রত দৃষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত রাখে। এইরূপে দলীয় শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারের প্রতিবন্ধকতা করে ও দলীয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে।

দলীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, যে-সমস্ত দেশে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান-নীতি শাসন-পরিচালনাক্ষেত্রে কার্যকরী করা হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়াই সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই যোগসূত্রের অভাবে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু দলীয় শাসনব্যবস্থার ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে যোগসূত্র ও সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া শাসনব্যবস্থা অব্যাহত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একই রাজনৈতিক

দলভুক্ত বলিয়া ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সত্ত্বেও তাঁহারা একযোগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

দলীয় শাসনের দোষ (Demerits)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য বিবেচিত হইলেও দলীয় শাসনব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন বলা যায় না। দলীয় শাসনব্যবস্থা আদর্শচ্যুত হইলেও শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে অনেক গলদ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দলাদলির সূত্রপাত করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক সময় ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত হয়। দলীয় সংহতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কোনরূপ মতানৈক্য বরদাস্ত করা হয় না। দলীয় নেতার মাধ্যমে যে-দলীয় নীতি নির্ধারিত হয়, বিবেকবুদ্ধি-বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সদস্যকে সেই নীতি মানিয়া চলিতে হয়। ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কোন কোন দেশে দলীয় বিধিনিষেধগুলি এত কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় যে, দলের সমর্থকগণ দলের ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়। সুতরাং দলীয় শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

দলীয় অনুশাসনের প্রতি এই অন্ধ ও অখণ্ড আনুগত্যের ফলে দলের সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়। জাতীয় সমস্যাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা না করিয়া দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ভোটসংগ্রহ ব্যাপারে তৎপর হয়। আর এই ভোটসংগ্রহ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে তাহাতে দেশের নৈতিক আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃগণ তাহাদের সামাজিক পদমর্যাদা ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চালনা করিয়া সমাজে এরূপ দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাপ্রচার, কলহ-দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের মত আবির্ভূত হয়।

নির্বাচনদ্বন্দ্বে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় ও মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাকুরী, সরকারী সাহায্য ও সম্মান যোগ্যতা বিচার না করিয়া দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করিয়া দলের সংহতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগ্য ব্যক্তি অপর দলভুক্ত বলিয়া সরকারী কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভ করিতে পারে না, সে দল বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয় ও সর্বদা সরকারী কার্যের ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিদ্রান্বেষণ করে ও সবপ্রকারে সরকারী কার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপ আত্মকলহের ফলে জাতীয় প্রগতিমূলক কার্যসমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দলীয় শাসনের আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, দলের নেতৃত্ব যখন জনকয়েক স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয়, তখন এই কুচক্রী দল নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের নিমিত্ত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

উপসংহার (Conclusion)

দলব্যবস্থার উপরি-উক্ত দোষগুলি থাকার জন্য অনেকে দলীয় শাসনের অবসান ঘটাইতে ইচ্ছা করেন। দলব্যবস্থার নিষ্পেষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অসাড় ও মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে দলব্যবস্থা বিলুপ্ত হইলে ব্যক্তিগত ইচ্ছা আত্ম-প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তা করিবে। কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দলব্যবস্থার অবর্তমানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অভিমত এককভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমষ্টিগতভাবে দলব্যবস্থার মধ্য দিয়া কার্যকর হয়। অপরপক্ষে দলব্যবস্থার অবর্তমানে কোন শাসনব্যবস্থারই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। শাসক-গোষ্ঠীকে পরিবর্তন করিতে হইলে একমাত্র বল-প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত অভিমত কার্যকর করিবার নিমিত্ত ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য দলব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। সত্য বটে যে, দলীয় শাসনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিন্তু

সেজন্য দলব্যবস্থার অবসান না ঘটাইয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি যাহাতে দূর করা যায় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

নাগরিকগণকে লইয়াই রাজনৈতিক দলগুলি গঠিত হয়। নাগরিকগণ যদি প্রকৃত শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দলব্যবস্থায় কোনরূপ সংকীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে না। দলের নেতার প্রতি দলের সমর্থকগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু দলের নেতা যদি বিপথগামী হন ও জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে উচ্চতর স্থান দেন, তাহা হইলে এরূপ নেতাকে প্রতিরোধ করা প্রত্যেক লোকেরই নৈতিক কর্তব্য। দলব্যবস্থায় সাফল্য অনেক পরিমাণে নেতৃত্ব-নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। দলপতি নির্বাচন করিলে জনগণের কর্তব্য শেষ হয় না। দলপতির কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির উপরে জনগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। নতুবা দলপতি স্বৈরাচারী হইয়া পড়িতে পারেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি কম তাহারা তাহাদের নেতার দ্বারা পরিচালিত হয়। নেতা যাহাতে স্বীয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত জনগণকে বিপথে পরিচালিত করিতে না পারেন সেজন্য শিক্ষিত, সচেতন ও সক্রিয় জনমত চাই। জনমত যদি হিতাহিতবোধসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে দলব্যবস্থার সমস্ত দুর্বলতা দূর হইয়া গণতন্ত্রকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিতে পারে।

চাপ সৃষ্টিকারী ও স্বার্থপ্রণোদিত সংস্থা (Pressure and Interest Groups)

রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলেও জাতীয় স্বার্থ উন্নয়নের জন্য ইহারা একটি সাধারণ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু আধুনিককালে রাজনৈতিক দল কর্তৃক সাধারণ স্বার্থে সাধারণ নীতি পরিচালনায় কিছু বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। এই বাধার ফলে দলগুলি কর্তৃক জন প্রতিনিধিত্ব কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে।

বর্তমানে সমাজব্যবস্থায় বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ সংঘ গঠিত হইয়াছে। এই সংঘগুলি ইহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারে

ক্ষমতাসীন দলের উপর চাপ দিয়া ইহাদের স্বার্থের অনুকূল আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত দলগুলি জনসাধারণ বা ভোটদাতাগণের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করে না বা নির্বাচনকালে কোন প্রার্থী মনোনয়ন করে না। ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সরকারী দলের উপর চাপ দিয়া ইহাদের বিশেষ স্বার্থ সুরক্ষিত করা। শ্রমিক সংঘ, ব্যবসায়ী সংঘ প্রভৃতি হইল এইরূপ বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত চাপ সৃষ্টিকারী সংঘ। এই বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত সংঘগুলির চাপে অনেক সময় সরকারী দল ইহার সাধারণ নীতি নির্ধারিত কার্যক্রম অন্ততঃ আংশিকভাবে বাতিল করিয়া এই বিশেষ সংঘগুলির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিতে বাধ্য হয়। ফলে সরকারী দল ভোটদাতাগণের অপ্রিয় হইয়া পড়েন।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল সাধারণ স্বার্থের উন্নয়ন এবং শাসিতের নিকট শাসকের দায়িত্ব। কিন্তু এই চাপ সৃষ্টিকারী সংস্থাগুলির অভ্যুত্থানে উপরি-উক্ত গণতান্ত্রিক দুইটি নীতিই ব্যাহত হইয়াছে। চাপ সৃষ্টিকারী দলগুলি সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষমতা পরিচালনা করে, কিন্তু ভোটদাতাগণের নিকট ইহাদের কোন দায়িত্ব নাই। অপর পক্ষে এই সংস্থাগুলি ইহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু গণতন্ত্রের মূল নীতি হইল সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণ। সুতরাং এই বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত সংস্থাগুলি বর্তমানে গণতন্ত্রের এক বিশেষ বাধাস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয়।

দুই দল বনাম বহু দল (Two-Party System vs. Multiple-Party System)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বহু দল অপেক্ষা দুইটি দল দেশের স্বার্থের পক্ষে অধিকতর অনুকূল। ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে দুইটি প্রধান দলের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দুইটি প্রধান দল দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে।

দুই দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Two-Party System)

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে যে-দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ইহাতে রাষ্ট্রীয় সরকার স্থায়িত্বলাভ করিয়া নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ইহাদের কার্যক্রম রূপায়িত করিতে সক্ষম হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্থায়িত্বলাভ করিলেও ইহারা জনমত-বিরোধী কার্য করিতে সাহস পায় না। কারণ, বিরোধী দলের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ইহাদের কার্যকলাপের উপর নিবদ্ধ থাকে। শাসনকার্যে কোনপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা জনমতকে ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতে পারে। ফলে পরবর্তী নির্বাচনকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার ফলে শাসনকার্যও উৎকর্ষ লাভ করে। তৃতীয়তঃ, দুইটি দল বর্তমান থাকিলে ভোটদাতাগণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও অধিকতর সহজ ও সরল হয়। ভোটদাতাগণের মাত্র দুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। সুতরাং তাহারা সহজেই প্রার্থী স্থির করিতে পারে।

দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিবার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে জনমতের বিভিন্ন দিক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশে যদি উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপন্থী কোন লোকের পক্ষে উল্লিখিত দুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবুদ্ধিসম্মতভাবে যোগদান করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সমস্যাগুলিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তৃতীয়তঃ, দুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের শাসকগোষ্ঠীও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ্ স্থায়িত্বলাভ করে। ক্ষমতাচ্যুত হইবার আশংকা কম থাকিলে মন্ত্রিসংসদ্ তাহাদের খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সর্ববিষয়ে একাধিপত্য-স্থাপনে প্রয়াস পায়। ফলে, মন্ত্রিসংসদ্ সর্বেসর্বা হইয়া উঠে ও আইনসভার প্রাধান্য খর্ব হয়। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় এই প্রকারে মন্ত্রিসংসদ্ আইন-প্রণয়নে, রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে, শাসন-পরিচালনার সর্ববিষয়েই

একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আইনসভার সার্বভৌমত্বের হানি করিয়াছে। চতুর্থতঃ, দুই-দল ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। ভোটদাতা নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের অনুশাসন অনুসারে ভোট দিতে বাধ্য হয়। পঞ্চমতঃ, দুইটি মাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই নির্বাচনের ফলে প্রকৃত জনমতকে কতদূর প্রতিফলিত করিতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিতে পারে।

বহু-দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Multiple-Party System)

দুই-দল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্য অনেকে বহু দলের অস্তিত্ব সমর্থন করেন। বহু-দল থাকিলে জনমত এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে পারে ও আইনসভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণ তাহাদের স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করে। এই ব্যবস্থা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দল আলাপ-আলোচনার দ্বারা সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ফলে, আইন-প্রণয়ন-কার্য ও শাসনকার্য বহু-দলের সমর্থনলাভ করিয়া ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থতঃ, বহু দল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলও শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। মন্ত্রিসংসদ্ একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বহু-দলের সম্মিলিত সমর্থনপুষ্ট বলিয়া স্বৈরাচারী হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এক-দল দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসংসদ্ অপেক্ষা বহু-দল-সমর্থিত মন্ত্রিসংসদ্ দেশের জনমতকে অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত করিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বহু দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী ও স্থায়ী মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করা সম্ভব নয়। দুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে মন্ত্রিসংসদ্ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে সামান্য মতানৈক্য হইলেই ঐ মন্ত্রিসংসদ্ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আইনসভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে

মন্ত্রিসংসদ্কে দলগুলির সম্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মন্ত্রি-গণের মধ্যে মতদ্বৈত ঘটিলে এক বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া মন্ত্রিসংসদের পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ্ যে শুধু অস্থায়ী হয় তাহা নয়, উহার দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। মন্ত্রিসংসদের কোন সদস্যই অন্যনিরপেক্ষ হইয়া একক ও স্বাধীনভাবে তাঁহার নিজের বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। সর্বদাই আলাপ-আলোচনা দ্বারা অন্য দলের সদস্যদের সম্মতির উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। ফলে, কোন নীতি কার্যকরী করিতে গেলে বহু সময় অতিবাহিত হয়। তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইহাতে দেশের সুশাসন ও হিতকর কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, অল্প সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রিসংসদ্ পুনর্গঠিত হয় বলিয়া মন্ত্রিসংসদের সদস্য-নির্বাচনে অনেক সময় দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। ফরাসী দেশে এই ব্যবস্থার ফলে সে দেশের মন্ত্রিসভা বহুল পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কি আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতি বা কার্যক্রম সেখানে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, বহু-দল থাকার জন্য জনসাধারণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও একটা সমস্যারূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন দল তাহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়া ভোটদাতার কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত কারণে দুই-দল ব্যবস্থার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ লেখক বহু-দল অপেক্ষা দুই-দল ব্যবস্থাকে শাসনকার্যের অধিকতর অনুকূল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। দুই-দল ব্যবস্থার জন্যই গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্ব ও দক্ষতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এক-দলীয় শাসন ও গণতন্ত্র (One-Party Government and Democracy)

বিগত প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কালে ইয়ুরোপের কয়েকটি দেশে এক-দলীয় সরকারের সূত্রপাত হয়। রুশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী দল বলপ্রয়োগ দ্বারা অন্য দলগুলিকে উৎসাদিত করিয়া দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

রুশ দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও সাম্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। রুশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালীতে যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী দল ও ফ্যাসিবাদী দল সাম্যবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করে। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময় যে জাতীয় সরকার গঠিত হয়, তাহাকে কার্যতঃ এক-দলীয় সরকার বলা যাইতে পারে। জাতীয় বিপদের সময় ইংলণ্ডের বিভিন্ন দল তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়া জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়। সুতরাং রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশের এক-দলীয় সরকার ও ইংলণ্ডের জাতীয় সরকারকে এক পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন নয়।

'এক-দলীয় সরকার' ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলে জাতীয় শক্তি ও সংহতির অপচয় ঘটে। জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি সাধারণতঃ কম। জনসাধারণকে প্রচারকার্যের দ্বারা বিভ্রান্ত করিয়া বিভিন্ন দলের সমর্থন লাভ করা হয়। ইহাতে জাতীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। কাজেই শুধুমাত্র যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে জাতীয় সরকার গঠন না করিয়া সর্ব কালের জন্য এক-দলীয় সরকার গঠন করিলে জাতীয় শক্তির কোনরূপ অপচয় ঘটে না। জাতির সমগ্র সদস্যই যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক দলীয়, দ্বি-দলীয় বা বহু দলীয় সকল শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় ঐক্য অধিকতররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এক-দলীয় সরকারের সপক্ষে যতই যুক্তির অবতারণা করা হউক না কেন, এক-দলীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হইবে ততদিন এই সরকার স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। জার্মানি ও ইতালিতে এক-দলীয় সরকারের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু রুশ দেশে এক-দলীয় সরকার

আজও সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ রুশ দেশের এক-দলীয় সরকার বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নানাবিষয়ে দেশের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের আস্থাভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছে। রুশ দেশের এক-দলীয় সরকারের ভবিষ্যৎ ইহার জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট গঠনমূলক কার্যের উপর নির্ভর করে।

এক-দলীয় শাসন ও গণতান্ত্রিক শাসন পরস্পর-বিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসন জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছা ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। জনগণ বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের অভিমত প্রকাশ সাহায্যে শাসক শ্রেণী নির্বাচন করে। গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা ও মতবিরোধ নিষ্পত্তির পথ উন্মুক্ত থাকে। ভোটদাতাগণ নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলবৎ করিতে পারে। কিন্তু এক-দলীয় শাসনব্যবস্থায় ভোটদাতার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র নাই বলিলেও চলে। যে ব্যবস্থায় ক্ষমতা একটি মাত্র দলের হস্তে কেন্দ্রীভূত, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। একটি মাত্র দলের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধ-নিষ্পত্তির কোন ক্ষেত্র নাই। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী দলের স্তাবক হইতে হয় অথবা তাহার নিজস্ব মতামত বিসর্জন দিয়া আধ্যাত্মিক মৃত্যুবরণ করিতে হয়।

[নবম অধ্যায়—একনায়কতন্ত্র দ্রষ্টব্য]

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায় (Means of Removing the Defects)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বী নাগরিক-সমষ্টি লইয়া গঠিত হয়। দলপ্রথার যে অসুবিধাগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে নাগরিক জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্যই দেখা দেয়। দলপ্রথার কুফলগুলি দুই প্রকারে দূরীভূত করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসনব্যবস্থাকে এরূপ-ভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ শাসন-ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে না পারে। এই নিমিত্ত শাসনব্যাপারে জনসাধারণের অভিমতকে গুরুত্ব প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

দেশের শাসনতন্ত্রে যদি গণভোট, গণপ্রস্তাব ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় একনায়কত্বের পরিবর্তে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে, শাসনব্যবস্থা হইতে সেই পরিমাণে দলীয় একনায়কত্বের ক্রটিগুলি দূরীভূত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্য, সম্মান ও সরকারী চাকুরী বিতরণ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের সমর্থকগণকে বশীভূত রাখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই ক্রটি দূরীকরণের জন্য শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে একমাত্র যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সংসদের দ্বারা সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে। তৃতীয়তঃ, শাসকবর্গ যাহাতে নিজেদের খুশিমত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হয় সেজন্য দেশের সংবিধান যথাসম্ভব অ-নমনীয় রাখিতে হইবে। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি যদি সাধারণ আইনগুলির মত সহজে পরিবর্তনশীল হয়, তাহা হইলে শাসকগোষ্ঠী তাহাদের সুবিধা অনুসারে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করিয়া দলীয় একনায়কত্ব স্থায়ী করিতে পারে। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয় বর্তমান শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিচারপতিগণ যাহাতে দলনিরপেক্ষ হইয়া বিচারকার্যের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে দলনিরপেক্ষভাবে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রে তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কোনরূপ প্রলোভন বা ভয়ের দ্বারা তাহারা যাহাতে কর্তব্যচ্যুত না হয় সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ষষ্ঠতঃ সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেজন্যও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সৎশিক্ষা পাইয়া প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা সাম্প্রদায়িক বা দলগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সব সময়ে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনই দলীয় প্রচারকার্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া সমষ্টিগত স্বার্থের হানি করিতে পারে না। দলগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন—এই কথাটি সম্বন্ধে যদি দলের সমর্থকগণ অবহিত থাকেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রীয় জীবনকে নানাদিক দিয়া সমৃদ্ধ করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার দ্বারা জাতীয় জীবনের এই ত্রুটিগুলি দূর করা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়।

দলবিহীন শাসন (Non-Party Government)

দল-প্রথার কুফল দেখিয়া অনেক লেখক দল-প্রথার বিলোপসাধন করিয়া দলশূন্য স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দলীয় শাসনের কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব কি? মানুষ হিতাহিতবোধসম্পন্ন চিন্তাশীল জীব। যতদিন মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি থাকিবে, ততদিন মানুষে মানুষে মতভেদ থাকিবে ও এই বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল গঠিত হইবে। সুতরাং মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক জীবনেও রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান মানুষের এই স্বাধীন চিন্তাশক্তির এক অভিব্যক্তি মাত্র। বলপূর্বক এই স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে বিনাশ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান যদি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে দলীয় শাসনের বিকল্প হিসাবে অনেকে বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় (Coalition) শাসনব্যবস্থা সংগঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু বহু-দলের সহযোগিতায় যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ফরাসী দেশের শাসনব্যবস্থা এই কারণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় শাসনের বিকল্প হিসাবে এক-দলীয় শাসনের (One-Party Government) সপক্ষে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক-দলীয় শাসন অনেক বিষয়ে শ্রেয় হইলেও এই ব্যবস্থা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্তরায় ইহা

অনস্বীকার্য। তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসনের অবসান ঘটাইয়া প্রাচীন কালের ব্যক্তিগত শাসন (Monarchy) প্রবর্তন করিতে পারা যায়। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিগত শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দলীয় শাসনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা বর্তমান গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যথাসম্ভব মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা কর্তব্য। দেশে যদি শিক্ষিত ও সচেতন জনমত গঠিত হয়, তাহা হইলে দলীয় শাসনের কুফল রাজনৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করিতে পারে না।

জনমত (Public Opinion)

গণতন্ত্র ও জনমত (Democracy and Public Opinion)

গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত সৃষ্টি করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের অবসান হইয়া স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কত্বের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য জনগণকে সর্বদা সজাগ থাকিয়া শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। শাসকশ্রেণী যদি বুঝিতে পারে যে, জনসাধারণ তাহাদের অন্যায় কার্যকলাপ কখনই বরদাস্ত করিবে না, তাহা হইলে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। সুতরাং দেশের জনসাধারণ যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া সরকারী কার্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে—সরকারী কার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে তাহা প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে সরকার কখনও বে-আইনী কার্য করিতে সাহসী হয় না। যেখানে জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকারে শাসকবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সেখানে জনগণের অধিকার কখনও ক্ষুন্ন হইতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একমাত্র পরিমাপক হইল শাসনব্যবস্থার উপর জনমতের প্রভাব। শাসনব্যবস্থা যদি

জনমত অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা সচেতন ও সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে।

জনমতের প্রকৃতি (Nature of Public Opinion)

জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তি একমত হইবে। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। জনমত বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝায় না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতই যে সকল সময় নির্ভুল হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং জনমত বলিতে সর্ববাদিসম্মত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় না। এ অবস্থায় কোন্ মতকে জনমত বলা যায় তাহা স্থির করা এক সমস্যা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মত পোষণ করে, সাধারণতঃ তাহাই জনমতরূপে পরিগণিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এই জনমত সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা এই মতের প্রতি যেন বিদ্রোহভাবাপন্ন না হয়। সংখ্যালঘু দল যদি বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন হইয়া সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করে, তাহা হইলে তাহাকে সুসংবদ্ধ জনমত বলা চলে না। তবে এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত কোন মত পোষণ করে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত বলিয়াই তাহাকে প্রকৃত জনমত বলা সমীচীন নয়।

জনসাধারণের প্রায়ই নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। বুদ্ধিমান্ ও কর্মঠ ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ ও তাহাদের সমাধানের উপায়গুলি স্থির করেন এবং এইগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে মতের সৃষ্টি করিতে সহায়তা করেন। জনসাধারণ তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই সকল চিন্তানায়কের মতে আস্থাবান্ হয়। এইরূপে জনসংখ্যার বিশাল এক অংশ যখন কোন নির্দিষ্ট মতের সমর্থক হয়, তখন তাহাকে জনমত বলা হয়। সুতরাং যে মত জনগণের বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর

কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই প্রকৃত জনমত বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন মতকে জনমত আখ্যা দেওয়া চলে না।

জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপায় (Agencies for the Formation and Expression of Public Opinion)

জনমত সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই সুপ্ত জনমতকে জাগ্রত করা আবশ্যক। জনমত একদিনে বা সহসা জাগ্রত হয় না—জনমতের সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ সময়সাপেক্ষ। বিভিন্ন উপায়ে এই জনমতকে রাজনৈতিকচেতনা-সম্পন্ন করিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিতে হয়। জনমত গঠনে নিম্নলিখিত উপায়গুলি বর্তমানযুগে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে।

১। সংবাদপত্র—The Press

জনমত গঠনে ও জনমত প্রকাশে সংবাদপত্র আজ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জনমত গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হইল কোন বিষয় সম্পর্কে জনগণকে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা যাহাতে এই তথ্যের ভিত্তিতে জনগণ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহাদের মত গঠন করিতে পারে। সংবাদপত্রগুলি এই তথ্য সরবরাহ করে। আইনসভার তর্ক-বিতর্ক, সরকারী আদেশ-নির্দেশ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌গণের মতামত, সভা-সমিতিগুলিতে প্রদত্ত বক্তৃতা, রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্রগুলি শুধু নিছক তথ্য সরবরাহ করে না—ইহারা এরূপ প্রণালীতে তথ্যগুলিকে বিন্যাস ও পরিবেশন করে যাহাতে সংবাদপত্র পাঠকবর্গ তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে মত গঠন করিতে পারে। প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কোন সংবাদপত্র সরকারী নীতির সমর্থক, কোনটি বা বিরোধী, আবার কোনটি বা মধ্যপন্থী। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র একই ঘটনার বিষয়বস্তু এরূপ বিভিন্নভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করে যাহাতে উক্ত সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ উক্ত সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদের ভিত্তিতে তাহাদের মতামত গঠন করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে, এক এক শ্রেণীর পাঠকবর্গের নিকট কোন একটি সংবাদপত্র বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

সুতরাং সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদপরিবেশনার মধ্য দিয়া সংবাদপত্রগুলি জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে। এতদ্ব্যতীত সংবাদপত্রে চিঠিপত্র প্রকাশ করিবার সুযোগ দান করিয়া সংবাদপত্রগুলি জনমত প্রকাশ ও সংগ্রহ করে। সংবাদপত্রগুলি একদিকে যেরূপ জনমত গঠনে ও প্রকাশে সাহায্য করে অপর-দিকে তদ্রূপ জনমত বিকৃত ও সংকীর্ণ করিতে পারে। বিকৃত তথ্য বিকৃত-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ইহারা জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, সরকার-বিরোধী মনোভাব প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারে। বর্তমান যুগে শিক্ষা বিস্তারের ফলে সংবাদপত্র পাঠার্থীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অধিকাংশ পাঠক সংবাদ পরিবেশনার ভিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করে। সুতরাং সংবাদপত্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাম্য হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণও সমভাবে কাম্য। যেহেতু সংবাদপত্রগুলি অজ্ঞ জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারে সাহায্য করে, সেইহেতু সংবাদপত্রগুলি যাহাতে স্বল্প মূল্যে দরিদ্র জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হয়, দেশের সরকারের সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

২। সভা-সমিতি—Platform

জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল সভা-সমিতির মাধ্যমে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মত যতই যুক্তিযুক্ত হউক না কেন তাহা কার্যকর হয় না। সেইজন্য সমবেতভাবে বহুজন সমষ্টি মিলিত হইয়া শোভা-যাত্রা, সভা বা সমিতির মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকাশ করে এবং এই সঙ্ঘবদ্ধ মত শক্তিশালী জনমতে পরিণত হয়। কোন মতের বিশিষ্ট সমর্থকগণ এইরূপ সভা-সমিতি মাধ্যমে তাঁহাদের মতের সারবত্তা বক্তৃতার সাহায্যে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া জনমত গঠন করিতে সাহায্য করেন। এরূপ সভা-সমিতি শুধু জনমত গঠন করে না—এইগুলি জনমত প্রকাশও করে। সভা-সমিতিগুলি জনস্বার্থের দাবীতে ও জনস্বার্থ-বিরুদ্ধ নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সেই প্রস্তাব কার্যকর করিবার উপায় হিসাবে আন্দোলন পরিচালনা করে। ইহাতে সুপ্তজনমত জাগ্রত ও সক্রিয় হইয়া আত্মপ্রকাশ করে।

৩। চলচ্চিত্র—The Cinema

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে সবাক্ চলচ্চিত্র জনমত গঠন ও প্রভাবিত করিবার একটি অভিনব উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়। সংবাদপত্র শুধু লিখন-পঠনপটু শিক্ষিত জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে চাক্ষুষ প্রমাণসহ তথ্য সরবরাহ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল চলচ্চিত্র। লোকে যুগপৎ চোখে দেখিয়া ও কানে শুনিয়া চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে এবং এই চলচ্চিত্রলব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করিতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, চলচ্চিত্র সাধারণতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় দেশের সরকার তাহার অনুসৃত নীতির সমর্থনে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। ব্যবসায়িগণও তাঁহাদের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু চলচ্চিত্র জনমত গঠনের একটি বিশিষ্ট উপায়।

৪। বেতার ও দূরদর্শন—The Radio and the Television

চলচ্চিত্রের ন্যায় বেতারও একটি জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে চলচ্চিত্রের ন্যায় এই উপায়ও জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। বেতার কিছু তথ্য সরবরাহ করে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনাও করে। কিন্তু ভারত প্রভৃতি অধিকাংশ দেশে বেতার প্রতিষ্ঠান সরকারের একচেটিয়া আয়ত্তে থাকিবার ফলে সরকার অনুসৃত রাজনীতিই বেতার ভাষণে স্থান পায়। সুতরাং বেতারে প্রচারিত সংবাদ ও ভাষ্যগুলি নিরপেক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং বেতার শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠনের একটি বিশিষ্ট উপায় হইলেও ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। দূরদর্শন যন্ত্র বর্তমানে জনমত গঠনে ও জনমত প্রভাবিত করিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। দূর-দূরান্তরের ঘটনা ও বক্তৃতা লোকে আজ ঘরে বসিয়া চাক্ষুষ দেখিতেছে ও শুনিতেছে। মার্কিন দেশে এই দূরদর্শনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সাপ্তাহিক বাণী জনগণের মধ্যে প্রচার করেন।

৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—Educational Institutions

জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে। এ সম্পর্কে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব আছে। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে মানুষ যে শিক্ষালাভ করে, পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিক্রমণীয় হয়। দেশের যাঁহারা নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টা তাঁহারা প্রায় সকলেই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। এই কারণে একনায়কতন্ত্র পরিচালিত দেশগুলিতে শিক্ষায়তনগুলির ছাত্রদের এই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা পরবর্তী জীবনে উক্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

৬। রাজনৈতিক দল—Political Parties

জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই হইল রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড। কিন্তু জনসাধারণ হইল অসংবদ্ধ ও কোন রাজনৈতিক বিষয়ে স্বকীয় মত গঠনে সাধারণতঃ অসমর্থ। রাজনৈতিক দলগুলি এই অসংবদ্ধ ও রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে কৌতূহল ও সচেতনতা সৃষ্টি করিয়া সুযোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হইল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা। কিন্তু জনসমর্থন ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। তাই দলগুলি শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি ও প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে উদাসীন ভোটদাতাকে উৎসাহশীল ভোটদাতায় পরিণত করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতা শিক্ষামূলক হইলেও দলগুলি যখন হীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে তখন সামাজিক আবহাওয়া দূষিত হয়।

আইনসভা (Legislatures)

আইনসভা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সরকার গঠনকারী দল ব্যতীতও সরকার সমর্থক ও সরকার-বিরোধী দলগুলি আইন-সভায় তাঁহাদের ভাষণ ও তর্ক-বিতর্কের দ্বারা জনমত জাগ্রত ও সক্রিয় করিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন দলের নেতাগণ আইনসভায় তাঁহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের তুলনামূলক বিচার করিতে পারে। এইরূপে আইনসভা জনমত গঠনে সাহায্য করে।

আইন ও জনমত (Law and Public Opinion)

বর্তমান যুগে নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা রাষ্ট্র-প্রণীত আইন দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও কৃষ্টিগত জীবন-ধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়তা করিবার অধিকার দাবী করে। বস্তুতঃ, মানবজীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহাকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত বলা যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-প্রণীত আইন-কানুন ও বিধিনিষেধগুলি যদি সার্বজনীন ও সর্ববাদিসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইনগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। এইজন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রের মূল কথা হইল যে, শাসনব্যবস্থা জনমতের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এবং আইনসভার প্রধান কর্তব্য হইল জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা। যে আইন জনস্বার্থের প্রতিকূল সে আইন সর্বথা পরিত্যাজ্য। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জনগণের আস্থাহীন হইবেন ও পরবর্তী নির্বাচনকালে জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং শাসনবিভাগ বা আইন-সভার পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনমত-বিরোধী কার্য করা সম্ভব নয়। আইনসভা প্রণীত আইন যদি দেশের জনমতকে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইনের বিশেষ কোন মর্যাদা থাকে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাকে জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যে শাসনব্যবস্থা জনমত দ্বারা সমর্থিত নয়, তাহা কখনও সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও বশ্যতার অভাবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। জনগণ সভা-সমিতি, সংবাদপত্র, শোভাযাত্রা, প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতির দ্বারা

আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলি ব্যর্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অস্ত্র 'বিদ্রোহ' দ্বারা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সুতরাং আইন-প্রণয়নে জনমতের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের জনমত (Public Opinion in India)

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতে প্রকৃত জনমত বলিয়া কার্যতঃ কোন শক্তি ছিল না। জনমত-গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও পরাধীনতা। পরাধীনতার অবসান হইবার ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃ আত্ম-সচেতন হইয়া তাহার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে শিখিতেছে। শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের ফলে তাহাদের জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের সংকীর্ণ স্বার্থদ্বারা প্ররোচিত না হইয়া জাতীয় স্বার্থদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে অচিরে ভারতে শক্তিশালী ও সক্রিয় জনমত গঠিত হইবে।

বর্তমানে প্রাদেশিকতা ভারতে জনমত গঠনের একটি প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিয়াছে। প্রাদেশিকতার মূল কারণ হইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণ এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া মনে করিবেন। জনমত যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, সেইজন্য দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্তসার

রাজনৈতিক দল—যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। দল-গঠন মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের মত এককভাবে কার্যকর হইতে পারে না, সেজন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষ তাহাদের সমবেত মতকে কার্যকর করিবার

প্রয়াস পায়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ-সাধন করা।

রাজনৈতিক দলের কার্য—জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার নীতি ও কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা দলের প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। জনসাধারণকে প্রচার-কার্যের দ্বারা দলীয় নীতিতে আস্থাবান্ করিয়া তাহাদের সমর্থন লাভ করা দলের আর একটি কার্য। সংখ্যাধিক্যের সমর্থন লাভ করিলে নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া রাজনৈতিক দল শাসনভার গ্রহণ করিতে পারে। শাসনভার হস্তগত হইলে দলীয় নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া রাজনৈতিক দল তাহার প্রতিশ্রুতি পূরণ করিতে পারে।

দলীয় শাসনের গুণ—১। অসংবদ্ধ জনমতকে প্রচারকার্যের দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া রাজনৈতিক দল জনশিক্ষা-প্রচারে সহায়তা করে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ লোকও উৎসাহিত হইয়া শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ্ স্থায়িত্ব লাভ করে ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম অনুসরণ করিতে পারে। ৩। দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে শাসনকার্যে উন্নতি হয়। বিরোধী দলের সমালোচনার জন্য ও পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হইবার আশঙ্কায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল স্বৈরাচারী হইতে পারে না বা জনমতকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে না। ৪। দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া সরকারী কার্য অব্যাহতভাবে পরিচালিত হইতে পারে।

দলীয় শাসনের দোষ—১। দলীয় শাসন মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে। ২। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ নষ্ট করিয়া দল-প্রথা ব্যক্তিত্ব উপেক্ষা করে। ৩। অনেক সময় দলের সমর্থকগণ দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন, ইহাতে জাতীয় স্বার্থ সঙ্কুচিত হয়। ৪। নির্বাচনকালে নানারূপ অবাঞ্ছিত ও নীতি-বিরোধী উপায়ে বিভিন্ন দল ভোট সংগ্রহ করে, ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়া নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। ৫। সংখ্যালঘু দল

শুধু বিরুদ্ধাচরণ করিবার উদ্দেশ্যে ভালমন্দ বিচার না করিয়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সকল কার্যক্রমে বাধা প্রদান করে।

দুই-দল বনাম বহু-দল—দুই-দলের গুণ: ১। দুই-দল থাকিলে ভোটদাতার প্রার্থিনির্বাচনের সমস্যা সহজ হয়। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভ করিয়া শাসনপরিষদ্ স্থায়িত্ব লাভ করে। ৩। বিরোধী দলের সমালোচনার দ্বারা জনমত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে এই ভয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বে-আইনী কার্য করিতে পারে না।

দুই-দলের দোষ: ১। এই ব্যবস্থায় দেশের জনমত বিশেষ করিয়া মধ্যপন্থী মত সম্যক্‌রূপে প্রকাশ হইতে পারে না। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা থাকে। ৩। মন্ত্রিসংসদ্ একটিমাত্র দলের নেতৃগণ দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া দেশের বিভিন্ন জনমত মন্ত্রিসংসদের কার্য দ্বারা প্রতিফলিত হয় না।

বহু-দলের গুণ: বহু-দল থাকিলে ১। দেশের জনমত অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইবার সুযোগ পায় ও জনসাধারণ এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারে। ২। মন্ত্রিসংসদ্ বহু-দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে জনমতের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক বলা যাইতে পারে। ৩। বহু-দলের সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদ্ অত্যাচারী হইতে পারে না।

বহু-দলের দোষ: ১। বহু-দলের সহযোগিতায় যে মন্ত্রিসংসদ্ গঠিত হয় তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। ২। অস্থায়ী বলিয়া মন্ত্রিসংসদ্ জাতীয় প্রগতিমূলক কোন দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না। ৩। বহু-দলের সম্মতি-সাপেক্ষ বলিয়া শাসনপরিষদ্ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। ৪। মন্ত্রিসংসদ্-গঠনে অনেক কূটনীতি প্রশ্রয় পায়।

এক-দলীয় শাসন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রুশিয়া, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে এক-দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এক-দলীয় সরকার অন্য দলগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করে। এক-দলীয় শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল, যে-কোন প্রকারে

হউক না কেন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্ত তাহারা ধর্ম, স্তায় ও নীতি পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এক-দলীয় সরকার দেশের স্বার্থে বিনা বাধায় দ্রুতগতিতে কার্য করিতে পারে। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা যে ক্ষুন্ন হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায়

১। শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের গণভোট, গণ-প্রস্তাব, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রভৃতি দ্বারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করা সম্ভব। ২। শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তির উপর সরকারী চাকুরী ও সরকারী সম্মান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইলে দলীয় শাসনের গলদ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে। ৩। লিখিত ও অ নমনীয় শাসনতন্ত্র এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে রাজনৈতিক দল তাহাদের খুশিমত কার্য করিতে পারে না। ৪। সরকারী কর্মচারী ও সংখ্যালঘু দলের স্তায্য অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইলে দলীয় ত্রুটি দূর করা সহজসাধ্য হয়।

দলবিহীন শাসন

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্তে অনেকে রাজনৈতিক দলগুলির বিলোপসাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। দলব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে এক-দলীয় সরকার বা দলগুলির সহযোগিতায় মন্ত্রিসংসদ্ গঠনের প্রস্তাবও করা হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে দলের অভ্যুত্থান স্বাভাবিক ও অনিবার্য। রাজনৈতিক দলের বিলোপসাধন না করিয়া দল-প্রথার দুর্বলতাগুলি দূর করিতে পারিলে দল-প্রথা অধিকতর কার্যকরী করা যায়।

জনমত—গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে শাসন-পরিচালনায় জনমতের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্তক। জনমতের কার্যকর শক্তির অভাবে গণতন্ত্র বিকৃত হইয়া স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে।

জনমতের প্রকৃতি—জনমত বলিতে সকল ব্যক্তিই যে একমতাবলম্বী হইবে ইহা বুঝায় না বা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতও বুঝায় না। যে মত

জনগণের বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই জনমত বলা হয়। সংখ্যালঘু দল এই মত সমর্থন না করিলেও সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না।

জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপায়—দেশে প্রকৃত জনমত গঠনে সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, রাজনৈতিক দল, চলচ্চিত্র, বেতার দূরদর্শন বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও বেতার-সাহায্যে জনমত প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্য এইগুলিকে ঠিক পথে পরিচালিত করা জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

আইন ও জনমত—গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমতের সমর্থন। রাষ্ট্র-প্রণীত আইন যদি জনমত প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইন লোকে মান্য করিতে চায় না। জনমতের প্রতিকূলতা করিয়া কোন সরকারই স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণ নানা উপায়ে, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতি দ্বারা আইন-প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতে জনমত—অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্য ভারতে এতদিন পর্যন্ত কোনরূপ প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে নাই। স্বাধীনতা-লাভের পর জাতীয় জীবনে নানা দিক দিয়া যে পরিবর্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, শিক্ষাবিস্তার হইলে ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠিত হইতে পারিবে। জনমত গঠনে ভারতের সংবাদপত্রগুলির ও রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the nature and functions of political parties. Are political parties indispensable in democracies? Give reasons for your answer.

রাজনৈতিক দলগুলির প্রকৃতি ও কর্মতৎপরতা আলোচনা কর। রাজনৈতিক দলগুলি কি গণতন্ত্রে অপরিহার্য? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

2. Explain the meaning of one-party rule. Discuss with reference to an example the advantages and disadvantages of one-party rule.

এক-দলের শাসন ব্যাখ্যা কর। একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে এক-দলীয় শাসনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

3. Discuss the problem of two-party system vs multiple-party system in democracies.

গণতন্ত্রে দ্বি-দল-প্রথা বনাম বহু-দল-প্রথা সমস্যাটি আলোচনা কর।

4. What is a political party? Are parties indispensable in a modern democracy?

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? গণতন্ত্রের পক্ষে কি রাজনৈতিক দল অপরিহার্য?

5. Discuss the nature of public opinion and point out its importance in popular government.

জনমতের প্রকৃতি আলোচনা কর এবং গণশাসন ব্যবস্থায় ইহার গুরুত্ব দর্শাও।

6. Explain the nature of Public opinion. What is its importance in popular government?

জনমতের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। জনগণ শাসিত সরকারে ইহার গুরুত্ব কি?

7. What do you mean by public opinion? Discuss the role of political parties, the press and the platform in moulding public opinion.

জনমত বলিতে কি বোঝায়? জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল, মুদ্রন যন্ত্র ও সভা-সমিতির ভূমিকা আলোচনা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী

(The Electorate)

নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার (The Electorate and the right of voting)

আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র বুঝায়। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাই তাহারা একটি নির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা সকল দেশেই একটা বিশেষ মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার কাহাদের থাকা উচিত, নির্বাচনব্যবস্থা কি ধরনের হওয়া উচিত, ইহা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দেশে যে সমস্ত লোকের ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার থাকে, তাহাদের সমষ্টিগতভাবে ভোটদাতৃমণ্ডলী বা নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকার: ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Universal Franchise: Arguments for and against the System)

গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভোটদানক্ষমতা আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ভোটদানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোট-দানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে তদনুরূপ ব্যাপক। অপরপক্ষে যত বেশী সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে গণতন্ত্রের পরিসর সেই অনুপাতে সঙ্কীর্ণতর হইবে। একটি দেশে যখন

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ভোটদানের অধিকার থাকে, তখন তাহাকে ব্যাপক বা সার্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকর হইলেও একটি দেশের সমস্ত নাগরিকেরই এই অধিকার থাকে না। সমস্ত জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে।

ভোটদান-ক্ষমতাকে সাধারণতঃ একটা অধিকার বলা হয়। কিন্তু একদিকে ইহা যেমন একটি অধিকার বলিয়া গণ্য হয়, অন্যদিকে ইহা আবার একটি গুরুদায়িত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। ভোটদান করার অধিকার হউক আর কর্তব্যই হউক, প্রত্যেক ভোটদাতার এই অধিকার অর্জন করিবার ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যেক্ষেত্রে এই অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায়, সেখানে ভোটদান-ক্ষমতা অর্পণ করা সমীচীন নয়। এই কারণে প্রত্যেক সভ্যদেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত, বিদেশীয় প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার-নীতির সপক্ষে বলা হয় যে, এই ক্ষমতা ব্যক্তিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি হইল জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা। সমষ্টিগত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার একমাত্র পন্থা হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার-দান। ভোটদান করিবার মাধ্যমেই জনসাধারণ শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ইচ্ছাকে কার্যকর করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে কোন শাসনব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রসম্মত শাসন ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী হইয়া যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে তজ্জন্য জনগণের ভোটাধিকার একান্ত আবশ্যক। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া জনগণ দায়িত্ববোধহীন ও অকর্মণ্য সরকারকে অপসারিত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে সকল নাগরিকই সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। একদল লোককে ভোটাধিকার দান

করিয়া অন্য সকলকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে, রাষ্ট্র তাহার সকল নাগরিকের নিকট হইতে সমান আনুগত্য লাভ করিতে পারে না। ফলে, রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ও এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য নাগরিকের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। সার্বজনীন স্বার্থের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এরূপ রাষ্ট্রকে কখনও কল্যাণরাষ্ট্র বলা যায় না।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে মিল, মেইন, লেকি প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভোটদান-অধিকার নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করিবার যোগ্যতা যাহাদের নাই, তাহাদের ভোটদান-অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত। মিল ভোটদান-ব্যাপারে ভোটদাতার শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা লিখিতে-পড়িতে জানে না ও গণিত-শাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত অপরিচিত, তাহাদের ভোটদান-অধিকার দেওয়া সমীচীন নয়। সুতরাং মিলের মতে পূর্বে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান-অধিকার দেওয়া উচিত ("Universal teaching must precede universal enfranchisement")। শুধুমাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিলে ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত সামান্য পরিচয় হইলেই যে লোকের ভোটদানের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়—এ-কথা সত্য নয়। ভোটদান-ব্যাপারে সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও মিলের উক্তির সমর্থন করা যায় না। সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহা সব সময়ে সত্য নয়। অধিকন্তু বর্তমানকালে দেখা যায় যে, ভিন্নমুখী নানাবিধ মতবাদ-প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির নিজস্ব মতের যতটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, অজ্ঞ এবং সংবাদপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা পাঠে অক্ষম ব্যক্তির নিজস্ব মতের ততটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ বুদ্ধি, পরার্থপরতা বা সমষ্টিগত হিতজ্ঞান প্রভৃতি যে গুণগুলি ভোটদানক্ষমতা-প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ভোট-দানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া

অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। সুতরাং পূর্বে শিক্ষা বিস্তার, পরে ভোটদান-ক্ষমতার সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করা যায় না। মিলের নিজ দেশ ইংলণ্ডেও মিল-বর্ণিত নীতি অনুসৃত হয় নাই। ইংলণ্ডে সংস্কার আইনগুলি পাস করিয়া যত সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোকই তখন লিখিতে পড়িতে পারিত। ভোটদান-ক্ষমতা সম্প্রসারণের ফলে জনগণের শিক্ষাবিস্তারের দাবী স্বীকৃত হইয়া শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল।

অনেকে বলেন যে, ভোটদাতার কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া চাই এবং কিছু কর-প্রদানের ক্ষমতা থাকা চাই। সম্পত্তিহীন ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ও মর্যাদা বুঝিতে পারে না, সেজন্য তাহারা সকল সময়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে নষ্ট হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু অধুনা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ভোটদান-অধিকারের একটি যোগ্যতা বলিয়া বিশেষ পরিগণিত হয় না। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত এবং এই প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার করা বর্তমান কল্যাণরাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Women Suffrage)

বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীজাতি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এমন কি, ইয়ুরোপের বহু প্রগতিশীল দেশেও বতমান শতাব্দী পর্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিপক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইত সেগুলি শুধু শিশু-সুলভ নয়, সেগুলিকে পুরুষের স্বার্থপরতার পরিচায়কও বলা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা যে, স্ত্রীজাতি যদি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্যার মধ্যে মতভেদের ফলে গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তি নষ্ট হইতে পারে। স্ত্রীজাতি অত্যধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে তাহাদের স্ত্রীসুলভ গুণগুলি অন্তর্হিত হইবে এবং তাহার ফলে শিশুপালন ও পারিবারিক জীবনযাপনে স্ত্রীজাতির অবশ্যকরণীয় কার্য-গুলি ব্যাহত হইবে। ইহা ছাড়াও বলা হয় যে, স্ত্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম নয়। আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়,

সুতরাং তাহাদের পৃথক্ ভাবে ভোট দিবার অধিকার থাকিতে পারে না। যুদ্ধে যোগদান করিবার ক্ষমতাকে অনেকে ভোটদানের একটি অপরিহার্য যোগ্যতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে যুদ্ধে যোগদানের অক্ষমতা-হেতু স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার জন্মিতে পারে না। পরিশেষে বলা হয় যে, অনেক স্ত্রীলোক এই ভোটাধিকার চায় না, সুতরাং স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

কিন্তু সুখের বিষয় যে, প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কাল হইতে স্ত্রীলোকের ভোটদানের ন্যায্য অধিকার প্রায় সমস্ত সভ্যদেশ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের ভোটদান-অধিকার শুধু যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নয়, আজ স্ত্রীজাতি ভোটদান ব্যাপারে পুরুষের সমানাধিকার অর্জন করিয়াছে। ইংলণ্ডে পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যা অপেক্ষা নারী ভোটদাতার সংখ্যা কিছু বেশী। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও সেই পার্থক্যের অজুহাতে সমাজের একটা বিরাট ও বিশিষ্ট অংশকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। জন স্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির ভোটদান-ক্ষমতার একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাঁহার মতে মাতৃত্ব ও শিশুপালন স্ত্রীজাতির একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি যদি মধ্যে মধ্যে ভোটদান করেন, তাহাতে তাহাদের স্ত্রীসুলভ বৃত্তিগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা যদি পুরুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্যও অনুরূপ উপাদান অপরিহার্য—এ কথা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের সমাবেশে সমাজ গঠিত। সুতরাং সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। স্ত্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে পারে না বা যুদ্ধক্ষম নয়—এ-কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। সক্রিয়ভাবে সৈনিকের কার্য না করিলেও অন্য নানাপ্রকারের বিশেষ করিয়া ধাত্রীহিসাবে স্ত্রীজাতি যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে স্ত্রীজাতি যে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্রীজাতিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত

রাখিবার আর সঙ্গত কারণ নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করেন ও দশ বছর পরে নূতন আইনের বলে তাঁহারা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টাদশবর্ষীয়া সকল নারীরই পুরুষের সমান ভোটাধিকার আছে। ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর প্রচারক ফরাসী দেশে এখনও পর্যন্ত স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন (Direct and Indirect Election)

সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়—প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ নিজেরাই সরাসরিভাবে ভোটদান করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। আইনসভার নিম্ন-পরিষদের সদস্যগণ ও স্থানীয় সরকারগুলির আইনসভা ও বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যমণ্ডলী সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

গুণ (Merit)

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারা অধিকতর সচেতন থাকেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকেও ভোটদাতাগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে হয়। এইরূপে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে, শাসকের দায়িত্ব বোধ ও শাসিতের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

দোষ (Demerit)

কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, ভোটদাতাগণ যদি অশিক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা নির্বাচনপ্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিতে পারেন না। অনেক সময় ভোটদাতাগণ ভালমন্দ বুঝিতে না পারিয়া প্রচারের

দ্বারা বিভ্রান্ত হন ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থের হানি করেন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের এই ত্রুটির জন্য অনেকে **পরোক্ষ নির্বাচন** পছন্দ করেন। পরোক্ষ নির্বাচন দ্বারা যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাঁহারা দুইটি দেশের পর্যায় ভোটদানের ফলে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, দেশের প্রাথমিক ভোটদাতৃমণ্ডলী ভোট দিয়া একদল প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এইরূপ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সুতরাং এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধিগণ সোজাসুজি ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে দ্বি-কক্ষ আইনসভ আছে, সেখানে উচ্চ-পরিষদের সদস্যগণের একটি অংশ ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত নিম্ন-পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

পরোক্ষ নির্বাচনের গুণ (Merit)

পরোক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রাথমিক ভোটদাতাগণ ভোট দিয়া অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর যে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আসল প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন বলিয়া যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরোক্ষ নির্বাচনের আর একটি সুবিধা হইল যে, আসল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে অল্পসংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং নির্বাচনের উত্তেজনা বা নির্বাচন-সংক্রান্ত কলহ, অশান্তি ও দুর্নীতি কম হয়।

দোষ (Demerit)

পরোক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতি নয় বলিয়া অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সহিত প্রাথমিক ভোটদাতাগণের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। প্রতিনিধিগণ অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা নির্বাচিত হন বলিয়া অনেক সময় জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যায়। জনসাধারণও প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে

প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান দোষ হইল যে, আসল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপার অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে থাকে। সুতরাং নির্বাচনে নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। যুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও পরোক্ষ নির্বাচন বাহুল্যমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভোটদাতাগণ যদি যোগ্য মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে সরাসরি আসল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে তাঁহাদের অক্ষম ভাবিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্র বনাম বহুসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্র (Single-Member Vs. Multiple-Member Constituency)

নির্বাচনকেন্দ্রগুলি এরূপভাবে সংগঠিত হইতে পারে যে, প্রতি নির্বাচন-জিলা হইতে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন অথবা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনপ্রথার বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্র দেশটিকে প্রতিনিধির সংখ্যানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিলায় ভাগ করিয়া প্রত্যেক জিলা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং প্রত্যেক ভোটদাতাকে একটিমাত্র ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। গ্রেট বৃটেন, ভারত প্রভৃতি দেশে এই প্রথা অনুসারে নির্বাচনকার্য পরিচালিত হয়।

অপরপক্ষে, বহুসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনপ্রথার বৈশিষ্ট্য হইল যে, যত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন সমগ্র দেশটিকে তদপেক্ষা অনেক কম সংখ্যক নির্বাচন-জিলায় বিভক্ত করিয়া প্রতি জিলা হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং সেই জিলা হইতে যত সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত হইবেন প্রত্যেক ভোটদাতা তত সংখ্যক ভোটদান করিতে পারেন। এই প্রথায় নির্বাচন-জিলাগুলি আকারে বৃহত্তর হয়। ফরাসী দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Single-Member Constituency)

প্রথমতঃ, একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনপ্রথার প্রধান সুবিধা হইল যে, এই প্রথায় ভোটদানব্যবস্থায় কোন জটিলতার না থাকার জন্য সাধারণ ভোট-

দাতাও তাহার একটিমাত্র ভোট তাহার পছন্দ অনুসারে যে-কোন প্রার্থীকে দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় নির্বাচন-জিলাগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য নির্বাচনপ্রার্থী এবং ভোটদাতা পরস্পরের পরিচিত হইয়া থাকেন এবং পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য তাঁহারা সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এই প্রথার আর একটি সুবিধা হইল যে, সংখ্যালঘু দলগুলি কোন-না-কোন জিলা হইতে তাঁহাদের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সমর্থ হন।

কিন্তু এই প্রথার প্রধান ক্রটি হইল যে, নির্বাচন-জিলাগুলি ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে ভোটদাতার পছন্দ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। নির্বাচন-জিলায় ভোটদাতার পছন্দমত যোগ্য প্রার্থী না থাকিলেও তাহাকে বাধ্য হইয়া নিম্নস্তরের প্রার্থীকে ভোট দিয়া নির্বাচন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচন-জিলায় বহু প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ফলে ভোটগুলি ভাগ হইয়া যে প্রার্থী আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাইয়া থাকেন তিনিই নির্বাচিত হন। সমগ্র ভোটসংখ্যার অর্ধেক ভোট না পাইয়াও আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপে সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত প্রার্থীকে জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধি বলা সমীচীন নহে।

তৃতীয়তঃ, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে একটি রাজনৈতিক দল অল্পসংখ্যক ভোট পাইয়াও অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার অনুপাতে সেই দল অধিক সংখ্যক আসন দখল করিতে পারে। ভারতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেসদল প্রদত্ত সমুদয় ভোটসংখ্যার শতকরা চল্লিশটি ভোট পাইয়াও সমুদয় আসন সংখ্যার শতকরা প্রায় সত্তরটি আসন দখল করিতে সক্ষম হয়।

চতুর্থতঃ, এই প্রথার আর একটি মারাত্মক ক্রটি হইল যে, ক্ষমতায় আসীন দল তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছামত নির্বাচন-জিলাগুলির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ক্ষুদ্র নির্বাচন-জিলা হইতে নির্বাচিত হওয়ার ফলে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতঃই সংকীর্ণ হইয়

পড়ে। এইজন্য তিনি তাঁহার প্রধান কর্তব্য অর্থাৎ দেশের বৃহত্তর স্বার্থ-সম্পর্কিত ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়েন।

বহুসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Multi-Member Constituencies)

এই প্রথার পক্ষে বলা হয় যে, নির্বাচন-জিলাগুলি বৃহত্তর হওয়ার ফলে ভোটদাতাগণ বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্য হইতে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন করিবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থার দ্বারা দেশের প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকতর সুযোগ হয়।

এই প্রথার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি তুলনামূলক বিচার করিলে অসুবিধাগুলিই অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ, নির্বাচন জিলাগুলি বৃহত্তর হওয়ার ফলে সাধারণ ভোটদাতার পক্ষে প্রার্থিগণের যোগ্যতা বিচার করিয়া ভোটদান করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রার্থিগণের পক্ষে ভোটদাতার ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মতামত জ্ঞাত হওয়া একরূপ অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় যে-কোন রাজনৈতিক দল আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অধিক সংখ্যক আসন দখল করিয়া সংখ্যালঘু দলগুলিকে তাহাদের ন্যায্য আসনসংখ্যা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় আইনসভায় বহু দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়—ফলে একাধিক দল লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয় বলিয়া কোন মন্ত্রিসভাই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ইহাতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ব্যাহত হয়।

উভয় প্রথার সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক যে, কোন প্রথাই এককভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এ সম্পর্কে ডঃ গার্ণারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতিনিধি-নিবাচনে নির্বাচন-জিলাগুলির সংগঠন উভয় প্রথার সংমিশ্রণে হওয়া উচিত। গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে এই মিশ্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতের নির্বাচন-জিলাগুলি প্রধানতঃ একসদস্য-সমন্বিত হইলেও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতিগুলির

জন্য আসন সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে একাধিক সদস্য-সমন্বিত নির্বাচন-জিলা গঠিত হইয়াছে।

অবৈতনিক বনাম বেতনভুক্ প্রতিনিধিত্ব (Should Representatives be paid or not?)

জন স্টুয়ার্ট মিল অবৈতনিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন যে, আইনসভার সদস্যগণ যদি বেতনভুক হন, তাহা হইলে অর্থের লোভে তাঁহারা আইনসভার সদস্য হইবার নিমিত্ত অধিকতর উৎসাহিত হইবেন। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বা অন্য জনহিতকর কার্যে তাঁহাদের তাদৃশ আগ্রহ থাকিবে না। এই সামান্য অর্থের লোভে অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আইনসভার সদস্য হইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। ফলে, যোগ্যতর ব্যক্তিগণ অর্থের লোভে আইনসভার সদস্য হওয়াকে সম্মানহানিকর বলিয়া বিবেচনা করিবেন। সদস্যগণ যদি বেতনভুক্ হন, তাহা হইলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও জনসাধারণের উপর করভারের চাপ বেশী পড়িবে।

বর্তমান যুগে উপরি-উক্ত মতবাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রায় সকল দেশের আইনসভার সদস্যগণই বেতন পাইয়া থাকেন। বেতনভুক্ প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যায়। আইনসভার কার্য বর্তমানে এত ব্যাপক ও জটিল হইয়াছে যে, সদস্যদের যথাযথভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে এই কার্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়। বাস্তব অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে তাঁহাদের সর্বদা স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হয়। সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া জনগণের সংস্পর্শে আসিতে হয়, নতুবা বাস্তবতার সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইতে পারে না। ইহা ছাড়া, বর্তমানে অধিক সংখ্যক সদস্য বিত্তহীন শ্রেণীর লোক-দিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বেতন না পাইলে তাঁহাদিগের পক্ষে আইনসভার সদস্যের কর্তব্য সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সরকারের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ বেতন পাইয়া থাকে। সুতরাং আইন-পরিষদের সদস্যগণ কিজন্য বেতন পাইবেন না, তাহার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অধুনা, গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশের আইনসভার সদস্যগণই বেতন পাইয়া থাকেন।

প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ (Nature of Representation)

নির্বাচিত প্রতিনিধির কর্তব্য সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন যে, প্রতিনিধি শুধু নিষ্ক্রিয় মুখপাত্র হিসাবে তাঁহার কার্য পরিচালনা করিবেন। তিনি যে কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইবেন, সেই কেন্দ্রের ভোটদাতাগণের নির্দেশ অনুসারে তাঁহার কার্য পরিচালনা করা অবশ্য-কর্তব্য। তাঁহার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিবার কোন অধিকার নাই।

উপরি-উক্ত মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয় এবং বর্তমান কালে প্রতিনিধির কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রতিনিধি বর্তমানে আর নিজ কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয় মুখপাত্র বলিয়া বিবেচিত হন না, তিনি সমস্ত জাতির প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হন। এ-কথা সত্য যে, প্রতিনিধিমাত্রই একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্বাচনের সময় প্রতিনিধিকে তাঁহার নির্বাচনের উদ্দেশ্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদের সমর্থন লাভ করিতে হয়। নির্বাচনের পরেও প্রয়োজনমত প্রতিনিধিকে নির্বাচকমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জ্ঞাত হইতে হয়। কিন্তু ভোটদাতাগণ বর্তমানে প্রতিনিধির ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির রাজনৈতিক মতামতের জন্যই ভোটদাতাগণ তাঁহাকে নির্বাচিত করেন। ভোটদাতাগণ ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা মতবিশেষের সমর্থক বলিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। প্রতিনিধি হইলেন মত বা নীতি-বিশেষের প্রতিনিধি, কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের প্রতিনিধি নহেন। সুতরাং নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ভোটদাতাগণের নির্দেশ অনুসারে কার্যপরিচালনা করিলে প্রতিনিধি যে মতের সমর্থক তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। প্রতিনিধি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী এবং সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ বলিয়া ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থ অপেক্ষা জাতির বৃহত্তর স্বার্থসংরক্ষণ ও ইহার উৎকর্ষসাধন হইল তাঁহার প্রধান কর্তব্য। প্রতিনিধি জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতেই তাঁহার বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহার নির্বাচনকেন্দ্র তাঁহাকে বেতন প্রদান করে না। নির্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইলেও তিনি জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে

সমগ্র জাতির প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। যে কার্যকে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল বলিয়া প্রতিনিধির বিবেকবুদ্ধি নির্দেশ দিবে, নিজ নির্বাচনকেন্দ্রের স্বার্থবিরোধী হইলেও বৃহত্তর স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সেই কার্য করাই প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্য বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। সুতরাং প্রতিনিধিকে নির্বাচনকেন্দ্রের নিষ্ক্রিয় মুখপাত্র না বলিয়া জাতির প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা অধিকতর সমীচীন।

একাধিক ভোটদান (Plural Voting or Weighted Voting)

অনেকক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিক ভোটদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। একই ব্যক্তি যখন বিভিন্ন যোগ্যতার জন্য দুই বা ততোধিক ভোট প্রদান করিতে সক্ষম হন, তখন তাহাকে একাধিক ভোটদানব্যবস্থা বলা হয়। সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে যেখানে ভোটদানের যোগ্যতা স্থির হয়, সেখানে নির্বাচক বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রে সম্পত্তির মালিক হইলে পৃথক্ ভাবে ভোটদান করিতে পারে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে একই ব্যক্তি বিভিন্ন যোগ্যতার মাপকাঠিতে একাধিক ভোট প্রদান করিতে পারেন। নির্দিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্রের প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী মাত্রই ভোটদান করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে এবং তিন বৎসর কাল অন্ততঃপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে শিক্ষাকার্যে ব্রতী থাকা ব্যক্তি হিসাবেও তাঁহার ভোটদান-ক্ষমতা থাকে।

একাধিক ভোটদানপদ্ধতির আর একটি প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারভেদের বিশেষত্ব হইল যে, শিক্ষিত ব্যক্তির বা সম্পত্তির মালিকের ভোটদান ক্ষমতায় অজ্ঞ ব্যক্তি বা সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির ভোটদান অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের এবং সম্পত্তির মালিক ও সম্পত্তিহীন ব্যক্তিগণের মধ্যে পার্থক্য করিবার জন্যই প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতির সপক্ষে বলা হয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিনিধি-নির্বাচনের যোগ্যতা অশিক্ষিত ব্যক্তির যোগ্যতা অপেক্ষা অনেক বেশী, সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থসংরক্ষণের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা অতীব

প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত ব্যক্তি ও সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা অশিক্ষিত ও সম্পত্তিহীন ব্যক্তিদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং শিক্ষিত ব্যক্তি ও সম্পত্তির মালিকগণের একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে, সম্পত্তিহীন ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থ সংকুচিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার দ্বারা নানাপ্রকারে জাতীয় উন্নতির সহায়তা করেন, অজ্ঞ লোক অপেক্ষা জাতীয় ব্যাপার পরিচালনায় তাঁহাদের অধিকতর অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দান করা যুক্তিযুক্ত।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে উহাদের সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি ও শিক্ষিত ব্যক্তির ভোটের গুরুত্ব স্থির করিবার উপযুক্ত এমন কোন মাপকাঠি নাই যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তির ভোট সব সময়েই অশিক্ষিত ব্যক্তির ভোট অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থের অধিক অনুকূল হইবে। সম্পত্তির মালিকানা-ভিত্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, সম্পত্তির মালিকানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকারসূত্র হইতে প্রাপ্ত, সম্পত্তির মালিকের নিজ যোগ্যতার দ্বারা অর্জিত নয়। গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল সমানাধিকার। একাধিক ভোটদান-পদ্ধতি সমানাধিকার নীতিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করে। সুতরাং এই পদ্ধতি গণতন্ত্রবিরোধী ও সেই কারণে বর্জনীয়।

প্রকাশ্য অথবা গোপন ভোট (Public or Secret Voting)

ভোটদান প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে, না গোপনে অনুষ্ঠিত হইবে এ সম্বন্ধে পূর্বে মতভেদ ছিল। প্রকাশ্য ভোটদান-পদ্ধতির সমর্থকগণের মতে ভোটদান করা নাগরিকগণের একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য এবং এই কর্তব্য নির্ভীকভাবে সর্বসমক্ষে পালন করা উচিত। ইহাতে ভোটদাতার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে। ভোটদাতা অপরের প্রশংসা বা নিন্দা উপেক্ষা করিয়া তাহার সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারে।

প্রকাশ্যে ভোটদান করা সৎসাহসের পরিচায়ক হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ভোটদাতার পক্ষে বা সমাজের পক্ষে হিতকর নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধারণ ভোটদাতা অপেক্ষা নির্বাচনপ্রার্থী উচ্চস্তরের

ব্যক্তি। নির্বাচনপ্রার্থী নানাপ্রকারে ভোটদাতাগণকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচনকার্য পরিচালিত হয়। সেইজন্য নির্বাচনপ্রার্থীর পশ্চাতে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সমর্থন থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্য ভোটদান-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইলে ভোটদাতার নানাভাবে বিব্রত ও উৎপীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে ভোটদান করা ভোটদাতার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। অনেক সময় বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া শুধু আত্মরক্ষার জন্যই ভোটদাতাকে ভোট দিতে বাধ্য হইতে হয়। সুতরাং ভোটদাতা যাহাতে নিজের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বাধীনভাবে তাহার প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে, সেজন্য গোপন ভোটদান-ব্যবস্থা অপরিহার্য। ব্যক্তি-বিশেষ বা দলবিশেষকে ভোট দিয়া ভোটদাতার যদি নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ভোটদান ক্ষমতা বিড়ম্বনা মাত্র। রাষ্ট্র যদি ভোটদাতাকে উৎপীড়নের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রকাশ্য ভোটদান-ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব নয়। প্রকাশ্যে ভোট-ব্যবস্থার এই অসুবিধার জন্য বর্তমানে গোপন ভোট-ব্যবস্থা সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের নির্বাচনসমস্যা (Problem of Minority Representation)

রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি-নির্বাচন হইয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া গণ্য হয়। এই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসনকার্য, পরিচালনা করে। সংখ্যালঘু দল তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না, ফলে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ প্রতিপদেই ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিবে—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেইজন্য আইনসভায় তাহাদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া, যে দল আজ সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহারা ভবিষ্যতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে

পারিবে না তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সুতরাং আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের দাবী উপেক্ষণীয় নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মতের প্রতিনিধিমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা গণতন্ত্রের একটা প্রধান উপাদান। সংখ্যালঘু দল যদি আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে না। নির্বাচনে এমনও হইতে পারে যে, সংখ্যালঘু দল শতকরা ৪৯টি ভোট পাইয়া একটি আসনও দখল করিতে পারিল না, আর শতকরা ৫১টি ভোট পাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সকল আসনগুলিই দখল করিল। এইরূপ নির্বাচনব্যবস্থার ফলে শতকরা ৪৯টি ভোটের অধিকারী দল একটিও আসন না পাইলে এ-জাতীয় নির্বাচনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট হইবে, তাহা নয়। প্রত্যেক সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহার সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে সেই জন্য অনুরূপভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর পুনর্গঠন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নির্বাচকমণ্ডলীর দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি দল বিশেষের পক্ষে ভোট দেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয় তাহা হইলে সংখ্যাগুরু দল আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করিতে পারিবে এবং সংখ্যালঘু দল এক-তৃতীয়াংশ আসন দখলের অধিকারী হইবে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরু দলই সর্বত্র শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলের যে কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকিবে না, এরূপ ব্যবস্থা কখনই গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক সংখ্যালঘু দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহাদের সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে, সেজন্য নানারূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। নিম্নে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হইল।

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী

(Methods of Minority Representation)

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন—Proportional Representation by Single Transferable Vote (Hare Scheme)

এই নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশটিকে নির্বাচন উদ্দেশ্যে কতকগুলি বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করিয়া এক একটি অঞ্চল হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইলেই নির্বাচিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটকে Electoral quota বলা হয়। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে যত সংখ্যক বৈধ ভোট গণনা করা হয়, সেই সংখ্যাকে সেই কেন্দ্রের আসন-সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হয়, তাহাই হইবে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা quota. এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতাকে নির্বাচনপ্রার্থিগণের নামের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং ভোটদাতা একটির অধিক ভোট প্রদান করিতে পারেন না। এই তালিকায় ভোটদাতা যে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য মনে করেন তাহার নামের পাশে '১' লিখিয়া দেন। ভোটদাতা তাঁহার পছন্দমত অন্য প্রার্থিগণের নামের পাশে যোগ্যতা অনুসারে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫ লিখিয়া দিতে পারেন। এই সংখ্যাগুলি হইল ভোটদাতার পছন্দের পরিমাপক।

ভোট-গণনার সময় যে সমস্ত প্রার্থী ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ অনুসারে পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা quota-র সমান ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যদি কোন নির্বাচন-প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই নির্বাচিত প্রার্থীর অতিরিক্ত ভোট তাহার পরবর্তী দ্বিতীয় পছন্দ-প্রাপ্ত প্রার্থীদের হস্তান্তরিত করা হয়। অতঃপর তাঁহাদের ভোট গণনা করা হয়। দ্বিতীয় পছন্দ-প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইবেন, তাঁহাদিগকেও নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহাদের অতিরিক্ত

ভোটগুলি তৃতীয় পছন্দ-প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। এইরূপে সকল আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গণনাকার্য চলিতে থাকে।

এই পদ্ধতি যাহাতে ত্রুটিবিহীন হয় সেইজন্য অনেক সময় quota ('কোটা') স্থির করিবার জন্য আসনসংখ্যার সহিত এক (১) যোগ করিয়া সেই সংখ্যা দ্বারা নির্বাচন-কেন্দ্রের সমগ্র বৈধ ভোটসংখ্যাকে ভাগ করা হয় এবং ভাগফলের সহিত এক (১) যোগ করা হয়। প্রণালীটি নিম্নে দেওয়া হইল:

$$\frac{\text{বৈধ ভোটসংখ্যা}}{\text{আসনসংখ্যা}+১}+১=\text{নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা quota.}$$

এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, সংখ্যানুপাতে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু দল আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতিতে কোন প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট না পাইলে ভোটদাতাদের ভোটটি কার্যকর হয় না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ভোটদাতার একটি ভোট অন্ততঃ কার্যকর হইবেই। ভোটদাতার প্রথম পছন্দ কার্যকর না হইলে দ্বিতীয় পছন্দ, না হইলে তৃতীয়—এইরূপে তাহার একটি পছন্দে একজন প্রার্থী নিশ্চয়ই নির্বাচিত হইবে। এই পদ্ধতির আরও একটি বিশেষ গুণ হইল যে, উহা যোগ্যতর ব্যক্তির নির্বাচন সম্ভব করিয়া আইনসভার মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

কিন্তু পদ্ধতিটি অতিশয় জটিলতাপূর্ণ ও ভোটগণনা করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ ও সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তালিকা-প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন (Proportional Representation by the List System)

তালিকা-প্রথা আনুপাতিক নিবাচন-পদ্ধতির একটি প্রকারভেদ বলিয়া গণ্য হয়। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির ন্যায় তালিকা-প্রথায়ও মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটসংখ্যাকে নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে উহাকে quota ('কোটা') বা নির্বাচনের উপযুক্ত ভোটসংখ্যা বলা হয়। এই প্রথায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ইহার মনোনীত নির্বাচনপ্রার্থীদের একটি তালিকা প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রদান

করে। তালিকায় প্রদত্ত প্রার্থীসংখ্যা নির্বাচন-কেন্দ্রের আসনসংখ্যার সমান হওয়া চাই। সেই কেন্দ্রে যতগুলি আসন পূরণ করিতে হইবে, ভোটদাতাগণ প্রত্যেকে সেই সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবে। কিন্তু এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হইল যে, ভোটদাতাকে প্রার্থী-হিসাবে ভোট না দিয়া তালিকা-হিসাবে ভোট দিতে হয়। ভোটদাতা যে-কোন একটি তালিকাকে তাহার সমগ্র ভোট প্রদান করিবে। প্রত্যেক তালিকার উপর প্রদত্ত মোট ভোট-সংখ্যাকে 'কোটা' দিয়া ভাগ করিলে যে ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি-সংশ্লিষ্ট তালিকা হইতে নির্বাচিত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি নির্বাচন-কেন্দ্রে চারিটি আসন পূরণ করিতে হইবে এবং এই কেন্দ্রে প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যা হইল ৪,০০০ হাজার। তাহা হইলে ৪,০০০÷৪ অর্থাৎ ১,০০০ সংখ্যা 'কোটা' বলিয়া স্থির হইবে ও প্রত্যেক নিবাচনপ্রার্থী দলের তালিকায় অন্ততঃপক্ষে 'কোটা' সংখ্যক ভোট পড়িলে সেই তালিকা হইতে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারিবে। ভোটদানের পর দেখা গেল যে, 'ক' দল মোট ভোটসংখ্যার মধ্যে দুই হাজার ভোট পাইয়াছে এবং 'খ' ও 'গ' দল যথাক্রমে এক হাজার করিয়া ভোট পাইয়াছে। প্রত্যেক দল কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটসংখ্যাকে 'কোটা' দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা দাঁড়াইবে, সেই সংখ্যক আসন তিনটি দলের মধ্যে বণ্টন করা হইবে অর্থাৎ 'ক' দল দুইটি আসন এবং 'খ' ও 'গ' দল যথাক্রমে একটি আসন লাভ করিবে।

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় ও প্রত্যেকটি দল সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নিবাচনে সুযোগ পায়। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির মত ইহা জটিল বা ব্যয়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া নিবাচনপ্রার্থীর যোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

সীমাবদ্ধ ভোট (Limited Vote System)

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের আর একটি উপায় হইল সীমাবদ্ধ ভোট-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি নিবাচন-কেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নিবাচিত হইতে পারে। যদি কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে ছয়টি আসন

পূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন ভোটদাতাই চারিটির অধিক ভোট দিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কোন-মতেই চারিটির অধিক আসন দখল করিতে পারে না। অবশিষ্ট দুইটি আসন সংখ্যালঘু দল পাইতে পারে।

এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু দল কিছুসংখ্যক আসন পাইলেও তাহাদের সংখ্যানুপাতে যে প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হইতে পারিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি হইতে আদৌ কোন আসন দখল নাও করিতে পারে।

স্তূপীকারী বা একত্রিত ভোট (Cumulative Vote)

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নির্বাচনের আর একটি উপায় হইল স্তূপীকারী ভোটপদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ নির্বাচন কেন্দ্রের আসনসংখ্যার সমসংখ্যক ভোটদান করিতে পারেন। কিন্তু ভোটগুলি বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ না করিয়া ভোটদাতা ইচ্ছা করিলে একজন প্রার্থী বা দুইজন প্রার্থীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে পারেন। ধরা যাউক, কোন নির্বাচন-কেন্দ্রের পাঁচটি আসন পূরণ করিবার জন্য ভোটদাতার পাঁচটি ভোট আছে। এক্ষেত্রে ভোটদাতা পাঁচজন পৃথক্ প্রার্থীকে একটি করিয়া ভোট দিতে পারেন, অথবা পাঁচটি ভোট একজন প্রার্থীকে দিতে পারেন, কিংবা একজনকে তিনটি ও অপর একজনকে দুইটি ভোট দিতে পারেন। এইরূপে একটি সংখ্যালঘু দল তাহাদের সমুদয় ভোট একজন প্রার্থীকে দিয়া তাহাকে নির্বাচিত করিবার সুযোগ পায়।

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দল প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার সুযোগ পায় বটে কিন্তু সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় অনেক ভোট নষ্ট হয়। একজন জনপ্রিয় প্রার্থী তাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিপুল সংখ্যক ভোট পাইতে পারেন, অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় প্রার্থী অল্পসংখ্যক ভোট পাইতে পারেন।

দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ (Second Ballot System)

নির্বাচনপ্রার্থী যাহাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বাচিত হইতে

পারেন সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে একটিমাত্র আসনের জন্য যখন দুইটির অধিক প্রার্থী প্রতিযোগিতা করেন, তখন ইহাদের মধ্যে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পান তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইলেও এই প্রার্থী নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্বাচিত নাও হইতে পারেন। ধরা যাউক, কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে বার হাজার ভোট প্রদত্ত হইয়াছে। এই বার হাজার ভোট তিনজন নির্বাচন-প্রার্থীর মধ্যে পাঁচ হাজার চার হাজার ও তিন হাজার করিয়া ভাগ হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার, ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্বাচন করিবার জন্য যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে প্রার্থীপদ হইতে অপসারিত করিয়া অধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত দুইজন প্রার্থীর পক্ষে পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়বার দুইজন প্রার্থী থাকায় একজন নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বাচিত হইতে পারেন।

এই ব্যবস্থায় নির্বাচনে বিলম্ব ঘটে ও প্রার্থীগণেরও নির্বাচনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Proportional Representation)

আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যেক দলই ইহার সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যখন দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন দল আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে, তখন আইনসভা সার্থকরূপে জনমত প্রতিফলিত করিতে সক্ষম হয়। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সন্তুষ্ট থাকে এবং সর্বদলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সরকারকে প্রকৃত জনগণ দ্বারা পরিচালিত সরকার বলা যায়। চতুর্থতঃ, হেয়ার উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতা জানে যে, তাহার একটি ভোট নিশ্চিতরূপে সার্থক হইবে। এইজন্য ভোটদাতার আত্মপ্রত্যয় জন্মে এবং তাহার রাজনৈতিক

চেতনা বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণ ব্যাপারে তাহার উৎসাহ জন্মে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা যোগ্যতার নির্বাচন সম্ভব হয়। ফলে আইনসভার মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আনুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল ও সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত নহে। এই পদ্ধতির বিশেষ ত্রুটি হইল যে, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও উপদল সৃষ্টি করিয়া আইনসভার সংহতি বিনষ্ট করে। ফলে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে আইন-প্রণয়ন কার্য বাধা পায়। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্যের অভাবে সরকার দুর্বল হয় এবং এই দুর্বলতার ফলে শাসনব্যবস্থায় নানাপ্রকার দুর্নীতি আশ্রয় পায়।

বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার উপায় (Methods of Protection of the Rights of Minorities in different Countries)

আধুনিক অনেক দেশেই বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেখা যায়। আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারগুলি যাহাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য লিখিত বা অলিখিত আইন বা অন্য নানা উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারগুলি সুরক্ষিত করা হয়।

ইংলণ্ড—ইংলণ্ডে সংখ্যালঘু সমস্যা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইংলণ্ডে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা-কল্পে তাহারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ উপেক্ষা করিতে পারে। ইংলণ্ডে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের সনদ, অধিকারের আবেদন, হেবিয়াস্ কর্পাস্ অ্যাক্ট প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক

আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। এতদ্ব্যতীত স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থা জনগণের অধিকাররক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান অধিকার ভোগ করে এবং এই অধিকার মানবিক অধিকার ঘোষণায় (Declaration of Rights of Man) দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট ইহার সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কে এই বিচারালয় কতকগুলি বিশেষ নীতি নির্ধারণ করিয়া তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু জাতি বাস করে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষাগত, কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় অধিকারগুলি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic), স্ব-শাসিত অঞ্চল (Autonomous Region) ও জাতীয় এলাকা (National Area) সৃষ্টি করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি এই স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সাহায্যে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে পারে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহারা নিজস্ব ভাষায় ইহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, প্রত্যেকটি অঞ্চল ও প্রত্যেকটি জাতীয় এলাকা সুপ্রীম সোভিয়েতে যথাক্রমে ১১, ৫ ও ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সর্ববিষয়ে সমান অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কাজ করিবার, বিশ্রাম করিবার, শিক্ষা ও ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার সকল সম্প্রদায়ের লোক ভোগ করে।

ভারত—ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অধিকারসমূহ শাসনতন্ত্রে বর্ণিত মৌলিক অধিকার দ্বারা সংরক্ষিত করা হইয়াছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। যদি কোন কারণে এই মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে উহার প্রতিবিধান করিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা করে। ইহা ব্যতীত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার বিশেষ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (Territorial or Geographical Vs. Occupational or Functional or Vocational Representation)

প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ, আঞ্চলিক ভিত্তিতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি নির্বাচন-অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চল হইতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেকটি অঞ্চলের সমগ্র অধিবাসিবৃন্দ জাতি, বর্ণ ও বৃত্তি-নির্বিশেষে প্রতিনিধি-নির্বাচনে ভোট প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার একজন প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের একটি জিলা বা মহকুমার সমস্ত ভোটদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ভোটে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। উক্ত জিলায় বা মহকুমায় শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, তাঁতি, কর্মকার, রেলকর্মী প্রভৃতি নানা পেশার লোকের বাস থাকিলেও এই সকল বিভিন্ন পেশার লোক ভোটদাতা হিসাবে একত্রে ভোটদান করিয়া তাহাদের পছন্দমত যে-কোন বৃত্তির লোককে প্রতিনিধি-নির্বাচন করিতে পারে। এই ব্যবস্থামত একজন ডাক্তার তাহার নিজ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পেশার অন্যান্য লোকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। মানুষ যখন একই অঞ্চলের অধিবাসী হয় তখন তাহারা সমস্বার্থসম্পন্ন হয়। সুতরাং একজন ডাক্তার বৃত্তিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেই অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের—তাঁতি, কর্মকার, সূত্রধর, শিক্ষক, রেলকর্মী, উকিল প্রভৃতির—প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের মূল কথা হইল যে, মানুষের রাজনৈতিক মতামত তাহার আঞ্চলিক স্বার্থদ্বারা যতটা প্রভাবিত হয় অন্য কিছুর দ্বারা ততটা প্রভাবিত হয় না। সুতরাং আঞ্চলিক ভিত্তির মধ্য দিয়াই তাহাকে তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদিগণ দাবী করেন যে, আঞ্চলিক নির্বাচন-কেন্দ্রের সাহায্যে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দ্বারা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি

নির্বাচিত হইতে পারে না। একই অঞ্চলের অধিবাসী হইলে যে সকল অধিবাসীই সমস্বার্থসম্পন্ন হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একজন ডাক্তারের প্রতিবেশী হইলে একজন কর্মকার যে ডাক্তারের সমস্বার্থসম্পন্ন হইবে তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না। শ্রমিক ও মালিক, জমিদার ও প্রজা, কোন কার্যালয়ের বড়কর্তা ও চাপরাসী একই অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও তাহাদের সমস্বার্থসম্পন্ন বলা দূরে থাকুক বিরুদ্ধস্বার্থসম্পন্ন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের রাজনৈতিক মতামত তাহার জীবিকা অর্জনের বৃত্তিদ্বারা অধিক পরিমাণে স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং বৃত্তিগত নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়াই তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। একজন ডাক্তার ও একজন কর্মকারের স্বার্থের মধ্যে এত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় যে, একজন ডাক্তার একজন কর্মকারের প্রতিবেশী হইলেও কর্মকারের প্রতিনিধিত্ব করিতে সক্ষম নয়। ডাক্তার ও কর্মকারের জীবনযাত্রা প্রণালী ও চিন্তাধারার মধ্যে এত বৈষম্য আছে যে, কেহ কাহারও প্রতিনিধিত্ব করিলে অন্যের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য ডাক্তারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন একজন সমস্বার্থসম্পন্ন ডাক্তার, অপরপক্ষে একজন কর্মকারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন একজন সমস্বার্থসম্পন্ন কর্মকার। তাহা হইলে উভয়কেই প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হইবে। সুতরাং নির্বাচন-কেন্দ্রগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া বৃত্তি অনুযায়ী সংগঠিত করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থামত সমস্ত দেশটিকে কতকগুলি বৃত্তিমূলক কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বৃত্তির লোকের জন্য পৃথক নির্বাচন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। জমিদার, প্রজা, শ্রমিক, মালিক, শিক্ষক, কর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন পেশার ভোটদাতৃগণ এক অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও পেশাগত নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই ব্যবস্থার মূল কথা হইল যে, মানুষের রাজনৈতিক মতামত তাহার বৃত্তিগত স্বার্থের দ্বারা যতদূর প্রভাবিত হয় অন্য কিছুর দ্বারা ততটা হয় না। সুতরাং বৃত্তিগত নির্বাচন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে।

সমালোচনা (Criticism)

যুক্তির দিক দিয়া দেখিলে বৃত্তিগত ব্যবস্থার দাবী একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আইন-পরিষদ্‌কে বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের দ্বারা সংগঠন করিলে আইনসভার কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তিত করিবার পথে অনেক অন্তরায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, কোন্ বৃত্তিগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবে ও কোন্‌গুলি নির্বাচন করিতে পারিবে না তাহা স্থির করা একটা জটিল সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্যার সমাধান হইলেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিগুলিও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিগুলির মধ্যে আসনসংখ্যা কি নীতিতে বণ্টন হইবে তাহা স্থির করা আর একটি সমস্যারূপে দেখা দিবে। তৃতীয়তঃ, বৃত্তি-মূলক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা গঠিত আইন-পরিষদে বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিগণ জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণ অপেক্ষা বৃত্তিগত স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অধিকতর যত্নবান্ হইবেন। ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে। বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিদ্বেষ ও কলহের ফলে আইনসভার সংহতি ও মর্যাদা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। আইনসভা শেষ পর্যন্ত একটা বিতর্কসভায় পর্যবসিত হইবে। চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, নির্বাচনব্যবস্থা মানুষের নাগরিকত্ববোধকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বৃত্তিবোধের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষ তাহার সমগ্র নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসনব্যবস্থা সংগঠন করে। বৃত্তিগত জীবন মানুষের সমগ্র নাগরিক জীবনের একটি অংশ মাত্র সুতরাং বৃত্তির মধ্য দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনব্যবস্থা পরিচালিত হইলে নাগরিক জীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। যিনি প্রতিনিধিত্ব করিবেন তিনি কোন বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধি নহেন, তিনি নাগরিক জীবনের সমগ্র স্বার্থের প্রতিনিধি। পঞ্চমতঃ, প্রতিনিধি জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে তাঁহার বেতন পাইয়া থাকেন, কোন বিশেষ বৃত্তির লোকেরা তাঁহার বেতন প্রদান করে না। সুতরাং কোন বৃত্তি বিশেষের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় ভোটদাতার দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র তাহার বৃত্তিগত স্বার্থের উপর নিবদ্ধ থাকার ফলে তাহাকে সংকীর্ণমনা করিয়া তুলে। এ জাতীয় ভোটদাতা কখনই প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক হইতে পারে না। সুতরাং

বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব কোনমতেই কাম্য নহে। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই প্রতিনিধি-নির্বাচন হওয়া উচিত। কিন্তু নির্বাচনব্যবস্থা এরূপভাবে সংগঠিত হইবে যাহাতে দেশের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন স্বার্থ আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পায়।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচন (Communal Representation through Separate Electorate)

ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদের পার্থক্য অনুসারে সংগঠিত না হইয়া সামাজিক এবং ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তির উপর সংগঠিত হইয়াছিল। এই রাজনৈতিক দলগুলির হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি নামকরণও হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনকালে নির্বাচনপ্রথার দ্বারা যখন আইনসভার আসনগুলি পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইল তখন হইতে প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল। আইন-পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন রক্ষিত ছিল এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচনের দ্বারা এই আসনগুলি পূরণ করা হইত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আসনগুলি হিন্দু ভোটদাতাগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত হিন্দু প্রতিনিধি দ্বারা পূরণ করা হইত, আর মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুসলমানগণের প্রদত্ত ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইত। হিন্দুর মুসলমান ভোটদাতার ভোটের প্রয়োজন হইত না, আবার মুসলমান প্রতিনিধির নির্বাচনের জন্য হিন্দুর ভোটপ্রার্থী হইতে হইত না। এক অঞ্চলের অধিবাসী ও সমস্বার্থসম্পন্ন হইলেও হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করিত হিন্দু, আর মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিত মুসলমান।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচনের পক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু দল একমাত্র পৃথক্ নির্বাচনের সাহায্যে প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পৃথক্ নির্বাচন-প্রথার অবর্তমানে তাহাদের একটি প্রতিনিধিও হয়ত আইনসভার সদস্য নির্বাচিত না হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থহানি হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। এই ব্যবস্থা মানুষের চিন্তাধারাকে সঙ্কুচিত করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক সাম্প্রদায়িক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠে, ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া অন্য সম্প্রদায়ের সমস্বার্থের ক্ষতি করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। সরকারী চাকুরীগুলিতে যোগ্যতার মাপকাঠির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের দাবীতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ফলে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায়। যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু বলিয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়, তাহারা কখনই নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় জীবনে একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার করিবার প্রয়াস পায় না। সাম্প্রদায়িকতার ফলে ভারত আজ দ্বিধাবিভক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য (Functions of the Electorate)

স্বৈরাচারী অথবা এক-নায়কের অধীন শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় দর্শকের পর্যায়ে পরিণত হয়। শাসকের ইচ্ছানুসারেই শাসিতের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আধুনিক যুগে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শাসিতেরাই শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া শাসনকার্যকে চালু রাখে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ভোটদানের অধিকারী। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার সদস্য নির্বাচন করে। আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যের তদারক করে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষমতা যে-কেহই পরিচালিত করুক না কেন, ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল নির্বাচকমণ্ডলী।

প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যতীত ভোটদাতৃমণ্ডলীর আর একটি কর্তব্য হইল শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা

শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি নির্বাচকমণ্ডলীর মত উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন বা শাসনকার্য পরিচালিত করে, তাহা হইলে ভোটদাতাগণ শক্তিশালী জনমত গঠন করিয়া সর্বতোভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে জনমত অনুসারে কার্যপরিচালনায় বাধ্য করিতে পারে। অল্প ব্যবধানে নির্বাচন, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ, গণভোট ও গণপ্রস্তাব অধিকারের মধ্য দিয়া নির্বাচকমণ্ডলী সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অপরপক্ষে, সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়াও নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের উপর পরোক্ষভাবে জনমতের শক্তিকে কার্যকরী করিতে পারে।

বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের সরকারই দলীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ নীতি ও কার্যক্রম আছে। এই নীতি ও কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সমর্থিত না হইলে সেই দলের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলী শাসনব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচকমণ্ডলী শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র নহে, তাহাদের কার্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শাসনকার্যে দক্ষ ও জনস্বার্থের পরিপোষক হইবে কিনা তাহা প্রধানতঃ নির্বাচকমণ্ডলীর যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য বলা যায় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য সুসংবদ্ধ ও সদাজাগ্রত জনমতের উপর নির্ভর করে।

সংক্ষিপ্তসার

নির্বাচকমণ্ডলী ও সার্বজনীন ভোটাধিকার—জনসংখ্যার যে অংশ ভোটদান করিয়া আইনসভার সদস্য নির্বাচন করিতে সক্ষম, তাহাকে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদান-ক্ষমতা থাকা গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত, বিদেশী প্রভৃতির ভোটদান-ক্ষমতা থাকে না। ভোটদান-ক্ষমতা একটা নাগরিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা নাগরিক জীবনের

একটা প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য যাহারা সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে অক্ষম, তাহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার—স্ত্রীজাতি পুরুষের উপর নির্ভরশীল, যুদ্ধে যোগদানে অক্ষম ও পারিবারিক সুখশান্তির পক্ষে অপরিহার্য—এই সমস্ত কারণে এতদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। অধুনা স্ত্রীজাতি জীবনের নানাক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া পুরুষের সমান ভোটদান-ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। স্ত্রীজাতি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অনেক নীচতা লোপ পাইবে ও রাষ্ট্রের শক্তি দ্বিগুণিত হইবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন—প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ ভোট দিয়া সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পরোক্ষ প্রথায় ভোটদাতাগণ একদল মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ও এই প্রতিনিধিগণ আসল প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতা ও প্রতিনিধি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত থাকিয়া মতামতের আদান-প্রদান করিতে পারেন। এই প্রথা ভোটদাতার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। পরোক্ষ নির্বাচনে ইহা সম্ভব নয়। ইহাতে প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক ভোটদাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়। পরোক্ষ নির্বাচনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর প্রতিনিধির নির্বাচন সম্ভব হয় ও নির্বাচনকার্যে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে না।

অবৈতনিক বনাম বেতনভুক্ প্রতিনিধিত্ব—পূর্বে প্রতিনিধিগণকে সাধারণতঃ কোনরূপ বেতন বা ভাতা দিবার রীতি ছিল না। সামান্য অর্থলোভের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অনেক অযোগ্য ব্যক্তি প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করা হইত। বর্তমানে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আইনসভার সদস্যগণকে বর্তমানে নানাবিধ কার্য করিতে হয় ও তাঁহাদের এইজন্য অনেক সময় ব্যয় করিতে হয়। তাহা ছাড়া যদি শাসন-বিভাগীয় ও বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিগণ বেতনভুক্ হন, তাহা হইলে আইনপরিষদের সদস্যগণেরও বেতন পাওয়া উচিত বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। এই কারণে আইনসভার সদস্যগণকে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ—প্রতিনিধিকে শুধু তাঁহার নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা হইলে ভুল করা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচন-কেন্দ্র-বিশেষ হইতে নির্বাচিত হইলেও তিনি জনমতের প্রতিনিধি, কোন অঞ্চল-বিশেষের প্রতিনিধি নহেন। সাধারণ স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তাঁহাকে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিনিধি সাধারণ তহবিল হইতে তাঁহার বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন, সুতরাং কোন অঞ্চল-বিশেষের প্রতি তাঁহার বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

একাধিক ভোটদান পদ্ধতি—নির্বাচনে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন যোগ্যতার জন্য অনেক সময় একাধিক ভোটপ্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। একই ব্যক্তিকে সম্পত্তির মালিক হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে দুই বা তিনটি ভোটের অধিকারী হইতে দেখা যায়। এই প্রথা গণতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া অনেক দেশে ইহার বিলোপ সাধন করা হইয়াছে।

প্রকাশ্য অথবা গোপন ভোট—প্রকাশ্য ভোটদান-ব্যবস্থায় সর্বসমক্ষে ভোটদাতাগণ ভোটদান করে। গোপন ভোটদান-পদ্ধতিতে ভোটদাতা সকলের অলক্ষ্যে নিজ ইচ্ছানুসারে ভোটদান করিতে পারে। প্রকাশ্য ভোটদান-ব্যবস্থার ফলে ভোটদাতার নিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকে ও সেইজন্য ভোটদাতা সব সময়ে নিজ ইচ্ছানুসারে ভোটদান করিতে পারে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের নির্বাচনসমস্যা—আইনপরিষদের সংগঠন এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু দল সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধির অভাবে গণতন্ত্র কার্যকর হইতে পারে না। এইজন্য নিম্নলিখিত নির্বাচন-প্রণালীগুলির দ্বারা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে:—

১। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন, ২। তালিকা-প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন, ৩। সীমাবদ্ধ ভোট; ৪। স্তূপীকারী ভোট, ৫। পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা।

এই প্রণালীগুলির মধ্যে পূর্বে ভারতে প্রবর্তিত পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। এই ব্যবস্থায় জাতীয়তাবোধ নষ্ট হয় ও বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ অনিবার্য হইয়া উঠে। ফলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে।

আঞ্চলিক বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব—সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি নির্বাচনকেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রতি কেন্দ্র হইতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনব্যবস্থাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বলা হয়। এই ব্যবস্থার মূল কথা হইল যে, একই অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া বিভিন্ন বৃত্তি-অবলম্বী হইলেও সেই অঞ্চলের সমুদয় অধিবাসীই সমস্বার্থসম্পন্ন হয়। সুতরাং এই বিভিন্ন পেশার ভোটদাতাগণের একত্রে ভোট প্রদান করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিত। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের মূল কথা হইল যে, একই বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জন করিলে এক অঞ্চলের অধিবাসী না হইয়াও একই বৃত্তির লোকগণ অধিকতর সমস্বার্থসম্পন্ন হয়। সুতরাং নির্বাচনব্যাপারে সমস্বার্থ-সম্পন্ন ভোটদাতাগণকে একই নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া তাহাদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত অর্থাৎ শিক্ষকের প্রতিনিধি হইবেন শিক্ষকশ্রেণী দ্বারা নির্বাচিত শিক্ষক, আর রেলকর্মীর প্রতিনিধিত্ব করিবেন রেলকর্মী দ্বারা নির্বাচিত রেলকর্মী।

পেশাগত প্রতিনিধিত্ব যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ কাম্য নহে। আইনসভার আসনসংখ্যা বৃত্তিগতভাবে ভাগ করা দুরূহ। এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধিগণের দৃষ্টিভঙ্গী তাহাদের সংকীর্ণ বৃত্তিগত স্বার্থে আবদ্ধ থাকার ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি হয়। আইনসভায় জনমতের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়, কোন বৃত্তি-বিশেষের প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে আইনসভা গঠিত হয় না।

নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য—১। প্রতিনিধি নির্বাচন করা; ২। প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন কর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্যক্রমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; ৩। প্রত্যক্ষভাবে গণভোট, গণপ্রস্তাব-অধিকার ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দ্বারা সক্রিয়ভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা।

রাষ্ট্রতত্ত্ব

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অবতারণা

Introduction

নামকরণ (Nomenclature)

সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনা করাই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু বিষয়বস্তুর আলোচনার পূর্বে আমাদের পঠিতব্য বিষয়ের একটি সর্বজনগ্রাহ্য নামকরণ করা প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রটিকে নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে—যথা, রাজনীতি (Politics), রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy) ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল্‌ এই শাস্ত্রকে রাজনীতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রকে রাজনীতি বলিতে অনেক লেখক আপত্তি করেন। তাঁহাদের আপত্তির কারণ হইল যে, রাজনীতি বলিতে প্রধানতঃ রাজ্যশাসনের চলিত রীতিনীতি ও পদ্ধতি বুঝায়। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমরা বর্তমান যুগে বুঝি সরকারের সাম্প্রতিক সমস্যাসমূহকে, যেমন ভারতরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সমস্যা হইল, পাকিস্তানের সহিত কাশ্মীর লইয়া যে বিরোধ সেই সমস্যার সমাধান করা। সুতরাং রাজনীতি বলিলে বুঝা যায় যে, যে-মত অনুসরণ করিয়া সরকার তাহার কার্যাবলী পরিচালনা করে তাহাকেই তদানীন্তন রাজনীতি বলা হয়। এইজন্য সর্বদেশে সর্বসময়ে এক রাজনীতি বা এক রাজনৈতিক মত বা একই প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজনীতি শুধু সরকারের বর্তমান অনুসৃত নীতি ও শাসনব্যবস্থার পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য শাস্ত্র ইহা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সরকারের নীতি ও শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা ব্যতীত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-

সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করা এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এইজন্য অনেক লেখক এই শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রদর্শন' এই আখ্যা দিতে চাহেন।

রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় তত্ত্বকথা আলোচনা করাই রাষ্ট্রদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, তাৎপর্য ও রাষ্ট্রকর্তব্যের মূলনীতি ব্যাখ্যা করাই রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়বস্তু। কিন্তু এই নামকরণও আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের সম্যক্ পরিচায়ক নহে। রাষ্ট্রদর্শন বলিলে শুধু রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝায়। দার্শনিক দিক ছাড়াও রাষ্ট্রের একটি কার্যকর দিক আছে। যে শাসন-পদ্ধতিতে ও যে নীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাহা রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনপদ্ধতি রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়বস্তু নহে। ইহা একটি রাষ্ট্রবিশেষের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা মাত্র, যাহা শুধু ভারতেই প্রযোজ্য। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রটির বিষয়বস্তুকে সিজ্‌উইক, পোলক প্রভৃতি লেখকগণ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—তত্ত্বগত রাজনীতি ও ফলিত রাজনীতি। রাষ্ট্রদর্শন বলিলে শুধু তত্ত্বগত রাজনীতিকে বুঝায় ও ফলে আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের পরিধি সংকুচিত হয়, কারণ আমরা আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রে তত্ত্বগত রাজনীতি ও ফলিত রাজনীতি উভয়েরই আলোচনা করি। এইজন্য বর্তমান যুগে আমাদের এই শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয় ও এই নামই সকলে গ্রহণ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু শুধু তত্ত্বগত রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহা ফলিত রাজনীতি সম্বন্ধেও আলোচনা করে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ও সরকার কতকগুলি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায়। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রে আমরা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যপদ্ধতির আলোচনা কার, সেইরূপ অন্য দিকে আবার যে মূল সূত্রগুলির উপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত তাহারও আলোচনা করি। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য আলোচিত হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রদর্শনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র বলা যাইতে পারে। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রটির সর্বজনগ্রাহ্য নাম হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

অনেক লেখক বিশেষ করিয়া ফরাসী লেখকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একক শাস্ত্র না বলিয়া অনেকগুলি শাস্ত্রের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (Political Sciences)। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের বিশেষ একটি দিকের আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত রাষ্ট্রসম্বন্ধে আলোচনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় শাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় একমাত্র শাস্ত্র নহে। বর্তমান যুগে যদিও আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচ্য বিষয়বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে ইহাদের আলোচনা সম্ভবপর নয়। এই বিষয়গুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐগুলির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভবপর নয়। এই বিষয়গুলিকে পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত না করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই বিশেষ শাখা বলিয়া গণ্য করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Scope of Political Science)

মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী, তাই সমাজ গঠন করিয়া সংঘবদ্ধভাবে বাস করে। মানুষের এই সামাজিক জীবন বহুমুখী। এই বহুমুখী জীবনের একটা দিক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার রাজনৈতিক জীবনে। আর এই রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে যে অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া, সেই প্রতিষ্ঠানটি হইল 'রাষ্ট্র'। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া তাহার যে বৃহত্তর জীবন সংগঠন করিয়াছে, সেই রাষ্ট্রকেন্দ্রীভূত মানবজীবনের আলোচনা করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। মহামতি অ্যারিস্টট্‌ল্ বলিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব। বর্তমান যুগের মানুষসম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌লের উক্তি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য না হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের প্রভাব মানবজীবনের উপর যেরূপ সুদূরপ্রসারী, অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই মানবজীবনের উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই মানুষকে বুঝিতে হইলে, তাহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর সম্যক্ বিশ্লেষণ করিতে হইলে, রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট

মানুষকেই আমাদের জানিতে হইবে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত এই রাষ্ট্রের বিষয়ই আলোচিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে শুধু রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচিত হয় তাহা নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের সংগঠন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বরাষ্ট্রের সহিত পররাষ্ট্রের সম্বন্ধ, নাগরিক অধিকার ও শাসনযন্ত্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। সর্বোপরি আলোচিত হয় রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও রাষ্ট্র কর্তব্য। মানুষ তাহার সামাজিক জীবনকে সার্থক করিবার জন্য রাষ্ট্ররূপ যে বিশাল সৌধ কোন্ অজানা অতীত যুগ হইতে গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা কি পরিমাণে মানব-জীবনের সহায়ক হইয়াছে ও ভবিষ্যতে মহত্তর জীবনগঠনে কতদূর সহায়ক হইতে পারে—তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

বর্তমান রাষ্ট্রের নীতি, গঠনপ্রণালী ও শাসনপদ্ধতির সহিত সম্যক্ পরিচিত হইতে হইলে রাষ্ট্রের অতীত জীবনের আলোচনা করা প্রয়োজন। পুরাতন কাঠামোর সংস্কার সাধন করিয়া মানুষ তাহাকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়াছে। তাই বর্তমান রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইলে অতীত ও মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা দরকার। অতীত ও বর্তমান রাষ্ট্রের যথাযথ স্বরূপ জানিতে পারিলেই আমরা রাষ্ট্রের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিতে সমর্থ হইব। যুগযুগান্তর ধরিয়া রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ তাহার মুক্তির সন্ধান খুঁজিতেছে। আদর্শ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সেই মুক্তির সন্ধান মিলিতে পারে। তাই রাষ্ট্রের আদর্শ পরিণতি কি তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়বস্তু। ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্বন্ধবিচার ও আদর্শ সম্বন্ধস্থাপনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সার্থকতা (Utility of the Study of Political Science)

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা মানুষ কি প্রকারে লাভবান হইতে পারে—এই শাস্ত্রের আলোচনার উদ্দেশ্য কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষকে জানিতে হইলে, তাহার কার্যাবলীর সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সমাজবদ্ধ মানব-

জীবনের চরম পরিণতি হইল রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানবজীবনের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। রাষ্ট্র শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক নাগরিককে তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশে সুবিধা দান করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানুষ আত্মসচেতন হইয়া তাহার নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যসম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির মধ্যে সমাজচেতনা সঞ্চারিত করিয়া ব্যক্তিকে স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্য হইতে পরার্থপরতার ব্যাপকতর স্তরে উন্নীত করে। এই শাস্ত্রের আলোচনা মানুষকে নানা বিষয়ে চিন্তাশীল করিয়া তুলে এবং মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করিয়া কিভাবে উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মত গঠন করিতে শিক্ষা লাভ করে। পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলি দূর করিয়া সুনাগরিক হইতে পারিলে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে আর বিবাদের অবকাশ থাকে না। সুতরাং নিছক জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীতও এই শাস্ত্রের অনুশীলনের একটা বাস্তব উপকারিতা অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই শাস্ত্রের আলোচনা ভারতীয় নাগরিকগণের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে নাগরিকগণের দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকগণের পক্ষে তাহাদের সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইতে হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত? (Is Political Science a Science?)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইতে পারে কি-না এ বিষয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে পূর্বে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাক্‌ল ও ফরাসী লেখক কোঁত প্রভৃতি এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এত ব্যাপক, জটিল ও

অনিশ্চয়তাপূর্ণ যে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকার্য সম্ভব নয়। এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর পরিধি এত বিস্তৃত ও এত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তু ইহার আলোচ্য বিষয় যে, রাসায়নিক ও জ্যোতির্বিদ্ যে পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া সেরূপ কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া এই শাস্ত্রের কোন একটি নির্দিষ্ট অনুশীলনপদ্ধতিও নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। বিরোধীপক্ষ আরও বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের মত বাস্তব নয়। এই শাস্ত্রে অনেক অবাস্তব বা কাল্পনিক বিষয়ের আলোচনা হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া কোন মতেই সমীচীন নয়।

বর্তমান যুগে এই বিরুদ্ধ মতবাদের অবসানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে কি-না সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান কি-না নির্ণয় করা সহজ হইবে। 'বিজ্ঞান' শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল বিশেষরূপ বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা বা গবেষণাদ্বারা আহরণ করা হয় এবং সেইজন্য এই জ্ঞানকে বিশেষ বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বলা হয়। এই সুসংবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়ম সংকলন করা যায় ও সেই সংকলিত সূত্রসমূহের প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করা হয়, কেননা তাহাদের বিষয়বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শৃঙ্খলিত জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং এইরূপে নির্ণিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্যোপযোগী সূত্রও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া রাজনৈতিক বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মানুষের

রাজনৈতিক আচরণ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন হইলেও মানুষের আচরণে মূলত কতকগুলি সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষাকার্য করিতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর পক্ষে তাহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এই শ্রেণীবিভক্ত ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিয়া বাস্তব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োগ করাও সম্ভবপর। সমস্ত বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ সূত্র থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও রাজনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব; সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত না করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

অধুনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইলেও অন্যান্য বিজ্ঞান-গুলির সহিত ইহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের কারণ হইল যে, শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাকার্যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের যে সুবিধা আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সে সুবিধা নাই। বৈজ্ঞানিক তাঁহার বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে পারেন, তাহার সঠিক পরিমাপ জানিয়া ও তাহাকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিকের গবেষণার সকল বস্তুই একই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকিলে একই রকমের ফলপ্রসূ হইবে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তাঁহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা অভ্রান্ত ও সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরূপ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। যে বিষয়-বস্তু লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলোচনা করেন, তাহা বহুল পরিমাণে বাহ্যিক পরি-বেশের উপর নির্ভর করে। আর এই বাহ্যিক পরিবেশ এত দ্রুত পরিবর্তনশীল যে, ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হউক না কেন তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। রাসায়নিক যে পদ্ধতিতে অম্লজান ও উদ্‌জান মিশ্রিত করিয়া জলে পরিণত করিতে পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঠিক সেই পদ্ধতিতে গণতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। রাসায়নিক দ্রব্যগুলির নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। বাহ্যিক কোন শক্তিই তাহাদের এই প্রতিক্রিয়া-সংঘটন প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাই তাহাদের সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা নির্ভুল ও সঠিক হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-

বিজ্ঞানী যদি মানবচরিত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াসম্বন্ধে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইতে পারে না। তাহার কারণ, মানবচরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নয়। অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে মানবচরিত্রেরও পরিবর্তন হয়। তবে সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও পরীক্ষামূলক গবেষণা সম্ভব। যখনই কোন রাষ্ট্র তাহার অনুসৃত নীতি বা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া নূতন নীতি বা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তখনই তাহাকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আশ্রয় লওয়া বলা যাইতে পারে। এই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়। বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে পরপর বহু শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া অবশেষে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। আদর্শ শাসনতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্যে সকল সভ্য দেশেই জনগণের উপর দিয়া এই পরীক্ষাকার্য চলিতেছে। কিন্তু পরীক্ষার ফল সব দেশে সমান হয় না। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এইজন্য লর্ড ব্রাইস্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। কোন সমাজবিজ্ঞানই প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির মত সম্পূর্ণ নয়। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চিন্তাধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পরিবতন চলিতেছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে স্থির সিদ্ধান্ত করা সহজসাধ্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ধনবিজ্ঞানের মতই একটি প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি (Methods of Political Science)

কি প্রণালীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একাধিক অনুসন্ধান-পদ্ধতি আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হয় নাই। তাহার কারণ তখন পর্যন্ত এই শাস্ত্র বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে নাই। বর্তমানে ইহা বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ও ইহার আলোচনা বর্তমানে

নানারূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হয় :—

(ক) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method)

এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত এই আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, পরীক্ষাকার্যে বৈজ্ঞানিকের যে সুবিধা আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সে সুবিধা নাই। বৈজ্ঞানিক অনেক কিছুর সঠিক পরিমাপ করিয়া নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে রাজনৈতিক ঘটনার সঠিক পরিমাপ করিয়া বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক, জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বলিয়া প্রাকৃত বিজ্ঞানসমূহের মত ইহার অনুসন্ধানকার্য সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ইহার অনুশীলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

(খ) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method)

এই পদ্ধতির সারমর্ম হইল যে, মানুষের স্বভাবের মূল প্রবণতাগুলি সবত্রই সমান। কিন্তু অবস্থাভেদে মানুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি ও কার্যাবলী ভিন্ন-রূপে প্রকাশ পায়। এই কথা স্মরণ রাখিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে হইবে। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রধান কার্য হইল বহু রাষ্ট্রের সহিত তাঁহার পরিচয় করা। প্রত্যেক রাষ্ট্র কর্তৃক ইহার অনুসৃত নীতি ও কার্যপ্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ করিবার শক্তি থাকা দরকার। রাষ্ট্রের শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়। অনেকগুলি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা দেখিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা সেগুলির পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নির্ভুল বিশ্লেষণ দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সন্ধান মিলিবে। সেই মূলসূত্রগুলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে রূপায়িত করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা সার্থক হইবে।

(গ) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)

এই পদ্ধতিকে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইতিহাসই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে পারে না। বর্তমান যুগে যে সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদ বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে সেগুলি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মানুষের রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই সমস্ত মতবাদের যথাযথ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সেই সময়কার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সে জ্ঞান-আহরণ ইতিহাস ব্যতিরেকে হয় না। রাজনৈতিক মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিরূপে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা লইয়া বিশ্লেষণ না করিলে তাহা জানা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ প্রগতির পথে, না অবনতির পথে—তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক মতে বিশ্লেষণ। কিন্তু এই বিশ্লেষণ-কার্য নিরপেক্ষভাবে করিতে হইবে। কোন কারণেই কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা মতবাদের প্রতি ব্যক্তিগত সহানুভূতি বা বিরুদ্ধ ভাবের বশবর্তী হইয়া সমালোচনা করা হইলে রাজনৈতিক সূত্রগুলি নির্ভুল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত ধারণার উর্ধ্বে উঠিয়া তাহাদের নিজস্ব গুণাগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে। তাহা হইলে পদ্ধতিটি সমধিক কার্যকর হইবে।

(ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)

অ্যারিস্টট্ল্, মন্‌টেস্কু, লর্ড ব্রাইস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে অতীত যুগের ও বর্তমানকালের রাষ্ট্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের তুলনামূলক বিচার করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, পাশাপাশি একসঙ্গে অনেকগুলি রাষ্ট্রের দোষ-গুণ নির্ণয় করিতে পারিলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের উৎকৃষ্টতর বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা সহজ

হয়। অ্যারিস্টটল্ তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করিবার নিমিত্ত অতীত যুগের বহু রাষ্ট্রের ও তাঁহার সমসাময়িক অনেকগুলি রাষ্ট্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সতর্কতার প্রয়োজন। যে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না, সেগুলিকে বর্জন করিয়া শুধু তুলনীয় বিষয়গুলির আলোচনা করিলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

(ঙ) আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method)

ফরাসী ও বিশেষ করিয়া জার্মান লেখকগণ এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র একটি আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাত্র এবং ইহার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা ও আইন বলবৎ করা। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে আইনের সীমাবহির্ভূত কোন সামাজিক প্রভাবের কার্যকারিতা এই পদ্ধতির সমর্থকগণ অস্বীকার করেন। রাষ্ট্র একটি বহু জটিল সমস্যাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। শুধু আইনজীবীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না।

(চ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method)

এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও গঠনের সহিত জীবদেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ বিবর্তনবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়। রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু শুধু বাহ্য সাদৃশ্যের দ্বারা রাজনৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না। অনেক সময় এই বাহ্য সাদৃশ্য ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

(ছ) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method)

এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি সমাজদেহ বলিয়া কল্পনা করা হয়। সমাজদেহ গঠিত হয় নাগরিকগণের সমবায়ে ও নাগরিকগণ এই সমাজদেহের অংশ। এই অংশগুলির গুণাগুণের উপর সম্পূর্ণ দেহের অর্থাৎ রাষ্ট্রের গুণাগুণ

নির্ভর করে। এই পদ্ধতিও জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির ন্যায় বিবর্তনবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করে।

(ক) মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological Method)

মনোবিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সূত্রের সাহায্যে অনেক সময় রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞান মানুষের কাজের পিছনে যে উদ্দেশ্য থাকে তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করে। সংঘবদ্ধভাবে মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহা মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। কি কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদল সৃষ্ট হয়, কি কারণে রাষ্ট্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধে, এগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

উপরি-উক্ত তিনটি পদ্ধতির কোনটিকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলে না। জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতিগুলি রাষ্ট্রকে শুধু একটি বিশেষ দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সুতরাং এগুলিকে পদ্ধতি না বলিয়া বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বলিলে অধিক সমীচীন হইবে।

(ঝ) দর্শনমূলক পদ্ধতি (Philosophical Method)

রুশো, মিল্, সিজ্উইক প্রভৃতি লেখকগণ এই পদ্ধতির সমর্থক। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে মানবপ্রকৃতি-সম্বন্ধে একটি মনঃকল্পিত ধারণা করা হয় এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কর্তব্য ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলি নীতি স্থিরীকৃত হয়। এই নির্ধারিত নীতিগুলির সহিত রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা চলে।

এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক সময় ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়া ইহার সমর্থকগণ অনেক সময় রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব সত্য উপেক্ষা করিয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতিগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ইহার কোন-একটি বিশেষ পদ্ধতি এককভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কোন পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সঠিক

অনুসন্ধান-পদ্ধতি নির্ণয় করিতে গেলে বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতির, যথা ঐতিহাসিক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, দর্শনমূলক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রভৃতির সমন্বয় সাধন করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানকার্য পরিচালিত করা উচিত। তবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির সন্ধান মিলিবে ও সেই সূত্রগুলির সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধবিচার
(Relation of Political Science to other Sciences)

বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, (ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Sciences) ও (২) মানবীয় বিজ্ঞান (Human or Social Sciences)। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগৎ সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য আহরণ করিয়াছে। যুক্তির ভিত্তিতে এই তথ্যগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া মানুষ নানা বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে যে তথ্যগুলির অধিকারী হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির ভিত্তিতেই পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। আর, জীবজগৎ ও মানবসমাজ সম্বন্ধে মানুষ যে তথ্যগুলি আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির সুসংবদ্ধ ও যুক্তিসম্মত প্রকাশ হইল মানবীয় বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত। উপরি-উক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্রগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও এই শাস্ত্রগুলি কোন-না-কোন দিক দিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান—সুতরাং এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অপরাপর মানবীয় বিজ্ঞান-গুলির সম্পর্কে বিচার করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Relation to Sociology)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ করাই হইল সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। মানুষকে লইয়া আলোচনা শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হয় না, আরও অনেক বিজ্ঞান আছে যেগুলি মানবজীবনের কোন-না-কোন দিক

লইয়া আলোচনা করে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল মানবীয় বিজ্ঞানই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই মানবীয় বিজ্ঞানগুলির কোন একটি পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানে মানুষের সামাজিক জীবনের সকল রকম অবস্থার আলোচনা হয়। এই বিজ্ঞানের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে হইলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মানবজাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রার প্রণালী—সর্ব বিষয়ের আলোচনা হয় এই সমাজবিজ্ঞানে। এই কারণে সমাজ-বিজ্ঞানকে মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় সামাজিক মানুষের শুধু একটা দিক। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানবজীবনের যে দিকটা আলোচিত হয় তাহাই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপগুলি মাত্র আলোচিত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে মানুষের রাজনৈতিক কার্য-কলাপ ছাড়া আরও অনেক কিছু আলোচিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইল নাগরিক জীবনের অধিকার ও কর্তব্য। কিন্তু এই অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সচেতন থাকে। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্বর্তী একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। রাষ্ট্রজন্মের বহু পূর্বেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহসম্বন্ধে যে-সমস্ত দেশগত আচার ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা রাষ্ট্রকর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর ও অধিক ব্যাপকভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান সমাজবিজ্ঞান হইতে আহরণ করিতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী না হইলে রাষ্ট্রসম্বন্ধে তাঁহার নির্ভুল ধারণা হইতে পারে না। বর্তমান যুগে যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এত ব্যাপক হইয়াছে যে, সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে আরও ইহার আলোচনা সম্ভবপর নয়, তথাপি একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষীকৃত শাখা। মানুষ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইবার বহু পূর্বেই সমাজ গঠন করিয়া সমাজসম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল, সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আলোচনা শুরু হয় সমাজজীবনের গোড়াপত্তন হইতে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয় রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইতে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Relation to History)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্যর জন্ সিলি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইতিহাস হইল রাজনীতির মূল এবং রাজনীতিই হইল ইতিহাসের পরিণতি।

"Politics without History has not root
History without Politics has no fruit".

একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইতিহাসে আলোচিত হয় মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ও মানব-সভ্যতার বহুমুখী কাহিনী। রাষ্ট্র মানবসমাজের একটি প্রতিষ্ঠান যাহা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের কাহিনী ইতিহাসপাঠে জানা যায়। মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের নিকট অতিমাত্রায় ঋণী। ইতিহাসে মানবসমাজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদিগকে ভবিষ্যতের আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত রাজনৈতিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতি হইতে পারে না। তাই বলিয়া আমরা যদি মনে করি যে, ইতিহাসে শুধু রাজনীতিরই আলোচনা হয়, তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। ইতিহাস শুধু রাজনীতিরই ইতিহাস নয়। মানবসভ্যতার সবদিকই আলোচিত হয় এই ইতিহাসে। তাহার সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, নৈতিক, কৃষ্টিগত সব কিছুরই কাহিনী ইতিহাসের বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাস হইতে শুধু সেই সকল তথ্য আহরণ করেন যে-তথ্যগুলি রাজনৈতিক জীবন-সংগঠনে সহায়তা করে। ধর্মের ইতিহাস বা চারুকলার ইতিহাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কোন প্রয়োজন হয় না।

ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্তু যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে, সেইরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তুই ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক অংশ আছে যেগুলির সহিত ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের প্রকৃতিনির্ণয় বা রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে এমন অনেক মতবাদ আছে যাহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ও দার্শনিক তত্ত্বের উপর

প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। গার্ণার বলেন যে, ঠিকভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে রাষ্ট্রনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা করা প্রয়োজন। আর ঠিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গেলে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান (Relation to Economics)

গ্রীক দার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক লেখক ধনবিজ্ঞানকে একটি পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া গণ্য করিতেন না। তাঁহাদের মতে ধনবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহাদের মতে ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থ আহরণ করা। ধনবিজ্ঞানের এইরূপ সংকীর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশের কারণও ছিল। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করাই রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করা হইত। এই কারণে রাষ্ট্রকে প্রভূত ক্ষমতাশালী করিয়া সমস্ত শক্তির আধার করিয়া গড়িয়া তোলা হইত। সেইজন্যই ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের আয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রকে অসীম শক্তিশালী করিয়া গঠন করা।

বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি অনেক ব্যাপক হইয়াছে। বর্তমানে ধনবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রের জন্য অর্থসংগ্রহ লইয়া আলোচনা করে না, জনসমষ্টির কল্যাণের জন্য অর্থের ব্যবহার কিভাবে হওয়া উচিত সমগ্রভাবে তাহার আলোচনা করে। তাই বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগসম্বন্ধে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম। মানুষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কিভাবে ধন উৎপাদন করে ও উৎপাদিত ধন বিনিময়ের দ্বারা অর্থে রূপান্তরিত করিয়া অর্থের মাধ্যমে নিজস্ব পারিশ্রমিক নির্ধারিত করিয়া কিভাবে তাহার অভাবমোচন করে ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা বর্তমানে এত বিরাট আকার ও জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে যে, এই শাস্ত্রের সম্যক্

অনুশীলনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র হইতে ইহার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই বর্তমানে ধনবিজ্ঞান একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র পৃথক্ তথাপি উভয় শাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয় শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক—সমাজের হিতসাধন করা। বেকার-সমস্যার দূরীকরণ, দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া দেশে যথেষ্ট ধনাগমের ব্যবস্থা করা এবং তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। ধনবিজ্ঞানের সম্পর্করহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন সুফল দিতে পারে না। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, এমন কি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বহুল পরিমাণে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অপরপক্ষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা—ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনব্যবস্থা বর্তমান যুগে রাষ্ট্রদ্বারা নির্ধারিত হয়। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত বহু জনহিতকর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্র হইল ধনোৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক। অধুনা বহু রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত করিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ধনবিজ্ঞানের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণ হইল যে, বর্তমান রাষ্ট্র জনগণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত; শুধু ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই বর্তমান রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ট্র বলা হয়। এই কল্যাণরাষ্ট্র জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত করে। এই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অবর্তমানে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ করিয়া ধনোৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটিত। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র যেরূপ মানুষের সামাজিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া দেয়, সেইরূপ আইনের দ্বারা রাষ্ট্র মানুষের পরস্পরের সহিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করিয়া সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সহায়তা করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের আলোচনার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবপর নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব (Relation to Anthropology)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান, সুতরাং নৃতত্ত্বের সহিত এই শাস্ত্রের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। অধুনা নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলে এরূপ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি, আদিম মানব সমাজের নানাবিধ সংগঠন ও জাতিতত্ত্বের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছে। জেংকস, মরগ্যান প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নৃতত্ত্ব হইতে বহু তথ্য আহরণ করিয়া সেই তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ দুইটি নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট-সম্পর্কের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইনের উৎপত্তি বিচার করিতে গেলেও দেখা যায় যে, প্রাচীন মানব সমাজে প্রচলিত নিয়ম-কানুন, প্রথা, আচার, বিধিনিষেধগুলির দ্বারা বর্তমান যুগের রাষ্ট্রস্বীকৃত আইনগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Relation to Ethics)

প্রাচীন যুগের সকল দেশের দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের শাখা বলিয়া গণ্য করিতেন। নীতিশাস্ত্রকেই তাঁহারা মূলশাস্ত্র বলিয়া মনে করিতেন ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূল সূত্রগুলি নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত। প্রাচীন ভারতেও রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, রাজার কর্তব্য প্রভৃতি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ তাঁহার 'রাজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই নৈতিক আদর্শের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রের আদর্শ এই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনৈতিক কার্যকলাপের একমাত্র মাপকাঠি ছিল নৈতিক আদর্শ এবং এই নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রাষ্ট্রের কার্য প্রধানতঃ পরিচালিত হইত।

ইতালীয় চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে সুবিধাবাদ আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে বলপ্রয়োগ মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি-মতবাদ প্রচারের ফলে রাবিজ্ঞান পুরাতন নৈতিক

আদর্শবাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। হব্‌স্‌, লক্‌, রুশো প্রভৃতি লেখকগণ এইরূপে নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ করিতে সহায়তা করিলেন। ফলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক্‌ শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পৃথক্‌ এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। নীতিশাস্ত্র মানুষের সমগ্র জীবনের—তাহার চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও বাহ্যিক আচরণ সব লইয়াই আলোচনা করে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আলোচনা করে শুধু মানুষের বাহ্যিক আচরণের। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এ কথা বলিলেও ভুল হইবে, কেন-না রাষ্ট্র-বিজ্ঞান মানুষের সমগ্র বহির্জীবন লইয়াই আলোচনা করিতে পারে না। শুধুমাত্র মানুষের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনাই হইল এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইতে সংকীর্ণতর। নীতিবিগর্হিত কার্য করিলে কোন দৈহিক শাস্তি নাই। বিবেকদংশন অথবা লোকনিন্দা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বে-আইনী অথবা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য করিলে দৈহিক শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ স্থিরীকৃত হয়, যেমন মিথ্যাভাষণ বা অকৃতজ্ঞতা সর্বসময়ে ও সর্বদেশে নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশগুলি, যেগুলিকে আইন বলা হয় সেগুলি রচিত হয় জনস্বার্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ জনগণের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া। যুদ্ধের সময় আকশপথে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনাচ্ছাদিত আলো রাখা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু অনাচ্ছাদিত আলো রাখা নীতিশাস্ত্রবিরোধী নয়।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলিতে হইবে যে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌ করা যায় না। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ মানব করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। সমাজে

মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচিত নীতিশাস্ত্র তাহারই নির্দেশ দেয়। কোন্‌টি ন্যায় কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয়, তাহা নীতিশাস্ত্রে আলোচিত হয়। এক কথায় নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যে উহাদের বহিঃপ্রকাশের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া দেয়। রাষ্ট্রপ্রণীত আইনগুলির বৈধতা নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে স্থিরীকৃত হয়। যদি কোন আইনের প্রচলিত নীতিবাদের সহিত সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে সে আইন জনগণ মান্য করিতে চায় না। রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। এই সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে জনগণের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আইন প্রণয়ন করিয়া এবং নীতিবিগর্হিত আইন, প্রথা ও লোকাচার দূর করিয়া রাষ্ট্র জনগণের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করিতে সহায়তা করে। বস্তুত, নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নির্দেশের মধ্যে সব সময় সূক্ষ্ম পার্থক্য করা যায় না। বর্তমান জনমত অনুসারে যাহা নীতিশাস্ত্রসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে রাষ্ট্রনির্দেশের মাধ্যমে পরবর্তী কালে তাহা নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপে রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের দ্বারা জনমতের পরিবর্তন ঘটে ও মানুষের নৈতিক জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। এক শতাব্দী পূর্বে আমাদের ভারতবর্ষে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল ও তখন এই প্রথা নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই প্রথাকে আইনের দ্বারা রহিত করা হয়। কালক্রমে জনগণের নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ হইতে এই প্রথা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তাহার কারণ আমরা শুধু বে-আইনী বলিয়া যে এই প্রথা আর মানি না তাহা নয়। এই প্রথা একটি দুর্নীতি ও নীতিশাস্ত্রবিরোধী, রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এই নৈতিক জ্ঞান জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম ও প্রধান তাৎপর্য হইল ব্যক্তির ও সমষ্টির মঙ্গলসাধন। রাষ্ট্রের আদর্শ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং নীতিশাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব (Relation to Psychology)

মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন জীব হইলেও অনেক সময় সহজাত প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ ও উত্তেজনার দ্বারা কার্যে পরিচালিত হয়। মনস্তত্ত্বে মানুষের এই যুক্তিবহির্ভূত কার্যাবলীর আলোচনা করা হয়। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষের পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়। কিন্তু মানুষের রাজনৈতিক কার্যাবলী অনেক সময়েই যুক্তিহীন ভাবাবেগ বা উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত নহে। ম্যাকডুগাল, ল্যা বঃ প্রভৃতি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেশের শাসনব্যবস্থার উপর মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রভাবের গুরুত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত, একমাত্র সেই শাসনব্যবস্থাই স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হয়। অনেক সময় বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীতে যে গণ-আন্দোলন উত্থিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই দাবী প্রকৃত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা জনসাধারণের এক বিশেষ ভাবাবেগের অভিব্যক্তি মাত্র। প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা বা প্রচলিত আইনের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের মূলেও অনেক ক্ষেত্রে এই যুক্তিহীন গণ-বিক্ষোভ কার্যকর হইতে দেখা যায়। সুইস্ দেশে যে শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা অন্য দেশে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই—ইহার মূলেও রহিয়াছে বিভিন্ন জাতির গঠনপ্রকৃতি ও মনোভাবের পার্থক্য। ইংলণ্ডের বিচিত্র শাসনব্যবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় যে, এই শাসনব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে ইংরাজ জাতির স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত নহে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কিছু কিছু মনস্তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইলেও সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপই মনস্তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলশাস্ত্র (Relation to Geography)

ভূগোলশাস্ত্রের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছু সম্বন্ধ আছে। মানুষের চরিত্র,

চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালী তাহার আবাসভূমির ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। দেশের জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য বা অনটন, সমুদ্র বা পর্বতের নৈকট্য প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চরিত্রগঠনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এই ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী লেখক বোঁড়া, মন্টেস্কু, রুশো প্রভৃতি মনস্বিগণ লোকচরিত্রের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাক্ল তাঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলিয়াছেন যে. মানুষ তাহার নিজের ও সামাজিক জীবনের কার্যাবলীতে স্ব-ইচ্ছা অপেক্ষা ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা অধিকতরভাবে চালিত হয়। বাক্লের মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র-পরিচালনাকার্যে ভৌগোলিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংলণ্ড যে তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সভ্যতা, শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল তাহার বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্র (Relation to Jurisprudence)

ব্যবহারশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রপ্রণীত ও রাষ্ট্রসমর্থিত আইনগুলির প্রকৃতি ও প্রয়োগবিধি বিশ্লেষণ করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যবহারশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় রাষ্ট্রের শাসনকার্য। এই শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্র কতকগুলি আইন বা বিধি প্রণয়ন করে, সেগুলির সাহায্যে রাষ্ট্র তাহার সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং রাষ্ট্র-কর্তৃক সৃষ্ট আইনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা চলে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্যবহারশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু সংকীর্ণতর ও এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন (Relation to International Law)

সামাজিক জীবনে প্রত্যেকটি মানুষ যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও একের সহিত অন্যের সম্পর্ক কতকগুলি আইন বা বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক কতকগুলি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত স্বরাষ্ট্রের সম্পর্ক যে-বিধানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই বিধানগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও জাতীয় আইনগুলির মত আন্তর্জাতিক আইনগুলি অতটা সুস্পষ্ট নয় এবং অতটা সহজে বলবৎ করা যায় না, তথাপি বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি এই আইন অনুসারে তাহাদের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালিত করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্রের বহির্মুখী কার্যকলাপ-সম্বন্ধে আলোচনা করা ও এই বহির্মুখী কার্যকলাপের একটা আদর্শ মান স্থির করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রের আদর্শ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয় করে না, আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও আলোচনা করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন, অপর দিকে সেইরূপ পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের একটা আদর্শ মান নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই মান স্থিরীকৃত হইলে সর্ব জাতির ও সকল দেশের মঙ্গল। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সহিত আন্তর্জাতিক আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; অপর পক্ষে রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী (New Approach to the Study of Political Science)

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। এই প্রাচীনপন্থিগণ মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক, তুলনামূলক, আরোহ (Inductive) ও অবরোহ (Deductive)

পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের আলোচনালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি প্রধানতঃ আদর্শগত ছিল, কারণ তাঁহাদের পর্যালোচনা শুধু কি প্রকারে এবং কেন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে ইহাতেই সীমাবদ্ধ নহে, কি হওয়া উচিত সে বিষয়েও তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এক শ্রেণীর লেখক গতানুগতিক আদর্শগত পদ্ধতি বর্জন করিয়া এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। এই লেখকগণ 'আচরণ পর্যবেক্ষক' শ্রেণী (Behaviouralists) বলিয়া পরিচিত। ইহাদের আলোচনা-পদ্ধতি আদর্শগত নয়। ইহাদের আলোচনা-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণমূলক (Emperical)। আচরণ পর্যবেক্ষকগণ কোন ঘটনার মূল্যায়ন না করিয়া শুধু কি প্রকারে এবং কেন ঘটনা ঘটে তাহাই আলোচনা করেন। সুতরাং আচরণ পর্যবেক্ষকগণ ধনবিজ্ঞানীদের অনুরূপ পদ্ধতিতে ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার বর্জন করিয়া নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা করেন।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নহে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন-প্রকৃতি অথবা ইহাদের আইনগত আদর্শ অপেক্ষা আচরণ পর্যবেক্ষকগণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্ষেত্রে আচরণ এবং কর্মতৎপরতার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। অর্থাৎ আচরণ পর্যবেক্ষকগণ রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সাহায্যে রাজনৈতিক ঘটনার পর্যালোচনা করেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীনপন্থী ও আধুনিক আচরণ পর্যবেক্ষণপন্থিগণের মধ্যে বিশেষ কোন মূলগত পার্থক্য নাই, শুধু বিষয়-বস্তু বিন্যাস প্রণালী, গুরুত্ব প্রদান ও পদ্ধতির পার্থক্য। প্রাচীনপন্থিগণ অনুসৃত পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি ছিল যে, তাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা ক্ষেত্রে মানব-চরিত্রের প্রভাবের উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। আচরণ পর্যবেক্ষণ-পন্থিগণ রাজনৈতিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উপর মানব-চরিত্রের প্রভাব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। অর্থাৎ আচরণ পর্যবেক্ষণপন্থিগণ প্রাকৃত বিজ্ঞান-সমূহের অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ

পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মতবাদ ও আদর্শ গঠন করিতে চাহেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিজ্ঞানীগণ প্রাকৃতিক পদার্থ ও শক্তিগুলিকে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া যে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানক্ষেত্রে অনুরূপ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহায্যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। ভোটদান ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করিয়া হয়ত কিছু পরিমাণ নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব, কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা বা ন্যায়পরতা সম্পর্কে আচরণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা কোন মতবাদ গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে, আচরণ পর্যবেক্ষণপন্থিগণ তাঁহাদের অনুসৃত পদ্ধতির সাহায্যে প্রাচীনপন্থিগণের অসম্পূর্ণতা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনপন্থিগণের অনুসৃত পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাজ্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন নাই।

সংক্ষিপ্তসার

নামকরণ—আমাদের আলোচ্য বিষয়ের নামকরণ লইয়া লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাজনীতি, রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই তিন নামে এই শাস্ত্র অভিহিত হয়। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও জটিলতা বিবেচনা করিয়া বর্তমান যুগের অধিকাংশ লেখক এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু—রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া সমাজবদ্ধ মানুষের যে দিকটা প্রকটিত হইয়াছে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মানবজীবনে রাষ্ট্রের প্রভাব অপরিসীম। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও তাৎপর্য এই শাস্ত্রে আলোচিত হয়। অতীত যুগের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বর্তমান রাষ্ট্রকে বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যৎ যুগের আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনার প্রয়াস পায়। রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা শুধু যে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় তাহা নয়, ইহা দ্বারা মানুষ বাস্তব জীবনেও লাভবান হয়। এই শাস্ত্র মানুষকে তাহার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আত্মসচেতন করে। এতদ্ব্যতীত মানুষের মধ্যে সমাজ-চেতনা

বৃদ্ধি করিয়া মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মান স্থিরপূর্বক উন্নত জীবনযাপনে সহায়তা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত?—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, অনিশ্চয়তা ও ইহার অনুসন্ধান-পদ্ধতির বৈচিত্র্যের জন্য এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে অনেকে আপত্তি করেন; কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই শাস্ত্রের অনুশীলন সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ও কার্যতঃ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই ইহার অনুশীলনকার্য পরিচালিত হয়। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত এই শাস্ত্র সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও ইহা একটি অসম্পূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি—রাষ্ট্রবিজ্ঞান-অনুসন্ধানের নানারূপ পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোনটিই একক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্যক অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং দুই বা ততোধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে সুফল পাওয়া যায়। পদ্ধতিগুলি যথাক্রমে নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হয়: ১। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি; ২। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি; ৩। ঐতিহাসিক পদ্ধতি; ৪। তুলনামূলক পদ্ধতি; ৫। দার্শনিক পদ্ধতি ইত্যাদি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক নির্ণয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান—রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষীকৃত শাখা বলা যাইতে পারে। সমাজবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানবজাতির সমগ্র জীবন, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় শুধু রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের রাজনৈতিক জীবন। রাষ্ট্র মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি সমাজবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা বহুলাংশে সংকীর্ণতর।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস—ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান সংগৃহীত হয়। মানুষের রাজনৈতিক চেতনা সুদূর অতীত হইতে সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে বর্তমান মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা ইতিহাসপাঠে জানা যায়। কিন্তু ইতিহাসকে নিছক রাজনৈতিক ঘটনার

কালনিরূপণ-বিদ্যা বলিলে ভুল হইবে; ইতিহাসে মানবসভ্যতার সব দিকই আলোচিত হয়। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মূল সূত্রের সন্ধান পাইতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য আবশ্যক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান—মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বহুলাংশে রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হইল দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা। এই উন্নয়ন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতির উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে ধনবিজ্ঞানের সম্পর্কবিহীন রাজনীতি কোন সুফল দিতে পারে না। রাষ্ট্রের কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও কার্যকারিতা অনেকাংশে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—উভয় শাস্ত্রই মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচিত তাহার নির্দেশ দেয়। উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ নাগরিক হইতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অপেক্ষা ব্যাপকতর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু মানুষের সামাজিক জীবনের বাহ্যিক আচরণের মান স্থির করিয়া দেয়। নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যে উহাদের বহিঃপ্রকাশের মান স্থির করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব—মানুষ সব সময় যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না, অনেক সময় ভাবাবেগ দ্বারাও কার্যে পরিচালিত হয়। মানুষ তাহার কার্যাবলীর পশ্চাতে যে সব সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, মনস্তত্ত্ব সেই সব সহজাত প্রবৃত্তিগুলির বিষয় আলোচনা করে। মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অনেকক্ষেত্রে যুক্তিহীন উত্তেজনা ও ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং অনেক রাজনৈতিক ঘটনা মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলশাস্ত্র—রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে মানব-চরিত্রের উপর নির্ভর করে। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের উপর মানুষের প্রকৃতি গড়িয়া উঠে। তাই রাষ্ট্রপ্রকৃতিও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইন—ব্যবহারশাস্ত্র

ও আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষীকৃত শাখা মাত্র। ব্যবহারশাস্ত্রে রাষ্ট্র-প্রণীত আইনের আলোচনা 'হয়। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি ও সমাজ

(Individual and Society)

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক—Relaton between Individual and Society.

ব্যক্তিকে লইয়াই সমষ্টি এবং সমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব। সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় না। পিতা-মাতার স্নেহ, আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাসা পাইবার এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মানুষ সমাজ গঠন করিয়া বাস করে। সমাজ একদিনে বা একজন লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও সভ্য হইয়া উঠিতেছে, সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে ততই বুঝিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের উপর সমাজের প্রভাব প্রসার লাভ করিতেছে। মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ নানাভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইল, মানুষ কেন স্বেচ্ছায় সমাজের এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইল ?

এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইল যে, মানুষ সমাজ ছাড়া বাস করিতে পারে না। সমাজের বাহিরে তাহার জীবন শুধু নিঃসঙ্গ ও দুঃসহ হয় না, সমাজের বাহিরে মানুষ ভাবের ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পায় না। মানুষের মধ্যে যে স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলি থাকে, সমাজের বাহিরে সেগুলির বিকাশ আদৌ সম্ভব নহে। সমাজে মানুষের কতকগুলি রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয়। এই রীতি-নীতিগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল এবং এইগুলির সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। সামাজিক পরিবেশে,

সামাজিক প্রভাবে মানুষের মন শুদ্ধ ও সৎপথগামী হয়—সমাজের বাহিরে সামাজিক প্রভাবের অবর্তমানে তাহার ভালমন্দ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন, যে-মানুষ সমাজে বাস করে না সে পূর্ণ মানুষ নহে। সে হয় অতি-মানব না হয় নিম্নস্তরের জীব।

তাহা হইলে কি সমাজ ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই? মানুষকে কি একেবারেই সমাজের দাসরূপে ভাবিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মানুষকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি মানুষ হইল সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষ যেমন সমাজ ছাড়িয়া বাস করিতে পারে না, সেইরূপ মানুষ ছাড়া সমাজের কোনো অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি এবং মানুষের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের উন্নতি হয় এবং মানুষের উন্নতি হইলেই সমাজ-ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। মানুষকে বাদ দিয়া সমাজ গঠিত হইতে পারে না এবং সমাজকে বাদ দিয়া মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। সুতরাং মানুষ ও সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

মানুষ বড় না সমাজ বড়, এ প্রশ্নের আজ আর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যখন সমাজ-চেতনা দুর্বল ছিল, তখন ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গলের পথ সুগম করা হইয়াছিল। তাই প্রাচীনকালে সামাজিক নির্দেশ ও সামাজিক বিধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়া অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হয়। এইরূপে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই ব্যক্তির উপর সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে মানুষের সমাজ-চেতনা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মানুষ যতই বুঝিতে পারিতেছে যে, সমষ্টির কল্যাণ না হইলে তাহার নিজের কল্যাণ স্থায়ী হইতে পারে না, মানুষ ততই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। সমাজের প্রতি মানুষের এই স্বেচ্ছাকৃত আনুগত্য একদিকে যেমন সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধগুলির কঠোরতা প্রশমিত করিয়াছে। কারণ, সমাজও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া, ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা লোপ করিয়া সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না।

যে সমাজ অহেতুক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে সমাজ স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা।

সমাজের অগ্রগতি –Growth of Society

সাধারণতঃ বলা হয় যে, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব অর্থে কি বুঝা যায় তাহার আলোচনা প্রয়োজন। বহু জনসমষ্টি সভ্যজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বাস করে। তাহারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ-জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সমাজ মানব-জীবনকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন লিখিত আইন-কানুনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার ও রীতি-নীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের জীবন বহুমুখী। বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ সমাজদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সঙ্ঘ ও নানা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সমাজের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ধর্মসংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিক-সঙ্ঘ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত। রাষ্ট্রও সমাজদেহের মধ্যে এইরূপ একটি সঙ্ঘ।

সুতরাং জনসমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং এই জনসমষ্টি সাধারণ স্বার্থে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিঃসঙ্গভাবে বাস করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। তাহার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে অপর মানুষের সঙ্গ কামনা করে। একদিকে এই সহজাত প্রবৃত্তির ও অন্যদিকে সমাজবদ্ধ জীবনের সুখ-সুবিধাগুলি, এই উভয়ে মিলিয়া মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজ সৃষ্টি করিয়া বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছে।

সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করি, তাহা গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। বর্তমান সমাজ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল।

মানুষ একাকী বাঁচিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের সাহায্য

প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ জীবন যে মানুষকে শুধু তাহার জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা দেয় তাহা নহে, মানুষ সংঘবদ্ধভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। সহযোগিতার সাহায্যেই মানুষের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং এই সহযোগিতাই হইল মানব-সমাজের মূলভিত্তি।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন যে, বাঁচিয়া থাকাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ভালভাবে বাঁচিয়া থাকাই হইল জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য (Life is not merely living but it is living well)। উন্নততর জীবন-যাপনের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং মানুষের এই চিত্তবিকাশের ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, চারু ও কারুশিল্প এবং গীতবাদ্য প্রভৃতি জন্মলাভ করে। এইগুলি হইল সভ্য জীবনযাপনের অপরিহার্য উপাদান। মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়াই সমাজের সাহায্যে সে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে।

বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও বর্তমানে মানুষ আর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীকে নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধিও সুদূর-বিস্তৃত। এইজন্য আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে।

পরিবারই হইল সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন সংগঠন। সন্তান-সন্ততির জন্ম, লালন-পালন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুরুষের নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সমবায় গঠিত হয়, তাহাকে পরিবার বলা হয়। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ব্যতীতও পরিবারের মধ্যে সমগোত্রীয় আত্মীয় থাকিতে পারে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিই হইল পরিবারের মূল ভিত্তি এবং

এই কারণেই প্রত্যেক পরিবারের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ঐক্য দেখা যায়। মানব-সমাজের সর্বত্রই পারিবারিক এই ঐক্যের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী পুরুষের এই মিলন ব্যতীত পরিবার গঠিত বা স্থায়ী হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-পুরুষের এই মিলন নির্দিষ্ট বিবাহ-পদ্ধতি বা অন্য বিধি অনুযায়ী স্থির হয় এবং এই নির্ধারিত পদ্ধতি বা বিধির বলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপিত এবং সমর্থিত হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক পরিবারের পরিচয়সূচক একটি স্বতন্ত্র নাম থাকে এবং এই নামের দ্বারা সন্তান-সন্ততিগণ পরিচিত হয়।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিতে হয়, অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি প্রাথমিক অভাব পূরণের সামগ্রী আহরণ করিতে হয়। পরিবারের সকল ব্যক্তিকেই সমবেতভাবে এই অর্থনৈতিক কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সন্তান-সন্ততিগণের জন্ম ও লালন-পালনের জন্য যে সমুদয় সামগ্রী প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিতে হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক পরিবারের একটি আবাস গৃহ থাকে এবং আবাসস্থলকে কেন্দ্র করিয়া পরিবারের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের স্বতন্ত্র আবাসস্থলের পরিবর্তে যৌথ গৃহও দেখা যায়।

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত পরিবারের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, পরিবার হইল মানব-সমাজের আদি ও প্রাথমিক সংগঠন। মানুষ কোন দিন যে পরিবার ছাড়া জীবন যাপন করিত ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সর্বত্র ও সকল স্তরের সভ্যতায় পরিবারের অস্তিত্ব ও প্রভাব দেখা যায়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব-জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পারিবারিক প্রভাব কার্যকর হইতে দেখা যায়। সুতরাং পরিবার হইল মানব-ইতিহাসের একটি সার্বজনীন সংগঠন।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিবার গঠন করে নাই। মানব-জীবনের এক স্বাভাবিক ভাবাবেগই হইল পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি। একই পরিবারের লোকজন যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া

একসঙ্গে জীবন যাপন করে তাহা যুক্তি অথবা বুদ্ধি অপেক্ষাও দৃঢ়তর। সে বন্ধন হইল স্নেহ, মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি। মানুষের এই অন্তর্নিহিত গুণাবলী একমাত্র পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মলাভ করে এবং বর্ধিত হয়। আর এই গুণগুলিই হইল সমাজে শিক্ষা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক।

তৃতীয়তঃ, পরিবারের একটি শিক্ষাগত ভূমিকা আছে। শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত-পালিত এবং বর্ধিত হয় এবং এখানেই সে সামাজিক জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে। পরিবারের প্রভাবে শিশু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনের বিধি ও আচরণ সম্পর্কে অবহিত হয় এবং পরিবারের প্রভাবেই তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত জীবনের সূত্রপাত হয়। সুতরাং পরিবারকে মানব-জীবনের একটি প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রও বলা যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ, পরিবার ব্যতীতও মানব-সমাজে গোষ্ঠী, বংশ, জাতি প্রভৃতি আরও সংগঠন আছে এবং এই সংগঠনগুলিও বহু পরিমাণে মানুষের ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র পরিবারের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার আয়তনের সীমাবদ্ধতা। পৃথিবীর সকল সমাজেই পরিবার সাধারণতঃ নিকটতম কতিপয় আত্মীয় লইয়া গঠিত হয়।

পঞ্চমতঃ, যদিও পরিবার প্রধানতঃ মানুষের ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি পরিবারের লোকজনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও দায়িত্ববোধ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, পারিবারিক সম্পর্ক শুধু স্নেহ-মমতা বা শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এই সম্পর্ক যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির দ্বারাও প্রভাবিত। এই পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করিয়াছে এবং পারিবারিক এই কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ হইতে মানুষের বৃহত্তর সামাজিক জীবনের কর্তব্যবোধ জন্মলাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবার একটি স্থায়ী ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার গঠন-প্রকৃতি ও কাঠামোর বহু পরিবর্তন ঘটিতেছে। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারেরও বিবর্তন ঘটিতেছে। ভারতের একান্নবর্তী পরিবার আজ ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রী কেন্দ্রিক পরিবারে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।

এইরূপে বিভিন্ন পরিবারের সমাবেশে ও সহযোগিতায় যৌথ-স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বিরামহীন বিবর্তনের ফলে মানব সমাজ গঠিত হইয়াছে।

লোকসমাজ বা সম্প্রদায় (Community)

সমাজের মধ্যেই বিভিন্ন লোকসমাজ বা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। এই বিভিন্ন লোকসমাজগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ সামাজিক নিয়ম, রীতি-নীতি ও আচার পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি লোকসমাজ বা সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সাধারণ সামাজিক নিয়মগুলির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া প্রত্যেকটি লোকসমাজ বা সম্প্রদায় ইহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে তৎপর হয়। কিন্তু কালের অগ্রগতিতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রভাবে এই সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবার প্রবণতা দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক সচেতনতা, ঐক্য ও সম-রূপতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

লোকসমাজ বা সম্প্রদায় সমাজের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এক অংশের জনসমষ্টি লইয়া গঠিত হয় এবং এই জনসমষ্টি কতকগুলি বিশেষ আচার-প্রথা, ঐতিহ্য ও উদ্দেশ্য দ্বারা একতাবদ্ধ হইয়া বৃহত্তর সমাজ সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ইহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৎপর হয়। লোক-সমাজ গঠন করিবার জন্য, কোন স্বতন্ত্র ভূভাগ ও স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য এক লোক-সমাজ অন্য লোকসমাজ হইতে পৃথক, সেই বৈশিষ্ট্যগুলিও সতত পরিবর্তন-শীল। একাধিক লোকসমাজের আচারগত, প্রথাগত, বা উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনজনিত প্রভাবে বিলীন হইতে পারে।

লোকসমাজ বা সম্প্রদায় নানা ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দুইটি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। স্ত্রীসমাজ (Women Community) বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইলেও অবয়বের বৈশিষ্ট্য, বসন-ভূষণের বৈশিষ্ট্য, সন্তান প্রজননের বৈশিষ্ট্য ও সর্বোপরি পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা স্ত্রীসমাজকে পুরুষসমাজ হইতে সহজেই পৃথক করিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীসমাজের যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হইল, সেগুলিও চিরস্থায়ী নয়, সেগুলি পরিবর্তনশীল। ভূষণের যে পার্থক্য তাহা ক্রমশই দূর

হইতেছে। পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা বর্তমান যুগে ক্ষীয়মাণ। স্ত্রী-জাতি আজ তাঁহাদের নানাপ্রকার সংঘ, সমিতির সাহায্যে তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর। বহুদেশে আজ স্ত্রীজাতি পুরুষের সমানাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়তঃ, বংশগত (Recial) ভিত্তিতেও গঠিত জনসমষ্টি অনেক সময় লোকসমাজ বলিয়া পরিচিত হয়, যথা আর্যসমাজ (the Aryan Community), য়্যাংলোস্যাকসন্ সমাজ (the Anglo-Saxon Community), শ্লাভ জাতি বা সমাজ (the Slav Community)। এই লোকসমাজগুলিরও চরিত্রগত, আচারগত, ঐতিহ্যগত কতিপয় সমতা এই জনসমষ্টির মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে সার্ভিয়া রাজ্যটি অষ্ট্রিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বৃহত্তর শ্লাভ রাষ্ট্র রুশিয়া সার্ভিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু জাতির ভিত্তিতে গঠিত লোকসমাজ যে সর্বকালে সমস্বার্থসম্পন্নহয়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

তৃতীয়তঃ, ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতেও জনসমষ্টিকে লোকসমাজ বলা হয়, যথা, ইহুদি সমাজ (the Jewish Community), মুসলমান সমাজ (the Muhammadan Community), হিন্দু সমাজ(the Hindu Community), ক্রীশ্চান সমাজ (the Christian Community)। ধর্মগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত লোকসমাজের কতিপয় আচারগত, ঐতিহ্যগত ও স্বার্থগত সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও এই লোকসমাজগুলি যে সর্ববিষয়ে ঐক্যবদ্ধ তাহা সত্য নহে। সমধর্মী হইলেও এক ইউরোপে প্রায় তিরিশটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠন দেখা যায় এবং এই সমধর্মী লোকসমাজগুলির মধ্যে কলহ-বিবাদও নিরন্তর ঘটে। মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও উপরি উক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। আধুনিককালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ধর্মগত ভিত্তিতে গঠিত লোকসমাজের দুর্বলতা সূচিত করে। অপর পক্ষে মধ্যযুগে জেরুজালেম লইয়া ক্রীশ্চান ও মুসলমান লোকসমাজ দুইটির মধ্যে যুদ্ধ, জার্মানী হইতে ইহুদি বিতাড়ন, ভারত-বিভাগ প্রভৃতি ধর্মগত ভিত্তিতে গঠিত লোকসমাজের শক্তির পরিচায়ক।

চতুর্থতঃ, ভাষা-ভিত্তিক লোকসমাজেরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতের বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল বাংলা ভাষা-ভাষী সমাজ। আচারগত, ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত এই লোকসমাজটি ইহার ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য ভারতের

অন্যান্য লোকসমাজ হইতে পৃথক। এই লোকসমাজের উদ্দেশ্য হইল মাতৃভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির সংরক্ষণ, উন্নতি ও প্রসার। নবগঠিত বাংলাদেশ প্রধানতঃ মুসলমান রাষ্ট্র হইলেও এই ভাষাগত ও কৃষ্টিগত ঐক্যের কারণে ভারতের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সহিত অধিকতর নিকট সম্পর্কযুক্ত।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, লোকসমাজ বা সম্প্রদায়গুলি বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গ এবং প্রত্যেকটি লোক-সমাজের কতিপয় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উদ্দশ্য থাকিলেও ইহারা বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার পরিপূরক মাত্র, প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। এদিক দিয়া দেখিলে এই বিভিন্ন লোকসমাজগুলিকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয ব্যবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বৃহত্তর সমাজ হইল যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বা সাধারণ সরকার, আর বিভিন্ন লোকসমাজগুলি হইল স্থানীয সরকার।

সংঘ বা সমিতি (Association)

সামাজিক মানুষের বহুমুখী জীবনের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য যখন জন-সমষ্টি একত্রিত হইয়া নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখন এই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে একটি সংঘ বা সমিতি বলা হয়। প্রত্যেক সংঘ বা সমিতির উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ অর্থাৎ একটিমাত্র উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই সমিতিগুলির সৃষ্টি হয় এবং বৃহত্তর সমাজ মধ্যে ইহার অঙ্গ হিসাবে এই সংঘগুলি ইহাদের উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপর। এই সমিতিগুলি সামাজিক, শিক্ষাগত, কৃষ্টিগত, ধর্মগত অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থসংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তৎপর হয়। তাই সমাজ মধ্যে আমরা ধর্মীয সংঘ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সমিতি, বণিকসভা, সমবায় সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি নানা জাতীয সমিতি দেখিতে পাই। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকেও একটি সংঘ বলা যাইতে পারে। তবে ব্যাপকতা, উদ্দেশ্য ও ক্ষমতার দিক দিয়া রাষ্ট্র হইল অসীম, আর অন্যান্য সংঘগুলি হইল সসীম। সংঘগুলি বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসমষ্টি লইয়া গঠিত হইতে পারে। সমিতির প্রধান ঐক্য-বন্ধন হইল উদ্দেশ্য। একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জনসমষ্টি জাতি-ধর্ম-ভাষা-নিরপেক্ষভাবে একই সংঘের সদস্য হইতে পারে। ইহাই হইল সম্প্রদায়ের সহিত ইহার পার্থক্য।

কতকগুলি সংঘ প্রয়োজনের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মলাভ করে,

অপর পক্ষে অন্যগুলি রাষ্ট্রের অনুমোদনে জন্মলাভ করে। পরিবার (Family) হইল মানুষের আদিম সংঘ। ইহাকে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নাই বা ইহার অস্তিত্বের জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। সমাজ গঠনের প্রাথমিক ও অপরিহার্য উপাদানরূপে পরিবার প্রথা আত্মপ্রকাশ করে।

মানুষ শুধু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব নহে বা শুধু নাগরিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। মানুষের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, কৃষ্টিগত প্রভৃতি জীবন আছে। রাষ্ট্র সমাজের সর্বাত্মক সংঘ হইলেও মানব-জীবনের এই বহুমুখী ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। তাই সমাজ মধ্যে এই বিভিন্ন জাতীয় সংঘের আবির্ভাব।

(সংঘ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

প্রতিষ্ঠান (Institution)

প্রতিষ্ঠান বলিতেও একটি উদ্দেশ্য-সাধক সংঘ বা সমিতি বুঝায় এব জনসমষ্টি লইয়াই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠান শব্দটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা স্থিং করা দুরূহ। কারণ পরিবারকে প্রতিষ্ঠান বলা হয়, শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকেও উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, অপর পক্ষে বিবাহপ্রথাকেও একটি প্রতিষ্ঠান (Institution) বলা হয়। কিন্তু যে অর্থে পরিবার ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত হয় অনুরূপ অর্থে বিবাহপ্রথাকে প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। কারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার বা শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পার্থক্য থাকিলেও এই উভয়ের একটা বাস্তব অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবাহপ্রথার এরূপ কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। এই প্রতিষ্ঠান মানুষের সামাজিক জীবনে অভিজ্ঞতা-জড়িত বির্তনের ফল। বিবাহপ্রথা কতকগুলি সামাজিক আচার পদ্ধতি ও নিয়ম লইয়া গঠিত এবং দেশভেদে ইহার বৈচিত্র্য দেখা যায় কোথায়ও বা এই বিবাহপ্রতিষ্ঠান প্রথাগত আচার ও নিয়মের স্তর উত্তীর্ণ হইয়া আইনের সমর্থন বলে স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে এই প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য হইল ইহা একটি পৃথিবী ব্যাপী প্রতিষ্ঠান।

সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তি ও সমাজ—ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ছাড়া মানুষ বাস করিতে পারে না, তাই সমাজের সৃষ্টি। সমাজ একদিনে সৃষ্টি

হয় নাই। পরিবারই হইল সমাজ সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর। বিভিন্ন পরিবারের সমাবেশে ও সহযোগিতায় যৌথ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বিরামহীন বিবর্তনের ফলে মানবসমাজ বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের চরিত্র চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করিয়া কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না—ব্যক্তি সমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। যে সমাজ ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনে অসমর্থ, সে সমাজের অস্তিত্ব সমর্থন করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সমাজ হইল মানুষের সর্ববৃহৎ ও সর্বাত্মক সংগঠন। কিন্তু মানুষের বহুমুখী জীবনের সকল চাহিদা সমাজ পূরণ করিতে পারে না—এই কারণে সমাজ মধ্যে ক্ষুদ্রতর বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংগঠনগুলি মানুষের আচার-আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত জীবনের চাহিদা পূরণ করে। তাই সমাজ মধ্যে আমরা বিভিন্ন সংঘ, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটি মানব-জীবনে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অভাব পূরণ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

রাষ্ট্রসংজ্ঞা (Definition of the State)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতথ্য আলোচিত হয়। সুতরাং প্রথমেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ইতালির চিন্তাবীর ম্যাকিয়াভেলী 'রাষ্ট্র' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস করিত। রাষ্ট্রের আয়তন নগরেই সীমাবদ্ধ থাকিত। গ্রীক ও রোমকগণ যথাক্রমে 'পোলিস্' ও 'সিভিটাস' এই দুইটি শব্দ দ্বারা রাষ্ট্রকে বুঝাইত। টিউটন যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্র' নামকরণ হইল। টিউটনেরাই সর্বপ্রথম 'স্ট্যাটাস্' কথাটি ব্যবহার করিল। বর্তমান যুগে 'রাষ্ট্র' শব্দটি অনবধানতাবশতঃ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় 'রাষ্ট্র' শব্দটি জাতি, সরকার, সমাজ, দেশ প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় আবার রাষ্ট্র শব্দটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকার বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অংশগুলিকে রাজ্য (State) বলা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাষ্ট্র' শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতীত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কয়েকটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই সমস্ত লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির জন্মদাতা মহামতি অ্যারিস্টটল্ বলিয়াছেন যে, স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে যখন অনেকগুলি পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হয়, তখনই তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বলিতে লেখক মানবচরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। আর এই মানবজীবনের চরম নৈতিক উৎকর্ষ লাভ হয় রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে। সুতরাং অ্যারিস্টটল্ ও অতীত যুগের

অন্যান্য দার্শনিকের মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

জার্মান পণ্ডিত ব্লুনৎস্লি ও সিডেল্ রাষ্ট্রের অনুরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ব্লুনৎস্লির মতে, যখন একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সংঘবদ্ধ হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। সিডেল্ বলেন, যখন বহুসংখ্যক লোক পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ অধিকার করিয়া কোন উচ্চতর শক্তির অধীনে সম্মিলিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। উড্রো উইলসনের মতে, নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয় ("A state is a pople organised for law within a definite territory")।

অন্যান্য বহু লেখক তাঁহাদের নিজস্ব ভাষায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলির কোনটি ত্রুটিবিহীন নহে। অনেকের মতে ডঃ গার্ণার রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র অল্পবিস্তর বহুসংখ্যক জনসমষ্টি যাহারা স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে ও যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সরকার আছে, যে শাসনপ্রতিষ্ঠানের নির্দেশ ঐ স্থানের অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত।

("The state, as a concept of Political Science and Public law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a difinite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.")

আধুনিককালের দুইজন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী—ল্যাস্কি ও ম্যাকাইভার রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ল্যাস্কি বলেন, "The modern state is a trritorial society divided into government and subjects claiming, within its allotted physical area, a supremacy over all other associations." (আধুনিক রাষ্ট্র হইল

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ সমাজ যে সমাজ হইল শাসক ও শাসিত লইয়া গঠিত এবং যাহা ইহার নিজস্ব নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর আধিপত্য দাবী করে)। অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি যদিও রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদ নীতির সমর্থক ছিলেন তথাপি তিনি রাষ্ট্রকে সার্বভৌমিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিতে চাহেন নাই।

ম্যাকাইভার বলেন, "The state is an assocition which, acting through law as promulgated by a government endwed to this end by coercive Power, maintains, within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order." (রাষ্ট্র হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা আইন ঘোষণা কারবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জবরদস্ত ক্ষমতার অধিকারী সরকার কর্তৃক ঘোষিত আইনের সাহায্যে কার্য করিয়া নির্ধারিত ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানবসমাজে সামাজিক শৃংখলার সার্বজনীন ও বাহ্যিক পরিবেশ অটুট রাখে)।

অধ্যাপক ল্যাস্কির ন্যায় ম্যাকাইভারও বহুত্ববাদের উগ্র সমর্থক। তিনি রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবে।

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of the State)

উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলি, বিশেষ করিয়া, ডঃ গার্ণারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত; যথা, জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, শাসনপ্রতিষ্ঠান বা সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা। জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ হইল রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্বের ভিত্তি; শাসনপ্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি।

(ক) জনসমষ্টি (Population)

বহু জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টির অবশ্য শ্রেণীবিভাগ করা যায়; যথা, পূর্ণ-নাগরিক, অসম্পূর্ণ-নাগরিক অর্থাৎ যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই, বিদেশী ও প্রজা। প্রজাগণের শুধু কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকে, কিন্তু তাহাদের অধিকারের দাবী

স্বীকৃত হয় না। বৃটিশ শাসনকালে ভারতীয়গণ প্রজাপদবাচ্য ছিল। রাষ্ট্রগঠনে একদল লোক প্রয়োজন, কিন্তু কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত, তাই অ্যারিস্টটল্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক রুশো পর্যন্ত রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্লেটো রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা ৫,০৪০-এ এবং অ্যারিস্টটল্ ১০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান যুগে মনাকো, স্যান্ম্যারিণো প্রভৃতি অল্পসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া, মহাচীন ও ভারতের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্রও পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগেও জনসংখ্যার দিক দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। এ্যান্ডোরা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হইল মাত্র ৫,০০০, অপর পক্ষে চীনদেশের জনসংখ্যা হইল ৪২২ মিলিয়নেরও অধিক। কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন সংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সরকারের সর্ববিধ কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

রাষ্ট্রগঠনে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশে যথেষ্ট জনবল থাকা একান্ত প্রয়োজন। হিট্লার শাসনকালে জার্মানীতে ও মুসোলিনি শাসনকালে ইতালিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু-সন্তানের জনক-জননীকে সরকারী সাহায্য প্রদান করা হইত। কিন্তু উৎপাদন পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য-বিহীনভাবে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের উন্নতির সহায়ক না হইয়া দেশের দুর্গতির কারণ হয়। সুতরাং বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ (Definite territory)

নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ বলিতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা বুঝায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আধিপত্য এবং কার্যকলাপ এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে

পরিচালিত হয়। তাই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে শুধু ভূমির উপরিভাগ বুঝায় না। ইহা এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রান্তর্গত ভূ-ভাগ, ভূগর্ভস্থ সমুদয় পদার্থ, আকাশপথ, নদনদী, গিরিপর্বত ও তিন মাইল পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল এই ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু রাষ্ট্রের এই নিজস্ব ভূ-খণ্ডের উপর একাধিপত্যের দুই-একটি বাধা আছে। বিদেশ হইতে আগত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের গৃহ স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সে গৃহ পররাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আইনতঃ পরিগণিত হয়। দিল্লীতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিদেশী যুদ্ধজাহাজ পররাষ্ট্রের বন্দরে সাময়িক কালের জন্য অবস্থান করিলেও তাহার উপর বন্দর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। তাহাদের দলের একজন নেতা থাকিতে পারে যাহার আদেশ দলস্থ সকলে মান্য করে, তথাপি তাহারা স্থায়িভাবে কোথাও বসবাস না করা পর্যন্ত রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। যখন একদল লোক স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের লইয়া রাষ্ট্রগঠনের সূত্রপাত হয়। কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহার যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা স্থির হয় নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থিরীকৃত করা যায় না। বর্তমান যুগে যে সমুদয় সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ভূখণ্ডের আয়তনের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। স্যান্‌ম্যারিণো রাষ্ট্রের আয়তন হইল মাত্র ৩৮ বর্গমাইল, অপরপক্ষে ভারতের আয়তন হইল ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৯৯ বর্গমাইল, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ৩০ লক্ষ বর্গমাইল এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন হইল ৮৭ লক্ষ বর্গমাইল। তবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকারের রাষ্ট্রেরই ভূখণ্ড থাকা চাই। এস্থলে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও মর্যাদা সব সময়েই এই ভূখণ্ডের আয়তনের উপর নির্ভর করে না। বৃটেন, জার্মানী, ফরাসী প্রভৃতি দেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে জগৎ-সভ্যতায় ইহাদের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। মনাকো বা স্যান্‌ম্যারিণোর ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিপদ হইল যে, এ জাতীয় রাষ্ট্র কখনও সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে

পারে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইহারা পরনির্ভরশীল হয় এবং এই পরিনির্ভরশীলতা অনেক সময় ইহাদের স্বাধীনতা হরণ করে। তবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সুবিধা হইল যে, রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা স্বল্প হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ অধিকতর সুসংবদ্ধভাবে একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয়ভাবে তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের কতকগুলি সুবিধা আছে। রাষ্ট্রের আয়তন বিস্তৃত হইলে সে রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজসাধ্য। এই কারণেই রুশ দেশ জয় করা অসম্ভব। ইহাছাড়া, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ইহাদের নৈসর্গিক সম্পদের প্রাচুর্যের সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু অতিকায় রাষ্ট্রগুলির প্রধান অসুবিধা হইল যে, আয়তনের ব্যাপকতার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র ক্ষীণ ও দুর্বল হয়। ফলে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হয়। শাসনব্যবস্থায়ও নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি প্রচলনের ফলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। তাই বর্তমান যুগের রাষ্ট্র-সংজ্ঞায় জনসমষ্টি ও ভূ ভাগ রাষ্ট্রগঠনের এই দুইটি উপাদানের কোন সীমারেখা স্থির করিবার প্রয়োজন হয় না।

(গ) শাসনযন্ত্র বা সরকার (Government)

একদল লোক কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করিলেই তাহাকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া চলে না। নির্দিষ্ট ভূ খণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। সুসংবদ্ধ জনসমষ্টির এই ঐক্যবদ্ধতা শাসনযন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। তাই যতদিন পর্যন্ত না তাহারা এক সুনিয়ন্ত্রিত শাসনযন্ত্র রচনা করিয়া তাহার কর্তৃত্বাধীনে আসে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের কোন সূচনা হইতে পারে না। এই শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি, যে শক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে বাস্তব

রূপ দিতে পারে। শাসনযন্ত্রবিহীন বা শাসনযন্ত্রবিকল রাষ্ট্র নাবিকহীন পোতের মত বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের নিয়ামক বা কর্ণধার। মানুষ যেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও সেইরূপ পরিচালিত হয় শাসনযন্ত্রের দ্বারা। তাই শাসনযন্ত্রকে সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিয়া ভুল করে। শাসনযন্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে; যথা, আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। এই তিন বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীসমষ্টিকে লইয়া রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র গঠিত।

(ঘ) সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty)

রাষ্ট্রগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শাসনযন্ত্র থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্রকে এই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রান্তর্গত সমগ্র জনসমষ্টির নিকট হইতে একক ও পূর্ণ আনুগত্য দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাই যাহার উপর রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রভুত্ব করে। রাষ্ট্রের ভিতর এমন কোন শক্তি থাকিতে পারে না, যে শক্তি রাষ্ট্রের কোন কার্যকে অবৈধ বা অযৌক্তিক বলিয়া অমান্য করিতে পারে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (Internal Sovereignty) বলা হয়। রাষ্ট্র যে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বেসর্বা তাহাই নয়। এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় না। নিজ ইচ্ছা অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাহার কার্য পরিচালনা করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইল, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার পরিচালনা করিবার অবাধ ও চরম ক্ষমতা; অপরটি হইল, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি (External Sovereignty)। যে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নাই, সে রাষ্ট্র স্বভাবতঃই

বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি এমন কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের রাষ্ট্রপদবাচ্য বলা যায় কি-না এ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। এই দেশগুলি রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের ফলে এমন একটি অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে যে, ইহারা নামমাত্র ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার করে, কিন্তু কার্যতঃ কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডের শাসনপাশ হইতে মুক্ত। এই দেশগুলিকে রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত করিবার নিমিত্ত গার্ণার তাঁহার প্রদত্ত রাষ্ট্রসংজ্ঞায় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া "বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় অনুরূপভাবে মুক্ত" (Independent or, nearly so, of external control) শব্দগুলির ব্যবহার করিয়াছেন।

এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের পর রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের বহু প্রগতিশীল লেখকও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অস্বীকার করেন। তাঁহারা মনে করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতি-পরিচালনায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিশ্বশান্তি স্থাপনের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহারা বিশ্বমানবের কল্যাণে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রের এই বহিঃস্থ সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান ঘটাইতে চান।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ব্যক্তিগত না স্থানগত? (State Sovereignty—personal or territorial?)

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে গেলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই উঠে যে, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা স্থান-নির্বিচারে ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য না ব্যক্তি-নির্বিচারে নির্দিষ্ট ভূভাগের উপর প্রযোজ্য? সার্বভৌমিকতা যদি ব্যক্তিবাচক বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অবাধ ক্ষমতার বলে স্বদেশ অথবা বিদেশ সর্বত্রই সমানভাবে তাহার নাগরিকদের উপর কর্তৃত্ব করিতে

পারে। রাষ্ট্রপ্রণীত আইন নাগরিকদের উপর সর্বত্রই সমানভাবে প্রযোজ্য। অপর পক্ষে যদি সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্থানবাচক বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল লোকের উপর—কি নাগরিক, কি বিদেশী—সমানভাবে ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যাহারাই বাস করুক না কেন সকলেই রাষ্ট্রের আইন মানিতে বাধ্য। এই শেষোক্ত মতবাদ অনুসারে বর্তমান যুগে সার্বভৌমিকতার প্রয়োগ হয়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের এই অবাধ কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমারেখার বাহিরে অন্য রাষ্ট্রের উপর বলবৎ হইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিনষ্ট হয়। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে সীমাবদ্ধ থাকিলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যত্যয় দেখা যায়। কোন দেশের রাষ্ট্রদূত অথবা যুদ্ধ জাহাজ সাময়িকভাবে যখন অন্য দেশে অবস্থান করে, তখন তাহাদের উপর সেই রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্রদূত সাময়িকভাবে ভিন্ন দেশে বাস করিলেও সে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন নহে।

সার্বভৌমিকতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা এ যুগে আর কার্যকর নাই। এই ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য দেশ ভিন্ন দেশেও তাহাদের অবাধ ও প্রতিহত ক্ষমতা বলবৎ করিত। বিগত শতাব্দীতে এই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র এশিয়ার কতকগুলি দেশে বিশেষ করিয়া চীনদেশে তাহাদের অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ করিত। এই ক্ষমতার বলে কোন ইংরাজ নাগরিক চীনদেশে গুরুতর অপরাধ করিলেও কোন চীন বিচারালয়ে চীনের আইন অনুসারে তাহার বিচার হইতে পারিত না। ইংরাজ নাগরিকের বিচার ইংরাজ বিচারকের দ্বারা তাহার স্বদেশীয় আইনানুসারে হইত। ইংলণ্ডের আইন ইংলণ্ডের বাহিরে ভিন্ন রাষ্ট্র চীনদেশে কার্যকর করা হইত। বর্তমান যুগে এই ভৌম-অধিকার-বহির্ভূত ক্ষমতার (Extra-territorial jurisdiction) অবসান ঘটিয়াছে। তথাপি একটি ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। এক রাষ্ট্র অপর দেশে জাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া দাবী করিতে পারে। যে আইনের দ্বারা এই দাবী সমর্থিত হয় তাহাকে *Jus*

Sanguinis (রক্তের ভিত্তিতে আইন) বলা হয়। এই আইন সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রের বাস্তব ও অবাস্তব রূপ (Idea vs. Concept of the State)

রাষ্ট্রসংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, রাষ্ট্র একটি বস্তুনিরপেক্ষ ধারণামাত্র, অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকে একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রের অবাস্তব রূপকে ইহার বাস্তব অস্তিত্বের উপাদান, জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়াও কল্পনা করিতে পারা যায়। এই অবাস্তব রূপ বহুলাংশে যৌথ কারবারের অস্তিত্বের অনুরূপ। বাস্তব দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের এই বাস্তব ও অবাস্তব উভয় দিকই আলোচিত হয়।

অনেক লেখক আবার রাষ্ট্রসংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করেন আদর্শ রাষ্ট্রের মাপকাঠিতে। পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের উপাদান অধুনা-প্রচলিত রাষ্ট্রের উপাদান হইতে পৃথক্। আদর্শ রাষ্ট্র বলিতে তাঁহারা মনে করেন রাষ্ট্রের যাহা হওয়া উচিত অর্থাৎ ভুলত্রুটিবিহীন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আর প্রচলিত রাষ্ট্রগুলি হইল ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মানবীয় প্রতিষ্ঠান। অনেকে মনে করেন, এক বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনেই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সার্থক হইবে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া টমাস্ মুর পর্যন্ত বহু লেখকই আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু কার্যতঃ এখন পর্যন্ত আদর্শ রাষ্ট্র একটি কল্পনামাত্র রহিয়া গেল।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিকল্পনা দেখা যায়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল্ উভয়েই নগর-রাষ্ট্রের ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পরিকল্পিত এই আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান ত্রুটি ছিল যে, এই রাষ্ট্র সর্বসাধারণের জন্য পরিকল্পিত হয় নাই, মুষ্টিমেয় নাগরিকদের সুখ-সুবিধার জন্যই এই রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। নগর-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইবার পর বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের একটা পরিকল্পনার প্রয়াস দেখা যায়। মহাবীর

আলেকজান্দার হইতে আরম্ভ করিয়া নাৎসী নায়ক হিট্‌লার পর্যন্ত এই আদর্শকে কার্যকর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও সফল হয় নাই। শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন আদর্শই মানবসমাজে স্থায়ী হইতে পারে না। অষ্টাদশ বা বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে একটা নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই আদর্শবাদ জাতীয়তাবোধ বা 'একজাতি একরাষ্ট্র' এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন ভাষাভাষী বা ধর্মাবলম্বী জাতিগুলি নিজ নিজ স্বাধীন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে নিজস্ব সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইল। বর্তমান শতাব্দীতে প্রথম মহাসমরের পরবর্তী কাল হইতে আদর্শ রাষ্ট্রসম্বন্ধে আবার নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন হইয়াছে। মানুষ বোধহয় বুঝিয়াছে যে, জাতিগত বৈষম্যের জন্য পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত থাকা মানবধর্ম নয়। তাই আবার বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, আর এই প্রচেষ্টা রূপায়িত হইয়াছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনে।

রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

(ক) স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (Permanence and Continuity)

রাষ্ট্রের একটি বিশেষ লক্ষণ হইল যে, ইহার বিনাশ নাই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি অস্থায়ী কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র হইল একমাত্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু শাসনযন্ত্রের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না।

(খ) রাষ্ট্রের সমানাধিকার (Equality of States)

রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইলেই প্রত্যেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের বলে সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। যেমন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট সমান অধিকার দাবী করিতে পারে, সেইরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রই সমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি দাবী করিতে পারে। এই অধিকার

দুই প্রকারের—আইনগত অধিকার (Legal Right) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Right)। আইনগত অধিকারের বলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের চক্ষে সমান বলিয়া পরিগণিত হয়। রাজনৈতিক অধিকারবলে সকল রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সমানভাবে যোগদান করিবার ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাষ্ট্রের আইনগত অধিকার সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকারে সাম্য নীতি এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N.) সংগঠনে এই নীতির কার্যকারিতার অভাব দেখা যায়।

রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইনসম্মত সংজ্ঞা (The State as a Concept of International Law)

আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে রাষ্ট্রসংজ্ঞা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'রাষ্ট্র' সংজ্ঞা অপেক্ষা ব্যাপকতর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হওয়া চাই। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে এই স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে ও নিজস্ব ইচ্ছানুসারে চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাহার থাকিবে। যখনই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে ও তাহার স্বাধীনতা অন্য রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তখনই সে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রমর্যাদা লাভ করে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর বহুদিন পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রমর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। অনেক রাষ্ট্রই ইহাকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি করে ও ইহার সহিত কোন কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করে না। বর্তমান সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপর কয়েকটি রাষ্ট্র নয়া চীনকে রাষ্ট্র বলিয়া এখনও স্বীকার না করিলেও চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করিয়া পূর্ণ রাষ্ট্রমর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে। যদিও ইংলণ্ড, ভারত, রাশিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ ইহাকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রধান উপায় হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করা।

ভারতকে কি স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্র বলা চলে?
(Is India a State ?)

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্টের পূর্বে এ প্রশ্নের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন ভারত সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। বহু জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শক্তিশালী শাসনযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু উল্লিখিত তারিখের পর হইতে ভারত, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্বাধীন উপনিবেশগুলির সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারত পূর্ণাবয়ব রাষ্ট্রমর্যাদা লাভ করিয়াছে। ভারত তাহার নিজের সংবিধান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রচনা করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ভারত যে স্বাধীন রাষ্ট্র নয় ইহার সপক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, ভারত এখনও পর্যন্ত বৃটিশ সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য রহিয়াছে ও বৃটিশ রাজার আনুগত্য স্বীকার না করিলেও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

নূতন সংবিধানে ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট নেতা হইলেন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। বৃটিশ রাজার ভারত সম্পর্কে আদৌ কোন ক্ষমতা নাই, এমন কি রাষ্ট্রের কোন কাজে বা রাষ্ট্রীয় কোন উৎসবেও তাঁহার নাম উল্লেখিত হয় না। তাঁহার এই নেতৃত্ব শুধু একটি ধারণামাত্র। ভারতকে বৃটিশ সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য রাখিবার নিমিত্তই এই সাধারণতন্ত্র রাজ্য হইতে 'বৃটিশ' শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদি সদস্য ও এই জাতিপুঞ্জের সভায় বহুক্ষেত্রে ভারত তাহার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিয়া বৃটেনের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছে। ভারত যে সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহা তাহার নিরপেক্ষ নীতির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সক্রিয়ভাবে ভারত এখনও পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে যোগদান করে নাই। কতকগুলি কারণে ভারত স্ব-ইচ্ছায় এই সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য রহিয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন বৃটেনের সহিত বহুদিন হইতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ভারতের নূতন সংবিধান বহুলাংশে বৃটেনের

সংবিধানের অনুসরণ করিয়াছে। এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ভারতের আরও কিছুদিন পর্যন্ত বৃটেনের সহিত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত আবশ্যক বলিয়া ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মনে করেন। সেইজন্য ভারত সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক ছেদ করে নাই। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারত স্ব-ইচ্ছায় এই সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের সদস্য হইয়াছে ও স্ব-ইচ্ছায় ইহার সদস্যপদ ত্যাগ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ইহার আছে। সুতরাং ভারতকে পূর্ণাবয়ব রাষ্ট্র না বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে? (Is the United Nations a State ?)

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রসংঘের (League of Nations) উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানও ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চিরতরে যুদ্ধের সম্ভাবনার অবসান করিয়া পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হইল এই প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় কিনা।

অনেক লেখক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত করেন, অনেকে আবার এই প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রগুলির উপর স্থান দিয়া ইহাকে একটি অভিভাবক রাষ্ট্র (Super state) রূপে গণ্য করেন।

আন্তর্জাতিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে রাষ্ট্রের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতে পারে। সাধারণ রাষ্ট্রগুলির ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানটির শাসন বিভাগ (নিরাপত্তা পরিষদ), আইন বিভাগ (সাধারণ সভা) ও বিচার বিভাগ (আন্তর্জাতিক আদালত) আছে। ইহার কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার জন্য একটি দপ্তরখানা আছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইহার একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র বা রাজধানী আছে ও ইহার নিজস্ব কোষাগার ও বাৎসরিক আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহাদের স্থায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী

প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে। বর্তমানে কাশ্মীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কতিপয় প্রতিনিধি ভারতে নিযুক্ত আছেন। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি চুক্তি করিতে পারে। গণতান্ত্রিক চীনের সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাস্তব দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্র বলা যায় না। যে কয়টি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত তাহার কোনটিই সম্যকরূপে এই প্রতিষ্ঠানে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, এই প্রতিষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই বা ইহার নিজস্ব নাগরিক নাই। অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের অনুরূপ শাসনযন্ত্র থাকিলেও এই প্রতিষ্ঠানের শাসনযন্ত্র কর্তৃক বিধিনিষেধ সদস্য রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ সম্মতি ও সাহায্য ব্যতীত কোন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধ ঘোষণা করিবার যে ক্ষমতা উল্লেখ করা হয় তাহার অর্থ হইল যে, এই প্রতিষ্ঠান সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য সৈন্য ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু সদস্য রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই সুপারিশ গ্রহণ না করিতেও পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের কোথাও এ-কথার উল্লেখ নাই যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা জাতিপুঞ্জে সমর্পণ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে ভারত প্রভৃতি বহু রাষ্ট্রই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী। কোন রাষ্ট্রের অনিচ্ছা বা অসম্মতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান অনিচ্ছুক রাষ্ট্রের উপর ইহার সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে সক্ষম নয়। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। সুতরাং ইহাকে রাষ্ট্র পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থতা বা সালিসি করিতে পারে, কিন্তু মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা ইহার অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলি পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অভিভাবক রাষ্ট্র বলা দূরে থাকুক, রাষ্ট্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলিবে না। কয়েকটি বিশেষ

উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা ব্যতীত ইহাকে অন্য নামে অভিহিত করা যুক্তিসম্মত নয়।

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)

সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ সামাজিক জীব। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই সামাজিক জীব অর্থে আমরা কি বুঝি। বহু জনসমষ্টি সভ্য জীবন যাপন করিবার জন্য একসঙ্গে বাস করে। তাহারা নানা বিষয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মনুষ্যসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয় তখনই সমাজ জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সমাজ মানবজীবনকে প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনরূপ লিখিত আইন-কানুনের আবশ্যক হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাধিক প্রথা, আচার, রীতি-নীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের জীবন বহুমুখী এবং এই বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন তৃপ্ত করিবার জন্য মানুষ সমাজদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ সংঘ বা সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সমাজমধ্যে আমরা দেখিতে পাই পরিবার, ধর্মসংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্র সমাজ-মধ্যে এইরূপ একটি সংঘ। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘগুলি অপেক্ষা একটি বিশিষ্ট সংগঠনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। ইহার কার্যকলাপ সমাজগণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। সুসংবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সমাজ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে, রাষ্ট্র সমাজকে সৃষ্টি করে নাই। সেইজন্য সমাজ-জীবনের মূল-নীতিগুলিকে রাষ্ট্র উপেক্ষা করিতে পারে না। সমাজের সহিত রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়:—

(ক) প্রথমতঃ, সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর। সমাজ মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-

মধ্যে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ শুধু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ।

(খ) কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না, কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে গেলে সমাজের সংজ্ঞা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়।

(গ) সমাজগঠনের সূত্রপাত রাষ্ট্রগঠনের বহু পূর্বে হইয়াছিল। রাষ্ট্রগঠন সমাজ-বিবর্তনের একটি অধ্যায় মাত্র। রাজনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমাজবদ্ধ মানুষ বহু পরে রাষ্ট্র গঠন করে।

(ঘ) রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের বা সরকারের প্রয়োজন হয়। এই সরকারের মাধ্যমেই জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পায়। সরকার হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। কিন্তু সমাজের এরূপ কোন শাসনযন্ত্র নাই। এস্কিমো, বেদুইন প্রভৃতি এমন অনেক আদিম জাতি আছে যাহারা সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করিলেও তাহাদের কোন শাসনযন্ত্র নাই।

(ঙ) সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। এই উপাদান ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর হইলেও সমাজের এরূপ কোন বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা নাই।

(চ) পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়ের পার্থক্য অধিকতর সুস্পষ্ট। রাষ্ট্র শুধু মানুষের বহির্জীবনের আচরণ স্থির করিয়া দেয়। তাহার অন্তর্জীবন অর্থাৎ তাহার চিন্তাধারা, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সীমারেখা স্থির করা সম্ভব। কিন্তু সমাজ নানাভাবে মানুষের সমগ্র জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভয় প্রভৃতি সামাজিক প্রবণতার দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়। নানাবিধ সামাজিক বিধিনিষেধ তাহার এই মনুষ্যত্ববিকাশে সহায়তা করে। এই সামাজিক প্রবণতা ও বিধিনিষেধগুলিকে রাষ্ট্র ব্যক্তির আত্ম-বিকাশের পথ সুগম করিবার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে সৃষ্টি বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য সংঘ (State and other Associations)

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। অন্যান্য সংঘগুলিও রাষ্ট্রের মত জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। ইহাদেরও শাসনযন্ত্রের মত কার্যকরী সমিতি ও আইন-কানুন আছে। কিন্তু এই কয়েকটি সাদৃশ্য ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নাই। অধিকন্তু উহাদের পার্থক্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) প্রথমতঃ, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা আছে, আর এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। কিন্তু অন্যান্য সংঘ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে সীমাবদ্ধ নয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বাহিরে অন্য রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের কার্য পরিচালনা করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ মিশন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংঘ। কিন্তু ভারতের বাহিরে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকগণও এই সংঘের সভ্য হইতে পারেন এবং এই সংঘের কার্য অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডেও পরিচালিত হইতে পারে। এমন কি, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী একটি সংঘ গড়িয়া উঠিতে পারে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের কার্যকলাপ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ব্যাপ্ত।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মানুষ মাত্রকেই একটা-না-একটা রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে। জন্মকাল হইতে মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। সাবালক হইলে তাহার ইচ্ছানুসারে এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতেই হইবে। কিন্তু সামাজিক অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন। যে-কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার ক্রীড়াসংঘ বা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া মানুষের পক্ষে বাধ্যতামূলক, অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

(গ) তৃতীয়তঃ, একজন লোক একই সময়ে মাত্র একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া আইনতঃ ও কার্যতঃ অসম্ভব। কিন্তু একটি লোক একই সময়ে অন্যান্য বহু সংঘের সভ্য হইতে পারে—তাহাতে কোন বাধা নাই।

(ঘ) চতুর্থতঃ, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ-গুলির মধ্যে প্রভেদ অনেক বেশী। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তৃপ্ত করিবার জন্য ধর্মসংঘগুলির আবির্ভাব হইয়াছে, শিক্ষায়তনগুলির সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ও নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি সংঘের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এইরূপ এক বা একাধিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে। মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অন্যান্য সংঘগুলির উদ্দেশ্য অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

(ঙ) পঞ্চমতঃ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হইতেও পারে। যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহারা গঠিত হয় সেই উদ্দেশ্য সফল হইলে বা অন্য কারণে তাহারা লোপ পাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের বিনাশ নাই। অন্যান্য সংঘগুলির রাষ্ট্রের মত স্থায়িত্ব বা ধারাবাহিকতা নাই।

(চ) ষষ্ঠতঃ, অন্যান্য সংঘগুলি অনেক সময় মানুষের বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রও এইরূপ জনহিতকর সংঘ গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু সকল সংঘই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন ও রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাহাদের কার্যকলাপের অবসান ঘটাইতে পারে।

(ছ) পরিশেষে, রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘগুলির প্রধান পার্থক্য হইল যে, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আর, এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণের ও অন্যান্য সংঘগুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে। কোন সংঘের কোন একজন সভ্য যদি সেই সংঘবিরোধী কাজ করে তাহা হইলে সেই সংঘ সেই সভ্যকে জরিমানা করিতে পারে বা সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোন দৈহিক শাস্তি দিবার ক্ষমতা ঐ সংঘের নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র তাহার সভ্যগণকে যে-কোন শাস্তি এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও দিতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজগণ্ডির মধ্যে যে বহুবিধ সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্রই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংঘ। ব্যাপকতা, উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও স্থায়িত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র হইল অসীম—অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি সসীম।

রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র (State and Government)

দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র প্রায় প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। যে চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহার মধ্যে শাসনযন্ত্র একটি মাত্র। যদিও রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি এই শাসনযন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়, তথাপি রাষ্ট্র শাসনযন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যদিও মস্তিষ্ক দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয় তথাপি মস্তিষ্ক যেমন সমগ্র মানুষটিকে বুঝায় না, সেইরূপ শাসনযন্ত্র শব্দটি দ্বারা সমগ্র রাষ্ট্রসংস্থাটির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বা সরকারের মধ্যে অনেক বাস্তব প্রভেদ আছে।

(ক) প্রথমতঃ, রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র অধিবাসীকে লইয়া। সকল নাগরিকই রাষ্ট্রের সভ্য। কিন্তু সরকার গঠিত হয় অনেক অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনাকার্যে যাহারা নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আইন-সভাগুলির সদস্য, শাসনবিভাগীয় কর্মচারী ও বিচারবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দকে লইয়া শাসনযন্ত্র গঠিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা ব্যাপকতর।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ। কোন রাষ্ট্রবিশেষের কথা ভাবিতে গেলে একটা ভৌগোলিক সীমার কথা মনে পড়ে। কিন্তু সরকার বলিতে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কল্পনার প্রয়োজন হয় না। সরকার প্রধানতঃ শাসনকার্যে রত অল্পসংখ্যক লোককে বুঝায়।

(গ) তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার হইলেও সরকার পরিবর্তনশীল। সরকারের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোনরূপ বিপর্যয় ঘটে না।

(ঘ) চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকারের এ ক্ষমতা নাই। সরকার রাষ্ট্রের বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালনা করে। কিন্তু রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে।

(ঙ) পঞ্চমতঃ, সকল দেশেই একই উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূভাগ, শাসনযন্ত্র ও সার্বভৌম ক্ষমতা—এই চারিটি উপাদান সকল রাষ্ট্রেই বর্তমান। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে সব রাষ্ট্রই এক পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু দেশভেদে শাসনযন্ত্রের রূপ বিভিন্ন হয়। রাষ্ট্র হিসাবে

গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একই প্রকার। কিন্তু দুইটি দেশের শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ পৃথক্।

(চ) পরিশেষে, বলিতে পারা যায় রাষ্ট্র একটি মনঃকল্পিত ধারণা মাত্র; ইহার কোন বাস্তব রূপ নাই। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। রাষ্ট্র বলিলে একটি বস্তুনিরপেক্ষ কল্পনা বুঝায় আর সরকার হইল রাষ্ট্রের সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ। তাই সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রই হইল সকল অধিকারের উৎস।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকাশ (Different manifestations of the State)

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশ ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রাষ্ট্র বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে শুধু গঠন প্রকৃতির পার্থক্য দেখা যায় তাহা নহে, এই রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধির মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

১। নগর-রাষ্ট্র (City-state)

প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশে নগরকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাষ্ট্রের আয়তন প্রধানতঃ নগরেই সীমাবদ্ধ থাকিত বলিয়া এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নগর-রাষ্ট্র বলা হইত। গ্রীক ও রোমক সভ্যতা এই নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। এই নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিবাসীর প্রচুর অবসর ছিল, এবং যাহারা রাষ্ট্রপরিচালনা কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিবার যোগ্যতার অধিকারী ছিল তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। ক্রীতদাস, দিন-মজুর ও স্ত্রীলোকগণ রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া তাহারা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত না। মধ্যযুগেও ইয়ুরোপে ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি কতিপয় নগর-রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়।

প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রের সহিত আধুনিক অতিকায় রাষ্ট্রগুলির নানাদিক দিয়া পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন যুগের নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন নাগরিকগণ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও

সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিত, কিন্তু বর্তমান যুগের রাষ্ট্র পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালের রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় বিশ্রামভোগী পরজীবী অভিজাত সম্প্রদায় নাগরিক সুখ-সুবিধার অধিকারী ছিল, বর্তমান রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে এতটা ভেদ দেখা যায় না। সকলেরই সমান অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন যুগের নগর-রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়া হইত। রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু রাষ্ট্রের জন-কল্যাণ ক্ষমতার দ্বারাই সমর্থিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী একটি নিকৃষ্ট স্তরের জীব বলিয়া পরিগণিত হইত। যে শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না, বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাপকাঠিতে তাহাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায় না।

২। প্রাচীন অতিকায়-রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য (Empire)

নগর-রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের পূর্বে প্রতীচ্য দেশে কতিপয় অতিকায় রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। স্বরাষ্ট্র ব্যতীত বহু পররাষ্ট্র বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা এই সকল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধাসত্ত্বেও এই সকল সাম্রাজ্য বহুদিন পর্যন্ত বহু বিভিন্ন জাতির উপর আধিপত্য অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন মিশর, চীন, ভারত, পারস্য ও আসিরীয়া দেশগুলি কর্তৃক এই সকল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সম্রাটই ছিলেন সর্ব বিষয়ের অধিকর্তা—তাঁহার ইচ্ছা ছিল চরম আইন। বিজিত দেশগুলির কোনপ্রকার স্বাধীনতা ছিল না। সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ ছিল। অনেক সময় বিজেতা বিজিত জাতিসমূহকে ক্রীতদাস পর্যায়ে পর্যবসিত করিত।

মিশর, পারস্য প্রভৃতি সাম্রাজ্যের পর অদ্বিতীয় বীর আলেকজান্দার কর্তৃক ম্যাসিডোনিয়ান্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি অল্পকালের মধ্যে আলেকজান্দার সমগ্র গ্রীস দেশে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া দুর্বার বেগে মিশর, পারস্য ও ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। অবশ্য তাঁহার অকালমৃত্যুর ফলে তাঁহার এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য

ধ্বংস হয়। ইহার পর রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। প্রাচীন সাম্রাজ্য গুলির মধ্যে সভ্যতার অগ্রগতিতে রোমক সাম্রাজ্যের অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক। রোমক শাসনপদ্ধতি ও আইন পরবর্তী যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার পথ-নির্দেশক বলিয়া আজও পর্যন্ত পরিগণিত হয়।

অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ, ফরাসী, রুশ ও অটোম্যান-তুর্ক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ নিছক পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। তাই পৃথিবীর কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই।

৩। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র (Feudal State)

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র ইয়ুরোপ কতকগুলি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দেশে রাজতন্ত্র বর্তমান থাকিলেও রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক দেশই কতকগুলি সামন্ত অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং এক এক অঞ্চলের সামন্ত ছিলেন সেই অঞ্চলের প্রকৃত শাসনকর্তা। সামন্তগণ দেশের রাজাকে নির্দিষ্ট কর প্রদান ও যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। ইহা ব্যতীত অন্য সর্ববিষয়ে তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। নিজ নিজ এলাকায় তাঁহারা সর্ববিষয়ে স্বৈরাচারী ছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জাপানেও এই সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল হইল যে, দেশে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার না থাকার ফলে রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়। সামন্ত নেতাগণের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে দেশে সর্বদা অশান্তি ঘটে। এই ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী ব্যতীত কৃষক, শ্রমিক ও বণিক প্রভৃতি শ্রেণী লইয়া গঠিত সাধারণ শ্রেণী ভূমিদাসে পর্যবসিত হয়।

৪। জাতীয় রাষ্ট্র (Nation-State)

অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যখন সমান্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটে, সেই সুযোগে ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশের নৃপতিবর্গ ক্ষমতাশালী বণিকশ্রেণীর সাহায্যে নিজ নিজ দেশে নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তার করিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেন। কিন্তু এই সময়কার রাষ্ট্রগুলি জাতির ভিত্তিতে গঠিত হইলেও একমাত্র রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের মালিক—জনসাধারণের শাসন-

ব্যবস্থায় কোন হাত ছিল না। রাজার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জাতির মধ্যে স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। পোল্যাণ্ডের যথেচ্ছা বিভাগ, নেপোলিয়নের খুসীমত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ ও নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ভিয়েনা চুক্তির রচয়িতাগণের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের নৈতিক কর্তব্যের প্রতি ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সাহায্য করে। পরবর্তী কালে এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ এরূপ উগ্র ও দুর্বার রূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্যতা স্বীকৃত হয়। ফলে, প্রথম বিশ্ব সমর পরিসমাপ্তির পর ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে জাতির এই দাবী সর্বপ্রথম স্বীকৃত হইয়া জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটে। জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'। পোল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ একই ভাষাভাষী ও একই ঐতিহ্যের অধিকারী, সুতরাং তাহাদের নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার আছে। জার্মানী, রুশিয়া বা অষ্ট্রিয়ার পোল্যাণ্ডের উপর কর্তৃত্ব করিবার কোন অধিকার নাই।

জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান নানাদিক দিয়া কাম্য হইলেও জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দাবী অবাধ ও শর্তহীন নহে। যে স্থলে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ফলে একদিকে আত্মকলহ ও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হয় এবং অপর দিকে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেরূপ স্থলে এই অধিকারকে অনধিকার বলা চলে।

৫। বিশ্ব-রাষ্ট্র (World State)

বিশ্ব-রাষ্ট্র হইল রাষ্ট্রের আদর্শ রূপ—ইহার বাস্তব কোন অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত দেখা যায় না। রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে যে স্বাজাত্যবোধ জাগরিত হয়, তাহার ফলে জাতির ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি একদিকে যেরূপ স্বাধীনভাবে তাহাদের আত্মোন্নতির দ্বারা জগৎ-সভ্যতা সমৃদ্ধ করিল, অপর দিকে সেইরূপ পারস্পরিক কলহ, বিদ্বেষ ও ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইল। উগ্র স্বাদেশিকতার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। পর পর দুইটি বিশ্ব-মহাসমর এই অত্যধিক স্বাদেশিকতার ফল।

দুইটি বিশ্ব-মহাসমরের ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় মানবজাতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী হইয়াছে। মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, জাতীয় রাষ্ট্রই সমাজ সংগঠনের শেষ অধ্যায় নহে এবং জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই মানুষের শেষ কর্তব্য নহে। মানুষ বুঝিয়াছে যে, জাতিগত বৈষম্যের জন্য পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত থাকা মানবধর্ম নয়। তাই বিশ্ব-রাষ্ট্র সংগনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, আর এই প্রচেষ্টা রূপায়িত হইয়াছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনে।

কিন্তু বিশ্ব রাষ্ট্র গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হইল রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমিকতার ধারণা এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই ধারণা বর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ব-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব বিরোধ, চীনের সমস্যা ও সর্বোপরি পশ্চিম ও পূর্ব গোষ্ঠীর রাষ্ট্রজোটের মারাত্মক দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে গঠিত বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের প্রধান অন্তরায়। বিভিন্ন জাতিগুলি যে দিন বুঝিতে পারিবে যে, যে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা ও প্রগতির রক্ষক, সে রাষ্ট্রের পক্ষে বিধ্বংসী যুদ্ধ দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট করা কখনই উচিত নয়—সেদিন বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মুক্ত হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রসংজ্ঞা—যখন একদল লোক কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে আইনশৃংখলা রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া শাসনযন্ত্র গঠন করে ও বহির্নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তাহাদের সামাজিক জীবন যাপন করে, তখন তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত; যথা, (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) শাসনযন্ত্র ও (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা। উপাদানগুলির মধ্যে শেষোক্তটি রাষ্ট্রগঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ হইল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রসম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। বর্তমান রাষ্ট্রসংজ্ঞায় জনসমষ্টি ও ভূভাগের কোন নির্দিষ্ট

সীমা স্থির নাই। রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহার স্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতা ও অন্য রাষ্ট্রের সহিত সমানাধিকার উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে রাষ্ট্রপদবাচ্য হইতে হইলে অন্য রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়।

জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূভাগ লইয়া রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু রাষ্ট্রের একটা অবাস্তব রূপ আছে—যাহার সহিত যৌথ কারবারের অস্তিত্বের তুলনা করা যাইতে পারে।

অনেক লেখক আবার রাষ্ট্রকে একটা আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আদর্শ রাষ্ট্র একটা মনঃকল্পিত ধারণা যাহার সহিত বর্তমান ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ রাষ্ট্রের তুলনা করা চলে না। অনেক লেখক বিশ্ব-রাষ্ট্রগঠন-পরিকল্পনাকেই আদর্শ রাষ্ট্রের বাস্তব পরিণতি বলিয়া মনে করেন।

ভারত কি স্বাধীন রাষ্ট্র?—বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতকে স্বাধীন না বলিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যদিও ভারত নামমাত্র বৃটিশরাজের নেতৃত্ব স্বীকার করে তথাপি ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারত সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজার কোন ক্ষমতা নাই। ভারত কতকগুলি সুবিধার জন্য সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের সদস্য রহিয়াছে। যে-কোন মুহূর্তে ভারত এই সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের সদস্যপদ নিজের ইচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে পারে।

রাষ্ট্র ও সমাজ—মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমাজের সৃষ্টি। সমাজ নানাবিধ সংঘ গঠন করিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া এই প্রয়োজন তৃপ্ত করে,—রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

১। সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র।

২। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না, কিন্তু সমাজগঠনে ইহার প্রয়োজন হয় না।

৩। রাষ্ট্রজন্মের বহু পূর্বে সমাজ গঠিত হয়।

৪। শাসনযন্ত্র বা সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলিতে পারে না, কিন্তু সমাজের গঠনে সরকারের প্রয়োজন হয় না।

৫। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে সার্বভৌম ক্ষমতার উপর; সমাজের এ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না।

৬। রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের উদ্দেশ্য অধিকতর ব্যাপক। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই সমাজের কাজ।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ—১। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই, সংঘের ভূখণ্ড না হইলেও চলে।

২। রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংঘ; অন্যান্য সংঘগুলি স্থায়ী না হইতেও পারে।

৩। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুমুখী; রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার সর্ববিধ উন্নতিসাধনে সহায়তা করে, অন্যান্য সংঘগুলি দুই একটি বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাহায্য করে।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রান্তর্গত সকলের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে, অন্যান্য সংঘগুলির অবাধ ক্ষমতা নাই।

৫। মানুষ ইচ্ছামত এক বা একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে বা সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য তাহাকে হইতেই হইবে—নাগরিক হওয়া বাধ্যতামূলক।

রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র—শাসনযন্ত্র বা সরকার রাষ্ট্রগঠনের একটি উপাদান মাত্র। রাষ্ট্রের সহিত ইহার পার্থক্য আছে।

১। রাষ্ট্রান্তর্গত সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের সভ্য, কিন্তু সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া—আইনসভার, শাসনবিভাগের ও বিচারবিভাগের কর্মীদের লইয়া সরকার গঠিত হয়।

২। রাষ্ট্র স্থায়ী সংঘ, সরকার পরিবর্তনশীল।

৩। রাষ্ট্র বলিতে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধারণা হয়, কিন্তু শাসনযন্ত্র বলিতে শুধু কার্যরত কতকগুলি বিশেষ লোকের সমষ্টি বুঝায়।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে।

৫। সকল রাষ্ট্রেরই একই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেশভেদে শাসনযন্ত্রের পার্থক্য দেখা যায়।

৬। রাষ্ট্র সর্ববিধ নাগরিক অধিকারের উৎস। কিন্তু নাগরিক অধিকার রক্ষার ভার সরকারের উপর। তাই নাগরিকগণের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না—অভিযোগ হইল সরকারের বিরুদ্ধে।

৭। রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহা একটি ধারণা মাত্র। সরকার হইল রাষ্ট্রের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকাশ—১। নগর-রাষ্ট্র, ২। সাম্রাজ্য, ৩। সামন্ত রাষ্ট্র, ৪। জাতীয় রাষ্ট্র ও ৫। বিশ্ব-রাষ্ট্র।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

(Theories about the Origin and Nature of the State)

উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মত—কোন্ সময়ে বা কি পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত। কোন পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী যে রাষ্ট্রের গঠনকার্য হইয়াছে ইতিহাসও এরূপ সাক্ষ্য দেয় না; সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন লেখক রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিতে গিয়া বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের কোনটিকেই একক সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। যে সমস্ত চিন্তাশীল লেখক রাষ্ট্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন। প্রথমটি হইল, দর্শনমূলক পদ্ধতি ও দ্বিতীয়টি হইল, ঐতিহাসিক পদ্ধতি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে আমাদের উপরি-উক্ত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রথমোক্ত পদ্ধতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে; যথা, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি—মতবাদ; বলপ্রয়োগে বিজয় ও অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—মতবাদ, সামাজিক চুক্তি—মতবাদ। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দুইটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে; যথা, পরিবারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—মতবাদ ও ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—মতবাদ।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি অথবা রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি—মতবাদ (Theory of Divine Origin of the State)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতবাদে

বলা হয়, ভগবান্ স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করেন। বিধাতার অভিপ্রায় মানবসমাজে রাজার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এই মতবাদের চারিটি উপ-সিদ্ধান্ত আছে। প্রথমতঃ, একমাত্র রাজতন্ত্র হইল ঈশ্বরানুমোদিত পদ্ধতি অর্থাৎ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য স্বয়ং ভগবান্ রাজাকে মনোনীত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী। তৃতীয়তঃ, রাজা তাঁহার কার্যের জন্য একমাত্র ভগবানের নিকট দায়ী, কোন পার্থিব শক্তির নিকট দায়ী নহেন। চতুর্থতঃ, প্রজাসাধারণের একমাত্র কর্তব্য হইল বিনা বিচারে রাজ-আজ্ঞা পালন করা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই মতবাদটি অতি প্রাচীন। ভারত, মিশর, চীন প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশসমূহে অতি পুরাকাল হইতে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক বা রোমকগণ এই মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন নাই। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ক্রমশঃ লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। মধ্যযুগে যখন ধর্মগুরু পোপ ও রাষ্ট্রনায়ক সমাজের মধ্যে সর্বাধিনায়কত্ব লইয়া বিরোধ শুরু হয়, সেই সময়ে পোপ এই মতবাদটির বলে নিজ অবাধ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজার সমর্থকগণ রাজাকেই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে পোপের সমর্থকগণ পোপকেই ঈশ্বরানুমোদিত প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে জনসাধারণকে অনুরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অবশ্য পোপের পরাজয় ঘটিল। পোপের ক্ষমতার অবসান ঘটিলে রাজা নিজ ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারের ফলে গণতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদ প্রয়োগ করা হয়। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া রাজার কাহারও নিকট দায়ী হওয়ার প্রশ্ন ছিল না। এই মতবাদটি ইংরাজ লেখক স্যার রবার্ট ফিল্মারও সমর্থন করেন। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্স্ এই মতবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি এই মতবাদ সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তকও রচনা

করেন। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও এই মতবাদ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই তিনটি দেশের শাসকগণ মিলিতভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাবৃন্দের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ভগবানের আদেশে এক পবিত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এক তিব্বত দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে এই মতবাদটি আর কার্যকর ছিল না। অধুনা নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা চলে না। এই রাষ্ট্রের ভিত্তি ইসলাম ধর্মের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী একমাত্র মুসলমান ব্যতীত কোন অ-মুসলমান নাগরিক এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন না। সামাজিক চুক্তি—মতবাদটির আবির্ভাবের ফলে এই বহু প্রাচীন মতবাদটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

সমালোচনা—এই মতবাদটির বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান। মানুষ নিজ ইচ্ছানুসারে ও নিজের সুবিধার জন্য ইহার সৃষ্টি করিয়াছে। ভগবান্ এ সমস্ত পার্থিব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ শুধু রাজতন্ত্র সমর্থন করে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিদ্বারা শাসিত রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ আলোকসম্পাত করিতে পারে না। বর্তমান যুগে রাজতন্ত্র একরূপ বিলোপের পথে। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থার যে নব নব রূপ বর্তমান রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায়, এই মতবাদের ভিত্তিতে সেগুলির উৎপত্তির বিচার সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, এ মতবাদটির পরিণতি অতি বিপজ্জনক ও কার্যতঃ দেখা গিয়াছে যে-সমস্ত রাজা এই মতবাদের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা ভগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধি এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেক শাসক প্রজার ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া স্বীয় ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে প্রজার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। রাজাকে ভগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও অত্যাচারী শাসকের অস্তিত্ব এই মতবাদদ্বারা সমর্থিত হয় না। কারণ, ভগবান্ হইলেন সর্বমংগল-বিধায়ক ও সর্ববিধ গুণের আকর। সুতরাং যিনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করিবেন তিনি

কখনই জনসাধারণের অহিত করিতে পারেন না। ফলে, এই মতবাদ শাসকবর্গকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের অবসান (Decline of the Divine Right Theory)

নানাকারণে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে আর কেহ এই মতবাদে বিশ্বাস করে না। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ অবসানের প্রধান কারণ হইল সামাজিক চুক্তি মতবাদের আবির্ভাব। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি মনুষ্য-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রচার করিল এবং এই প্রচারের ফলে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তি ও অতি-মানবীয় রূপ পরিবর্তিত হইল। দ্বিতীয়তঃ, 'রিফরমেশন' আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের মনে মধ্যযুগীয় ধর্মসম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। ইহার ফলে পোপের অবাধ ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া শাসক-গণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। শাসনব্যাপারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার ফলে রাষ্ট্র ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান হইতে জাগতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। তৃতীয়তঃ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার ও প্রসারের ফলে জনসাধারণের উপর ধর্মের বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত জনসাধারণ ক্রমশঃই রাষ্ট্রকে একটি মনুষ্যসৃষ্ট জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিল।

মূল্য-নির্ধারণ (Evaluation of the Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ে এই মতবাদে অধুনা কেহই আস্থা স্থাপন করে না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে. এই মতবাদটি কোন কোন বিষয়ে মানবসমাজে প্রভূত হিতসাধন করিয়াছিল। বর্তমানযুগে অসার ও অনুপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও যে যুগে এই মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে যুগে ইহার কার্যকারিতা ও প্রভাব অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, প্রাচীনকালের মানুষ বর্তমান যুগের মানুষের মত সুসংবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত ছিল না। সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি হইল আইন-শৃংখলা মানিয়া চলিবার কর্তব্যবুদ্ধি। এই বুদ্ধি যখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয় তখন অন্য উপায়ে এই বুদ্ধি সমাজদেহে

সম্প্রসারিত করিতে হয় নতুবা সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন অচল হইয়া যায়। রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি ও রাজা ভগবানের মনোনীত প্রতিনিধি—এই বিশ্বাস রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন সমাজে প্রচার করিয়া এই মতবাদটি রাষ্ট্রগঠনের প্রথম যুগে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। প্রজারা রাজাকে ঈশ্বরের দূত মনে করিয়া তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিত। এইরূপে অন্ধ-বিশ্বাসের মধ্য দিয়া মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তি মধ্যযুগীয় ধর্ম-ব্যবস্থার নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পার্থিব ব্যাপারের নিয়ামক-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। রাজনীতি, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রথম আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল। এই মত-বাদের সহায়তায় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হইল। সুতরাং এই মতবাদ হইতে বর্তমান গণতন্ত্রের সূত্রপাত হইল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের একটা অন্তর্নিহিত সত্য আছে যাহা যুগে যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একটা নৈতিক উদ্দেশ্যও আছে। জন-সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই নৈতিক বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া যদি শাসকগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। এই মতবাদের আরও একটি সত্য হইল যে, শাসকবর্গ যদি মনে করেন যে, আইনের কাছে দায়িত্ব ছাড়াও তাঁহাদের অতিরিক্ত একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা উন্নততর হয়।

পরিবারের ক্রমসম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ

(ক) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal Theory)

এই মত অনুসারে রাষ্ট্রকে পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ বলিয়া মনে করা হয়। কতকগুলি পরিবারকে লইয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া জাতি এবং অবশেষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পারিবারিক সংগঠনের ক্রমিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—এই মতবাদের মূল কথা হইলেও

পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। স্যর হেনরি মেইনের মতে আদিম মানব পরিবারগুলি পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) ভিত্তিতে গঠিত ছিল। এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলি হইল প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন এবং এই সংগঠনের কর্তা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। ইনি পিতৃশ্রেষ্ঠ (Patriarch) রূপে পরিচিত ছিলেন ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির উপর ইহার অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। পরিবারের মধ্যে ইনি ছিলেন সর্বময় কর্তা ও সমগ্র পরিবার ইহার নির্দেশে পরিচালিত হইত। পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া যখন গোষ্ঠীতে পরিণত হইল তখন সেই গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হইতেন গোষ্ঠীপতি। এইরূপে কতকগুলি গোষ্ঠী মিলিত হইয়া কালক্রমে রাষ্ট্রে পরিণত হয় ও পিতৃশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের পদে অভিষিক্ত হন। সুতরাং পিতৃশ্রেষ্ঠের নেতৃত্বে একদিন যে পরিবার সংগঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই বর্তমান রাষ্ট্রের অঙ্কুর নিহিত ছিল বলিয়া এই মতবাদে ধরা হয়।

স্যর হেনরি মেইনের বহু পূর্বে অ্যারিস্টট্‌ল্ পরিবার হইতে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। স্যর রবার্ট ফিল্‌মার এই মতবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

সমালোচনা (Criticism)—ম্যাক্‌লীনান, মর্গান প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রাচীন রোম ও আরও কতিপয় দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলেও এই জাতীয় পরিবার সর্বদেশে প্রবর্তিত ছিল না। বহু দেশে বহু জাতির মধ্যে পরিবার গঠিত হইত মাতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে। বর্তমান যুগেও এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রবর্তিত আছে। তাহা ছাড়া, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের উদ্ভব হইয়াছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার উদ্ভবের বহু পূর্বে। অনেক লেখক আবার মেইনের মতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এমন অনেক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা পরিবার সংগঠন না করিয়া দলবদ্ধভাবে সমষ্টিগত জীবন যাপন করে। কাজেই পরিবারের পরিব্যাপ্তিতে যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে একথা বলা অভ্রান্ত সত্য হইতে পারে না।

(খ) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal Theory)

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সত্যতা মূলতঃ সমর্থন করিলেও পারিবারিক সংগঠনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ হইতে পৃথক্। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ প্রমাণ করিতে চায় যে, আদিম পরিবার-গুলি মাতৃশ্রেষ্ঠাকে (Matriarch) কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত হইয়াছিল। পুরুষের পরিবর্তে নারীই ছিল পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী। ম্যাক্‌লীনান, জেংকস্ প্রমুখ এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে মানবসমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে মাতাই ছিলেন সন্তান-সন্ততিদের রক্ষক ও অভিভাবক। নির্দিষ্ট পিতার অবর্তমানে মাতার পরিচয়ে সন্তান সন্ততিদের পরিচয় পাওয়া যাইত। সুতরাং মাতাকে কেন্দ্র করিয়া পরিবার গঠিত হইত। প্রাচীন গ্রীক ও জার্মান জাতিদের মধ্যে এরূপ মাতৃসম্বন্ধীয় জ্ঞাতি-নির্ণয় পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ভারতে মালাবারের নাইরদিগের মধ্যে এখনও পর্যন্ত এই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সংগঠনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

সমালোচনা (Criticism)—পিতৃকর্তৃত্বীয় পরিবারের মতবাদের মত মাতৃকর্তৃত্বীয় মতবাদ সম্পর্কেও একথা বলা চলে যে, এই মতবাদের সমর্থনে কোন ইতিহাস নাই। হেনরি মেইনের মতবাদের সমালোচনা করিয়া জেংকস্ বলিয়াছেন যে, পরিবার হইতে জাতির ক্রমপরিণতির যে মতবাদ মেইন প্রচার করিয়াছেন, কার্যতঃ দেখা যায় যে, পরিণতি হইয়াছে ঠিক বিপরীত দিক হইতে। জেংকসের মতে প্রথম ও আদি দল ছিল জাতি (Tribe), এই জাতি ভাঙ্গিয়া কতকগুলি উপজাতির (Clan) সৃষ্টি হয়, উপজাতি ভাঙ্গিয়া কতকগুলি গোষ্ঠী হইল ও অবশেষে গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া বহুসংখ্যক পরিবারের সৃষ্টি হইল। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে ব্যক্তি একক ও নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি আবার সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সমাজগঠনের প্রাথমিক উপাদান হইয়া দাঁড়াইল।

রাষ্ট্র পরিবার-সম্প্রসারণের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে এই মতবাদ হইতে রাষ্ট্র উৎপত্তির একটা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। পারিবারিক সংগঠন ও পিতৃশ্রেষ্ঠ অথবা মাতৃশ্রেষ্ঠার কর্তৃত্ব আত্মীয়তা-বন্ধনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ যে বন্ধনের ভিত্তিতে এক সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে সংগঠিত হয়, তাহা পারিবারিক বন্ধন অপেক্ষা

শুধু পৃথক নয়, আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জ্ঞাতিত্ব বা স্বগোত্রীয় বন্ধনের ক্রমপরিণতিই যে রাষ্ট্র-উদ্ভবের একমাত্র কারণ একথা বলা সমীচীন নয়।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত যে মতবাদগুলি প্রচলিত আছে, বলপ্রয়োগ মতবাদ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্র সম্বন্ধে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা এই মতবাদে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই মতবাদ একটা নির্দিষ্ট অভিমত দেয়; দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও এই মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই মতবাদের সারমর্ম হইল যে, শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতিকে শারীরিক শক্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করিয়াছে। এই মতবাদে মানবচরিত্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক কলহপ্রিয়তা ও ক্ষমতালাভের প্রবণতা আছে তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সত্য বটে যে, মানুষ একদিকে সামাজিক জীব, কিন্তু সমাজে বাস করিয়াও মানুষ তাহার আদিম ও স্বাভাবিক কলহপ্রিয়তা ও ক্ষমতালিপ্সার প্রবৃত্তি জয় করিতে পারে নাই। তাই কি ব্যক্তিগত জীবনে কি সংঘবদ্ধ জীবনে মানুষ এই প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুর্বলের উপর তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। এই প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষাই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের অন্যতম কারণ। প্রাচীন মানবসমাজ নানা গোষ্ঠী, দল ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীপতি বা দলপতি নিজের অনুচরদের পূর্ণ আনুগত্য ও সক্রিয় সহযোগিতার বলে অন্য দলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিত। এইরূপে যখন কোন দলপতি তাহার অনুচরদের সাহায্যে যথেষ্ট আয়তনের কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাসনকার্য আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। সুতরাং যুদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের একটা প্রধান উপায়।

'জোর যার মুল্লুক তার,' Might is right,' 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'— 'None but the brave deserves the fair,' প্রভৃতি প্রবাদবচনগুলি

সব দেশেই প্রচলিত আছে ও এইগুলি, রাষ্ট্র যে তাহার অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়ে অপরিহার্যরূপে বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য দেয়।

বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হইলেই বলপ্রয়োগের কার্যকারিতার অবসান ঘটে না। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যও বলপ্রয়োগ প্রয়োজন। দুর্বল বা অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বিজিত লোকজন সুবিধা পাইলে বিজেতার অধীনতাপাশ হইতে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, সেজন্য বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা সব সময়েই রাখা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলারক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষাকল্পে সব বিজেতাকেই পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ভিত্তি, সম্প্রসারণ ও অস্তিত্ব পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ধারণা করা হয়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিশ্লেষণ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্ণয় করিতে এই মতবাদ বহুদিন পূর্ব হইতে প্রবর্তিত আছে। কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই মতবাদ ব্যবহার করিয়াছেন। মধ্যযুগে খৃষ্টধর্মের মহিমা ও অবাধ প্রতিপত্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ধর্মযাজকগণ এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, রাষ্ট্রশক্তি পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর পোপের ক্ষমতা ঈশ্বরানুমোদিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরাও এই মতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বিরোধী অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়া রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চান। প্রকৃতির বিধানানুযায়ী জীবন-সংগ্রামে একমাত্র যোগ্যতমেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। রাষ্ট্র দুর্বলকে সাহায্য করিয়া জীবনযুদ্ধের ক্ষেত্র সংকুচিত করে ও তদ্দ্বারা প্রকৃতির বিধান কার্যকর হইতে বাধা দেয়। সমাজতন্ত্রবাদী মতের একদল উগ্র সমর্থক বলেন যে, রাষ্ট্র মূলতঃ পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র পশুবল প্রয়োগ করিয়া দুর্বল শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণপূর্বক ধীরে ধীরে তাহাদের ধ্বংস সাধন করিতেছে। কার্ল মার্ক্স, লেনিন প্রমুখ উগ্র সমাজতন্ত্রবাদিগণের মতে রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিলীন হইয়া যাইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একদল জার্মান দার্শনিক এই বলপ্রয়োগনীতির এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে একমাত্র রাষ্ট্রই হইল শক্তির

নিদর্শন ও বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়। তাঁহারা জগৎ জুড়িয়া জাতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি পরিব্যাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগনীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য নীতি বলিয়া মনে করিতেন। রাষ্ট্র-জীবনদর্শনে এই নীতি কার্যকরী হওয়ার ফলে জার্মান জাতিকে বহুবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত মারাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে।

সমালোচনা—রাষ্ট্রগঠনে পশুবলের দান উপেক্ষণীয় নহে, এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও একমাত্র শারীরিক শক্তির দ্বারাই যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে একথা বলা যায় না। এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা বলপ্রয়োগ নীতিকে রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে না। এ সম্বন্ধে রুশো বলেন, যে অধিকার পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে অধিকারেরও অবসান ঘটে। ইতিহাসের ঘটনাবলীতেও এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন রূপে রাষ্ট্রগঠনের সহায়তা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শারীরিক শক্তি যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইহা মনে করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, শারীরিক বলই রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান নহে। তৃতীয়তঃ, নৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই মত সমর্থনযোগ্য নহে। যে মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র সে উদ্দেশ্য কখনও সফল করিতে পারে না। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা যদি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠনই এই মহান্ আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, এই মতবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী। গণতন্ত্রের ভিত্তি জনমতের ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীতে বিশ্বাস করে; কিন্তু এই মতবাদ মানবচরিত্রের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু ক্ষুদ্রতার উপর গুরুত্ব দেয়। 'জোর যার মুল্লুক তার'—এই নীতি প্রযুক্ত হইলে শুধু যে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীভাব বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা লোপ

পাইবে। একমাত্র যুদ্ধদ্বারাই আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান হইবে। ফলে, মানুষের বহু যুগের কষ্টার্জিত সভ্যতা ও কৃষ্টি ধ্বংস হইয়া পৃথিবীতে এক অসহনীয় বন্য পরিবেশের সৃষ্টি হইবে।

উপরি-উক্ত সমালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বলপ্রয়োগ নীতি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু সমর্থনযোগ্য না হইলেও একথা মানিয়া লইতে হইবে যে, পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলি এই বলপ্রয়োগ-দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল ও বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলিও শেষ পর্যন্ত এই শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাহা না হইলে পুলিশ ও সেনাবিভাগ স্থায়িভাবে রাখিবার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না। সমস্ত রাষ্ট্রই এই দুইটি বিভাগের বিলোপ সাধন করিয়া রাষ্ট্রের ব্যয়সংকোচ দ্বারা অন্যান্য বহু জনহিতকর কায করিতে পারিত। আসল কথা হইল যে, রাষ্ট্রকে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ও বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষাকল্পে পশুবলের প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু সকলেরই রক্ষক ও পালক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনগণদ্বারা সমর্থিত হইবে। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। গণতন্ত্র আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সত্য আজ মানিয়া লইতে হইবে যে, জনসাধারণের সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লব,' ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের 'ফরাসী বিপ্লব' ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের 'রুশ বিপ্লব' স্বৈরাচীর রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের সমাধি রচনা করিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, জনসাধারণ শুধু শাস্তি বা পীড়নের ভয়ে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্বীকার করে তাহা নয়, স্বীকার করে এই কারণে যে, রাষ্ট্রের শক্তি জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত আইন অনুসারে জনসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হয়। তাই বলা হয় জনসাধারণের ইচ্ছা বা সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি—শক্তি নয় ("Will, not force, is the basis of modern state.")

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে এই মতবাদটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই মতবাদটি যে শুধু

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিচার করে তাহা নহে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিশ্লেষণেও এই মতবাদটি সহায়তা করে।

রাষ্ট্র একটি সামাজিক চুক্তির ফলে গঠিত হইয়াছে—ইহাই এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও মানুষের পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। এই মতবাদের সারমর্ম হইল যে, মানুষ একদিন সমাজগণ্ডির বাহিরে বাস করিত। সমাজগঠনের পূর্বে মানুষ এমন একটা অবস্থায় বাস করিত যেখানে মনুষ্য-প্রণীত কোন আইন-কানুন ছিল না। মানুষ নিজের ইচ্ছামত তাহার দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত করিত। রাষ্ট্র-উৎপত্তির পূর্বে মানুষের এই প্রাক্ সামাজিক অবস্থাটি 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' বা 'প্রকৃতির রাজত্ব' (State of Nature) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ ক্রমশঃই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। দুর্বলের উপর সবল অত্যাচার করিলে দুর্বলকে রক্ষা করিবার কোনরূপ আইনসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল না। তাই মানুষ তার আদিম জীবনযাত্রা-প্রণালী পরিবর্তন করিয়া সুসংবদ্ধ জীবনযাপনমানসে নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইল। চুক্তির ফলে মানুষ সমাজবদ্ধ হইল, রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিয়া রাষ্ট্ররূপ সংঘ গঠন করিল ও প্রকৃতির রাজত্বের অনিশ্চয়তার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিল।

এই মতবাদটি বহু প্রাচীন। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য এবং গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল্ প্রভৃতি এই মতবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত লেখকদ্বয় এই মতবাদটি যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন। রোমক লেখকগণ বিশেষ করিয়া পলিবিয়াস্ এই মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁহার মতে রাজার নির্দেশ জনসাধারণ আইন বলিয়া মান্য করে, তাহার কারণ রাজশক্তির উৎস হইল জনসাধারণ। রাজা জনসাধারণের প্রতিনিধি মাত্র। মধ্যযুগে রাজতন্ত্রবিরোধী লেখকগণদ্বারা এই মতবাদটি বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। তাঁহাদের মতে অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত এমন কি হত্যা করিবার অধিকারও প্রজাসাধারণের আছে। কেননা, জনসাধারণের প্রদত্ত ক্ষমতার বলেই রাজা বলীয়ান্ ও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে রাজাকে শাস্তি দিবার অধিকার জনসাধারণের আছে।

এইরূপে ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এই মতবাদ নানারূপে প্রচার করিয়াছিলেন। এই লেখকগণের মধ্যে ইংরাজ লেখক হব্‌স্ ও লক্ এবং ফরাসী লেখক রুশো এই মতবাদের সমর্থনকারী হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের পরেও জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল্ কান্ট ও ইংরাজ রাজনীতিবিশারদ বার্কও এই মতবাদের আলোচনা করেন। বর্তমান যুগে এই মতবাদটির আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতই হব্‌স্, লক্ ও রুশোর অভিমত লইয়া আলোচনা করিতে হয়, কারণ এই তিন ব্যক্তিই চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে—এই মতবাদটি বিশেষ গুরুত্বের সহিত প্রচার করিয়াছেন।

হব্‌সের অভিমত

'লেভিয়াথান্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হব্‌স্ তাঁহার চুক্তিবাদী মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মনুষ্যসৃষ্ট কোনরূপ আইন-শৃংখলা ছিল না—প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। 'জোর যার মুল্লুক তার'—এই নীতিদ্বারাই মানুষের অধিকার নির্ধারিত হইত। হব্‌সের মতে মানুষ স্বভাবতঃই অসদ্ ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ করে। তাহার নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই তাহার প্রধান প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে সব সময়েই পরিচালিত হইত। মানুষের জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মানুষ সব সময়ে পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠতর শক্তির বলে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিত। শ্রেষ্ঠতর শক্তি ছাড়া মানুষের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায় বাধা দিবার অন্য কোন পন্থা ছিল না। সুতরাং হবসের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে মানুষ এমন একটা বন্য অবস্থায় ছিল যেখানে তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালী একদল রক্তপিপাসু নেকড়ে বাঘের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনুরূপ ছিল। এইরূপ ভীষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল তখন তাহারা একযোগে মিলিত হইয়া এই ভয়াবহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে ইচ্ছুক হইল। তাহারা সকলেই প্রাকৃতিক পরিবেশে যে অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, সেই অবাধ স্বাধীনতা একটা পারস্পরিক চুক্তির

দ্বারা বিনা শর্তে, নিঃশেষে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া তাহাদের নিজেদের একজনের হস্তে সমর্পণ করিল। এই লোকটি সমাজে রাজা বলিয়া পরিচিত হইল ও সমস্ত লোকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইল। জনসাধারণের উপর তাহার অসীম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল।

হব্‌সের মতে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের দুর্বিষহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া একটা চুক্তি করিল—যে চুক্তির ফলে একজন শাসনকর্তার আবির্ভাব হইল। সুতরাং শাসক চুক্তির একটি পক্ষ নহে। মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া—তাহার হস্তে তাহারা তাহাদের তথাকথিত প্রাকৃতিক সমস্ত অধিকার বিনা শর্তে সমর্পণ করে। রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য অর্থাৎ জনগণের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এইজন্য প্রজাগণ রাজার নিকট কোন কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিবে না বা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারিবে না। সুতরাং হব্‌সের মতে রাজা প্রজার উপর কোনরূপ অবিচার করিতে পারেন না। অবিচার করার অর্থ হইল চুক্তি ভঙ্গ করা। রাজা কোনরূপ চুক্তি করেন নাই, কাজেই কোন চুক্তিদ্বারা তিনি বাধ্য নহেন। জনগণই নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে। সুতরাং প্রজাগণ যদি রাজার নির্দেশ অমান্য করে বা বিদ্রোহ করে, তাহা হইলে প্রজাগণই চুক্তিভঙ্গের দোষে দায়ি হইবে। আর যে চুক্তিদ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, সে চুক্তি ভঙ্গ করিলে পুনরায় প্রাকৃতিক পরিবেশের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফিরিতে হইবে। চুক্তিভঙ্গের ফলে সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বিকল হইবে।

উপরি-উক্ত যুক্তিদ্বারা হবস্ জনসাধারণের উপর রাজার অব্যাহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে রাজার আদেশই হইল আইন। সুতরাং তাঁহার মতবাদ দ্বারা তিনি স্বৈরাচার সমর্থন করেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী হব্‌সের এই মতবাদের উপর অনেক আলোকসম্পাত করিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন ও তাঁহার এই মতবাদ দ্বারা ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের যথেচ্ছ শাসন-ব্যবস্থার সমর্থন করেন। তাঁহার পুস্তকের নামকরণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'লেভিয়াথান্' শব্দটির অর্থ হইল অতিকায় সামুদ্রিক জীববিশেষ। এই জীবের শক্তিও অপরিসীম। চুক্তির দ্বারা যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার ক্ষমতাও এই সামুদ্রিক জীববিশেষের ক্ষমতার মত অবাধ ও অপরিসীম। হব্‌স্ এমন একটি মতবাদ প্রচার করিলেন, যে মতবাদ মানুষকে অতি নিকৃষ্ট স্তরের জীব বলিয়া চিত্রিত করিল। প্রাকৃতিক রাজত্বে মানুষ যখন বাস করিত তখন তাহার জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পাশব ও স্বল্পায়ু"। চুক্তির দ্বারা সামাজিক জীবন লাভ করিয়াও মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। প্রাকৃতিক পরিবেশের অরাজকতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মানুষ স্বৈরাচারী শাসনের নিষ্পেষণে পূর্ববৎ জর্জরিত হইতে লাগিল। হব্‌সের মতে একটিমাত্র চুক্তি দ্বারা সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি চুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনসম্মত রাজশক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন, কিন্তু যাহারা চুক্তি করিয়া এই রাজশক্তির সৃষ্টি করিল, সেই গণশক্তিকে তিনি অস্বীকার করিলেন। হব্‌স্ তাঁহার পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচনা করিয়াছিলেন।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হব্‌স্ যদিও তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্বৈরতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন তথাপি গণশক্তি যে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির উৎস তাহা বিশেষ গুরুত্বের সহিত বলিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিও জনসাধারণের ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হব্‌স্ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার পুস্তকে এই গণবিরোধী মতবাদ প্রচার কারয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ও বিশেষ করিয়া তাঁহার স্বদেশ ইংলণ্ডে অন্তর্বিপ্লব দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া লোকের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। হব্‌স্ এমন একটি রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে শক্তি স্বীয় ক্ষমতাবলে রাজনৈতিক বিবাদের অবসান ঘটাইয়া দেশে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করিতে পারে।

লকের অভিমত

জন্ লক্‌ও এই সামাজিক চুক্তি-মতবাদের বিশদ্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হব্‌স-প্রবর্তিত মতবাদের মূল সূত্রগুলির সহিত লকের মতবাদের মূল

সূত্রগুলির সাদৃশ্য থাকিলেও দেখা যায় যে, এই উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্।

লকের মতে রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে সমাজের বাহিরে এমন একটি অবস্থায় মানুষ বাস করিত, যে অবস্থাকে তিনিও প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রকৃতির রাজত্ব বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে লক্ প্রাক্-সামাজিক (Pre-social) যুগ না বলিয়া প্রাক-রাষ্ট্র (Pre-political) যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হইত। লকের মতে মানুষ স্বভাবতই দুর্বৃত্তপ্রকৃতি নহে। প্রাক্-রাষ্ট্র যুগে মানুষ যে স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, তাহা শুধু শ্রেষ্ঠতর শারীরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ন্যায়বোধ ও প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মানুষের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে সমস্ত মানুষই ছিল স্বাধীন ও সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার জন্য মানুষ বাধ্য হইয়া এই শান্তিময় প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সমস্ত অসংবদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত, সেগুলি সম্বন্ধে মতভেদ হইলে মীমাংসা করিবার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে দোষীকে শাস্তি দিবার নিরপেক্ষ কোন বিচারক ছিল না। তৃতীয়তঃ, বিচারব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্য কোন শাসন বিভাগও ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই অনিশ্চয়তা দূর করিয়া একটি বিধিসম্মত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন মানুষ উপলব্ধি করিল। এই উপলব্ধির ফলে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। তাহার পর তাহারা দ্বিতীয় চুক্তিদ্বারা একজনকে রাজা করিল। প্রথম চুক্তির দ্বারা একটি রাষ্ট্র গঠিত হইল ও দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা একটি সরকার—রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজার সহিত তাহাদের এই চুক্তি হইল যে, তিনি আইন প্রণয়ন করিয়া লোকের জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা বজায় রাখিবেন ও প্রজারা এই নিমিত্ত তাঁহার অনুশাসন মানিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে। লকের মতে রাজা চুক্তির একজন পক্ষ ও তিনি যতদিন চুক্তির শর্ত মানিয়া কাজ করিবেন ততদিন তিনি জনগণের সমর্থন পাইবেন। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে অর্থাৎ

স্বেচ্ছায় অথবা নিজের অক্ষমতাহেতু শাসনকার্য পরিচালনা করিতে না পারিলে তাঁহার রাজনৈতিক অধিকারও হারাইবেন। এই মতবাদদ্বারা লক্ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লব' সমর্থন করেন।

লক্ তাঁহার স্বদেশের ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার মতবাদটির ব্যাখ্যা করেন। হব্‌সের মত তিনি মানবচরিত্রকে এত নীচ প্রকৃতির বলিয়া মনে করেন নাই। লকের মতে পর পর দুইটি চুক্তি-দ্বারা রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু হব্‌স্ এবিষয়ে মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। লকের মতে মানুষ নিঃশেষে সমস্ত ক্ষমতা বিনা শর্তে সরকারের হস্তে অর্পণ করে নাই। জনসাধারণের হস্তেই শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে, যে ক্ষমতার বলে জনসাধারণ অন্যায়কারী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। লকের মতে আইন রাজার নির্দেশ নহে। আইনের উৎস হইল জনমত এবং এই জনমত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। সুতরাং লক্ তাঁহার মতবাদদ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। কিন্তু তিনি এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন যে, তাহার ফলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী হইয়া ওঠে। হব্‌সের মতবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে যেরূপ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, লকের পরিকল্পিত রাষ্ট্রে সেইরূপ সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়—সরকারের স্থায়িত্ব জনসমষ্টির খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে। হব্‌স গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তিতে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। লক্ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া গণশক্তিকেই সর্বশক্তির আধার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য হইল এই রাষ্ট্রশক্তি ও গণশক্তির মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজের রাজনৈতিক জীবনধারা অব্যাহত রাখা। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ফরাসী দার্শনিক রুশো এই মতবাদের ব্যাখ্যা করেন।

রুশোর অভিমত

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে রুশো তাঁহার 'কণ্ট্রাক্ট সোশ্যাল' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি-সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন। রুশোর এই সামাজিক চুক্তি-মতবাদ সম্বন্ধে

বলা হইয়াছে যে, তিনি হব্‌সের পদ্ধতিতে লকের মতবাদের সম্যক পরিবর্ধন করেন। তিনিও হব্‌স্ ও লকের প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানুষের জীবনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু তাঁহার মতে প্রকৃতির রাজ্যে ছিল আদর্শ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে কোনরূপ কলহ-বিবাদ ছিল না। তাহারা পরস্পরের সহিত পরম সুখে ও সম্প্রীতিতে জীবন যাপন করিত। মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ কোনরূপ কৃত্রিম বন্ধন বা বাধ্যবাধকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না। মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্ত জীবন যাপন করিত। প্রকৃতির রাজ্যের এই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে রুশো মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। এই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে তাহাদের নানারূপ সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন সমস্যাগুলির সমাধান করিবার প্রয়োজন হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রবর্তনের ফলে মানুষের আদিম সরলতা ও পূর্ণ সাম্য অন্তর্হিত হইল। যেদিন হইতে মানুষ এই সমস্ত সমস্যা-সমাধানের জন্য চিন্তা করিতে শিখিল, সেইদিন হইতে তাহাদের অধঃপতন হইল ("The man who reflects is corrupt")। মানুষ ক্রমে ক্রমে আপন-পর বিচার করিতে শিখিয়া স্বর্গরাজ্যের শান্তিময় ও পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতা-বিশিষ্ট জীবন হইতে বঞ্চিত হইল। ইহার ফলে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদবুদ্ধির আবির্ভাব হইল। শেষ পর্যন্ত এই ভেদবুদ্ধি মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকলহ ও নানারূপ নীচতার সৃষ্টি করিয়া মানুষকে হব্‌স্-বর্ণিত অসহনীয় প্রাকৃতিক অবস্থায় পর্যবসিত করিল। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত মানুষ নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। এই রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া মানুষ প্রাকৃতিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইল। সুতরাং এদিক দিয়া হব্‌স্-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রুশো-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে সাদৃশ্য রহিল।

রুশোর মতে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটিমাত্র চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হব্‌স্ বা লকের মতানুযায়ী তাহারা বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিল না। মানুষ নিজেদের মধ্যে এই মর্মে ঠিক করিল যে, তাহারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতা

প্রয়োগ করিত তাহা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ না করিয়া সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার নির্দেশের অধীনে সমর্পণ করিল। সমষ্টিগত এই ইচ্ছাকেই রুশো সাধারণ ইচ্ছা (General Will) আখ্যা দিয়াছেন। রুশো কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কতিপয় জনসমষ্টির উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ না করিয়া সমষ্টির এই সাধারণ ইচ্ছাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু রুশো-বর্ণিত এই সাধারণ ইচ্ছার সহিত হব্‌স্‌-বর্ণিত অবাধ রাজতন্ত্রের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। হব্‌সের 'লেভিয়াথান্‌' যেরূপ অসীম, চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী, রুশোর সাধারণ ইচ্ছাও তদ্রূপ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। রুশো রাজার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ না করিলেও যে সমষ্টিগত বা সাধারণ ইচ্ছায় ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা কার্যতঃ স্বৈরাচারী শাসকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, রুশো হব্‌সের মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

সাধারণ ইচ্ছা (General Will)—রুশো তাঁহার এই সমষ্টিগত সাধারণ ইচ্ছার নিজস্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ নিজেদের মধ্যে যে পারস্পরিক চুক্তি করে, সেই চুক্তির ফলে এই সাধারণ ইচ্ছার জন্ম। এই চুক্তির কোন দ্বিতীয় পক্ষ নাই। এই চুক্তির দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সমস্ত ক্ষমতা পরিহার করিয়া সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ করিল। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ক্ষমতাকে সমষ্টিগত ইচ্ছা বা ক্ষমতায় সমর্পণ করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা সাম্যনীতির অবসান ঘটিল না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নবগঠিত রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে যাহা সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা ফিরিয়া পাইল। চুক্তির দ্বারা ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া কেহই পরাধীন হইল না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চুক্তিদ্বারা গঠিত এই সমষ্টিগত ইচ্ছাতে রুশো সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন। এই ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য। একমাত্র সমষ্টিই প্রত্যক্ষভাবে এ-ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। রাষ্ট্রের মধ্যে সমষ্টির এই ইচ্ছা হইল চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। এই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল সমষ্টির মঙ্গলসাধন করা। সাধারণের মঙ্গলসাধন করা যে

ইচ্ছার উদ্দেশ্য নয়, সে ইচ্ছা সমষ্টিগত হইলেও তাহাকে রুশো সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া মনে করেন না। হব্‌সের মত তিনি এই সাধারণের ইচ্ছাকেই সর্বশক্তিময়, অবাধ ও অপ্রতিহত কর্তৃত্বের আধার বলিয়াছেন। যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার সংঘর্ষ হয় তাহা হইলে সাধারণের ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তি তাহার প্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ভ্রান্ত ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াছে ও এরূপ স্থলে সাধারণের ইচ্ছা বলপ্রয়োগদ্বারা ব্যক্তির উপর বলবৎ করা যাইবে। কারণ সাধারণের ইচ্ছা যে শুধু অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী তাহা নয়, ইহা সব সময়েই অভ্রান্ত ও সমষ্টির মঙ্গলবিধায়ক। সুতরাং রুশোর মতবাদ অনুসারে সরকারের কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই। সরকার সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনযন্ত্র মাত্র। সরকার সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশে সাধারণ ইচ্ছাপ্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

লাস্কি প্রভৃতি অনেক লেখক রুশোর এই মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বলিতে পারা যায় যে, কার্যতঃ এই সাধারণের ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংখ্যালঘিষ্ঠের কার্যতঃ কোন কর্তৃত্ব নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠেরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের কার্যে আপত্তি করিয়া বাধা দেয় তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠেরা তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছা জানে না বলিয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য করা যায়। ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতের বিরুদ্ধে বলা চলে যে, ইহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের সমর্থন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা হব্‌সের 'লেভিয়াথানের' মতই স্বৈরাচারী। তবে রুশোর কল্পিত চুক্তিতে রাজার কোন স্থান নাই। হব্‌সের মত তিনি রাজাকে অপ্রতিহত স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার সমর্থন করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হব্‌স্ ও লকের মতবাদের—রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা—সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে রুশো লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। লাস্কি বলেন যে, বর্তমান রাষ্ট্রজীবনে প্রত্যক্ষভাবে এই সাধারণ ইচ্ছা প্রয়োগ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব;

সমালোচনা—এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বহু সমালোচনা হইয়াছে। এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, চুক্তির দ্বারা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই গঠিত হয় নাই। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত মে-ফ্লাওয়ার চুক্তির নজির দেখাইয়া অনেক লেখক ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চুক্তির সম্পাদনকারীরা এই মতবাদে বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন দিনই বাস করেন নাই বা তাঁহারা চুক্তির দ্বারা কোন নূতন রাষ্ট্রও গঠন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে এক দেশ হইতে অন্য দেশে গিয়াছিলেন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অযৌক্তিকও বটে। সভ্যতার নির্দিষ্ট স্তরে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন আদিম মানব প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত তাহারা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এখানে তাহার প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Right) ছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও অধিকার প্রকৃতির রাজ্যে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কেন না প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন কোন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না যিনি মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া, চুক্তি বলবৎ করিতে গেলে আইনের প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক আইন কখনও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই মতবাদের মধ্যে গুরুতর অসংগতি দেখা যায়। চতুর্থতঃ, স্যর হেন্‌রি মেইন-এর মতে আদিম মনুষ্যসমাজগুলি জন্মগত অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন সমাজমধ্যে মানুষের পদমর্যাদা স্থির হইত জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে, চুক্তি বা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নয়। সেই অবস্থার বিবর্তনের ক্রমপরিণতি হইল চুক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা। সুতরাং চুক্তি হইল সামাজিক অগ্রগতির পরিণতির নিদর্শন, এই মত অনুযায়ী ইহার গোড়াপত্তনের নিদর্শন হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদে জনমতকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জনমত সব সময়ই যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জনমত যে সব সময়েই বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহাও নয়, পরন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তিহীন উত্তেজনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া জনমত

স্বৈরাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের ও দশের অনেক অনিষ্ট সাধন করে। ফরাসী বিপ্লবে ও রুশ বিপ্লবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর নামে যে সব অন্যায়, অবিচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দ্বারা অতি সহজেই অনুমেয় যে, জনমতের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র যে সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ষষ্ঠতঃ, এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি অংশীদারী কারবারের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়। অংশীদারী কারবার যেরূপ কতকগুলি লোক তাহাদের সুবিধার জন্য ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, রাষ্ট্রও সেইরূপ কতকগুলি লোকের খামখেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারেরা যে উদ্দেশ্যে কারবার গঠন করে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তদপেক্ষা বহু গুণে ব্যাপক ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ নাগরিক হইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই তাহার জীবনের বহুমুখী প্রবণতা সার্থকতা লাভ করে। পরিশেষে, এই মতবাদের বিরুদ্ধে ইহা বলা যায় যে, যদিও আদিম পিতৃপুরুষগণ একটা চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই চুক্তিদ্বারা উত্তরপুরুষদের বাধ্য থাকিবার কোন সংগত কারণ নাই। বর্তমান পার্লামেন্ট সভা আইন করিয়া যেমন ভবিষ্যৎ পার্লামেন্ট সভাকে সেই আইনের দ্বারা বাধ্য রাখিতে পারে না, সেইরূপ আইনের দৃষ্টিতে অতীত যুগে পিতৃপুরুষদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বর্তমান বংশধরদিগকেও বাধ্য করিতে পারে না।

মতবাদের মূল্য নির্ধারণ ও ইহার বাস্তব গুরুত্ব (Evaluation and Practical Importance of the Social Contract Theory)

এই মতবাদ অযৌক্তিক, বিপজ্জনক ও ইতিহাস দ্বারা আদৌ সমর্থিত হয় না, সুতরাং রাষ্ট্র উৎপত্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কে এই মতবাদ কোনরূপ নূতন আলোকসম্পাত করিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ হিসাবে পরিত্যক্ত হইলেও অন্যদিক দিয়া এই মতবাদের যথেষ্ট সার্থকতা আছে ও যে যুগে এই মতবাদ কার্যকর ছিল সে যুগে ও তৎপরবর্তী কালে এই মতবাদ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার

ভিত্তির উপর স্থাপিত—এই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মতবাদটি বর্তমান গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। কোন রাজশক্তি যে ঐশ্বরিক বিধান বা শক্তিবাদের উপর স্থায়ী হইতে পারে না, এই মতবাদ তাহাই প্রচার করিল। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ রাজার হস্তে অবাধ ও দায়িত্বহীন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া স্বৈরাচারের প্রবর্তন করে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ জনগণের ইচ্ছাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া প্রচার দ্বারা স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাইতে সাহায্য করে। এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, যাহার ফলে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারের অবসান হইয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বাণীর উৎসও হইল এই মতবাদটি। আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা দিয়াছিল এই মতবাদটি ও তদবধি আজ পর্যন্ত এই মতবাদটি নিপীড়িত মানবসম্প্রদায়কে আশার বাণী যোগাইতেছে। রাষ্ট্র কোন-একটা বাস্তব চুক্তিদ্বারা গঠিত না হইলেও এই পারস্পরিক চুক্তির ধারণা শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া এই মতবাদটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা আনিতে সক্ষম হইয়াছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া এই মতবাদ ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিতে সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-বিবর্তনের ইতিহাসে এই মতবাদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। বলপ্রয়োগনীতির অবসান ঘটাইয়া শাসক-শাসিতের সম্পর্ক স্থির করিয়া এই মতবাদটি লোকায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করিতে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ, এই মতবাদটিকে বর্তমান গণতন্ত্রের অগ্রদূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

চুক্তিবাদিগণ আধুনিক সার্বভৌমিকতা সংজ্ঞার রূপায়ণে সাহায্য করেন। হব্‌সের মতবাদের মধ্যে আইনগত সার্বভৌমিকতা ধারণার অংকুর দেখা যায় যাহা পরবর্তী কালে জন অষ্টিন সুষ্ঠুভাবে বিবৃত করেন। লক্‌ রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। আর রুশো লোকায়ত্ত সার্বভৌমিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। লক্‌ পরোক্ষভাবে ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতিও আলোচনা করেন যাহা পরবর্তী কালে ফরাসী লেখক মণ্টেস্কু বিশদভাবে আলোচনা করেন।

হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (Points of Agreement and Difference between Hobbes, Locke and Rousseau)

সাদৃশ্য—১। উপরি-উক্ত তিনজন লেখকই সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া শাসক-শাসিতের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

২। রাষ্ট্র জন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত—এ বিষয়েও তিনজন লেখক একমত।

৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের অনিশ্চয়তা ও অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ সম্মিলিতভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করে—এ বিষয়েও হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর মধ্যে একমত দৃষ্ট হয়।

৪। এই পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব—একথা তিনজন লেখকই সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিলেও এই তিনজন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই মতবাদের বিশ্লেষণ করেন। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ছিল বিভিন্ন। এইজন্য উপরি-উক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের মতবাদের মধ্যে মূলগত বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়।

বৈসাদৃশ্য—১। তিনজন লেখকই প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানব-জীবনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে তিনজন লেখকই তিনটি পৃথক মত পোষণ করিতেন ও সেইজন্য তিনটি পৃথক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ। তাঁহার মতে মানুষ স্বভাবতই দুর্বৃত্তপ্রকৃতি এবং সর্বদাই অন্যের ক্ষতিসাধন করিয়া স্বীয় ইষ্টসাধনে তৎপর। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বীয় শ্রেষ্ঠতর শক্তি ব্যতীত অধিকার রক্ষা করিবার জন্য কোনপ্রকার আইনসম্মত উপায় ছিল না। লক্‌ ও রুশো উভয় লেখকই রাষ্ট্র-উৎপত্তির পূর্বে প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখ করিয়াছেন। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা দুর্বিষহ হয় নাই। পরন্তু মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস করিত।

রুশো প্রাকৃতিক পরিবেশকে মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আদিম মানব প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব বজায় রাখিয়া বাস করিত। কিন্তু মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা ক্রমশই জটিলতর হইয়া মানুষের আদিম সরলতা ও সাম্যভাব দূরীভূত হইলে সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান দেখা দিল। এই ভেদ-বুদ্ধির আবির্ভাবের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের শেষ অধ্যায়ে মানুষ হব্‌স্‌-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের দুর্বিষহ অবস্থায় উপনীত হইল।

২। হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মনুষ্যকৃত কোন আইন ছিল না। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের জীবন পরিচালিত হইত। মানুষ অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী ছিল এবং অবাধ স্বাধীনতা প্রাকৃতিক পরিবেশে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা আনয়ন করিয়া মানুষের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিল। হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মানুষের প্রাক্-সামাজিক অবস্থা। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের জীবন পরিচালিত হইত। মানুষ স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারী ছিল। মানুষের জীবন হব্‌স্‌-বর্ণিত 'নিঃসঙ্গ, কদর্য, পাশবিক ও স্বল্লায়ু' ছিল না। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল প্রাক্-রাজনৈতিক অবস্থা। রুশোর মতেও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রথম পর্যায়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তাহাদের মধ্যে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ে সভ্যতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম হইয়া তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইল।

৩। হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়াবহ অনিশ্চয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের কয়েকটি অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইল। রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভয়াবহ অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল।

৪। হব্‌সের মত অনুসারে একটিমাত্র চুক্তিদ্বারা রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

লকের মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তি (Social Contract) দ্বারা

রাষ্ট্র গঠিত হয়। তৎপরে দ্বিতীয় একটি রাজনৈতিক চুক্তি (Political or Governmental Compact) দ্বারা সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি শাসনযন্ত্র (রাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত হয়।

হব্‌সের মত অনুসরণ করিয়া রুশোও বলেন, একটিমাত্র চুক্তিদ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ও তৎপরে জনসাধারণ আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের নিছক প্রতিনিধি হিসাবে একটি শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি করে।

৫। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হব্‌স্ রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। লক্ ও রুশো রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

৬। হবসের মতে মানুষের মধ্যে একটি একতরফা চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাজা চুক্তির কোন পক্ষ ছিলেন না—চুক্তির ফলেই রাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। লকের মতে রাজা হইলেন চুক্তির একটি পক্ষ। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর যে দ্বিতীয় চুক্তি হয় তাহা রাজা ও প্রজার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

রুশোর মতে মানুষের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি হয়—ইহাতে রাজ-তন্ত্রের কোন স্থান নাই।

৭। হবসের মতে মানুষ বিনা শর্তে নিঃশেষে তাহাদের সমুদয় ক্ষমতাই রাজতন্ত্রে সমর্পণ করে—এমন কি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকারও তাহারা সমর্পণ করে।

লকের মতে মানুষ শর্তসাপেক্ষে রাজার হস্তে আংশিকভাবে তাহাদের কতিপয় অধিকার সমর্পণ করে। কিন্তু বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা তাহারা নিজ হস্তে রাখে।

রুশোর মতে মানুষ কোন রাজতন্ত্রে অধিকার সমর্পণ না করিয়া তাহাদের সমবেত সাধারণ ইচ্ছার (General Will) হস্তে অধিকার সমর্পণ করে।

৮। হব্‌সের মতে রাজা (সরকার) চুক্তির পক্ষ না হওয়ার জন্য জনসাধারণের রাজার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাজতন্ত্র একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বিনাশ নাই। জনগণের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার নাই—কারণ জনগণ, নিঃশেষে বিনাশর্তে সমুদয় ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া রাজতন্ত্রে সমর্পণ

করিয়াছে। সুতরাং রাজার বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হইল চুক্তি ভঙ্গ করা. আর চুক্তিভঙ্গের ফলে রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র বিকল হইলে মানুষকে পুনরায় প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

লকের মতে যেহেতু রাজা চুক্তির একটি পক্ষ, সেইহেতু তিনি চুক্তির শর্ত-দ্বারা বাধ্য। তাঁহার মতে রাজা অক্ষমতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চুক্তি ভঙ্গ করিলে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার আইনসঙ্গত অধিকার জনসাধারণের আছে। সুতরাং বিদ্রোহ দ্বারা সরকারের পরিবর্তন হইলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে।

রুশোর মতেও সরকার চুক্তির পক্ষ নহে—সুতরাং চুক্তি বা সার্বভৌম ক্ষমতার সহিত সরকারের কোন সম্পর্ক নাই। লোকায়ত্ত সার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

৯। হব্‌সের মতে চুক্তিদ্বারা বহু ব্যক্তি এক ব্যক্তির হস্তে (রাজার) বা একটি সংসদের হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করে।

লকের মতে জনগণ আংশিকভাবে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

রুশোর মতে চুক্তির পূর্বে মানুষ সাম্যের অধিকারী ছিল ও চুক্তিদ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া মানুষই তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। রুশোর মতে জনগণের সমবেত সাধারণ ইচ্ছার হস্তে ক্ষমতা সমর্পিত হইল ও এই সাধারণ ইচ্ছার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রত্যেক মানুষ ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরও স্বাধীন ও সমান রহিল।

১০। হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বৈরাচার সমর্থনের প্রয়াস পান।

লক্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লব' সমর্থন করেন।

রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেন।

১১। হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা সার্বজনীন সার্বভৌমকে উপেক্ষা করিয়া আইনানুগ সার্বভৌমত্বে সমুদয় ক্ষমতা আরোপ করেন—ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়।

লক্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা সার্বজনীন সার্বভৌমত্বে সমুদয় ক্ষমতা আরোপ

করিয়া আইনানুগ সার্বভৌমকে উপেক্ষা করেন। ফলে, শাসনযন্ত্র দুর্বল ও অস্থায়ী হয় এবং জনসাধারণের খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হয়।

রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহার মতবাদ সফল হয় না।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব হ্রাস (Decline of the Social Contract Theory)

প্রত্যেক রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সমসাময়িক অবস্থার বিশেষ প্রয়োজন মিটাইতে নতন নূতন মতবাদের সৃষ্টি হয় এবং প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন মতবাদের পরিবর্তে নূতন মতবাদের জন্ম হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ ও বলপ্রয়োগ মতবাদ দুইটিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সামাজিক চুক্তি মতবাদের আবির্ভাব হয়। কিন্তু মানুষের চিন্তাধারা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক চুক্তি মতবাদও একসময়ে অলীক ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে সমস্ত কারণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান পদ্ধতি আবিষ্কার হইল প্রধান। গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষ কল্পনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মানুষের যে সকল মনঃকল্পিত ধারণা ছিল তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। ফলে, রাষ্ট্র সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে যখনই এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রযুক্ত হইল তখন কল্পনাসাহায্যে গঠিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইল।

দ্বিতীয়তঃ, ডারউইন-প্রবর্তিত বিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) আবির্ভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে এই বিবর্তনবাদ গৃহীত হইল। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক্ষেত্রেও এই মতবাদ প্রয়োগ করিয়া বলা হইল, রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল। কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিনে বা একটি উপাদানের

সাহায্যে রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। সুতরাং বিবর্তনবাদ আবির্ভাবের ফলে কষ্ট-কল্পিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব হ্রাস পাইল।

তৃতীয়তঃ, পরবর্তী কালে যখন গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ (Theory of Popular Sovereignty) স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সামাজিক চুক্তি মতবাদের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিল না। কারণ, সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাহায্যে যে সত্য অস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ সে সত্যকে স্পষ্টতর ও অধিকতর শক্তিশালী করিয়া প্রকাশ করিল।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও গণতন্ত্রের অভ্যুদয় (Social Contract Theory and Democracy)

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুইটি হইল গণতন্ত্রের মূলকথা। সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সমাজ-জীবনে অপরিহার্য। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার স্থায়িত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা ও সাম্য সামাজিক চুক্তি মতবাদেরই পরিণতি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদে বলা হয় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের মূল কথা সামাজিক চুক্তি মতবাদের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এই মতবাদ ব্যক্তির ন্যায়সংগত অধিকার-গুলির রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবও পরোক্ষভাবে এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বাধীনতা ও সাম্যের এই বাণী যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নিপীড়িত জনসাধারণের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপর

প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। লকের মতবাদ গ্রহণ করিয়া আমেরিকার বিপ্লবিগণ বলেন যে, মানুষ তাহার প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ বিশেষ করিয়া সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যে সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে, সে সরকার কখনই তাহাদের বিনা সম্মতিতে তাহাদিগকে প্রাকৃতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, লক্ স্পষ্টভাবে সরকারের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে সরকার হইল জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সরকারের কাজ জনসাধারণের ইচ্ছা ও সম্মতির দ্বারা পরিচালিত হইবে। সরকার আইন অনুসারে শাসন পরিচালনা করিবে এবং বে-আইনী কাজ করিলে জনসাধারণ আইনভঙ্গকারী সরকার বাতিল করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারিবে। আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হইল: জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গণতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শাসন ও আইন-প্রণয়ন কার্যের পৃথকীকরণ। লক্ তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে এই বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছাকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির আধার বলিয়াছেন। তিনি বলেন শাসন-ব্যবস্থা যখন সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আত্মশাসন বলা হয়। রুশো জনসাধারণের সম্মতিকেই শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে সরকার হইল সমাজের প্রতিনিধিমাত্র এবং সরকার যতদিন সমাজের আস্থাভাজন থাকে ততদিন কাজ করে। কিন্তু রুশোর এই গণতন্ত্রও সমষ্টির স্বৈরাচার দোষে দুষ্ট।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রচারক হব্‌স্ গণতন্ত্র-বিরোধী ছিলেন। হব্‌স্ রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থাকে অভিন্ন করিয়া স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিদ্বারা যে শাসন-ব্যবস্থা গঠিত হয় তাহাতে হব্‌স অসীম ও অবাধ ক্ষমতা আরোপ করিয়া ব্যক্তি-

স্বাধীনতার সমাধি রচনা করেন। তবে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এমন কি চরম স্বৈরতন্ত্র সমর্থক হব্‌স্‌ও বলেন যে, রাজার অসীম ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল জনগণ যাহারা চুক্তি দ্বারা বিনাশর্তে নিঃশেষে পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া রাজতন্ত্রে ক্ষমতা সমর্পণ করে। সুতরাং হব্‌সের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদও গণতন্ত্রের অভ্যুদয়ে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (**Historical or Evolutionary Theory**)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। কোন উপাদানই একক রাষ্ট্র গঠন করে নাই। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য গার্ণার বলিয়াছেন। তিনি সকল রকম মতবাদ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নহে, অথবা পশুবলের ফল নহে, পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা বা পরিবারের সম্প্রসারণদ্বারাও ইহার সৃষ্টি হয় নাই। রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমপ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। গঠনের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের সূত্রপাত হইয়াছিল অতি সাধারণভাবে, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ইহা ক্রমশই জটিলতর হইতে লাগিল।

রাষ্ট্রের সূত্রপাত কিভাবে হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তবে বর্তমান যুগে জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রের আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্র গঠনের কয়েকটি অপরিহার্য উপাদান এবং এই দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। এইজন্য ঐতিহাসিক মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রথমতঃ, মানুষ সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়।

ষের এই সমষ্টিগতভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধ্যেই রাষ্ট্রগঠনের বীজ আছে। রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব য়াছে। আদি সমাজে **রক্তসম্পর্কের বন্ধন** (Kinship) মানুষকে বার বা গোষ্ঠীতে একত্রিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পরিবার ও ষ্ঠী সম্প্রসারিত হইয়া বৃহত্তর উপজাতি বা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। রূপে রক্তসম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষুদ্র পরিবার হইতে বৃহত্তর ও জটিলতর তর উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালে **ধর্মের বন্ধন** (Religion) রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ াযা করিয়াছিল। আদিম মানবজাতি নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধামিশ্রিত র চক্ষে দেখিত। সমাজের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত চতুর ব্যক্তি নিজেদের নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া প্রচার য়া অন্য লোকগুলির উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিল। এই কগুলি সমাজের রক্ষক বা নেতা বলিয়া পরিচিত হইলেন। কালক্রমে ধর্মীয় সংগঠনগুলির সৃষ্টি হইল তখন ইহারা ফ্যারাও, পোপ বা খলিফা ধারণ করিয়া সমাজে ধর্মগুরুর পদমর্যাদা লাভ করিলেন। এইজন্যই া যায় যে, প্রাচীনকালের রাজারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মগুরু বলিয়াও চহিত হইতেন। বর্তমান যুগেও ইংলণ্ডের রাজা প্রচলিত ধর্মমহামণ্ডলের কর্তা (Head of the Established Church) বলিয়া পরিচিত। রূপে রাজনৈতিক চেতনা-উন্মেষের পূর্বে ধর্মই মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত ার ভাব জাগরিত করিয়া রাষ্ট্রের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে ক্ষা দিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের কোন এক স্তরে **পাশবিক বলের** (Force) কারিতার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। মানুষ যখন তাহাদের ভ্রাম্যমাণ ন পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের দলপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস আরম্ভ করিল তখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা সম্বন্ধে তাহারা তন হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে প্রবর্তিত হইলে এই সম্পত্তি ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনের জন্যই মানুষের আভ্যন্তরীণ ন্তি ও শৃংখলা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের ধন, মান ও াত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ফলে, প্রত্যেক সমাজে একজন

দলপতির উদ্ভব হইয়াছে আর এই দলের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত শারীরি শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। যুদ্ধকালে যিনি নেতা বা দলপ নির্বাচিত হইতেন শান্তির সময়েও তাঁহার কর্তৃত্ব কালক্রমে স্বীকৃত হই এইরূপে সামরিক প্রয়োজনে মানুষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ সুশৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

রাষ্ট্র-উৎপত্তির ইতিহাসে **'শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগি** **(Consent of the people)** বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্র করিয়াছিল। সমাজের কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল ও রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া, রাষ্ট্র যে জ গণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত—এই মতবাদ জনসমাজে প্রচ করিলেন। ফলে, জনসমাজ তাহাদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্ব সচেতন হইয়া উঠিল। এই রাজনৈতিক চেতনা (Political Consciou ness) জনসমাজে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র জনমতে ভিত্তিতে রূপায়িত হইল।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। জনসমাজে **জাতীয়তাবো** **(Principle of nationality)** যতই শক্তিশালী হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে জাতির দাবী স্বীকৃত হইয়া রাষ্ট্রগুলি 'একজাতি একরাষ্ট্র' ভিত্তির উপ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেইজন্য বর্তমান যুগে বিশালায়তন সাম্রাজ্যের পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নানাদি দিয়া পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কোন রাষ্ট্রের পক্ষে আর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহার স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা বজা রাখা সম্ভবও নয়, আর প্রয়োজনের দিক দিয়াও অপরিহার্য নয়। তাই এ শতাব্দী পূর্বের স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী রাষ্ট্র আজ তাহ নিজের ও পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদে (Internationalism) তাহ অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা অন্ততঃ আংশিকভাবে পরিত্যাগ করিয়া বৃহৎ মানব-গোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে।

অর্থনৈতিক কারণগুলিও (Economic Forces) রাষ্ট্রের বিবর্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-উদ্ভবের ফলে সম্পদে

পাদন, বিনিময় ও বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করা বর্তমান রাষ্ট্রের একটি শ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তিষ্ঠিত না হইলে কোন রাষ্ট্রই তাহার উদ্দেশ্য সার্থক করিতে পারে না। ! অর্থনৈতিক কারণে বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র হইতে ক্রমশঃই াজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র একদিনে একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। মানুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণা ও কার্য-রিতা জন্মিতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে হয়ত রিবারের মতন সহজ ও সরল সংগঠনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল, রপর রাজনৈতিক চেতনা-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপাদানের ভাবে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তবে একথা স্মরণ খিতে হইবে যে, রাষ্ট্রগঠনে এই বিভিন্ন উপাদানগুলি যে সব সময়ে পৃথকভাবে জ করিয়াছে তাহা নয়। রাষ্ট্রবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই উপাদানগুলি মলিতভাবেও রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করিয়াছে। মানুষ যতই সভ্য হইতেছে ট্রসম্বন্ধে তাহাদের ধারণাও ততই পরিবর্তিত হইয়া রাষ্ট্র আজ এক অভূতপূর্ব গঠনে রূপায়িত হইয়াছে। মানবজীবনে বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রভাব যে শুধু রপ্রসারী তাহা নয়, মানুষ আজ রাষ্ট্রকে সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ যা মনে করে। সুতরাং রাষ্ট্র-উৎপত্তি সম্পর্কে ডাঃ গার্ণার ও বার্জেসের ভমত প্রণিধানযোগ্য।

"The state is neither the handiwork of God, nor the result f superior physical force, nor the creation of resolution or onvention, nor a mere expansion of the family." (Garner)

এখন জিজ্ঞাস্য হইল যে, রাষ্ট্র যদি ঈশ্বর, পশুবল, চুক্তি বা পরিবার প্রসারণ দ্বারা সৃষ্ট না হয় তাহা হইলে ইহার উৎপত্তির উৎস কোথায়? ার্জেস এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন: "The state is a ontinuous development of human society out of grossly mperfect beginning through crude but improving forms of nanifestation towards a perfect and universal *organisation* of mankind." (Burgess)

রাষ্ট্র হইল মানবসমাজের দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের ক্রমোন্নত ফল।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

(Theories of the Nature of the State)

বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রকে একটি সামাজি প্রতিষ্ঠান বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন রাষ্ট্র এব ঐতিহাসিক বিবর্তন-প্রসূত সংগঠন মাত্র। নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণ রাষ্ট্রকে এব নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক সংগঠন বলিয়া বর্ণনা করেন। র বিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রকে শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি রাজনৈ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন, অপর পক্ষে ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্‌গণ রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন ও আইনসংগত অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি আই মূলক সংগঠন বলিয়া বিবেচনা করেন। উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রে দার্শনিকগণ তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত রাষ্ট্রে এরূপ গুণ ও উদ্দেশ্য আরো করিয়াছেন যাহাতে রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থিত হ এইরূপে বিভিন্ন চিন্তাধারার ফলে রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা মতবা সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে রাষ্ট্র সম্পর্কে কয়েকটি বিভিন্ন মতের আলোচনা ক হইল।

১। ইতালীয় দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্র' শব্দটি প্রব করেন। তিনি রাষ্ট্রকে শক্তি-ভিত্তিক বলিয়া বর্ণনা করেন। বার্নহা ট্রিস্‌কে প্রভৃতি জার্মান লেখকগণও রাষ্ট্রকে শক্তির একমাত্র ধারকরূপে ক করিয়া রাষ্ট্রে অবাধ ক্ষমতা আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের এই একম শক্তি-ভিত্তিক কল্পনা সমর্থনযোগ্য নহে। শক্তি রাষ্ট্র অস্তিত্বের একম ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, রাষ্ট্র-শক্তি যখন ন্য অধিকার রক্ষায় প্রযুক্ত হয়, একমাত্র তখনই তাহা সমর্থনযোগ্য।

২। আইনবিদ্‌গণ রাষ্ট্রকে আইন-প্রণয়ন ও ন্যায্য অধিকার রক্ষা করি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা করেন। কিন্তু এই মতবা বিরুদ্ধে বলা হয় যে, আইন-প্রণয়ন ও আইন-বলবৎ করা রাষ্ট্রের একমাত্র কর্ত নহে। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রের আরও বহু উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। সুত আইনবিদ্‌গণের এই মতবাদ ভ্রান্ত না হইলেও অসম্পূর্ণ।

৩। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রকে মানবজীবনের একটি অভিশাপরূপে গণ্য করেন এবং যতশীঘ্র রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত জীবনে অবাঞ্ছিতরূপে হস্তক্ষেপ দ্বারা ব্যক্তির স্বাভাবিক ও সাবলীল ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং রাষ্ট্রের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে এরূপ অতিরঞ্জিত বিরোধী মনোভাব কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কোন কোন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রমাণিত হইলেও এ যাবৎ ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্র যে সাহায্য করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

৪। বহুত্ববাদিগণ (Pluralists) বলেন, রাষ্ট্র সমাজস্থিত বহুবিধ সংঘের অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক সংঘ, ধর্মীয় ও সামাজিক অন্যান্য সংঘগুলির ন্যায় রাষ্ট্রও একটি সংঘ। প্রত্যেকটি সংঘের ক্ষমতা ইহার কার্যের আনুপাতিক হইবে। যেহেতু রাষ্ট্রের কার্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সেইহেতু রাষ্ট্রকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করা যুক্তিযুক্ত নয়। বহুত্ববাদিগণের মতে সমাজস্থিত অন্যান্য সংঘগুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিবার রাষ্ট্রের কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু বহুত্ববাদিগণের রাষ্ট্রবিরোধী এই চরম মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা না থাকিলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নহে। সামাজিক জীবনের এই ঐক্য ও শৃংখলা একমাত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি ও রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং সামাজিক জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব অপরিহার্য।

৫। কার্ল মার্কস্ প্রমুখ সমাজতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রকে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে সৃষ্ট একটি সংগঠন বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র-সংগঠনের সাহায্যে ধনী দরিদ্রকে এবং সবল দুর্বলকে শোষণ করে। সমাজে যে সম্প্রদায়ের হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সেই সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করে। সুতরাং শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। উপরি-উক্ত মতবাদ আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ, কোন কোন রাষ্ট্র হয়ত সময় বিশেষে শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও সব রাষ্ট্রকেই শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষক বলিয়া বিবেচনা করা সমীচীন

নহে। শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক রাষ্ট্র না বলিয়া বিকৃত রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল রাষ্ট্রই সাধারণ স্বার্থের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হয়।

৬। স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রে অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তিমানবকে উপেক্ষা করা হয়। এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতালীর একনায়ক মুসোলিনি স্পষ্টভাবে এই মতবাদ নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"সকলেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, কেহই রাষ্ট্রের বাহিরে নয়, কেহই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়।" ("All within the state, none outside the state, none against the state.") এই মতবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে, যে মতবাদ ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না, যে মতবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পায়, সে মতবাদ আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য বিফল হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র অস্তিত্বের কোন সমর্থন নাই।

রাষ্ট্র সম্পর্কে উপরি-উক্ত মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, কোন মতবাদই এককভাবে রাষ্ট্র অস্তিত্বের যুক্তিসম্মত সমর্থন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রশ্ন হইল তাহা হইলে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, রাষ্ট্র হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও চরম সংগঠন। এই সংগঠনের সাহায্যেই মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে পারে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল সত্যই বলিয়াছেন, 'আইন ও ন্যায়বোধ দ্বারা মার্জিত মানুষই হইল শ্রেষ্ঠ জীব। আর আইন ও ন্যায়বোধবিহীন মানুষ হইল নিকৃষ্ট জীব।' রাষ্ট্র মানুষের মধ্যে এই আইনানুগতভাব ও ন্যায়বোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সংগঠন কোন শ্রেণী-স্বার্থের ধারক নহে, ইহা সাধারণ স্বার্থের রক্ষক। সামাজিক অন্যান্য সংঘগুলির উদ্দেশ্য হইল সংঘগুলির সদস্যগণের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করা, অপর পক্ষে রাষ্ট্র হইল সার্বজনীন স্বার্থের প্রতিনিধি ও রক্ষক। সার্বজনীন স্বার্থের রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র সামাজিক

সমুদয় সংঘের পারস্পরিক সম্পর্ক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে সামাজিক জীবনে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিতে না পারে। বিরোধের অবসান ঘটাইয়া বহুর মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধনপূর্বক সার্বজনীন স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক যতই জটিল আকার ধারণ করিতেছে, সামগ্রিকভাবে সামাজিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই জটিল সম্পর্কের চরম নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে।

রাষ্ট্র মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য—এই গ্রীক মতবাদ গ্রহণযোগ্য না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র হইল সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট সংগঠন—একমাত্র যে সংগঠনের সাহায্যে সার্বজনীন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। মানুষের হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সুতরাং যে রাষ্ট্র এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম, সেরূপে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সমর্থন দূরের কথা, সে রাষ্ট্র ইহার নাগরিকগণের আনুগত্য বা বশ্যতার দাবী করিতে পারে না। পুলিশি রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে আজ কল্যাণ-ব্রতী রাষ্ট্রের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল ব্যক্তি নির্বিচারে প্রত্যেক মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা।

আইনমূলক মতবাদ (Juristic or Juridical Theory)

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আইন ছাড়া রাষ্ট্রের কোন পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা নাই। সুতরাং রাষ্ট্র হইল একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যকলাপ শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ।

আইনমূলক মতবাদ সম্পর্কেও বিভিন্ন শ্রেণীর আইনবিদ্‌গণ একমত নহেন। বিশ্লেষণমূলক শ্রেণীর আইনবিদ্‌গণের (Analytical Jurists) মতে রাষ্ট্রই হইল আইনের একমাত্র উৎস। রাষ্ট্রের কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা, ব্যাখ্যা করা ও আইন বলবৎ করা। যে আইন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত বা প্রযুক্ত হইবার নির্দেশ পায় নাই তাহা বিচার বিভাগ কর্তৃক আইনরূপে প্রযুক্ত বা কার্যকর হইতে পারে না। অপরপক্ষে ঐতিহাসিক

আইনবিদ্‌গণের (Historical Jurists) মতে রাষ্ট্রই আইনের একমাত্র উৎস হইলেও সব· আইনই যে রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ হইতে হইবে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন দেশে প্রচলিত চিরা-চরিত প্রথাগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ না হইলেও সর্বত্র আইন বলিয়া গণ্য হয়। ডুগুই প্রভৃতি লেখকগণ আইনকে রাষ্ট্রের উপরে স্থান দিয়া বলেন যে, রাষ্ট্র-জন্মের পূর্বেও আইনের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং রাষ্ট্র আইন-নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রের আইনের বিধান লংঘন বা অবহেলা করিবার কোন অধিকার নাই।

অনেক লেখক আবার রাষ্ট্রের আইনগত ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়াছেন। ব্যক্তির যেমন আইনগত অধিকার ও কর্তব্য আছে রাষ্ট্রেরও তদ্রূপ অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে পারে ও নিজেও অভিযুক্ত হইতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রের আইনমূলক ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব কল্পনা-প্রসূত—বাস্তব নহে। কারণ, রাষ্ট্রান্তর্গত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়া রাষ্ট্রের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা নাই।

জৈব মতবাদ (Organic or Organismic Theory)

সামাজিক চুক্তি প্রভৃতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক যে সমস্ত মতবাদ রাষ্ট্রের কৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সেই মতবাদগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একদল লেখক এই জৈব মতবাদ প্রবর্তন করেন। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহ বা উদ্ভিদ্‌দেহের সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতিগত ও গঠনগত সমতা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। জীবদেহের সজীবতা হইতে শুরু করিয়া জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যু, এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলই অনুরূপভাবে রাষ্ট্রদেহে দেখা যায়। এই সাদৃশ্যগুলি হইতে এই মতবাদে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, রাষ্ট্র প্রাণবন্ত জীবদেহের অনুরূপ একটি দেহী ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণবন্ত জীবের প্রকৃতির অনুরূপ।

রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিবার প্রয়াস মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রথম পর্যায় হইতে শুরু হইয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও রোমান দার্শনিক সিসারোর লেখার মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে

পাওয়া যায়। মধ্যযুগের মারসিগ্‌লিও, অকৃহাম প্রভৃতি দার্শনিকেরা এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তারপর সামাজিক চুক্তি-মতবাদের লেখক হব্‌স্‌ ও রুশো এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। হব্‌স্‌ রাষ্ট্রকে একটি অতিকায় সামুদ্রিক জীবের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার পুস্তকের নামকরণ করিয়াছিলেন 'লিভিয়াথান্‌'। রুশোর মতে জীবদেহের মত রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। সরকার হইল রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক, আর রাজস্ব হইল ইহার শোণিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই মতবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ববর্তী লেখকগণ রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহ বা উদ্ভিদ্‌দেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূপ একটি দেহী বলিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা সপ্রমাণিত করিবার প্রয়াস পান। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই মতবাদের উগ্র সমর্থকগণ রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান তাহা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন। জার্মানীতেই সর্বপ্রথম এই জৈব মতবাদ ইহার চরম রূপ পরিগ্রহ করে। জার্মান দার্শনিক ব্লুনৎস্লি এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। ব্লুনৎস্লির মতে রাষ্ট্র মানুষের প্রতিমূর্তি। তিনি রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রকে পুরুষ-প্রকৃতি ও ধর্মসংগঠনকে নারী-প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করেন। ইংরাজ দার্শনিক স্পেনসারের হস্তে এই মতবাদ পূর্ণ ও চরম রূপ পরিগ্রহ করে। স্পেনসার সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই মতবাদের বিশ্লেষণ করিয়া বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। স্পেনসার রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে শুধু সেগুলির উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, উভয়ের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য আছে সেগুলিরও উল্লেখ করেন।

সাদৃশ্য—রাষ্ট্র ও জীবদেহের পরস্পরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে: ১। জীবদেহ যেরূপ কতকগুলি জীবকোষ-দ্বারা গঠিত, রাষ্ট্রও সেইরূপ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। ২। জীবদেহের প্রত্যেকটি কোষ যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও সমস্ত কোষ সম্পূর্ণ দেহের উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ রাষ্ট্রভুক্ত মানুষও প্রথমতঃ পরস্পরের উপর নির্ভশীল ও দ্বিতীয়তঃ সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ৩। জীবদেহ ও রাষ্ট্র উভয়েরই জীবন

আরম্ভ হয় ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে। তাহার পর তাহারা একই নিয়মে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশঃই জটিল রূপ গ্রহণ করে। ৪। জীবদেহের কোন একটি কোষ বিনষ্ট হইলে সমস্ত দেহের যেরূপ কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এতদ্ব্যতীত হার্বার্ট স্পেনসার উভয়ের মধ্যে কতকগুলি গঠনগত সাদৃশ্যের অবতারণা করেন। ৫। তাঁহার মতে জীবদেহের যেরূপ শিরা-উপশিরা আছে, রাষ্ট্রদেহে তদ্রূপ যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। জীবদেহে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যেরূপ স্নায়ুব্যবস্থা আছে, রাষ্ট্রেদেহের বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তদ্রূপ সরকার আছে। ৬। রাষ্ট্র ও জীবদেহ উভয়েই ক্ষয়িষ্ণু। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে নূতন অংশ গঠিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলির স্থান পূরণ হয়। রাষ্ট্রেরও তদ্রূপ বৃদ্ধ, অকর্মণ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকের স্থান নবজাত ব্যক্তির দ্বারা পূরণ হয়।

সমালোচনা

জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি গঠনগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উভয়ের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কোন দুইটি জিনিসের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাহাদের অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই মতবাদের সমর্থকগণ যে সাদৃশ্যগুলির ভিত্তিতে উভয়কে অভিন্ন বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন সেই সাদৃশ্যগুলি শুধু বাহ্যিক, মূলগত নয়। জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একদিকে যেরূপ বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখা যায়, অপর দিকে সেইরূপ বহু মূলগত বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে এবং সেই বৈসাদৃশ্যগুলি এত সম্যক্ পরিস্ফুট যে, রাষ্ট্রকে কোন মতেই জীবদেহের অনুরূপ বলা চলে না।

১। প্রথম বলা যায় যে, জীবদেহের কোন একটি কোষকে জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক মানুষেরই একটা পৃথক্ সত্তা আছে ও রাষ্ট্রের বহির্ভূত হইলেও তাহার পৃথক্ সত্তা বজায় থাকে।

২। জীবদেহের কোষগুলির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—জড়বস্তুর মত তাহাদের কোন নিজস্ব বুদ্ধি বা পৃথক্ ইচ্ছা নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই

একটা স্বীয় বুদ্ধি বা পৃথক্ ইচ্ছাশক্তি আছে এবং এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই মানুষ স্বীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে।

৩। স্পেন্সার নিজেই বলিয়াছেন যে, জীবদেহের প্রত্যেকটি জীবকোষ পরস্পরের সহিত দৃঢ় সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু সমাজে মানুষ পরস্পরের সহিত জীবকোষগুলির মত দৃঢ় সম্বন্ধযুক্ত নয়। তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে।

৪। জীবদেহের চেতনা শুধু তাহার মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত আর রাষ্ট্রের চেতনা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত আছে।

৫। পরিশেষে বলা যায় যে, জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন জীবদেহ হইতে জন্মলাভ করিয়া আভ্যন্তরীণ শক্তির বলে প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে একথা বলা চলে না। অনেক রাষ্ট্র শক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং জীবদেহের জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর সঙ্গে রাষ্ট্রের জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। জীবদেহের পরিণতি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, কিন্তু রাষ্ট্রের বিনাশ নাও হইতে পারে।

অধিকন্তু এই মতবাদের অনেক সমর্থক রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান। ফলে রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়।

মূল্যনির্ধারণ ও কার্যকারিতা

বর্তমান যুগে এই মতবাদ, অসার, অলীক ও বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও ইহার কিছু অন্তর্নিহিত সত্য আছে ও সে সত্যকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। দেহের ন্যায় রাষ্ট্রও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির উপর নির্ভরশীল এবং এই বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির উৎকর্ষের উপর রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। মানবদেহের কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যেমন সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রের কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমগ্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দূষিত হয়। সুতরাং এই মতবাদে রাষ্ট্রভুক্ত জনগণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

এই মতবাদ দুইটি বিভিন্ন দিক্ দিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রথমতঃ, স্পেনসার প্রমুখ লেখকগণ এই মতবাদের

ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়। জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা ছাড়া রাষ্ট্রের আর করণীয় কিছুই থাকে না। অপর পক্ষে এই মতবাদ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ফলে, সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে। জার্মান দার্শনিকেরা এই মতবাদের ভিত্তিতে তাঁহাদের আদর্শবাদ প্রচার করিয়া রাষ্ট্রকে একটি অপৌরুষেয় প্রতিষ্ঠান ও সর্বশক্তির আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

আদর্শবাদ (Idealist or Absolute Theory)

রাষ্ট্র সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি হইল সম্পূর্ণ বাস্তবতাবর্জিত কল্পনা মাত্র। মানুষের কল্পনায় রাষ্ট্রের আদর্শ রূপ কি হইতে পারে এই মতবাদটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা করিয়া এক আদর্শ ভিত্তির উপর এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে এই মতবাদের জন্মদাতা বলা হয়। প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত 'রিপাবলিক্' গ্রন্থে এই মতবাদের ভিত্তিতে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন। এই রাষ্ট্র ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও মানুষ এই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাহার জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া পূর্ণ পরিণতির পথে চালিত করিতে পারে। প্লেটোর মত আদর্শবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিলেও অ্যারিস্টটল্ সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনিও রাষ্ট্রের এই আদর্শ-পরিণতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পিত রাষ্ট্র একেবারে বাস্তবতাবর্জিত কল্পনা মাত্র ছিল না।

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট, ফিচে ও বিশেষ করিয়া হেগেলের হস্তে এই মতবাদ এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করে। হেগেল রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র এক অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান ও এই প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়া একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে—যে ব্যক্তিত্ব সকল ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে। এই ব্যক্তিত্বের আবার একটা নির্দিষ্ট নৈতিক মান

রাছে। এই নৈতিক মানের মাপকাঠিতে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অধিকার ও সমস্ত প্রচেষ্টার পরিমাপ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের এই ব্যক্তিত্ব শুধু আত্মসচেতন নয়, ইহা সমস্ত কর্মপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টার উৎস। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বার্থ কখনই এই রাষ্ট্রের ইচ্ছার পরিপন্থী হইতে পারে না, কারণ রাষ্ট্র হইল সকল সভ্যতা, কৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও প্রচেষ্টার উৎস। রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করাই হইল জনগণের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য, কারণ রাষ্ট্রের এই অপ্রতিহত ক্ষমতা ভগবৎপ্রদত্ত।

হেগেলের শিষ্য বার্ণহার্ডি ও ট্রিট্‌স্‌কের হস্তে এই মতবাদ চরম পরিণতি লাভ করে। তাঁহারা রাষ্ট্রকে শুধু একটি অপরিসীম শক্তির আধার বলিয়া বর্ণনা করেন এবং এই শক্তির নিয়ত প্রয়োগদ্বারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধের দ্বারা করায়ত্ত করিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা রাষ্ট্রের এক মহান্ কর্তব্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে যুদ্ধ না করিলে রাষ্ট্রের পৌরুষের হানি হয়, সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী। অনেকে মনে করেন যে, এই আদর্শবাদী জীবনদর্শনের জন্যই জার্মান জাতি এতটা রাজভক্ত ও যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পর পর দুইটি মহাসমরে জার্মান জাতির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন রাষ্ট্রজয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও জার্মান জনসাধারণের নির্বিচারে রাষ্ট্রনির্দেশ পালন করিবার কর্তব্যবোধ প্রমাণিত হয়।

ইংলণ্ডেও আদর্শবাদী রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনা হয়। এই আলোচনা সম্পর্কে গ্রীন্, ব্রাড্‌লে ও বোসাংকের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ইহারা জার্মান আদর্শবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকের মতে রাষ্ট্র সর্বপ্রধান সংগঠন ও সর্বশক্তির মূল উৎস হইলেও ইহার কার্যক্ষেত্রের ও শক্তির একটা সীমা আছে। মোট কথা, ইংরাজ আদর্শবাদীরা রাষ্ট্ররূপ দেবতার পাদপীঠতলে ব্যক্তিকে বলিদান দিতে চাহেন নাই।

সমালোচনা।

এই মতবাদের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। রাষ্ট্র সমাজ হইতে শুধু ভিন্ন নয় পরন্তু রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সমাজের গণ্ডি অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণতর।

এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সমাজের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সর্বময় সর্বাত্মক বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি পররাষ্ট্র ব্যাপারে রাষ্ট্রের ইচ্ছাই হইল সব ইচ্ছার উর্ধ্বে। এই ধারণার বশবর্তী হইলে একদিকে যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব লোপ পায়। এই মতবাদে রাষ্ট্রের যে স্বাধীনতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের কথা বলা হয়, তাহা স্বৈরাচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর স্বৈরাচারের পরিণতি হইল যুদ্ধবাদ।

মূল্যনির্ধারণ—এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, সংঘ হিসাবে ইহা রাষ্ট্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই যে নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার ভোগ করে ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিয়া নাগরিক অধিকার ভোগে সহায়তা করে—এই সত্যটি এই মতবাদে বিশেষ জোরের সহিত বলা হইয়াছে। সুতরাং নাগরিক অধিকারের স্রষ্টা ও রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র নাগরিকদের নিকট চরম আনুগত্য ও ত্যাগস্বীকার দাবী করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত এই মতবাদ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়া মানুষকে আদর্শ নাগরিক হইতে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদ (Marxist Concept of the State)

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ জানিতে হইলে মার্কস্-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে একটু পরিচয় আবশ্যক। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ও শ্রেণী-সংগ্রামের উপরই মার্কস্ প্রধানতঃ তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মার্কসের মতবাদ তাঁহার 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' (Communist Manifesto) ও 'মূলধন' (Capital) নামক দুইখানি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। মার্কস্ কর্তৃক যে নূতন জীবনদর্শন ও নূতন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারিত হইল তাহার ফলে পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধিত হইল। ডারউইন যেরূপ জৈব বিবর্তনবাদ উদ্ভাবন করিয়া জীব জগতের উৎপত্তির ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, মার্কসও

সেইরূপ মানব-ইতিহাসের বিবর্তনবাদ আবিষ্কার করিয়া মানব-ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেন।

মার্কসীয় মতবাদের মূল সূত্র হইল যে, মানবজীবনে উচ্চাঙ্গ জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলি অন্য জাতীয় চাহিদা অপেক্ষা তীব্রতর এবং মানুষের মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি অন্যান্য চাহিদাগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপেক্ষা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। উপরি-উক্ত সূত্রের ভিত্তিতে মার্কস্ সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় যুগে যুগে যে পরিবর্তন দেখা যায়,—তাহার মূল কারণ হইল পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন। অর্থনৈতিক জীবনে উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রভূতভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট কালে একটি সমাজ ইহার কলা, দর্শন, আইন, ধর্ম, আচার, রীতি-নীতিসহ যে বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা যে ধাঁচে গঠিত হয়, তাহা তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থাই সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো স্থির করে। তিনি আরও বলেন যে, যুগে যুগে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুরূপ একটি সমাজ-ব্যবস্থা ও অনুরূপ শ্রেণী-প্রাধান্যের অভ্যুদয় ঘটে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-ইতিহাসের ব্যাখ্যা করাকেই ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভাষ্য বলা হয়।

মানব-ইতিহাসের এই জড়বাদী ব্যাখ্যা মার্কস্ ইতিহাসের দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিকার যুগকেই মার্কস্ মানবসমাজ বিবর্তনের আদি অধ্যায় আখ্যা দিয়াছেন। এই যুগে শিকারের যন্ত্রপাতি ও শিকারলব্ধ পশু সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। শিকার যুগের এই অপরিণত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাও অপরিণত সাম্যবাদী ধাঁচে গঠিত ছিল।

শিকারবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন পশুপালন বৃত্তি গ্রহণ করিল তখন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কাঠামোর

পরিবর্তন ঘটিল। পশুপালন যুগে সমাজে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর আবির্ভাব হইল—পশুর মালিক শ্রেণী ও পশুর মালিকানা-বিহীন শ্রেণী। এই যুগে সর্বপ্রথম বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় অসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রেণী-সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

পশুপালন বৃত্তি গ্রহণের ফলে মানবসমাজে যে অসাম্যের সূত্রপাত হয়, পরবর্তী কৃষিযুগে এই অসাম্য আরও বৃদ্ধি পায়। কৃষিযুগে কৃষিকার্যই ছিল ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় এবং এই কারণে জমির মালিকগণ সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া ভূমিহীন শ্রেণীকে একান্তরূপে নিঃসহায় ও জমির মালিকগণের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলে। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে ভূমিদাস (Serf) শ্রেণীর আবির্ভাব হয় এবং জমির মালিক শ্রেণী ও ভূমিদাস শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটিতে থাকে।

উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটে। যন্ত্র সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রভূত পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। এই কারণে যান্ত্রিক যুগে মূলধনের মালিক কৃষিযুগের জমিদার শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করিল। অর্থের বলে মূলধনের মালিকগণ উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে বিত্তহীন শ্রেণী অনন্যোপায় হইয়া জীবিকা সংস্থানের উদ্দেশ্যে মালিক শ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। মালিক শ্রেণী এই বিত্তহীন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শ্রমজীবিগণকে তাহাদের শ্রমদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য শ্রমিকগণের পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে লাগিল। শ্রমদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মূল্য ও শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরি এই উভয়ের পার্থক্যকেই মার্কস্ 'উদ্বৃত্ত মূল্য' (Surplus Value) আখ্যা দিয়াছেন। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের সমগ্র পরিমাণই শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া মালিক শ্রেণী আত্মসাৎ করেন। এইরূপে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া মালিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতাও অধিকার করেন। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার বলে তাঁহারা সাহিত্য, কলা, ইতিহাস, দর্শন, আইন প্রভৃতি তাঁহাদের শ্রেণীস্বার্থের সুবিধা অনুসারে সৃষ্ট

করেন। এ যুগেও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থাও ধনতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে।

মার্কস্ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যান্ত্রিক যুগের উন্নত অবস্থায় বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎকট প্রতিযোগিতার ফলে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অধিক পরিমাণ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিবে। ইহার ফলে একদিকে যেরূপ ধনিক-মালিকের মুনাফা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে তদ্রূপ শ্রমিক শ্রেণীর আয় হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই শোষণ পদ্ধতির ফলে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইবে এবং অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য-পীড়িত হইবে। এইরূপে পশুপালন যুগে অর্থনৈতিক কারণে মানবসমাজে শ্রেণীভেদের ফলে যে অসাম্যের বীজ উপ্ত হয়, উন্নত যান্ত্রিক যুগে সেই ক্রমবর্ধমান অসাম্য তীব্রতর হইয়া উগ্র শ্রেণী-সংগ্রামে পর্যবসিত হইবে। সমস্ত দেশের ধনিক শ্রেণী তাহাদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইবে, অপরপক্ষে পৃথিবীর সমগ্র শ্রমজীবী মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন করিয়া মিলিত হইবে।

সুতরাং মার্কসীয় ইতিহাসের ভাষ্য অনুসারে বলা যায় যে, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কাঠামো সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন যুগে বিত্তবান ও বিত্তহীন—এই দুইটি শ্রেণীর বিপরীত স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে। বিত্তবান শ্রেণী ইহার স্বার্থ রক্ষাকল্পে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে। রাষ্ট্ররূপ সংগঠন হইল এই উপায়গুলির অন্যতম। এই সংগঠনের সাহায্যে বিত্তবান শ্রেণী বিত্তহীন শ্রেণীকে অবদমিত রাখিতে চেষ্টা করে। বিত্তবান শ্রেণী রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে শোষিত শ্রেণীর উপর ইহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং মার্কসের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একমাত্র এই পশুবল প্রয়োগ করিয়াই রাষ্ট্র সমাজের শ্রেণীগত কাঠামো অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। এই কারণে মার্কস্ রাষ্ট্রকে শ্রেণী স্বার্থের ধারক এবং শ্রেণী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the Marxian Concept of the State)

মার্কসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কস্ শুধু অর্থনৈতিক প্রভাবের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কার্যতঃ দেখা যায় যে, সমাজ-বিবর্তনে অর্থনৈতিক পরিবেশ ছাড়াও ধর্ম, ন্যায়, নীতি, কলা, কৃষ্টি প্রভৃতি উপাদানগুলির প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ, দুইটি বিষয়ে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শোষণের ফলে দরিদ্র শ্রেণী দরিদ্রতর হইবে। কিন্তু শিল্পের উন্নতির ফলে প্রায় সকল দেশেই দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমোন্নতি দেখা যায়। মার্কস্ আরও বলিয়াছিলেন যে, বিত্তহীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে কালক্রমে রাষ্ট্র সংগঠন বিলীন হইবে। রুশ দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেও রাষ্ট্রের এখনও অবসান ঘটে নাই।

তৃতীয়তঃ, মার্কস্ যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের কথা বলিয়াছেন, সে রাষ্ট্র হিংসা-দ্বেষবর্জিত ও মানব-সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র কখনও বিপ্লব বা শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মতামতের বিভিন্ন অংশ পরস্পর-বিরোধী।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কস্ শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বব্যাপী একতার উপর তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সকল শ্রেণীর শ্রমিককে একতাবদ্ধ হইতে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক আহ্বান সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী আজও পর্যন্ত জাতীয়তাবোধ পরিহার করিয়া আন্তর্জাতিক আদর্শ গ্রহণ করে নাই।

কিন্তু এই বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, মার্কস্ তাঁহার মতবাদ প্রচার দ্বারা শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। মার্কসের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হইলেও একথা মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন-জনিত কর্মপ্রচেষ্টা মানুষের ইতিহাসের গতিকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে।

[পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দিষ্ট ইতিহাস নাই। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনাই রাষ্ট্র-উৎপত্তির মূল সূত্র বলিয়া ধরা যায়। এ সম্বন্ধে পাঁচটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা—

১। **ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ**—এই মতবাদ রাষ্ট্রকে ভগবানের সৃষ্ট সংগঠন বলিয়া মনে করে ও রাজা ভগবৎ-প্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র ভগবানের কাছে দায়ী থাকিয়া রাষ্ট্র পরিচলনা করেন। প্রাচীনকালের অনেক দেশে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল ও এই মতবাদ রাষ্ট্রগঠনের প্রথম অধ্যায়ে মানুষকে ধর্মভয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিবার শিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা রাজার স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেয় ও বর্তমান যুগের রাজতন্ত্র ব্যতীত বিভিন্ন রকম আকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

২। **বলপ্রয়োগ মতবাদ**—এই মতবাদে 'জোর যার মুল্লুক তার' এই প্রবচনের যুক্তি-যুক্ততার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। সবল দুর্বলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বও এই পশুবলের সহায়তায় বজায় রাখে। রাষ্ট্রগঠনে ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ও বাস্তব দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে একথা অনস্বীকার্য হইলেও, রাষ্ট্র যে একমাত্র পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত একথা বলা যায় না। পশুবলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রই চিরস্থায়ী হয় না। শাসিতের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত।

৩। **সামাজিক চুক্তি মতবাদ**—রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সম্পাদিত চুক্তিদ্বারা ইহার উদ্ভব হইয়াছে— এই মতবাদের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ এক প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় বাস করিত। এই অবস্থাকে প্রকৃতির রাজত্ব বলা হইয়াছে। এখানে মানুষের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিলে তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন

করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। সুতরাং রাষ্ট্র চুক্তিদ্বারা গঠিত। হবস্, লক্ ও রুশো এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। এই তিনজন লেখক একই বিষয়ে আলোচনা করিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন ছিল। হবস্ তাঁহার মতবাদ-দ্বারা রাজশক্তির অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। লক্ এই মতবাদকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর রুশোর হস্তে এই মতবাদ লোকায়াত্ত সরকারের রূপ গ্রহণ করে।

এই মতবাদটি অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের ও বল-প্রয়োগ মতবাদের বিলোপ সাধন করিয়া বর্তমান গণতন্ত্রের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়।

৪। **পারিবারিক সম্প্রসারণ মতবাদ**—মাতৃতান্ত্রিক অথবা পিতৃ-তান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্র কালক্রমে ইহার বর্তমান রূপ লইয়াছে, এই মতবাদে ইহাই বলা হয়। পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে জাতি এইভাবে সহজ ও সরল সংগঠনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ক্রমশঃই জটিলতাপূর্ণ হইয়াছে। জাতিত্ববন্ধন রাষ্ট্রগঠনের সহায়তা করিয়াছে একথা স্বীকার করিলেও বলা যায় না যে, একমাত্র পারিবারিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়াও মানুষের আদিম সংগঠন যে পরিবার হইতে আরম্ভ হয় তাহারও কোন নিশ্চিত নিদর্শন নাই।

৫। **বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদ**—রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদগুলির মধ্যে এইটিই হইল বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। এই মতবাদের বিশেষত্ব হইল যে, ইহা রাষ্ট্রগঠনের কোন একটি বিশেষ উপাদান বা রাষ্ট্র-উৎপত্তির কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সবগুলির সমন্বয়ে একটি সম্ভাব্য মতবাদ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। রাষ্ট্র বহু যুগ ধরিয়া বহু ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রাষ্ট্রগঠনে রক্তসম্বন্ধ, ধর্ম, শারীরিক শক্তি, রাজনৈতিক চেতনা, জাতীয়তাবোধ, অর্থনৈতিক কারণ প্রভৃতি বহু শক্তি কার্যকরী হইয়াছে। রাষ্ট্র একদিনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা-দ্বারা বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিষয়ক মতবাদ

১। **জৈব মতবাদ**—এই মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া একটি সজীব ও সচেতন দেহী বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। জীবদেহ যেরূপ কতকগুলির জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত ও এই জীবকোষগুলি যেরূপ পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, তদ্রূপ রাষ্ট্রও কতকগুলি মানুষের সমন্বয়ে গঠিত ও এই মানুষগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। জীবকোষগুলি যেরূপ সমস্ত দেহের উপর নির্ভরশীল, জনগণও সেইরূপ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ব্লুনৎস্লি ও স্পেন্সার এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন।

রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্যগুলির কথা বলা হয় সেগুলি বাহ্যিক, মূলগত নয়, তাহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে এত মূলগত প্রভেদ আছে যে-জন্য রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূপ বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

২। **আদর্শবাদ**—এই মতবাদে রাষ্ট্রের বাস্তবতাবর্জিত আদর্শ পরিকল্পনা করিয়া রাষ্ট্রে এক নৈতিক ও অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হইয়াছে, যাহার ফলে রাষ্ট্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটাইতে পারে।

মার্কসীয় মতবাদ—সাম্যবাদী ইস্তাহার ও মূলধন নামক গ্রন্থ দুইখানি হইতে রাষ্ট্রসম্পর্কে মার্কসের মতবাদ জানিতে পারা যায়। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা, উদ্বৃত্তমূল্যের সূত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম—এই তিনটি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া মার্কস তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মতে শিকারযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান শিল্পযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজের যে শ্রেণীর অধিকারে থাকে, সেই শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করিয়া সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সমাজে দুই শ্রেণীর আবির্ভাব হয় ক্ষমতাসীন বিত্তবান শ্রেণী ও ক্ষমতাহীন বিত্তহীন শ্রেণী। একদল শাসক ও শোষক, আর একদল শাসিত ও শোষিত। এই শোষণের প্রতিবাদে শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষ অনিবার্য। শোষিত শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে শোষক শ্রেণীর হস্ত হইতে বলপ্রয়োগে ক্ষমতা গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে শোষিত শ্রেণীর দ্বারা

রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হইলেও শেষ পর্যন্ত শোষক শ্রেণী যখন নির্মূল হয়, তখন এক শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হয় যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য থাকে না। মার্কসের মতে বিত্তবান শ্রেণী রাষ্ট্ররূপ সংগঠনের সাহায্যে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সেনা-বাহিনী ও পুলিশ সাহায্যে তাহাদের ক্ষমতা স্থায়ী করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের শক্তি পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। শোষিত শ্রেণী রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা শোষক শ্রেণীর হস্ত হইতে বলপ্রয়োগ সাহায্যে হস্তগত করিয়া শ্রেণী-ভিত্তিক রাষ্ট্রকে শ্রেণীহীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করে।

মার্কসের মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার মূল সূত্র গ্রহণযোগ্য। শ্রেণী সংগ্রামের সাহায্যে বিত্তহীন শ্রমজীবিগণ যে তাহাদের বহু ন্যায্য অধিকার অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য।

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বভৌমিকতা

(Sovereignty)

সার্বভৌমিকতার অর্থ (Meaning of Sovereignty)

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলিলে বুঝা যায় রাষ্ট্রের সেই সব মৌলিক সর্বোচ্চ ও অসীম ক্ষমতা, যাহা ব্যক্তি, সংসদ বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বস্তুর উপর অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র ইহার এলাকার মধ্যবর্তী যে কোন ব্যক্তি বা সংসদের উপর আধিপত্য করিতে পারে ও তাহাদের নিকট হইতে অখণ্ড আনুগত্য ও বশ্যতা আদায় করিতে পারে। নিজের এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমত্ব পূর্ণ হওয়া চাই। যদি কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নির্দেশের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে ইহার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতা। ইহার উপর আর কোন ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা রাষ্ট্র অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা রাষ্ট্রের মৌলিক ক্ষমতা—যাহার বলে রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছানুসারে ইহার কার্যাবলী পরিচালিত করিতে পারে ও যে ক্ষমতার বলে এক রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty)

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আদিম বা মৌলিক (original)। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা কোন উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে পারে না। ইহা রাষ্ট্রের স্বৈর (absolute) ক্ষমতা। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অসীম (unlimited)। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ করা হয়। চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা অবিভাজ্য (indivisible)। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল এই ক্ষমতার অধিকারী। একাধিক প্রতিষ্ঠান একযোগে আংশিকভাবে এই ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারে না। সমাজ-ব্যবস্থার ঐক্য বজায় রাখিবার নিমিত্তই সার্বভৌমত্বের এই অবিভাজ্যতা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

একই সমাজে একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী থাকিলে সমাজ-ব্যবস্থার কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ফলে, সমাজ-ব্যবস্থা ব্যাহত হইতে পারে। তাই সমাজ-ব্যবস্থার সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সার্বভৌম শক্তির অবিভাজ্যতা প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী (permanent)। রাষ্ট্র ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সহিত এই ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তনে এই ক্ষমতার অস্তিত্বের কোন হানি হয় না। ষষ্ঠতঃ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নহে (inalienable)। কোন মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিয়া নিজে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্রও বাঁচিতে পারে না। সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছায় তাহার ভূখণ্ডের কোন অংশ অন্য রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করিতে পারে। এই কার্য দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কোন হানি হয় না। সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আইনানুমোদিত স্বত্ববিশিষ্ট (imprescriptible) দীর্ঘকাল ভোগদখল-বিশিষ্ট রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সাময়িক অপপ্রয়োগ বা অব্যবহারের কারণে নষ্ট হইতে পারে না।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ (Different Aspects of Sovereignty)

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী কে বা কাহারা ও কাহার দ্বারা এই শক্তি প্রযুক্ত হয় এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকিবার ফলে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিভিন্ন লেখকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইহার আলোচনা করিয়াছেন। সেইজন্য এই ক্ষমতার প্রকারভেদ দেখা যায়।

কার্যকরী বা প্রকৃত সার্বভৌমত্ব ও নামমাত্র সার্বভৌমত্ব (Actual and Titular Sovereignty)

রাষ্ট্রের মধ্যে যে বা যাহারা রাষ্ট্রের আদিম, স্বৈর ও চরম ক্ষমতার অধিকারী ও যাহারা এই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারে, তাহাকে বা তাহাদিগকে বাস্তব সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলা হয়। আর যাহার নামে

এই ক্ষমতা বলবৎ করা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে যিনি কার্যক্ষেত্রে এই ক্ষমতা নিজ ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাকে নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। সার্বভৌমত্বের এই দুইটি দিকের পার্থক্য বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থায় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা নামেমাত্র সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। শাসন-ব্যাপারের সকল কিছুই তাঁহার নামে কার্যকরী করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের কেবিনেট সভাই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগকারী।

বাস্তব সার্বভৌমত্ব ও আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব (De facto and De jure Sovereignty)

যে শক্তির বলে কোন কর্তৃপক্ষ বৈধভাবে বা অবৈধভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য লাভ করে ও তাহার নির্দেশ বলবৎ করিতে পারে, তাহাকে বাস্তব সার্বভৌম বলা হয়। বাস্তব সার্বভৌমত্ব আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হইয়া শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারে। জনসাধারণ ভয় বা কুসংস্কারের জন্য এই সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ মানিতে বাধ্য হয়। আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তি আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সার্বভৌম শক্তি আইনানুমোদিতভাবে রাষ্ট্রের জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য দাবী করিতে পারে এবং এই সার্বভৌম শক্তির জনগণকে আদেশ দিবার ক্ষমতা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনানুমোদিত সার্বভৌম ক্ষমতা বৈধ উপায়ে সংগৃহীত ও আইনানুমোদিতভাবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ হয়। অপরপক্ষে, বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা বৈধভাবে সংগৃহীত নাও হইতে পারে ও আইনানুমোদিতভাবে ইহার প্রয়োগ না হইয়া বলের দ্বারা এই ক্ষমতা কার্যকরী হইতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী পোল দেশ অধিকার করিয়া সেই দেশের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল ও বাস্তবক্ষেত্রে জার্মান কর্তৃপক্ষ এই চূড়ান্ত ক্ষমতা সাময়িকভাবে পোল দেশে প্রয়োগ করিত। পোল দেশের অধিবাসিগণ জার্মান কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ মানিতে বাধ্য হইয়াছিল। পোল দেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং পোল দেশে অবস্থিত জার্মান কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাস্তব সার্বভৌম

শক্তির অধিকারী বলা যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষমতার অধিকারী হইলেও জার্মান কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আইনানুমোদিত ছিল না। উচ্চতর সামরিক শক্তির বলে তাহারা পোল জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য আদায় করিত। পোল দেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষই ছিল আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, যদিও সাময়িকভাবে এই কর্তৃপক্ষ বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম ছিল। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর আইনানুমোদিত পোল কর্তৃপক্ষ পুনরায় বাস্তব সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইল। স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাংকো প্রজাতন্ত্রী কর্তৃপক্ষকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বলপূর্বক সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। আইনানুমোদিত প্রজাতন্ত্রী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অবসান হইয়া নূতন সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল ও বলপূর্বক এই সার্বভৌম শক্তি কার্যকরী করা হইল। নূতন কর্তৃপক্ষ আইনানুমোদিত না হইলেও বাস্তব সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইল। বাস্তব সার্বভৌম শক্তি কালক্রমে নির্বাচন দ্বারা জনগণের সমর্থন লাভ করিতে পারিলে আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তব ও আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তি দুইটি পৃথক শক্তি নহে—সার্বভৌম শক্তির দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বাস্তব সার্বভৌম শক্তি স্থায়িত্ব লাভ করিয়া জনগণের নৈতিক সমর্থনের ফলে আইনানুমোদিত শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, অপরপক্ষে আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তি কালক্রমে কার্যকরী ক্ষমতা লাভ করিয়া বাস্তব সার্বভৌম শক্তিতে রূপায়িত হইতে পারে।

আইনগত সার্বভৌম শক্তি ও রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি (Legal and Political Sovereignty)

সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, আর কি বৈদেশিক ব্যাপারে—ইহার সর্বময় কর্তৃত্ব। আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সার্বভৌমত্ব সহজে বুঝা যায়। কিন্তু আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রের মধ্যে এই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী কর্তৃপক্ষের স্থান নির্দেশ করা একটি জটিল সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানকল্পে দুইটি বিভিন্ন সার্বভৌম শক্তির উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

জন্ অষ্টিন রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌম শক্তিতে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে এরূপ একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকিবেন যিনি এই চরম ক্ষমতার অধিকারী ও যাঁহার মাধ্যমে এই চরম ক্ষমতা বলবৎ করা হইবে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া তাহার সমষ্টিগত ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করিবার উপর। সমষ্টিগত ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত চরম ক্ষমতাবিশিষ্ট এক কর্তৃপক্ষ থাকে। আইনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। এই কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিয়া অভিহিত হয় এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি এই আদেশ মানিতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্রের মধ্যে এইরূপ সর্বজনগ্রাহ্য আইন-প্রণয়ন করিবার অধিকারী যে কর্তৃপক্ষ, তাহাকেই আইনগত সার্বভৌম বলা হয়। আইনজীবিগণ এই সার্বভৌম ক্ষমতার নির্দেশকে আইন বলিয়া গ্রহণ করেন ও বিচারালয়গুলি এই আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে। এই আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশ অযৌক্তিক বা জনমত-বিরোধী হইতে পারে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার বৈধতাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার মত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভাকে এই আইনগত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলা যাইতে পারে; রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক রচিত আইন-ইংলণ্ডের সর্বত্র অবাধভাবে প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনতঃ একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তে থাকিতে পারে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় ভিন্ন এক কর্তৃপক্ষ এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিতেছে। আইনগত সার্বভৌমকে সব সময় রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া-স্বীকার করিলেও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায় না। আইনগত সার্বভৌম শক্তির নির্দেশদানের ক্ষমতা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে এই আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। নিছক খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আইনগত সার্বভৌম কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে, আইনগত সার্বভৌম

কর্তৃপক্ষের আড়ালে এমন আর একটি শক্তি লুকায়িত আছে যাহার অভিমতকে আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করে। আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের পিছনে অবস্থান করিয়া যে শক্তি আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সেই শক্তিকে রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি বলা হয়। এই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইল রাষ্ট্রের নির্বাচকমণ্ডলী যাহাদিগকে আইনগত সার্বভৌমের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। আর এই রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট আইনগত সার্বভৌম দায়ী। আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশগুলি যদি যুক্তি-বিরোধী বা নীতিজ্ঞান-বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া পরবর্তী নির্বাচনকালে নূতন আইনগত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করিতে পারে। নানাভাবে জনমত সংগঠন ও শক্তিশালী করিয়া রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি আইনগত সার্বভৌম শক্তির উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক সার্বভৌমের হস্তে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা আছে। অন্য পন্থা বিফল হইলে বিদ্রোহের মাধ্যমে রাজনৈতিক সার্বভৌম তাহাদের সমষ্টিগত ইচ্ছা আইনগত সার্বভৌমের উপর বলবৎ করিতে পারে। সুতরাং আইনগত সার্বভৌমকে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট নতি স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজনৈতিক সার্বভৌম চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ তাহারা এই ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকারী নহে। রাজনৈতিক সার্বভৌম অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলী যদি একত্রিত হইয়া সম্মিলিতভাবে কোন নির্দেশ দেয়, সেই নির্দেশ আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কোন বিচারালয়ই এই নির্দেশকে আইনের মর্যাদা দিয়া সেই আইনের প্রয়োগ করিতে পারে না। রাজাসহ পার্লামেন্ট সভা ইংলণ্ডের আইনগত সার্বভৌম, আর নির্বাচকমণ্ডলী হইল রাজনৈতিক সার্বভৌম। রাজনৈতিক সার্বভৌম তাহাদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করিতে গেলে আইনগত সার্বভৌমের মাধ্যমে ব্যতীত অন্য উপায়ে করিতে পারে না। আর আইনগত সার্বভৌম রাজনৈতিক সার্বভৌমের ভোটের উপর নির্ভরশীল বলিয়া আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে তাহাকে নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমত সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতঃই ইহা মনে হয় যে, রাষ্ট্রের দ্বিবিধ সার্বভৌমিকতা আছে—একটি হইল আইনগত, অপরটি হইল রাজনৈতিক। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একক ও অবিভাজ্য। আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব সার্বভৌম রাষ্ট্রের দুই বিভিন্ন রূপ মাত্র। প্রথমটি আইনগ্রাহ্য। দ্বিতীয়টি আইনগ্রাহ্য নয়, সুতরাং আইনের চক্ষে ইহাকে সার্বভৌম বলা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

গণ বা সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব মতবাদ (The theory of Popular Sovereignty)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলি আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্র স্বৈরতন্ত্র হইতে বিবর্তনের ফলে বর্তমানে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বৈরতন্ত্র হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উন্নীত করিবার জন্য যতগুলি শক্তি কার্যকরী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের অবাধ, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল জনগণ। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি আর জনগণের নির্দেশই হইল আইন। রাষ্ট্রের মধ্যে এই গণশক্তির ঊর্ধ্বে অন্য কোন শক্তির অস্তিত্ব এই মতের সমর্থকগণ স্বীকার করেন না। প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশে এই গণ-সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র-ব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

রাষ্ট্রব্যবস্থা-প্রবর্তনের প্রথম যুগে সার্বজনীন সার্বভৌমত্বের দাবী স্বীকৃত হয় নাই। তখন কোন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের অনুমোদিত প্রতিনিধি বলিয়া এই শক্তির অধিকারী হইতেন। কালক্রমে রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চারের ফলে এই সার্বভৌম শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হইল। এককেন্দ্রীয় সার্বভৌম শক্তি একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইল। গণ-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সার্বভৌম শক্তি জনগণের অধিকারে পর্যবসিত হইল। ফরাসী লেখক রুশোর হস্তে এই গণ-সার্বভৌম মতবাদটি একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল। রুশোর মতে জনগণই হইল রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। সরকারের কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই, সরকার শুধু সাধারণের ইচ্ছাকে কার্যকরী করে। এই সাধারণ ইচ্ছা প্রয়োজন হইলে সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

এই মতবাদটি একটি মহান্ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'জনগণের অভিমতই হইল ভগবানের অভিমত' *Vox populi vox dei*—Voice of the people is the voice of God' রুশো তাঁহার যুক্তিতর্কের দ্বারা এই মতবাদটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্তমান জগতে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তনে সহায়তা করেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অধ্যাপক রীচি এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু রীচি গণ-সার্বভৌমত্বের দাবী উচ্চতর শারীরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমষ্টিগতভাবে জনগণের শারীরিক শক্তি সরকারের শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং সরকারের বলপ্রয়োগ নীতি যদি একটি সম্ভাব্য সীমা অতিক্রম করিয়া জনগণের উপর বলবৎ করা হয় তাহা হইলে জনগণও তাহাদের সমষ্টিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জনগণ সরকার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, সুতরাং অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া জনগণের সার্বভৌমত্বের দাবী সমর্থনযোগ্য।

সমালোচনা

এই মতবাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। মতবাদটির সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য ইহার বিরুদ্ধে প্রদর্শিত যুক্তিগুলির বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, সুসংবদ্ধ নাগরিক জীবনযাপন করিতে সহায়তা করা যদি রাষ্ট্রের একটি অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রের মধ্যে এমন একটি নির্দিষ্ট সংগঠন থাকা দরকার যাহার নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের দ্বারা। যে কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের জন্য এই আইন প্রণয়ন করিবেন, সেই কর্তৃপক্ষের একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিয়া সেইগুলিকে সুসংবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে। এই কর্তৃপক্ষ-সম্বন্ধে কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকিলে আইন-প্রণয়নে ও আইনগুলি বলবৎ করিতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটি করিয়া আইনসভা থাকে যাহার নির্দেশগুলি সকলে মান্য করে।

আইনসভা একটা নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সংগঠন, সুতরাং আইনসভার পক্ষে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব, কিন্তু তাই বলিয়া একটা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক মিলিতভাবে এই আইনসভার স্থান অধিকার করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু জনসমষ্টি সুসংবদ্ধভাবে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে অক্ষম, সেইহেতু তাহাদের অসংবদ্ধ ইচ্ছাকে আইনরূপে কার্যকরী করিয়া দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, জনগণ সুসংবদ্ধ হইয়া যদি সুস্পষ্টরূপে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও এই জনমত আইন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। কোন বিচারালয়ই এই জনমতের নির্দেশ অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে বাধ্য নয়। সুতরাং গণ-সার্বভৌমত্বের দাবী সমর্থন করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক রীচির মতে জনগণই হইল বৃহত্তর শক্তির অধিকারী, সুতরাং শক্তির পরীক্ষা দ্বারাও গণ-সার্বভৌমত্ব সমর্থিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকার অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত একদল সৈনিকের সাহায্যে বহুসংখ্যক লোককে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে। সুতরাং জনগণকে অধিকতর শক্তির অধিকারী বলাও সঙ্গত নয়।

চতুর্থতঃ, বলা হইয়াছে যে, প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া জনগণ তাহাদের সার্বভৌম শক্তিকে কার্যকরী করে। ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া জনগণ সরকার গঠন করে, আবার ভোট দ্বারাই তাহারা ইচ্ছামত সরকার পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই ভোটদান-ক্ষমতার মাধ্যমে জনগণ তাহাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের অতি অল্প সংখ্যক লোকই এই ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমান সার্বজনীন ভোটাধিকারের যুগেও জনসমষ্টির শতকরা ৫০ জনের বেশী এই অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ভোটদান-ক্ষমতা সার্বভৌমত্বের নিদর্শন ধরিয়া লইলেও ইহাকে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব আখ্যা দেওয়া চলে না। আবার এই ভোটদাতৃগণ বর্তমান দলগত রাজনীতির যুগে নিজেদের অভিমত বিসর্জন দিয়া দলীয় নেতার অভিমতের প্রতিধ্বনি করিতে বাধ্য হন। সুতরাং এ দিক

াও গণ-সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত না হইয়া দলীয় নেতৃত্বের সার্বভৌমত্ব াণিত হয়।

সুতরাং বাস্তব দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদটি র্থনযোগ্য নয়। কোন রাষ্ট্রই জনগণ দ্বারা পরিচালিত হয় না বা পরি- ালিত হইতে পারে না। জনগণ যখন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ য়া রাষ্ট্র গঠন করে তখন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসংঘকে সার্বভৌম ক্তির অধিকারী বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে ষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হয়, সুতরাং এ দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও রাষ্ট্রই হইল র্বভৌম শক্তির প্রকৃত অধিকারী।

গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, জনমত যদি ংবদ্ধ হইয়া জনহিতকর কার্যের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাহা হইলে এই মতের শক্তিকে কোন রাষ্ট্রই উপেক্ষা করিতে পারে না। সুসংবদ্ধ জনমত দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিয়া পরিগণিত হয়। আইনজীবিগণ ই গণ-সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে এই সার্বভৌমত্ব হইল একমাত্র শক্তি যে শক্তি সরকারের যথেচ্ছাচারিতা িরোধ করিতে পারে। অধ্যাপক লাস্কির মতে গণ-সার্বভৌমত্বের প্রকৃত ৎপর্য হইল, যে শক্তির দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাই হইল গণ সার্বভৌম শক্তি।

াতীয় সার্বভৌমিকতা (National Sovereignty)

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে জাতীয় সার্বভৌমিকতা ত্বের জন্ম হয়। এই মতবাদে বলা হয় যে, জাতিই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্তার আবাসস্থল ও একমাত্র অধিকারী। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও ষের প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদ হইতেই জাতীয় সার্বভৌমিকতা ণার সৃষ্টি হয়। এই মতবাদ পরোক্ষভাবে গণ-সার্বভৌমকিতা তত্ত্বের র্থন করিলেও কার্যতঃ জাতীয় সার্বভৌমিকতা ও গণ-সার্বভৌমিকতা ার্থবোধক নহে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব উপেক্ষণীয় না লেও আইনের দিক দিয়া জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় না। আইনগত র্বভৌমিকতা সব সময়েই সমগ্রভাবে জাতির মধ্যে নিহিত থাকে। আর

এই জাতিই হইল জনমতের উৎস। সুতরাং এই জাতীয় স্বাধীনতা ধারণা সাহায্যে জনমতকে একটা সুস্পষ্ট রূপ ও আইনসম্মত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জাতীয় সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে এই তত্ত্বের সাহায্যে সমগ্রভাবে জাতির প্রাধান্য ঘোষণা হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধারণার কোন কার্যকারিতা নাই। জাতীয় স্বাধীনতা একটা কল্পনামাত্র—ইহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ইহা আইন প্রণয়নে অক্ষম।

সার্বভৌমিকতা ও শাসনতান্ত্রিক আইন (Sovereignty and Constitutional Law)

রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে অনেক লেখক বলেন যে সার্বভৌমিকতা শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ, কেননা রাষ্ট্রের কার্যকলাপ শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র আইন ইচ্ছামত লংঘন করিতে পারে না। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না—শাসনতান্ত্রিক আইন প্রকৃতপক্ষে সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রের নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন সার্বভৌমের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র, সার্বভৌমের বাধা হইতে পারে না।

উপরি-উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে এক শক্তিশালী মতবাদ গঠিত হইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয় যে, সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ আইন সাধারণ সম্পর্কিত সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইজন্য রাষ্ট্রই এই আইন গুলির অনুমোদন অধিকর্তা। অপর পক্ষে শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি ও ইহার আচরণ-বিধি নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া এই আইনের অধিকর্তা হইল সমাজ নিজে। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র সমাজের অসংখ্য সংঘের মধ্যে মাত্র একটি সংঘ—ইহার উদ্দেশ্যও সীমাবদ্ধ। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র সমাজের অধীন। শাসনতন্ত্র সামাজিক সাধারণ ইচ্ছার বিশেষ রূপায়ণ ও প্রকাশ। সুতরাং রাষ্ট্র এই সামাজিক

ধারণ ইচ্ছার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রীয়ক্ষমতার
ৃত বাধাস্বরূপ। সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক দেশে
সনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে ভোটদাতাগণের বা বিশেষ সভার
াামত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্র ইচ্ছামত
সনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে না। রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইল
াাজ।

ষ্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদ (Austin's Theory of Sovereignty)

সার্বভৌমতত্ত্ব সম্বন্ধে যত লেখক আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ষ্টিন্ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার মতবাদ বুঝিতে লে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি আইনবিদ্ ছিলেন ও ইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি সার্বভৌমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। হার মতে সার্বভৌমত্ব বলিতে শুধু আইনানুমোদিত সার্বভৌমকে বুঝায়। ষ্টিন্ আইনশাস্ত্রের বিশদ আলোচনা করেন ও আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ রিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে সার্বভৌমত্বের আলোচনা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী খক হব্‌স ও বেন্থামকে অনুসরণ করিয়া অষ্টিন্ আইন ও সার্বভৌমের সংজ্ঞা র্দেশ করেন। তিনি বলেন, যদি কোন সমাজে এক নির্ধারিত উচ্চ নবীয় কর্তৃপক্ষ (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ) সমাজের অন্য কোন চতর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকার না করেন কিন্তু এই নির্ধারিত র্তৃপক্ষ সমাজের অধিকাংশের নিকট হইতে স্বভাবজাত আনুগত্য প্রাপ্ত হন, হা হইলে সেই সমাজে ঐ নির্ধারিত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইলেন সার্বভৌম ং ঐ উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে লইয়া ঐ সমাজকে রাজনৈতিকভাবে গঠিত ধীন সমাজ বলা হয়। ("If a determinate human superior, not a habit of obedience to a like superior, receive habitual bedience from the bulk of a given society, that determinate perior is the sovereign in that society and that society, cluding the determinate superior, is a society political nd independent.")

অষ্টিনের সার্বভৌম সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়:

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রে কোন-না-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ লইয়া গঠি এমন একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহার আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিয়া সে সমাজে পরিগণিত হইবে। এইরূপ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষই হইলেন সেই সমাজে সার্বভৌমত্বের অধিকারী। অষ্টিনের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ে সার্বভৌম সব সময়েই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশযোগ্য হওয়া চাই। জনমত ব রুশো-প্রবর্তিত সাধারণের ইচ্ছা প্রভৃতি অ-ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাগুলি সার্বভৌমত্ব আরোপ করা চলে না।

(খ) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল সমাজের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। এ কর্তৃপক্ষ অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয় না বা অন্য কো উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য স্বীকার করে না, পরন্তু সমাজের অন্য সক তাহার আনুগত্য স্বীকার করে। অষ্টিনের মতে এই কর্তৃপক্ষই হইলে সার্বভৌম ও এই সার্বভৌম চরম ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

(গ) এই ক্ষমতার অধিকারীকে মানবীয় হইতে হইবে। এই ক্ষম ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতা নয়।

(ঘ) সমাজে অধিক সংখ্যক লোক যদি সার্বভৌমের নির্দেশ পালন কা তাহা হইলেই যথেষ্ট। সার্বভৌম বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য সমাজে সমস্ত ব্যক্তিরই আনুগত্যের প্রয়োজন হয় না। তবে এই আনুগ স্বভাবজাত হওয়া চাই।

(ঙ) আইন হইল সার্বভৌমের নির্দেশ। এই নির্দেশ ছাড়া আইনে অন্য কোন উৎস নাই।

অষ্টিন্‌প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকারী হইবেন একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর এই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষে আদেশই আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ক্ষমতা অসীম, স্থৈর ও অবিভাজ্য

সমালোচনা

একাধিক লেখক অষ্টিনের সার্বভৌমতত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করি এই মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমত

অষ্টিনের মতবাদ বর্তমান গণতন্ত্রের আদর্শ-বিরোধী। তিনি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সার্বজনীন সার্বভৌমকে অস্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আইনানুগ সার্বভৌমের অবাধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজনৈতিক সার্বভৌমকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। আইনানুগ সার্বভৌম আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ আইনানুগ সার্বভৌমের ক্ষমতা রাজনৈতিক সার্বভৌমের নির্দেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনবিদ্‌গণের নিকট রাজনৈতিক সার্বভৌমের বিশেষ কোন তাৎপর্য না থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে আইনানুগ সার্বভৌমের কার্যকলাপের উপর রাজনৈতিক সার্বভৌমের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের বিরুদ্ধে স্যর্‌ হেন্‌রী মেইনের সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, সার্বভৌম কোন ক্ষেত্রেও অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয় বা হইতে পারে না। স্বৈরাচারী শাসকদিগের মধ্যে যাহাকে অদ্বিতীয় বলা যায় এরূপ শাসককেও অনেক সময় জনমতের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। কোন দেশের স্বৈরাচারী শাসকও লোকাচার এবং প্রথাগত নিয়মগুলিকে বাতিল করিতে সাহসী হয় না। মেইন পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, স্বৈরাচারী শাসকের অন্যতম রণজিৎ সিংহের পক্ষে তাঁহার নিজ সৃষ্ট আইন নহে এরূপ বহু প্রথাগত লোকাচার ও নিয়ম মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি আইন আছে যেগুলিকে সার্বভৌমের নির্দেশ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া জনগণকে ভোটাধিকার প্রদান করেন। এই ভোটাধিকার আইনের মধ্যে নির্দেশের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। পঞ্চমতঃ, অষ্টিনের মতানুসারে যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা সার্বভৌমহীন হইতে পারে না। পরিশেষে বলা যায়, অষ্টিন্‌ একটি সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতে সার্বভৌমত্ব হইল সরকারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, অষ্টিনের

সার্বভৌমতত্ত্ব সম্পূর্ণ অসার নহে। অষ্টিন্‌প্রদত্ত মতবাদের সমালোচনা করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি একজন আইনবিদ্ ছিলেন ও আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তিনি সাবভৌমতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। সার্বভৌমতত্ত্বের আলোচনা হিসাবে পূর্ববর্তী লেখকগণ অপেক্ষা তাঁহার মতবাদের মধ্যে একটা নূতনত্ব দেখা যায়। তিনি আইনানুগ সার্বভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌম হইতে পৃথক্ করিয়া বিশদরূপে তাহার ব্যাখ্যা করেন। অষ্টিনের পূর্বে সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অষ্টিন্‌ই সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের একটা নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করেন। তাঁহার মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌমকে উপেক্ষা করিয়া আইনানুগ সার্বভৌমের উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতবাদ অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট কিন্তু ভ্রান্ত নহে।

অষ্টিনের সর্বভৌমতত্ত্বের পুনঃসংজ্ঞা নির্দেশ (Austin's theory of Sovereignty redefined)

অষ্টিন্‌প্রদত্ত সার্বভৌমতত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু বিরূপ সমালোচনার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমালোচকগণের মতে অষ্টিনের সার্বভৌমতত্ত্ব মূলতঃ শক্তিভিত্তিক অর্থাৎ পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত—জনগণের ইচ্ছা বা সহযোগিতার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। জনৈক সমালোচক এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, অষ্টিন—এরূপ একটি সার্বভৌম শক্তির অবতারণা করিয়াছেন যাহার অস্তিত্ব বাস্তব কোন রাজনৈতিক সংগঠনে দেখা যায় না। এরূপ সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব একমাত্র দাস-ব্যবসায়ের উপনিবেশে সম্ভব।

কিন্তু অষ্টিন্‌প্রদত্ত সার্বভৌমতত্ব সম্পর্কে এইরূপ অত্যধিক বিরুদ্ধ সমালোচনা বাস্তবতা-বর্জিত বলিয়া মনে হয়। একটু গভীরভাবে অষ্টিনের মতবাদ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শুধু আইনবিদের দৃষ্টিভংগী লইয়া সার্বভৌমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন নাই, পরন্তু হিতবাদী আইন-বিদের দৃষ্টিভংগী লইয়া বিধিবদ্ধ আইনগুলির পশ্চাতে যে সমস্ত প্রভাব কার্যকরী সেগুলিরও যথাযথ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সমাজের অধিকাংশ লোক সরকারের প্রতি যে স্বভাবজাত আনুগত্য প্রদর্শন করে, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া অষ্টিন্ বলেন, লোকে যে অরাজকতা অপেক্ষা যে-কোন

শাসনব্যবস্থা অধিকতর পছন্দ করে তাহা সমাজের অধিকাংশ লোকের সরকারের প্রতি এই স্বভাবজাত আনুগত্য প্রদর্শনের দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা জনগণের আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেহেতু এই আনুগত্য জনগণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, সেই হেতু বলা যায় যে, প্রত্যেক শাসনব্যবস্থাই জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত—শুধুমাত্র পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপক ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অষ্টিনের সার্বভৌমতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি বিভাজ্য? (Theory of Divided Sovereignty)

অছিশাসন-ব্যবস্থা (Mandate System), দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা (Condominium) প্রভৃতি উদ্ভবের ফলে সার্বভৌম শক্তির বিভাজ্যতা প্রমাণিত হয় বলিয়া অনেকের ধারণা। অছিশাসন-ব্যবস্থায় একটি পশ্চাদ্‌পদ জাতি কয়েকটি বিষয়ে এক বা একাধিক সভ্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সার্বভৌম শক্তি দুইটি ভিন্ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া মনে হয়। দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থায় একটি রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যুগপৎ দুইটি রাষ্ট্র দ্বারা মিলিতভাবে পরিচালিত হয়। সুদান দেশের শাসনকার্য যুগপৎ ইজিপ্‌ট ও গ্রেট বৃটেন কর্তৃক পরিচালিত হইত। এ ক্ষেত্রেও বলা হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজ্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জাতীয় (কেন্দ্রীয়) সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ হয় ও উভয় সরকার শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমালোচনা

কিন্তু উপরি-উক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই মতবাদের সমর্থকেরা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় সে সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া এই ভুল ধারণা পোষণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক যে সমুদয় ক্ষমতা পরিচালিত হয়, সেগুলি বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয় ও এই দুইটি সরকার শাসন-কার্যের উৎকর্ষের জন্য পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়া নির্ধারিত বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রকৃত তথ্য হইল যে, সরকারের ক্ষমতাগুলিকে ভাগ করা হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ভাগ হয় না। জেলিনেকের উক্তির উদ্ধৃতি করিয়া গার্ণার এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। জেলিনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার ভাগ হয় না। যে বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমতা প্রযুক্ত হয়, সেই বিষয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, অর্থ-সংক্রান্ত-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, আর, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি স্থানীয় ব্যাপারগুলির শাসন প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার ভাগ হয় বলিলে মারাত্মক ভুল হইবে। সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য। ইহাকে ভাগ করিলে ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি সীমাবদ্ধ? (Theory of Limited Sovereignty)

অনেক লেখক রাষ্ট্রকে অসীম ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী আখ্যা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা দুই দিক্ দিয়া সীমাবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা ঐশ্বরিক বিধান, জনমত ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর বৈদেশিক ব্যাপারে এই ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।

সার্বভৌম ক্ষমতার উপরি-উক্ত বাধাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রই ঐশ্বরিক বিধান বা জনমত অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য নয়। অবস্থার চাপে অনেক সময় রাষ্ট্রকর্তৃক নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনও প্রবর্তিত ও প্রযুক্ত হয় এবং জনসাধারণও তাহা মানিয়া চলে। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি রাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যকলাপের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয় বটে,

কিন্তু রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছা অনুসারে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে। জার্মানীতে হিটলার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পূর্বতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া দিয়া জনমত ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচনা করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনের যে বাধার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও সব সময়ে কার্যকরী হয় না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এইজন্য আন্তর্জাতিক আইন বহুক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়। আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার মত উচ্চতর ক্ষমতা-বিশিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ নাই বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা নাই। বাস্তবক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য হয়ত রাষ্ট্র জনমত-বিরোধী অথবা নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্যকলাপগুলিকে সম্ভবমত পরিহার করিয়া চলে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্র সব কিছুই করিতে পারে। পারস্পরিক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সাধারণতঃ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিলেও আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়, একথা বলা চলে না। সুতরাং দেখা যায় যে, নিজ অভিরুচি অনুসারে রাষ্ট্র অনেক সময় অবাধ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োগে বিরত থাকে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা নাই—এই ক্ষমতা অসীম, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত।

সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদ (Pluralistic Conception of Sovereignty)

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অবাধ, অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া-রূপে বহুত্ববাদের আবির্ভাব হয়। ব্যবহারিক জগতে যেরূপ কোন বিষয়ের আতিশয্য ঘটিলে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, চিন্তাজগতেও তদ্রূপ কোন চিন্তাধারার আতিশয্যের ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়া বিপরীতমুখী চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের রাজনীতিবিশারদগণ রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার

ফলে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান্ হইল এবং এই সর্বশক্তিমান্ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজের অন্যান্য সংঘগুলির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিল। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা যখন চরম রূপ পরিগ্রহ করিল তখন রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার প্রতিবাদস্বরূপে বহুত্ববাদের আবির্ভাব হইল। গিয়ার্কি, মেথট্ল্যাণ্ড, বার্কার, লাস্কি, ম্যাকাইভার প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। তাঁহারা নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক মানুষের জীবন বহুমুখী। এই বহুমুখী জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য রাষ্ট্রেরও যেরূপ প্রয়োজন, সমাজের অন্যান্য সংঘগুলিরও সেইরূপ প্রয়োজন আছে। তাই মানুষ পরিবার, ধর্মসংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি নানাবিধ সংঘ সৃষ্টি করিয়াছে। এই সংঘগুলির প্রত্যেকটির একটি উদ্দেশ্য আছে ও প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ব্যক্তির আনুগত্য শুধু রাষ্ট্রের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাহাকে সমভাবেই বিভিন্ন সংঘগুলির আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। মানুষ শুধু নাগরিক জীবন লইয়া থাকিতে পারে না, তাহার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, কৃষ্টিগত জীবনও আছে। বহুমুখী জীবনের এই বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অন্যান্য সংঘগুলির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং এই সংঘগুলি নানাভাবে মানুষের জীবনে উপযোগিতা সৃষ্টি করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য করে। রাষ্ট্রও সমাজের মধ্যে এইরূপ একটি বৃহৎ সংঘ, কিন্তু রাষ্ট্রকে সমাজের একমাত্র সংঘ বলিয়া গণ্য করিলে মারাত্মক ভুল হইবে।

বহুত্ববাদীরা আরও বলেন যে, প্রত্যেক সংঘের ক্ষমতার একটা সীমা আছে—আর ক্ষমতার এই সীমা নির্ধারিত হয় সেই সংঘের করণীয় কার্যকলাপের দ্বারা। রাষ্ট্রের কার্যকলাপের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্র শুধু মানুষের বহির্জীবনের একটি প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত করে—মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নাই। তাই মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের অন্যান্য অংশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য

সামাজিক অন্যান্য সংঘগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্র এরূপ একটি বৃহৎ সংঘ, যাহা মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এ সম্পর্কে ম্যাকাইভার বলেন যে, একখানি কুঠার যেরূপ একটি পেনসিল কাটিবার পক্ষে অনুপযোগী অস্ত্র, মানুষের অন্তর্জীবনের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উন্নয়নে রাষ্ট্রও সেইরূপ অনুপযোগী। এই বিশ্লেষণের দ্বারা বহুত্ববাদীরা প্রমাণ করেন যে, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্ষমতা যদি কার্যের আনুপাতিক হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রকার্যকলাপের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে বলিয়া তাহাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া চলে না। সুতরাং সসীম রাষ্ট্রকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

উপরি-উক্ত যুক্তির অবতারণা করিয়া বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে অসীম ক্ষমতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। সমাজের অন্যান্য সংঘগুলি, যথা বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মসংগঠন, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি উপযোগী সংঘগুলিও নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। এই সংঘগুলির উপর রাষ্ট্রের একাধিপত্য করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এইরূপে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘগুলির সমপর্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন।

তাঁহাদের মতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা যেরূপ অন্যান্য সংঘের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ, বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা তদ্রূপ অন্য রাষ্ট্রের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্র অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজস্থিত অন্যান্য সংঘগুলির অস্তিত্ব যেরূপ রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতা দ্বারা ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে পররাষ্ট্র সম্পর্কেও রাষ্ট্রের এই অসীম ক্ষমতা স্বীকৃত হইলে তদ্রূপ বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই অসীম ক্ষমতার বলে শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। এই ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করে। ফলে মানব সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিগত দুইটি বিশ্ব মহাসমর ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলার রক্ষক এবং সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক যে রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অশান্তি সৃষ্টি ও সভ্যতা-বিরোধী কার্যকলাপ করিবার ক্ষমতা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। সুতরাং কোন রাষ্ট্রবিশেষের যে সমস্ত কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী বা মানব সভ্যতা-বিরোধী সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিশেষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে সমস্ত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক স্বার্থ-সম্পর্কিত সে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রবিশেষের হস্তে কোন মতেই ন্যস্ত থাকিতে পারে না। এই সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা নির্ধারিত হইবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলক করিয়া রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ করেন।

সমালোচনা

বহুত্ববাদীদের মত আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাঁহাদের মতে সমাজস্থিত প্রত্যেকটি সংঘ হইল স্বাবলম্বী, স্বাধীন ও রাষ্ট্র-প্রভাবমুক্ত। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই বিভিন্ন সংঘগুলির মধ্যে অবশ্যম্ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবর্তমানে এরূপ কোন শক্তি থাকিবে না, যাহা সংঘগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রশমিত করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা গুরুতর আকার ধারণ করিলে সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এই সমালোচনার উত্তরে বহুত্ববাদীরা বলেন যে, অন্যান্য সংঘগুলির মধ্যে মতবিরোধ বা কলহ ঘটিলে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কলহ-বিবাদের অবসান ঘটাইবে। বহুত্ববাদীরা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের মর্যাদা দান করিয়া অন্যান্য সংঘগুলির পক্ষে রাষ্ট্রের নির্দেশ অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বহুত্ববাদিগণ প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এদিক দিয়া

খিতে গেলে বলা যায় যে, বহুত্ববাদ দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পূর্ণ-প বিনষ্ট হয় নাই, শুধুমাত্র পরিবর্তিত হইয়াছে (modified but not jected)।

দ্বিতীয়তঃ, বহুত্ববাদিগণের মতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারণেরই দেশ্যে রাষ্ট্রক্ষমতার সংকোচন আবশ্যক। কিন্তু ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘগুলির কর্তৃত্বাধীন করিবার ফলে সংঘগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বৃদ্ধির পবিবর্তে সংকুচিত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

তৃতীয়তঃ, লাস্কি পববর্তীকালে বহুত্ববাদ সম্পর্কে তাঁহার পূর্বমত সংশোধন রিয়া বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পুন-ন্যাস করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন না করা যায় ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ করা সমীচীন নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর পরিধি ।• দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে যে, এই কল্যাণমূলক কার্যগুলির সাফল্যের ন্য সর্বাত্মক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অপরিহার্য। ইহা ছাড়াও বর্তমান যুগেব বাত্মক যুদ্ধের সময়ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত। তরাং বর্তমান যুগে বহুত্ববাদের প্রয়োগ ক্ষেত্র অতি সীমাবদ্ধ।

বহুত্ববাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, এই মতবাদ সমাজেব অন্যান্য ংঘগুলির কার্যকারিতার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিয়া সেইগুলির পযোগিতা প্রমাণিত করিয়াছে। বহুত্ববাদিরা আবও বলেন যে, এই মাজহিতকর সংঘগুলি তাহাদের নিজ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। া° বিনা কারণে তাহাদের কার্যকলাপের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। ংরা° বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার কিছু পরিবর্তন সাধন রিয়াছে—সার্বভৌমিকতাকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রের ার্বভৌমিকতা স্বীকার না করিলেও রাষ্ট্রের প্রাধান্য তাহাদের স্বীকার করিতে ইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি ক্ষার জন্য সার্বভৌমিকতার বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি (Location of Sovereignty)

রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি নির্ণয় করা এক জটিল সমস্যা।

এ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন মতগুলির সারমর্ম নিম্নে-প্রদত্ত হইল :

প্রথমতঃ, বহু লেখক গণ বা সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না বা কার্যক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। সুতরাং এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকারী, সেই কর্তৃপক্ষই হইল রাষ্ট্রের প্রকৃত সার্বভৌম শক্তি। এই মত অনুসারে গ্রেট বৃটেনের রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কারণ ইহা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতেই শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস বা রাজ্য আইনসভাগুলি এককভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার অধিকারী নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন-পদ্ধতি অত্যধিক পরিমাণে জটিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব কংগ্রেস সভার ২/৩ সংখ্যা সদস্যের দ্বারা অথবা রাজ্য আইনসভাগুলির ২/৩ সংখ্যক সদস্যের প্রস্তাবে আহূত একটি বিশেষ সভার দ্বারা সমর্থিত হইয়া রাজ্য আইনসভাগুলির ৩/৪ অথবা আহূত বিশেষ সভার ৩/৪-এর সম্মতি লাভ করিলে বলবৎ হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত হওয়ার ফলে উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং অনেক লেখক বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন—সুতরাং বিভাজ্য। কিন্তু এ মতবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যুক্তরাষ্ট্রে উভয়বিধ সরকারের অবস্থিতি থাকিলেও একটি মাত্র রাষ্ট্রের অবস্থিতি সূচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতার ভাগ হয়, সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসসভা, রাজ্য আইনসভা বা বিশেষ আহূত সভাগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না—কারণ, এই সভাগুলি সরকারের বিশেষ কর্মবিভাগ মাত্র এবং সাময়িক কালের জন্য আহূত হয়। অপর পক্ষে, সার্বভৌম শক্তি শুধু

অবিভাজ্য নহে—ইহা চিরন্তন। এইজন্য অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি নির্ণয় করা এক দুঃসাহসিক কার্য।

তৃতীয়তঃ, গেটেল্ রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত আইনসভাসমষ্টির উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়াছেন। আইনসভা বলিতে অবশ্য তিনি কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ও স্থানীয় আইনসভার উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগও আইন প্রণয়ন করে। অনেক দেশে ভোটদাতৃগণ গণভোট, গণ-নির্দেশাধিকার প্রভৃতি উপায়গুলির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়নকার্যে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং গেটেলের মতে দেশের সমুদয় আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

উপরি-উক্ত মতবাদ আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। কেন না, আইনসভা বা শাসনবিভাগ প্রভৃতি শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র। সার্বভৌমত্ব হইল একমাত্র রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য—শাসন-যন্ত্র এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সংক্ষিপ্তসার

সার্বভৌমিকতা ও ইহার বৈশিষ্ট্য—রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ, অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয়। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র সকল অধিবাসী ও সংঘগুলির উপরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদের আনুগত্য আদায় করে। বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ক্ষমতা অসীম, অবিভাজ্য, স্থায়ী ও অবিনশ্বর।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ—সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়, যথা, প্রকৃত সার্বভৌমত্ব ও নামমাত্র সার্বভৌমত্ব। ইংলণ্ডের রাজা নামমাত্র সার্বভৌম, প্রকৃত সার্বভৌম হইল কেবিনেট সভা। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তব ও আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব। আইনানুমোদিত সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইলেও কার্যতঃ ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে।

বাস্তব সার্বভৌম আইনানুমোদিত না হইয়াও কার্যতঃ ক্ষমতার প্রয়োগ করে। তৃতীয়তঃ, আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌম শক্তি। আইনগত সার্বভৌম আইন-প্রণয়নে সর্বেসর্বা হইলেও রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট দায়ী। রাজনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমের স্রষ্টা হইলেও তাহাদের নির্দেশ আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

গণ-সার্বভৌমত্ব—এই মতবাদে জনসাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া প্রচার করা হয়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন রুশো। জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যক্ষেত্রে এই অধিকার তাহারা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। অনেকে বলেন, ভোটদানক্ষমতাই হইল সার্বভৌম শক্তি-প্রয়োগের একটা পন্থা। কিন্তু এই ভোটদানের অধিকারী সকলে নয়। ইহা ছাড়া, জনগণ সমবেতভাবে তাহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও সেই ইচ্ছা আইন বলিয়া বিচারালয় কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে না।

গণ-সার্বভৌমত্ব প্রকৃতপক্ষে সুসংবদ্ধ জনমতের বিজয় ঘোষণা করে। কোন রাষ্ট্রই জনমতের দাবী উপেক্ষা করিতে সাহসী হয় না।

অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদ—অষ্টিন্ আইনবিদের দৃষ্টি লইয়া সার্বভৌমত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজের একটি সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের উপর আইনগত সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়া তাহার নির্দেশকে আইন আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌম উপেক্ষা করিয়া আইনগত সার্বভৌমকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। আইনগত সার্বভৌমের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণীয় হইলেও তাঁহার মতবাদ সার্বভৌমত্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি বিভাজ্য?—অনেকে মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ ইহা সত্য নয়। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সার্বভৌম শক্তি স্বয়ং শাসন করিবার বিষয়গুলি ভাগ করিয়া দেয়। সার্বভৌম শক্তির কোন বিভাগ হয় না।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি সীমাবদ্ধ?—ঐশ্বরিক বিধান, জনমত ও শাসনতান্ত্রিক আইনকে অনেকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা

বলিয়া মনে করেন। বৈদেশিক ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক আইনকে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সীমা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এইগুলিকে প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা বলা চলে না। কারণ, আইনতঃ কোন রাষ্ট্রই এইগুলি মানিতে বাধ্য নয়, তবে কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় রাষ্ট্র তাহার কার্যকলাপ এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাহাতে ঐ নীতিগুলি উপেক্ষিত না হয়।

বহুত্ববাদ—রাষ্ট্রের অবাধ ও অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিবাদ হিসাবে এই মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্বর্তী বহু সংঘের মধ্যে একটি সংঘ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতির মত রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংঘ। সকল সংঘেরই সমাজ-জীবনে উপযোগিতা আছে। সংঘ হিসাবে রাষ্ট্র মানব-জীবনের বহির্ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, সুতরাং ইহার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ। কাজেই কার্যের অনুপাতে ইহা অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন যে, সমাজেব প্রত্যেকটি সংঘ নিজ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই সংঘগুলির উপর কর্তৃত্ব করিবার রাষ্ট্রের কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে, সমাজের বিভিন্ন সংঘগুলির মতবিরোধ ও বিবাদ অবসান করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রাধান্য অপরিহার্য।

সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি—সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি সম্পর্কে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা একটি জটিল সমস্যা। অনেকের মতে জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী; আবার অনেকে বলেন, যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অধিকারী, তাঁহারাই হইলেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। গেটেলের মতে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী সমষ্টিকে সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হইল যে, সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও চিরন্তন, সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রই ইহার প্রকৃত অধিকারী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইন

(Law)

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Law)

'আইন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ-জীবনে মানুষকে অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই বিধি-নিষেধগুলিকে সাধারণতঃ সামাজিক আইন বলা হয়। সভ্য জীবনযাপনের জন্য মানুষকে যে নৈতিক বিধি মানিয়া চলিতে হয়, তাহাকে নৈতিক আইন বলা হয়। বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্রগুলিতে আইন শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানে কার্যকারণের সম্পর্ক বুঝাইতে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আইন' সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আইনের সংজ্ঞানির্দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। জন অস্টিন ও তাঁহার অনুগামীদের মতে আইন হইল সার্বভৌমের নির্দেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অধস্তন ব্যক্তিরা আইন বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য। আইন যেরূপেই প্রচারিত হউক না কেন, ইহার একমাত্র উৎস হইল সার্বভৌম শক্তি। সুতরাং এই মত অনুসারে ধরা হয় যে, আইন একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয় ও আইন বলবৎ করিবার জন্য এক সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য। এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া হেন্‌রি মেইন্ বলেন যে, আইন শুধুমাত্র সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশে আইনানুগ সার্বভৌম-রচিত আইন ছাড়াও নানারূপ প্রচলিত প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি আইন বলিয়া অভিহিত হয়। মেইনের মতে সার্বভৌমের নির্দেশ আইনের একমাত্র

উৎস নহে। সামাজিক নানাপ্রকার শক্তির দ্বারা আইন প্রভাবিত হয়। প্রথা, আচার, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক শক্তি আইনের পরিবর্ধনে সহায়তা করে। সুতরাং আইনকে একটা স্থিতিশীল শক্তি না বলিয়া গতিশীল শক্তিরূপে পরিগণিত করা উচিত।

উপরি-উক্ত সমালোচনার সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে অষ্টিনের অনুগামিগণ অষ্টিন্‌-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন : আইন হইল সমাজে মানুষের প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের আকারে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যে নিয়মগুলি শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের শক্তি ও প্রভাব দ্বারা বলবৎ করে।

হল্যাণ্ড-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাই আইনের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি বলেন আইন হইল মানুষের বহির্জীবন-সম্পর্কিত কতকগুলি বিধি-নিষেধ, যাহা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক বলবৎ করা হয়। সুতরাং অষ্টিনের অনুগামিগণ দুই দিক্‌ দিয়া অষ্টিন্‌-প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন। প্রথমতঃ, আইন শুধু সার্বভৌমের নির্দেশ নয়, স্বভাবজাত প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির সমাবেশে আইনের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আইনের স্রষ্টা নয়, এই কর্তৃপক্ষ আইন বলবৎ করে মাত্র। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও আইন মানিতে বাধ্য। তাহারা আইনের আওতার বাহিরে নয়।

বর্তমানে আইনের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক লেখকগণ বলেন, আইন হইল বহির্জীবন-নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি বিধি-নিষেধ, যাহা, জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে আইন জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট নয়, সে আইন কখনও বলবৎ করা যায় না। আইনের বাধ্য-বাধকতা নির্ভর করে আইনের প্রকৃতির উপর। আইন মান্য করিলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়—এই বিবেচনা দ্বারা চালিত হইয়া সাধারণতঃ লোকে আইন মান্য করে। যে আইন ব্যক্তির বা সমষ্টির পক্ষে

কল্যাণকর নয়, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকে মানিতে চায় না। সুতরাং আইন মান্য করা বা না-করা জনসাধারণের আইনের প্রকৃতিসম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করে—রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। আর রাষ্ট্র শুধু এই সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক মাত্র। এই ক্ষমতা জনসাধারণই রাষ্ট্রকে প্রদান করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র জনসাধারণের সম্মতি অনুসারেই এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, আইন যদি জনসাধারণের সম্মতির অভিব্যক্তি হয় তাহা হইলে আইন মান্য করাইবার জন্য বলপ্রয়োগের কি প্রয়োজন? একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই আইনগুলি ব্যক্তিনির্বিচারে প্রযোজ্য। সকলেই সব সময় আইন মানিতে বাধ্য। উড্রো উইলসন্ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, আইন মানুষের চিন্তাধারার দর্পণস্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি। ইহা শারীরিক ও নৈতিক শক্তির মাধ্যমে কার্যকর হয়। মানুষের চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন ঘটে। চিন্তাধারার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ আইনে প্রতিফলিত হয়। একটা দেশের আইন বিশ্লেষণ করিলে সে দেশের তৎকালীন সমাজিক চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতি জানা যায়। যেহেতু আইন মানুষকে একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার জীবনযাত্রা পরিচালিত করিতে বাধ্য করে, সেইহেতু ইহাকে সক্রিয় শক্তি বলা হইয়াছে। আইনের অবর্তমানে মানুষ তাহার খুশিমত জীবন যাপন করিতে পারে। আইন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজে নানা স্তরের লোক থাকে। একদল নৈতিকবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কর্তব্যবোধে আইন মান্য করে। নৈতিকজ্ঞানই তাহাদের আইন মানিতে বাধ্য করে। কিন্তু সমাজে এমন অনেক লোক থাকে যাহারা স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আইন মান্য করে। তাই যখন কোন আইন এই সমস্ত লোকের স্বার্থ-বিরোধী হয় তখন তাহারা আইন মান্য করিতে দ্বিধা করে। এই শেষোক্ত দলের জন্যই শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় আইন সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। যখন নৈতিক শক্তি আইন মান্য করাইতে ব্যর্থ হয়, তখন শারীরিক শক্তির প্রয়োগে আইন বলবৎ করা অপরিহার্য হইয়া উঠে।

আইনের সমর্থন (Sanction behind Law)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আইনের সমর্থন ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূল্যের (Validity and value) উপর নির্ভর করে। আইনের বৈধতা রাষ্ট্রের শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়। আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সকলেই মান্য করিবে। যে আইন সকলে মান্য করে না, সে আইনকে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক আইন বলা যায় না—আর যে আইন ইহার সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যবিহীন হয়, সে আইন প্রকৃত আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু আইনের এই সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রকৃতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রশক্তি আইনকে বৈধ করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের যদি কোন নৈতিক মূল্য না থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্র শুধু বলপ্রয়োগ দ্বারা আইন বলবৎ করিতে পারে না। শুধুমাত্র শক্তিমান রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বলিয়াই লোকে আইন মান্য করে না—আইন ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত -আইন সার্বজনীন স্বার্থের ধারক ও রক্ষক—এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই লোকে আইন মানে। সুতরাং যে আইন যত পরিমাণে নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠি· হইবে, সে আইন ততই সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হইবে। সুতরা· আইনের বৈধতা নীতিজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে। আইনের নৈতিক মূল্যই ইহাকে বৈধ করিতে সাহায্য করে। সুতরাং আইনের সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রকৃতি অর্থাৎ সমর্থন ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূল্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

আইনের উৎস (Sources of Law)

আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কোন দেশেরই প্রচলিত আইন শুধু রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। নানাবিধ সামাজিক শক্তি আইন-গঠনে কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু আইনের উৎস যাহা হউক না কেন, প্রত্যেকটি আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রচারিত, স্বীকৃত ও কার্যকর হওয়া চাই। আইন-গঠনে নিম্নলিখিত শক্তিগুলি কার্যকরী হইয়াছে :

১। প্রথা (Custom)

প্রত্যেক দেশের প্রচলিত আইনগুলির মধ্যে কতকগুলির প্রথাগত বিধি-নিষেধ দেখা যায়। এই প্রথাগুলি আইনানুগ সার্বভৌম কর্তৃক রচিত হয় না। ইহারা আপনা হইতেই প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠে। রাষ্ট্র-উদ্ভবের পূর্ব হইতে এগুলি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইয়া মানুষের সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্র-উদ্ভবের পরবর্তী কালে এই প্রচলিত প্রথার অনেকগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এই স্বীকৃতির ফলেই প্রথাগুলি আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

২। ধর্ম (Religion)

প্রথার মতই ধর্মীয় আইনগুলিও আইন-সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। এই অনুশাসনগুলি সমাজ-জীবন নানাভাবে সুসংবদ্ধ করিয়া সমষ্টিগত জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়াছে। এই অনুশাসনগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালনার কার্যে সহায়ক বলিয়া রাষ্ট্র এগুলিকে সমর্থন করিয়া আইনের মর্যাদা দিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের আইনের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

৩। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Adjudication)

বিচারালয়ের আইনসম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলিও নূতন আইনের সৃষ্টিকার্যে অনেক সাহায্য করিয়াছে। বিচারকেরা শুধু আইনের প্রয়োগ করেন না, তাঁহারা প্রয়োজনমত আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। আইনের অর্থ যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহা হইলে বিচারকেরা ব্যাখ্যা করিয়া আইনের যে সিদ্ধান্ত করেন তাহাই সঠিক আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। একজন বিচারক কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইনের সিদ্ধান্ত যখন অন্যান্য বিচারকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়, তখন এই নূতন সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হয়।

৪। ন্যায়পরতা (Equity)

আইনের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক সময় বিচারকদের নিজেদের ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে হয়। বিচারকার্য

যাহাতে ন্যায়ধর্ম অনুসারে পরিচালিত হয় সেজন্য বিচারকেরা এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই ন্যায়ধর্মের ভিত্তিতেও অনেক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং বিচারকগণ দুই প্রকারে আইন সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। প্রথমতঃ, আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা ও দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রয়োগে ন্যায়ধর্মের অনুসরণ করিয়া।

৫। আইনবিদ্‌গণের আলোচনা (Scientific discussion)

অভিজ্ঞ আইনবিদ্‌গণ তাঁহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক সময় নূতন আইনের সৃষ্টি ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের সহায়তা করেন। সমষ্টিগত জীবনে কোন্‌টি আইনরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত ও কোন্‌টি বর্জনীয় এ বিষয়ে আইনবিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত প্রায় সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হয়। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করিয়া এই সিদ্ধান্তগুলি আইনে পরিণত হয়।

৬। আইন-প্রণয়ন (Legislation)

অধুনা আইন-পরিষদ্‌ই আইনের প্রধান উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। আইন পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রপরিচালন কার্য সহজ করিয়াছে।

ওপেনহাইম, হল্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আইনবিদ্ পণ্ডিতগণ উপরি-উক্ত বিষয়-গুলিকে আইনের বিভিন্ন উৎস বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি করেন। তাঁহাদের মতে জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাই হইল আইনের প্রধান উৎস। এই সমবেত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ নানা প্রণালীতে হইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন মানব-সমাজে এই সমবেত ইচ্ছা প্রথা বা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই সমবেত ইচ্ছা প্রতিনিধিমূলক আইন-পরিষদের মাধ্যমে আইনরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং উক্ত পণ্ডিতগণের মতে প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আইনের উৎস না বলাই যুক্তিসম্মত।

রাষ্ট্রীয় আইন ও অন্যান্য আইন

প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature)

সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, অনেক লেখক রাষ্ট্র-জন্মের পূর্বে মানুষ যে পরিবেশে বাস করিত তাহাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ অথবা প্রকৃতির রাজ্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যে সমস্ত আইন মান্য করিত সেগুলিকে প্রাকৃতিক আইন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

গ্রীক দার্শনিকদের লেখার মধ্যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান, মানবসমাজের নিয়মগুলি ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। মনুষ্যকৃত আইনগুলি প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অনুরূপ হইলে সেগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হইত। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল্ উভয়েই প্রাকৃতিক আইনের নজির দেখাইয়া তাঁহাদের অনেক মতবাদ সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ষ্টোয়িক দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে যে সামঞ্জস্য সমন্বিত নিয়ম বিদ্যমান, মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়া সমাজোপযোগী করিতে হয়। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি এইরূপে আইনের মর্যাদা পায়। রোমকগণ এই প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে তাঁহাদের আন্তর্জাতিক আইন (*Jus gentium*) সৃষ্টি করেন। উহা বর্তমান যুগে পূ আন্তর্জাতিক আইনরূপে গণ্য হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষে এই যুক্তি দেখান হয় যে, ইহার পশ্চাতে কোন আইনের অনুমোদন নাই। শুধুমাত্র নৈতিক অনুমোদনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই নিয়মগুলি কার্যকর করা যায় না। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি একটা নৈতিক আদর্শের মান স্থির করে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপে এই নৈতিক মান বলবৎ করা সম্ভবপর নয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের এই ত্রুটিসত্ত্বেও বাস্তব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই নিয়মগুলির প্রভাব প্রভূত পরিমাণে অনুভূত হয়। জুরির দ্বারা বিচারপদ্ধতি, বিচারকালে বিচারকদের ন্যায় ও ধর্মনীতি অনুসরণ, আন্তর্জাতিক আইনের

ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রভৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মেরই পরোক্ষ প্রয়োগ বলা যাইতে পারে।

সামাজিক আইন (Social Law)

সামাজিক আইনগুলি মানুষের সমষ্টিগত জীবনের কার্যকলাপের একটা মান স্থির করিয়া দেয়। প্রত্যেক সমাজেই এইরূপ কতকগুলি নিয়ম থাকে যাহা সমাজভুক্ত ব্যক্তিমাত্রই সাধারণতঃ মানিয়া চলে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম প্রত্যেক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন এগুলি সম্পর্কে সাধারণতঃ নিরপেক্ষ। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলি বহু ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের পূর্বতন সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেছে। মানুষের সামাজিকতা বোধের উপরই প্রধানতঃ ইহার অনুমোদন নির্ভর করে।

ধর্মীয় আইন (Religious Law)

ধর্মীয় আইন বলিতে ধর্মের কতকগুলি অনুশাসন বুঝায়। প্রত্যেক ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন থাকে। এই অনুশাসনগুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসরণকারিগণ মানিয়া চলেন। কেহ যদি এই অনুশাসনগুলি অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হইবেন, অথবা সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসরণকারিদের দ্বারা সমাজচ্যুত হইবেন। কিন্তু এজন্য রাষ্ট্র তাঁহাকে কোনরূপ দৈহিক শাস্তি প্রদান করিবে না। ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ধর্মের বন্ধন সকল সমাজেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

নৈতিক আইন (Moral or Ethical Law)

সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের অপরাপর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক কতকগুলি বাস্তব কার্যকর নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বাস্তব নিয়মগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি নিয়মের কল্পনা করা যায়, যে নিয়মগুলি দ্বারা মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক একটা আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শেষোক্ত এই নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের দ্বারা

নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র জীবন ধারণ করা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। মানুষ চায় যাহাতে তাহার নৈতিক জীবনেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। নৈতিক জীবনে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে মানুষের নীতিসম্মত জীবন যাপন করিতে হইবে। এইজন্য প্রত্যেক সমাজে মানুষের ঔচিত্যবোধকে ভিত্তি করিয়া কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিধি-নিষেধগুলি মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের আদর্শ মান স্থির করিয়া দেয়। নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এইগুলিকে নৈতিক আইন বলা যায়।

রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়মের সম্পর্ক (Relation between Law and Morality)

রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন ও নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। আইন শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, অপর পক্ষে মানুষের নৈতিক ধারণা তাহার সমগ্র জীবনকে—চিন্তাধারা, কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও বাস্তব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং নৈতিক আইনের কার্যক্ষেত্র ব্যাপকতর। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন শক্তিপ্রয়োগে বলবৎ করা হয়। আইনভঙ্গকারী শাস্তি পায়, কিন্তু নৈতিক অপরাধ রাষ্ট্র কর্তৃক দণ্ডনীয় নয়। নৈতিক অপরাধীকে শুধু বিবেকদংশন অথবা লোকনিন্দা সহ্য করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট এবং ব্যক্তিনির্বিচারে সব সময়ে প্রযোজ্য, কিন্তু নৈতিক নিয়মগুলি সুসংবদ্ধ বা সুস্পষ্ট নয় এবং দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে এগুলি সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটে ও প্রয়োগেরও ব্যতিক্রম হয়। চতুর্থতঃ, নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্য, অনৌচিত্য, ন্যায় ও অন্যায়বোধের একটা নির্দিষ্ট মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সাধারণের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক জ্ঞানের উপর সব সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অকৃতজ্ঞতা, বিদ্বেষবুদ্ধি প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ, কিন্তু এগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। রাত্রিকালে বাতি না জালিয়া দ্বিচক্রযান চালনা করা নৈতিক অপরাধ না হইলেও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত। যুদ্ধকালে গৃহের অভ্যন্তরস্থিত আলোক অনাচ্ছাদিত রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু শান্তির সময়ে উহা অপরাধ বলিয়া

গণ্য হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে, নীতিবিগর্হিত বলিয়াই যে মানুষে আচরণ বেআইনী ঘোষিত হয় সব সময়ে তাহা সত্য নহে। জনস্বার্থসংরক্ষণে জন্য রাষ্ট্র মানুষের অনেক আচরণকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে।

অনেক লেখক বলেন যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষাকল্পে রাষ্ট্র যে কোন আইন—এমন কি নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনও প্রবর্তিত করিতে পারে। ("The safety of the state is its first law and to realis this end it must be above morality.") কিন্তু এই মতবাদ বিনা শর্তে গ্রহণ করা যায় না। ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রেরও নিজ অস্তিত্ব ও স্বাধীনত রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে মানিয়া লইলেও রাষ্ট্রকে অবা ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষ করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্র সাময়িকভাবে নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন প্রবর্তন করিতে পারে। কারণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হইল রাষ্ট্র ও সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যদি বিপদাপন্ন হয় তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতারও অবসান ঘটিতে পারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রকে আপৎকালে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। সেইজন্য অন্তর্বিপ্লব অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় রাষ্ট্র অনেক নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনের বলে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ অধিকার বা বিদ্যালয়গৃহকে আস্তাবলে পরিণত করিবার অধিকার প্রভৃতি নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া যাইতে পারে না। এইরূপ অবাধ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচনা করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের নীতিজ্ঞান-বিরোধী আইন করিবার অধিকার শর্তসাপেক্ষ।

এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম ও আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উভয় নিয়মই মানুষের ধর্মগত ধারণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষের নৈতিক জ্ঞান রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রপ্রবর্তিত কোন আইন যদি প্রচলিত নীতিজ্ঞানবিরোধী হয় অথবা প্রচলিত নীতিজ্ঞান হইতে বেশী অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্‌পদ হয়, তাহা হইলে সে আইন লোকে মান্য করে না। সুতরাং প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রাষ্ট্রের আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য

হইল মানুষের নৈতিক উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিয়া সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন সৃষ্টি করা যেগুলি মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতিসাধন করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি সঞ্চারিত করিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় রাষ্ট্রকে পুরাতন আইন বা সামাজিক আচার-প্রথার সংস্কার অথবা বিলোপসাধন করিয়া নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। নূতন আইনের দ্বারা রাষ্ট্র মানুষের ঔচিত্যবোধ বৃদ্ধি করাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিক তৎকালে প্রচলিত সতীদাহ-প্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার বিলোপসাধন করেন। আইনের দ্বারা এই কু-প্রথার বিলোপসাধন হওয়াতে কালক্রমে লোকের নৈতিক বুদ্ধিও পরিবর্তিত হইতে থাকে। সতীদাহ-প্রথা শুধু বে-আইনী হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান কালের লোকে বিবেচনা করে না—তাহারা মনে করে এই প্রথা নীতি-বিগর্হিত, তাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং আইনের মাধ্যমে লোকের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক মানুষের যেমন অপরাপর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরও তদ্রূপ অপরাপর রাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাহার কারণ হইল কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এক রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে অপরাপর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। অধুনা যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ার ফলে সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া নানাবিধ আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ আদান-প্রদানের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় কতকগুলি সর্ববাদিসম্মত নিয়মে। এই নিয়মগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় আইনের অনুরূপ প্রথায় আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। আন্তর্জাতিক প্রথা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক পরামর্শ-

সভার সিদ্ধান্ত ও খ্যাতনামা আইনবিদ্ পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন পরিপুষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় সৃষ্টি আইন অনুসারে নিম্নলিখিত উৎসগুলি আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃত উৎস বলিয়া পরিগণিত হয়। (ক) আন্তর্জাতিক প্রথাগত বিধান (conventions), (খ) আন্তর্জাতিক প্রথা, (গ) সভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের নীতি, (ঘ) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক আইনবিদের অভিমত। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিচারপ্রার্থী পক্ষগুলির সম্মতিক্রমে উপরি-উক্ত উৎসগুলি নিরপেক্ষভাবে ইহার ন্যায়বোধ (equity) প্রয়োগ করিয়া বিচার করিতে পারে। এই আইন এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের শান্তির সময়ে, যুদ্ধকালে বা নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনকালে কি সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করে। আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাই। রাষ্ট্রগুলির সম্মতিই হইল ইহার প্রধান অনুমোদন। রাষ্ট্রগুলি এই আইনানুসারে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিয়া পরোক্ষভাবে এই আইনের সমর্থন করে। আবার অনেক সময় এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ইহার সমর্থন করে।

আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলা হইবে, কি কতকগুলি নৈতিক নিয়মের সমষ্টি বলা হইবে, এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। অষ্টিন্ আইনের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সংজ্ঞা অনুসারে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করা যায় না। প্রত্যেক আইনের পশ্চাতে একটি সার্বভৌম শক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য বলিয়া মনে করিলে এই আইনকে আইন আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার মত কোন সার্বভৌম শক্তি ইহার পশ্চাতে নাই। আইন অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে দণ্ড দিবার উপযুক্ত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত অবর্তমান। রাষ্ট্রগুলি বহু ক্ষেত্রে এই আইন মান্য করে না। সুতরাং যে আইন মান্য করা বা না-করা আইনভঙ্গকারীদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সে আইনকে প্রকৃত আইন বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

আন্তর্জাতিক আইন অনেক সময় রাষ্ট্রগুলি মান্য করে না—এই যুক্তিতে

ইহাকে প্রকৃত আইন বলিতে আপত্তি করা হয়। রাষ্ট্রীয় আইনও বহু ক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়। রাষ্ট্রীয় আইন ক্ষেত্রবিশেষে ভঙ্গ হইলেও যদি সেগুলিকে আইন আখ্যা দিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক আইন সময় বিশেষে ভঙ্গ হয় বলিয়া ইহাকে আইন বলিয়া স্বীকার না করা অযৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইনের বিধি অনুসারে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্বক আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিয়াছে বলিয়া কোন রাষ্ট্রই স্বীকার করে না। আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী বলিয়া যখনই কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় তখনই অভিযুক্ত রাষ্ট্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া দোষ-ক্ষালনের নিমিত্ত সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়া সে যে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে নাই ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়। রাষ্ট্রের এই আচরণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও ঐ আইন অনুসারে তাহার কার্য পরিচালিত করিতে যত্নবান। তৃতীয়তঃ, কোন সভ্য রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করে না। অধিকন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আন্তর্জাতিক আইনকে জাতীয় আইনের একটি অংশ বলিয়া বিবেচনা করে।

চতুর্থতঃ, অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কোরিয়ার যুদ্ধকালে ও ইংরাজ-ফরাসী কর্তৃক ইজিপ্ট আক্রমণকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক অর্থনৈতিক চাপ-সৃষ্টি ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করিতে ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বলা হয় যে, আইন হইল কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি যাহা সর্বসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন হয় আইনকে বলবৎ করিবার নিমিত্ত, আইনের অস্তিত্বের নিমিত্ত সার্বভৌম ক্ষমতা অপরিহার্য নহে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিশারদ পণ্ডিত হল্‌ ও ওপেনহাইম্‌ এই আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনের পশ্চাতেও আন্তর্জাতিক জনমতের অনুমোদন ও সমর্থন আছে। জনমতের এই অনুমোদন ও সমর্থন যত বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে আন্তর্জাতিক আইন

অনুরূপভাবে ততো শক্তিশালী হইবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক জনমত অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আইনের মত সকল ক্ষেত্রে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলি অধিকতররূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত এবং বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী বজায় রাখিবার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক আইনকে বাধ্যতামূলক করিয়া আইনের মর্যাদা দেওয়া বর্তমান যুগে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Law)

দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে আইনের শ্রেণী ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা আইন রচিত হয়, সেই কর্তৃপক্ষের পার্থক্যের ভিত্তিতে, দ্বিতীয়তঃ, আইন কাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা দেখিয়া ইহার শ্রেণী ভাগ করা হয়।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে আইনের নিম্নলিখিত শ্রেণী ভাগ করা হয় ; যথা—

১। আইনপরিষদ্ রচিত লিখিত আইন—Statutes.

এই আইনগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনপরিষদ্ কর্তৃক রচিত হয়। বর্তমানে সব দেশেই এইরূপ আইনের প্রাধান্য দেখা যায়।

২। শাসনবিভাগীয় নির্দেশ—Ordinances.

এইগুলি শাসনবিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ অবস্থায় প্রবর্তিত হয় বলিয়া উহাদিগকে শাসনবিভাগীয় নির্দেশ বলা হয়। এই নির্দেশগুলি বিশেষক্ষেত্রে স্বল্পস্থায়িভাবে প্রয়োগ করা হয়।

৩। সচরাচরিক প্রথা—Common Law.

এই নিয়মগুলি লোকাচার হইতে উদ্ভূত হইলেও বিচারালয় কর্তৃক প্রযুক্ত ও বলবৎ করা হয়।

৪। শাসনতান্ত্রিক আইন—Constitutional Law.

এই আইনগুলি রাষ্ট্রের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। যে দেশের শাসনতন্ত্র অনমনীয়, সেই দেশেই শুধু শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

। আন্তর্জাতিক আইন—International Law.

এই আইন সভ্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া ।লির মধ্যে সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি-সংরক্ষণে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়তঃ, আইনকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—

:। রাষ্ট্রীয় আইন—Municipal Law ও ২। আন্তর্জাতিক আইন—rnational Law. রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত ও বলবৎ হয়। রাষ্ট্রের বাহিরে অন্য রাষ্ট্রে ইহার াগ হয় না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ হয় সকল সদস্য রাষ্ট্রের । রাষ্ট্রীয় আইনকে পুনরায় দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—ব্যক্তি-সম্পর্কিত আইন—Private Law ও (খ) সাধারণ-সম্পর্কিত ন—Public Law. ব্যক্তি-সম্পর্কিত আইন জনসাধারণের পারস্পরিক র্ক নির্ধারণ করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। সাধারণ-সম্পর্কিত ন ব্যক্তির সহিত সরকারের সম্পর্ক স্থির করিয়া শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা ক্ত স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই ব্যবস্থা করে। সরকার-সম্পর্কিত নকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—(১) শাসনতান্ত্রিক ন -Constitutional Law ও (২) শাসনবিভাগীয় আইন—ministrative Law. শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারের কার্যসমূহ । করিয়া তাহার সীমারেখা টানিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থির করে। নবিভাগীয় আইনগুলি সরকারী কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্তব্য িরণ করে।

আইন
- জাতীয় (National)
  - নতান্ত্রিক (Constitutional)
  - সাধারণ (Ordinary)
    - সাধারণ-সম্পর্কিত (Public)
      - সন সংক্রান্ত (Administrative)
      - সাধারণ (General)
    - ব্যক্তি-সম্পর্কিত (Private)
- আন্তর্জাতিক (International)

রাষ্ট্র ও আইন (State and Law)

রাষ্ট্রের সহিত আইনের কি সম্পর্ক তাহাই বিচার্য বিষয়। এক লেখক বলেন যে, রাষ্ট্র হইল আইনের উৎস। রাষ্ট্র সমাজের প্রতিনি হিসাবে আইন প্রণয়ন করে এবং জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারি যাহাতে আইনানুমোদিতভাবে কার্য পরিচালনা করে, সেজন্য আইন বল করে ও আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে। এইরূপে রাষ্ট্রসৃষ্ট আ সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায়গু দূর করে। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকে আইনের স্রষ্টা বা জনক ব যাইতে পারে।

মতান্তরে ডুগুই (Duguit), ক্র্যাব্ (Krabbe) প্রভৃতি লেখক আইনকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দেন। তাঁহাদের মতে আইন রাষ্ট্র-নিরপে ভাবে অবস্থান করে। রাষ্ট্র শুধু আইনকে স্বীকৃতি দান করে এবং আ বলবৎ করে। তাঁহাদের মতে এমন কি সর্বশক্তিমান্ রাষ্ট্রও আইন দ্বা বাধ্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্বও আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দিক দি দেখিতে গেলে রাষ্ট্রকে আইনের আজ্ঞাবহ বলিয়া মনে হয়।

যে সমস্ত লেখক আইনের উপর প্রাধান্য আরোপ করিয়া আইনকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দেন তাঁহারা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত নহেন। সরকার হইল রাষ্ট্রের সক্রি বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, সেইজ সরকারের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্য। সরকারের কার্যকলা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এই নিমিত্ত সমস্ত সভ্য দেশেই পৃথক এ শ্রেণীর আইন দ্বারা সরকারের কার্যকলাপের পরিধি স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই আইনগুলিকে শাসনতান্ত্রিক আইন বলা হয়। সরকারী কার্যকলাপে দ্বারা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রি আইন অনুসারে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহা প্রতিকার বিধান করিতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে এই শাসনতান্ত্রিক আইনও পরিবর্তন করিতে

[ৃ]রে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সরকারই আইন দ্বারা বাধ্য, [রা]ষ্ট্রের কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

সংক্ষিপ্তসার

[আ]ইন

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি—'আইন' শব্দটি নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়, [যথা]—সামাজিক আইন, প্রাকৃতিক আইন, নৈতিক আইন, ধর্মীয় আইন [ইত]্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন বলিতে বুঝায় কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, [যে] নিয়মগুলি ব্যক্তিগত জীবনে পারস্পরিক আচরণের মান নির্ণয় করে। [আ]ইনগুলির পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অনুমোদন আছে বলিয়া [জন]সাধারণ এগুলিকে মান্য করে। অষ্টিন্ আইনকে সার্বভৌমের নির্দেশ [বলি]য়া আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টিন্‌প্রদত্ত সংজ্ঞায় প্রথাগত নিয়ম, [বি]চারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির স্থান নাই বলিয়া পরবর্তী লেখকগণ উহার [প]রিবর্তন করিয়া আইনের নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। বর্তমানে [আ]ইন জনমতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রের [সা]র্বভৌম শক্তি জনমত অনুসারেই এই আইনগুলিকে বলবৎ করে।

আইন একদিকে যেমন সামাজিক চিন্তাধারার পরিচায়ক, অন্যদিকে [তদ্র]ূপ একটি কার্যকরী শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। আইন মানুষের [ক]র্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া মানুষের কার্যকলাপ একটা নির্ধারিত পথে [প]রিচালিত করে।

আইনের উৎস—প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, [ন্যা]য়নীতি, আইনবিদ্‌গণের আলোচনা ও আইনপরিষদ্ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক [প]দ্ধতিতে আইন-প্রণয়ন—এইগুলিই হইল আইনের জন্মদাতা। বর্তমানে [অ]ধিকাংশ আইনই শেষোক্ত পদ্ধতিতে রচিত হয়।

প্রাকৃতিক আইন—প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া [মানু]ষ স্বীয় বিবেকবুদ্ধির প্রয়োগে যে নিয়মগুলি দ্বারা নিজেদের পারস্পরিক [সম্প]র্ক নিয়ন্ত্রিত করিত সেগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক আইন বলিয়া [প্র]াকালে অভিহিত হইত। প্রাকৃতিক নিয়মগুলির পিছনে আইনের কোন

সমর্থন নাই বলিয়া এগুলিকে কার্যকরী করা চলে না। পরবর্তী যুগে আই গঠন ব্যাপারে প্রাকৃতিক আইনের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

সামাজিক ও ধর্মীয় আইন—এই নিয়মগুলিও সাধারণতঃ সমা ব্যবস্থায় ও ধর্মসম্প্রদায়ের সংগঠনে লোকে মানিয়া চলে। কিন্তু এগুলি কার্যকরী করা যায় না।

নৈতিক নিয়ম—সমাজে মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচি নৈতিক নিয়মগুলি তাহা নির্ধারণ করে। এই নিয়মগুলি মানুষের চিন্তাধা ও কার্যে তাহার বহিঃপ্রকাশ উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। বিবেকের কশাঘাত লোকনিন্দাই হইল ইহার অনুমোদন। নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনে মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়।

১। নৈতিক আইন মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন উভয়কেই নিয় করে—রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বহির্জীবনের একটা প্রধান অংশ নিয় করে।

২। নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেক বা জনমত দ্বারা অনুমোদিত হ রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়।

৩। নৈতিক নিয়মগুলি অপেক্ষাকৃত অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট; অপরপ রাষ্ট্র-প্রণীত আইন সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট।

৪। নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্যবোধের মান দ্বারা স্থিরীকৃত হ রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সমাজের সুবি অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন পরিবর্তিত হইতে পারে।

৫। নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্যকলাপ সব সময়ে বে-আইনী বলি পরিগণিত হয় না, অপরপক্ষে নীতিজ্ঞান-বিরোধী না হইলেও অনেক কার্যকল বে-আইনী হইতে পারে।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনি সম্পর্কযুক্ত। প্রচলিত নীতিজ্ঞান-সম্মত না হইলে কোন রাষ্ট্রীয় আই জনমতের সমর্থন লাভ করিতে পারে না। মানুষের নৈতিক জীবনের উৎক সাধন করাই হইল উভয়বিধ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক আইন—এই আইনগুলি সভ্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরি সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তি রক্ষা করে

রাষ্ট্রজাতিক আইন কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই—রাষ্ট্রগুলির সর্ববাদিসম্মত মতের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই আইনগুলিকে বলবৎ করিবার পক্ষে শক্তিশালী কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষও অবর্তমান। সেইজন্য অনেকে ইহাকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক আইনের সপক্ষে একটি পৃথিবীব্যাপী শক্তিশালী জনমতের সৃষ্টি হইয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে।

আইনের শ্রেণীবিভাগ—দুইটি পদ্ধতি দ্বারা আইনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, আইনপ্রবর্তনের কর্তৃপক্ষ দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ আইন কাহাদের সম্পর্কিত তাহা নির্ধারণ দ্বারা।

রাষ্ট্র ও আইন—আইনের স্রষ্টা ও আইন বলবৎ করিবার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। অপর পক্ষে বলা হয় যে, আইনের স্থান রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে, কেন না, রাষ্ট্রও আইনসম্মত কার্য করিতে বাধ্য। প্রকৃত তথ্য হইল যে, সরকারের কার্যকলাপ শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়, সুতরাং সরকার আইন দ্বারা বাধ্য—রাষ্ট্র বাধ্য নয়।

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ

(State and Nationalism)

স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবোধ— (People, Nationality, Nation and Nationalism)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝা যায়, একই ঐতিহ্য-দ্বারা পরিপুষ্ট একদল লোক যাহারা একই নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস না করিতেও পারে অথবা এক ভাষাভাষী নাও হইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ইহুদি জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না। তাহারা বিভিন্ন দেশে বাস করিত ও সেইজন্য তাহাদের ভাষাগত কোন ঐক্য ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের নাগরিক হইলেও সমষ্টিগতভাবে এক অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী বলিয়া ইহুদি জাতির মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ ছিল। সমগ্র ইহুদি জাতি এই ঐক্যবোধদ্বারা আজ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের সকলকেই জাতীয় মানুষ বলিয়াই মনে করে।

জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় তখনই, যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীরতর ঐক্যবোধদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্য জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। রক্তের, ভাষার, ধর্মের বা কৃষ্টির অভিন্নতা এই একতাবোধকে শক্তিশালী করিয়া জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সহায়তা করে।

জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ আত্মসচেতন হয় ও নিজেদের বহিঃশাসন হইতে মুক্ত করিয়া এক স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাহাদের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার প্রয়াস পায়, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের ফলে স্বজাতীয় মানুষ জাতীয় জনসমাজ বলিয়া

পরিচিত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের ফলে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। স্বজাতীয় মানুষ অপেক্ষা জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ গভীরতর আর এই ঐক্যবোধ রাজনৈতিক চেতনার জন্মদাতা। রাজনৈতিক চেতনা যখন গভীরতর হয় তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত একদল লোক যখন নিজেদের রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম হয়, তখন তাহাদের রাজনীতির ভাষায় জাতি বলা হয়। জাতীয়তাবোধ + রাষ্ট্র = জাতি। সুতরাং স্বজাতীয় মানুষ ও জাতীয় জনসমাজ জাতিগঠনের দুইটি প্রাথমিক স্তর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

জাতীয় জনসমাজ অনেক সময় একটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বৃহৎ জাতির ক্ষুদ্র এক অংশকে বুঝাইতে উপজাতি অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়। যেমন, বৃটিশ জাতির একটি অংশ হইল স্কচ্ উপজাতি।

রাষ্ট্র ও জাতি (State and Nation)

অনেক সময় জাতি শব্দটি ও রাষ্ট্র শব্দটি পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন বলা হয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রকৃত অর্থ হইল সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক একটি সংঘ। বস্তুতঃ রাষ্ট্র ও জাতি একার্থবোধক নহে।

নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আইন ও শৃংখলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকেই রাষ্ট্র বলা হয়। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনব্যবস্থা ও সর্বোপরি সার্ব-ভৌমিকতা এই চারিটিই হইল রাষ্ট্র অস্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু জাতির সংজ্ঞা রাষ্ট্র সংজ্ঞা হইতে শুধু পৃথক নয়, গভীরতরও বটে। জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মবোধ থাকা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জাতি একার্থবোধক হয় তখন যখন রাষ্ট্রভুক্ত সমগ্র জনসমষ্টি একই ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। একাত্ম-বোধের অবর্তমানে একটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব কিন্তু একজাতি গঠিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কালে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য একটি মাত্র রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত

হইলেও ইহা একজাতি ছিল না। রুশিয়ার জারের সাম্রাজ্য সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। এক শাসনব্যবস্থাভুক্ত হইলেও এই রাষ্ট্রগুলির জনসমষ্টির মধ্যে কোন একাত্মবোধ ছিল না এবং এই একাত্মবোধের অভাবে ইহারা জাতি পদবাচ্য হইতে পারে নাই।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, রাষ্ট্র ও জাতি এই দুইটি সংজ্ঞা পরস্পর-বিরোধী নয়, পরন্তু একটি অপরটির পরিপূরক। একই রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী বাস করিলে একই শাসন, আইন ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন জাতি ক্রমশই একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক জাতিতে পরিণত হয়। সুইস দেশে এইরূপে তিনটি পৃথক ভাষাভাষী জাতি একই শাসনব্যবস্থার অধীনে এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অপর পক্ষে যখন একদল লোক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের নিজস্ব রাজনৈতিক জীবন, কৃষ্টি, ভাষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়, তখন এই একাত্মবোধই তাহাদের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করিতে সাহায্য করে। ইতিহাসে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পোলাণ্ড দেশ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এইজন্য বলা হয় যে, রাষ্ট্র জাতি সৃষ্টি করে, আবার জাতিও রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। "The state creates the nation : the nation creates the state."

কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে জাতিভিত্তিক নয়। রাষ্ট্রগঠনের প্রধান উপাদান হইল সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধ যতই শক্তিশালী ও গভীর হউক না কেন, সার্বভৌমিকতার অবর্তমানে এই ঐক্যবদ্ধ জাতি রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিদেশী অধিকৃত জাপান-জার্মানী ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

জাতীয় জনসমাজ বা জাতি গঠনের উপাদান (Elements of Nationality)

জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে জাতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে উপাদানগুলি জাতীয় জনসমাজ গঠনে সহায়তা করে, সেইগুলিই জাতিগঠনেরও সহায়ক। একমাত্র রাজনৈতিক চেতনার বিদ্যমানতা বা অভাবের উপর ইহাদের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত। জাতিগঠনের উপাদানগুলিকে

দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, বাহ্যিক উপাদান ও ভাবগত উপাদান। এই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিলে জাতিগঠনে ইহার প্রত্যেকটির কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যায়।

কুলগত ঐক্য (Racial Unity)

অনেকে মনে করেন জাতিগঠনে কুলগত ঐক্য অপরিহার্য। যখন জাতীয় জনসমাজের সমস্ত মানুষ নিজেদের এক বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করে তখনই জাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ কথা সব সময় সত্য নয়। উদ্ভবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে জার্মান ও ইংরাজ একই টিউটন বংশোদ্ভব, কিন্তু জাতি হিসাবে ইহারা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপর পক্ষে, ইংরাজ ও স্কচ্ এক বংশোদ্ভব না হইলেও এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বংশোদ্ভব মানুষ—জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী একজাতি বলিয়া পরিচিত। সুতরাং অভিন্ন কুল জাতিগঠনের একমাত্র উপাদান বা অপরিহার্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া রক্তের যে সংমিশ্রণ চলিয়াছে তাহার ফলে কোন জাতিই আজ আর অবিমিশ্র জাতি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কিন্তু এককুলোদ্ভব হইলে জাতীয় ঐক্য দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

ভাষাগত ঐক্য (Sameness of Language)

কুলগত ঐক্য যেরূপ জাতিগঠনে অপরিহার্য নয়, ভাষাগত ঐক্যও সেরূপ অপরিহার্য নয়। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে, কিন্তু তাহাদের ভাষাগত বিভেদ জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। পরন্তু এই ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক আদর্শ জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া একই রাষ্ট্রে একজাতি হিসাবে বসবাস করিতেছে। ভাষা ভাবের আদান-প্রদানে সহায়তা করিয়া ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। সুতরাং ভাষাগত ঐক্য জাতিগঠনে সহায়তা করে একথা অনস্বীকার্য হইলেও ভাষাগত ঐক্যের অভাবে যে জাতির সৃষ্টি হইতে পারে না একথা বলা যায় না।

ধর্মগত ঐক্য (Religious Unity)

মধ্যযুগে ধর্মগত ঐক্য জাতিগঠনের একটি প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইলেও বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে ইহার প্রভাব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। একমাত্র মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি ব্যতীত অন্য কোথায়ও ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় নাই। ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়ুরোপে অনেক জাতি আছে যাহাদের মধ্যে ধর্মগত অনৈক্য জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি প্রভৃতি বহু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার ধর্মগত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও অতি আধুনিক কালে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাংলা দেশ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব জাতিগঠনের উপাদান বলিয়া গণ্য হয় না।

ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical Unity)

কতকগুলি লোক এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করিলে তাহারা একজাতিতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক ঐক্য জাতিগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাকে অপরিহার্য বলা চলে না। বহুদিনব্যাপী এক ভৌগোলিক ঐক্যের মধ্যে বসবাস করিয়াও ভারতের অধিবাসী হিন্দু-মুসলমান একজাতিতে পরিণত হয় নাই। আবার বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করিয়াও ইহুদি জাতি তাহাদের একজাতিত্ব হারায় নাই।

ভাবগত ঐক্য (Spiritual Unity)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, জাতিগঠনে বাহ্যিক উপাদানগুলি সব সময়ে বিশেষ কার্যকর হয় না। এগুলির অবিদ্যমানেও জাতির উদ্ভব সম্ভব। জাতীয় জনসমাজ বা জাতিগঠন প্রধানতঃ নির্ভর করে জাতির এক বিশেষ মনোভাবের উপর। যখন জাতীয় জন-সমাজের জনসমষ্টি তাহাদের মূলগত ঐক্যে একান্ত আস্থাবান্ হইয়া একজাতিত্ব-বোধে অনুপ্রাণিত হয়, তখনই কুলগত, ভাষাগত বা ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা একজাতিতে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হইল, এই ভাবগত ঐক্য কি?

ভাবগত ঐক্য একটা মানসিক অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতি বাহ্যিক ঐক্য অপেক্ষা মানসিক ঐক্যের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়। একদল লোকের মধ্যে কুলগত বা ভাষাগত বা আরও অনেক প্রকার সামাজিক বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু অতীতে যদি একই ইতিহাসের ঘটনাবলীর পথে তাহাদের জীবন গঠিত হইয়া থাকে, যদি তাহারা একই ঐতিহ্য বা সভ্যতার অধিকারী ও একই সুখদুঃখের অংশ গ্রহণকারী হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য তাহারা দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন একদল লোক নিজেদের অন্যান্য সকল দল হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে। অতীতের এই সম-সুখ-দুঃখভোগের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শ এই জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত করিয়া সকলকে একতার সূত্রে গ্রথিত করে। সময়ের অগ্রগতির ফলে এই ভাবগত ঐক্যের বন্ধন তাহাদের মধ্যে দৃঢ়তর হয় ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে সম-সুখদুঃখ ও সম-স্বার্থের ভিত্তিতে একত্রিত করিয়া একজাতিতে পরিণত করে। সুইস্-জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সৃষ্টিতেও এই উপাদানটি বিশেষ কার্যকর হইয়াছে।

বাহ্যিক ও ভাবগত ঐক্যের ফলে যখন একদল লোক নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে, তখনই তাহাদের জাতীয় ভাবের উদয় হয়। এই জাতীয় ভাব বা সাজাত্যবোধ (Nationalism) জাতিগঠনের চরম পরিণতি। সাজাত্যবোধ দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের উপর গড়িয়া উঠে। একটি দ্বারা সম-সুখদুঃখভোগী ও সম-আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল লোক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। অপরটি অসম-সুখদুঃখভোগী ও অসম-আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসমষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভেদের সৃষ্টি করে ও বিভিন্ন জাতিতে পরিণত করে।

জাতীয়ভাবের উৎপত্তি (Growth of Nationalism)

জাতীয় ভাব আদিম মানবসমাজে অত্যন্ত স্থূলভাবে বিদ্যমান ছিল। যুক্তিবিহীন এক অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ জাতিবন্ধন বা গোষ্ঠিবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হইত। তাহার রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে এই অন্ধ

প্রবৃত্তি একটি ধারণায় পর্যবসিত হয়। মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রজাসাধারণের উপর উৎপীড়ন সুরু হইলে মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তি তাহাদিগকে অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করিবার অনুপ্রেরণা আনিয়া দেয়। অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, ও রাশিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র যখন যুক্তভাবে পোল জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদের এই সাজাত্যবোধ বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইল, তখন হইতে এই অনুপ্রেরণা একটা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে কার্যকরী রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইল। এই রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি সমস্ত নিপীড়িত জাতিকে আত্মসচেতন করিয়া তাহাদের মধ্যে সাজাত্যবোধ-জাগরণে সহায়তা করে। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইয়ুরোপের রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা যখন ভিয়েনায় শান্তিবৈঠকে মিলিত হন তখনও পর্যন্ত তাঁহারা এই সাজাত্যবোধের কার্যকরী শক্তিকে উপেক্ষা করেন। ফলে, এই উপেক্ষিত সাজাত্যবোধ বিপ্লবের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের ক্ষুদ্র জাতিগুলি তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া স্বাধীন জাতি বলিয়া ঘোষণা করিল। পশুবলের দ্বারা এই সাজাত্যবোধ দমন করা প্রথম মহা-সমরের একটি অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথম মহাসমর সমাপ্তির পর ভার্সাই সন্ধিবৈঠকে সর্বপ্রথম এই সাজাত্যবোধকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও সাজাত্যবোধ-ভিত্তিতে কতকগুলি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের জাতিগুলি এই সাজাত্য-বোধ ভিত্তির উপর তাহাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার অর্জন করে। বর্তমান যুগে এই সাজাত্যবোধ এমনই এক গভীরতর ঐক্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে যে, পশুবলের প্রয়োগে এই শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। প্রথম মহাসমরের পর ইয়ুরোপে সাজাত্য-বোধের যে বিজয় অভিযানের সূত্রপাত হইয়াছিল, দ্বিতীয় মহাসমর পরি-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ করিয়া এশিয়া মহাদেশের নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে এই অনুভূতি একটি দুর্বার কার্যকরী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। ভারত, বর্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। যে দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও

ধর্মের পার্থক্য ভিত্তি করিয়া ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের জন্ম হইল, ২৪ বৎসর পর সেই জাতি ও ধর্মের ভিত্তি মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ক্রীশ্চান অধ্যুষিত বাংলা দেশের অভ্যুদয় ঘটিল। এইরূপে মানুষের আদিম অন্ধ প্রবৃত্তি রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ধিত হইয়া রাজনৈতিক জীবনের চরম পরিণতির পথ সুগম করিল।

এক জাতি এক রাষ্ট্র (One Nation one state)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন একদল লোক বাহ্যিক বা ভাবগত ঐক্যের দ্বারা নিজেদের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে আত্মসচেতন হয়, তখনই তাহারা তাহাদের পৃথক্ সত্তা এক পৃথক্ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক আত্মসচেতন জাতি ইহার নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করিয়া ইহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাঁচাইতে চায়। জাতির এই দাবী স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি সম-অনুভূতি-সম্পন্ন জাতি লইয়া গঠিত হইবে—একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক বিরোধী-মনোভাবাপন্ন জাতির সমন্বয় উভয় জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার অন্তরায় হইবে। বৈরিভাব, আত্মকলহ প্রভৃতি মুক্ত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক জাতি পরস্পরের সহিত শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করিয়া নিজের সভ্যতা ও কৃষ্টির অবদানে জগৎ-সভ্যতার উন্নতি করিতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রগুলি 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের চিন্তাবীর জন স্টুয়ার্ট মিল জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

ভারতীয়গণকে কি এক জাতি বলা যাইতে পারে (Is India a Nation ?)

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ভারতকে অনেকে একজাতি বলিয়া গণ্য করিতেন না। বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ্ প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয়গণকে এক জাতি বলিয়া পরিগণিত করা যুক্তি-সম্মত ছিল না। দেশবিভাগের পরবর্তী কালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতকে আর এক জাতি বলিয়া স্বীকার না করা অসঙ্গত। সত্য বটে,

ভারতে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি জাতিগঠনের বিভিন্ন বাহ্যিক ঐক্যের অভাব। কিন্তু ভারতবাসী আজ এক গভীরতর ভাবগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এক ভাবগত ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের দরবারে তাহাদের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই হইল ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শ। এই আদর্শ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আজ সফল হইতে চলিয়াছে। সুতরাং তিন জাতি-সমন্বিত সুইস দেশ ও বহু জাতি-সমন্বিত সোভিয়েত দেশের মত ভারতীয়গণও আজ অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

আত্মনির্ধারণের নীতি ও ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Right of Self-determination and arguments for and against it)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের নির্বন্ধাতিশয্যে স্বীকৃত হইল, তখন এই নীতিতে ইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে জাতির ভিত্তিতে পুনঃসংগঠিত করিবার একটা প্রচেষ্টা চলিল। প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের এই দাবীকে আত্মনিধারণের নীতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই নীতির ভিত্তিতেই 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' মতবাদ সমর্থিত হয়। যে সমস্ত জাতি তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের শেষ ধাপে উপনীত হইয়াছিল, এই আত্মনির্ধারণ-নীতি সেই সমস্ত নষ্টগৌরব জাতিকে তাহাদের ভাব, ভাষা, ধর্ম, তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। সুতরাং এই নীতি প্রয়োগের উপর একটা মুমূর্ষু জাতির জীবনমরণ নির্ভর করে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রযোজ্যতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সম্যক বিকাশের জন্য ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে পরপ্রভাবমুক্ত স্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজন। ভারতের দৃষ্টিভংগী, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ইংলণ্ড

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ প্রস্ফুটনের জন্য ইংলণ্ডের শাসনপাশ মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নতুবা ভারতের জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়।

এইরূপে প্রত্যেক জাতিই যদি স্বাধীনভাবে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ করিতে পারে তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানে মানব-সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়। প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির অবদানে লাভবান হয়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ফলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষের স্থলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় ও যুদ্ধের আশংকা হ্রাস পায়। কারণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের মনোভাব দূর করিয়া সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। সুতরাং রাজনৈতিক স্বাধিকারের ভিত্তি বহুজাতি না হইয়া এক জাতি হওয়া উচিত।

ইংলণ্ডের চিন্তাবীর জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই নীতির বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একটি আবশ্যিক শর্ত হইল যে, রাষ্ট্রের সীমারেখা প্রধানতঃ জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সহিত এক হওয়া চাই। ("It is in general a necessary condition of free institutions, that the boundaries of government should coincide in the main with those of nationalities.")। 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতির সমর্থক হইলেও মিল্ 'সাধারণভাবে বলিতে গেলে' এবং 'প্রধানত.' এই দুইটি কথার দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নাও হইতে পারে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের নীতি অবাধভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা ও ইহার অবাধ প্রয়োগ জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কি প্রতিকূল তাহা বিবেচনা করা উচিত। যাঁহারা সর্বক্ষেত্রে এই নীতির অবাধ প্রয়োগ সমর্থন করেন না, তাঁহারা এই নীতির বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বহুদিন হইতে এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূভাগে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করিবার ফলে সম-সুখদুঃখভোগী হইয়া এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তী কালে কোন আকস্মিক কারণে সেই ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণ নীতির

ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার দেওয়া জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অপর পক্ষে, যদি একটি জাতির দুইটি অংশ সমুদ্র, পর্বত বা অন্য কোন নৈসর্গিক ব্যবধানে দুইটি পৃথক্ ভৌগোলিক ভূভাগের বাসিন্দা হয়, তাহা হইলেও তাহাদের এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একত্র সমাবেশ দ্বারা আত্মনির্ধারণের নীতি কার্যকরী করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যাহাকে পূর্বে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয় বলা হইত, ঘটনাচক্রে বর্তমান শতাব্দীতে তাহা সম্ভব, সুতরাং বাঞ্ছনীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। প্রথম মহাসমরের পর গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে প্রথম লোক-বিনিময়ের সূত্রপাত হয়। তুরস্কের গ্রীক অধিবাসিগণ গ্রীসে ফিরিয়া আসে আর গ্রীসের তুর্ক অধিবাসিগণ তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করে। লোক-বিনিময়ের মাধ্যমে আত্মনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই সমস্যার সমাধান জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়। ইদানীং কালে ভারত-বিভাগের ফলে লোক-বিনিময় অনেক স্থলে পরোক্ষভাবে বাধ্যতামূলকরূপে দেখা দিয়াছে। এরূপ অধিক সংখ্যায় ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে লোক-বিনিময় বোধহয় অন্য কোন দেশে ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠিত পুরাতন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে যদি এই নীতির অবাধ প্রয়োগ হয় তাহা হইলে বর্তমান আটাশটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইয়ুরোপে প্রায় আটষট্টিটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে। ক্ষুদ্র সুইস্ দেশ ও ইংলণ্ড প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই তিনটির কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। পরন্তু দেশ-বিভাগের ফলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলির সন্তোষজনক সমাধান না হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সর্বদাই আত্মকলহে লিপ্ত থাকিয়া তাহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির অগ্রগতিতে যত্নবান হইতে পারিবে না।

তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলি অচিরে কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তাঁবেদার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থতঃ, এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-পুনর্গঠন কার্য একবার আরম্ভ হইলে ইহার আর পরিসমাপ্তি হইবে না। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতি এই আত্মনির্ধারণ-

নীতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র-রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবী করিবে। ফলে, ঐক্যবদ্ধ বহু রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। রাজনীতি গ্রাম্য দলীয় মনোভাবে পর্যবসিত হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ, ক্ষমতালিপ্সা, প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রভৃতি প্রবল আকার ধারণ করিয়া যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলিবে। ফলে শান্তির পরিবর্তে জগতে এক অশান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পঞ্চমতঃ, এই নীতির অবাধ প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলি (Poly-national States) যে এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অনগ্রসর বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, একথা ঠিক নয়। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র জ্ঞানবিজ্ঞানে, সভ্যতায়, কৃষ্টিতে ও শক্তিসামর্থ্যে অনেক এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র (Mono-national States) অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ও শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইস্ দেশ, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

এতদ্ব্যতীত এই আত্মনির্ধারণ-নীতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি অসন্তুষ্ট জাতির দাবীর দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে না—ইহার স্বীকৃতি ও ইহার প্রয়োগ-ক্ষমতা নির্ভর করে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ইচ্ছার উপর। সুতরাং এই আত্মনির্ধারণের নীতি একটি নৈতিক দাবী মাত্র, কাজেই ইহাকে একটি আইনসঙ্গত দাবী বলা চলে না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আলাণ্ড দ্বীপ এই আত্মনির্ধারণ-নীতির ভিত্তিতে যখন ফিনল্যাণ্ড দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুইডেনের সহিত মিলিত হইবার দাবী জানাইল, তখন লীগ অব্ নেশন্‌সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ জাতির এই দাবী শুধু নৈতিক দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

সুতরাং এই দাবী সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহা সর্বক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রযোজ্য নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া যখন একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবিশিষ্ট জাতিকে বলপূর্বক অপর একটি জাতি তাহার পদানত করিয়াছে বা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও সমগ্র জনসমষ্টির এক বিশাল অংশ তাহাদের পৃথক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এই স্বাধিকার দাবী করে—সেই সকল ক্ষেত্রে আত্ম-নির্ধারণ-নীতি প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড

ভারত, বর্মা ও কোরিয়ায় এই দাবী নৈতিক ও আইনসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশুবলের সাহায্যে জাতির এই আত্মনির্ধারণের দাবী চিরদিন দমিত রাখা সম্ভব নয়—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য।

জাতির অন্যান্য দাবী (Other Rights of Nationalities)

আত্মনির্ধারণের দাবী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলেও জাতির অন্যান্য দাবীগুলি পূরণ করা উচিত। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি অন্যান্য কতকগুলি অধিকারের দাবী করিতে পারে। এই অধিকারগুলি পূরণ করিতে জাতীয় রাষ্ট্রের যত্নবান হওয়া উচিত।

(ক) জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার (Right to Exist)

একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসমষ্টিকে তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিবার অধিকার দেওয়া উচিত। জাতীয় রাষ্ট্র এমন কোন নীতি বা আইন বলবৎ করিবে না, যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইতে পারে।

(খ) ভাষা রক্ষার অধিকার (Right to Language)

একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বাস করিতে পারে। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান, শিক্ষাকার্য বা সাহিত্য ও কৃষ্টির পুষ্টিসাধন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। বলপূর্বক সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষার ব্যবহার বন্ধ করিয়া তাহাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাধ্যতা-মূলক করা উচিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা দান করিবার দাবী করিতে পারে না।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার (Right to Retention of Local Laws and Customs)

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই অধিকারের দাবী লীগ অব নেশন্স্ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক জাতির সামাজিক জীবন কতকগুলি আচার, রীতি-নীতি ও প্রথার দ্বারা বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতীয় জীবনের অনেকখানি স্থান এই সামাজিক প্রথাগুলি অধিকার করিয়া থাকে। কোন সম্প্রদায়ের এই সামাজিক প্রথাগুলি যদি সমগ্র জাতীয় জীবনের বা জাতীয়

নৈতিক জ্ঞানের পরিপন্থী না হয় তাহা হইলে এই প্রথাগুলি সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(ঘ) আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to Legal and Political Equality)

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক এই দুই প্রকার অধিকারের দাবী করিতে পারে। যোগ্যতা থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকই— সে যে সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন, ভোট দিবার ক্ষমতা বা সরকারের সর্ববিধ কার্যে যোগদান করিবার অধিকার অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া কাহারও অধিকারের কোন তারতম্য হওয়া উচিত নয়। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া কোন সম্প্রদায় রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনরূপ বিশেষ অধিকার ভোগের দাবী করিতে পারে না।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানসিক অনুভূতির সক্রিয় বহিঃপ্রকাশের ফলে কতকগুলি জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া এক জাতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই অনুভূতি মানুষকে তাহার অধিকারগুলি সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া নির্যাতিত পরাধীন জাতিগুলির মুক্তিলাভের পথের সন্ধান আনিয়া দেয়। প্রত্যেক মুক্ত জাতি তাহার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া জগৎসভায় তাহার ন্যায্য আসন লাভ করিতে পারে। জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহার জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে পারে। জাতীয়তাবোধ মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে যে, জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি লোক তাহার সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রতি নির্বিচারে আনুগত্য স্বীকার করিবে, কেন-না, জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও ইহার উন্নতিবিধান প্রত্যেক মানুষের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনই হইল প্রথম ও শেষ অধ্যায়।

সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়তাবোধ একটি মহান্ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিসমষ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই সমষ্টিগত জীবনের পক্ষেও জাতীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য। মানবসভ্যতা বিকাশের জন্যই প্রত্যেক প্রকৃত স্বতন্ত্র জাতির এই অধিকার থাকা প্রয়োজন। এই অধিকারের বলে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব গুণাবলী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিয়া জগৎ সভ্যতাকে উন্নততর করিতে সহায়তা করে।

রাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ফলে বহু দেশে একনায়কত্বের অবসান হইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদ জাতির মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারিত করিয়া একটা মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা দেয়।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ (Perverted Nationalism)

কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে জাতির পক্ষে তাহার পরিণাম ভয়াবহ। জাতীয়তাবাদের বিকৃতি দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। প্রথম কারণটি জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, আর দ্বিতীয়টি নির্ভর করে এক জাতির সহিত অন্য জাতির সম্পর্কের উপর। কতকগুলি ক্ষুদ্র উপজাতি বা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ জাতি গঠিত হয়। মূলগত ঐক্য থাকিলেও এই সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইতে পারে, বা বিভিন্ন আচার-প্রথার দ্বারা তাহাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এইরূপ এক বা একাধিক সম্প্রদায় মূল জাতি হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক ভাষা, ইতিহাস ও কৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এক পৃথক্ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। এই মনোভাবের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ক্যারেন জাতি বর্মা হইতে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতেছে। শ্লোভাক ও শ্লোভেনিস্ সম্প্রদায়গুলিও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে পৃথক হইবার দাবী জানাইতেছে। এই মনোভাবকে বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বলা চলে। এই মনোভাবের ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি তাহার সমষ্টিগত সংহতি ও ঐতিহ্য হারাইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে—স্বদেশপ্রেম প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়। ভারতেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই

স্বার্থপ্রণোদিত ভেদবুদ্ধি কিছু কার্যকরী হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব জাতীয় জীবনের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। সুতরাং অঙ্কুরেই ইহার বিনাশসাধন না করিলে জাতীয় জীবনে ইহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি স্বীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টিতে অত্যধিক আস্থাবান হইয়া অপর জাতিকে অবজ্ঞা করিতে শিখে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ছলে-বলে-কৌশলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতির উপর চাপাইতে চায়, তখন এই জাতীয়তাবাদ আক্রমণাত্মক মূর্তি ধারণ করিয়া বিশ্বশান্তির অন্তরায় হইয়া উঠে। এইরূপ বিকৃত জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা শুধু নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা বা আস্থারূপে প্রকাশ না পাইয়া অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। ফলে, শক্তিশালী জাতিসমূহ নিজেদের জাতীয় গর্ব ও শক্তি প্রচার করিবার মানসে দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা হরণ করে। বর্তমান যুগে এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ জাতির অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবী ব্যাপিয়া ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। বড় বড় জাতিগুলি শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রয় করিবার জন্য দুবল রাষ্ট্রগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রসারের উদ্দেশ্যে অথবা খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের অজুহাতে ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের বহু ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অনেক সময় এই উপনিবেশ খুঁজিতে গিয়া দুই বা ততোধিক বৃহৎ জাতির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বিদ্বেষমূলক ও আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবোধের জন্য প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সহিত অথবা বিজিত জাতিগুলির সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সেজন্য বিরাট সামরিক বাহিনী ও রণসম্ভার রাখা প্রয়োজন; কিন্তু ইহার ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, সামান্য কোন কারণেই জাতিগুলির মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ ও স্বার্থপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদের পরিণামে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়। স্বার্থের হানাহানির কি ভীষণ পরিণাম, বিগত দুইটি মহাসমর তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। অধুনা আবার কয়েকটি বৃহৎ বিত্তশালী রাষ্ট্র অর্থসাহায্য দিয়া দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর কর্তৃত্ব

স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে।

জাতীয়তাবাদ একটা মহান আদর্শ। এই আদর্শে প্রত্যেক জাতিকেই প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। ইহার মূলনীতি হইল—আপনি বাঁচ ও অপরকে বাঁচিতে দাও। কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট জাতীয়তাবাদ একটা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক এবং যখন এই জাতীয়তাবাদ ইহার মহান্ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আক্রমণাত্মক হইয়া উঠে তখন ইহা যুদ্ধবাদে পরিণত হয় আর যুদ্ধবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই জন্মদাতা।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ হইতে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি হয়। যখন কোন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র বলপূর্বক দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নানাভাবে এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় স্বার্থসাধনের জন্য শোষণ করে, তখনই সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হয়। বিজিত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, শিক্ষাদীক্ষা, কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য বিজেতাগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করে। সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া একই শাসনব্যবস্থা ও একই আইন বলবৎ করা হয়। ইংলণ্ড, জার্মানি, ইতালি, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি এমন কি ক্ষুদ্রকায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিশালী রাষ্ট্র বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড পররাজ্য গ্রাস করিয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রসার করিতে দ্বিধা করে নাই।

সাম্রাজ্যবাদীরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের এই লুণ্ঠনকার্য সমর্থনের অভিপ্রায়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বেরও অবতারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, দুর্বল ও অক্ষম জাতিগুলির পক্ষে তাহাদের নিজেদের অগ্রগতির জন্য সবল ও বুদ্ধিমান্ জাতির সংস্পর্শে আসা উচিত বা সভ্য জাতিগুলি অনগ্রসর জাতিগুলিকে সভ্যতার উচ্চস্তরে পঁহুছিয়া দিবার জন্ত তাহাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং, সভ্য জাতিগুলি নিঃস্বার্থে এই গুরুভার বহন করিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদের পিছনে যে-কোন দার্শনিক তত্ত্ব থাকুক না কেন,

সাম্রাজ্যবাদ যে একটা সর্বনাশা প্রলয়ংকর শক্তি ইহা আজ অবিসংবাদী সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে, মানবসভ্যতা ও প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে বিপদস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই আজ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিয়া সাম্রাজ্যবাদের কঠোরতা হয়ত কিছু প্রশমিত করা যায়। এই ব্যবস্থা দ্বারা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশ-গুলিতে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism)

আন্তর্জাতিকতা শুধু একটা রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতির ব্যাপার নহে, ইহার একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে। এই অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গণ্ডির বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ বিশ্বমানবতার স্তরে উপনীত হইতে পারে। আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু পরবিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করা দূষণীয়। স্বার্থসম্বন্ধে তৎপর হওয়া মানুষের ধর্ম, কিন্তু স্বার্থপরতা সর্বথা পরিত্যাজ্য। ব্যক্তিগত জীবনে যদি এই নীতি প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনেও ইহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় জীবনে এই নীতি কার্যকরী হইলে আন্তজাতিক বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক কলহের আর সম্ভাবনা থাকে না। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব—এই মহান্ আদর্শ কোন জাতিবিশেষের জন্য রচিত হয় নাই, পরন্তু ইহা সর্বজাতির আদর্শ—এই মনোভাবের উদয় হইলে আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিয়া পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত ও কৃষ্টিগত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক জাতি যদি তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিবাদের অবসান ঘটিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলিকে নানাভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে

আনিয়া আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। আন্তর্জাতিকা-বৃদ্ধির পথে একমাত্র অন্তরায় হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম শক্তির প্রযোজনীয়তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কতকগুলি মহান্ কর্তব্য পালনের উপর। রাষ্ট্রের এই কর্তব্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করিয়া মানুষের সর্বাত্মক অগ্রগতিতে সাহায্য করা। যে সার্বভৌম শক্তির বলে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলাব রক্ষক বলিয়া পরিগণিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদের দ্বাবা বিশ্বশান্তি-বিনাশে সেই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ হইতে পারে না—মানুষ যেদিন এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে সেদিন জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিবে না—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'—এই নীতির দ্বারাই জাতীয় জীবন পরিচালিত হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বর্তমান জগতে এই নৈতিক মনোভাবের উদয় না হইলে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধন হইল মানব সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)

পারস্পরিক সহযোগিতা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির পক্ষে অপরিহার্য এই সত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর অনেক জাতি বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারা জাতীয়তাবাদের মূল প্রকৃতি চরম সার্বভৌমত্বের দাবী আংশিকভাবে পরিত্যাগ করিয়া আন্তজাতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করাইবার জন্য লীগ অব নেশন্সের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের গঠনগত ও প্রকৃতিগত ত্রুটি থাকায় সম্পূর্ণরূপে ইহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে বিফলকাম হয়। বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র ইহার সদস্য না থাকায় ইহার মর্যাদা ও কার্যকারিতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর আংশিক সাফল্যের সহিত কাজ করিবার পর ইতালির সহিত আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা বিশেষরূপে প্রকটিত হয় এবং ইহার নিষ্ক্রিয়তার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ত্বরান্বিত হইয়া ইহার ব্যর্থতা প্রমাণিত করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলি ও নিরপেক্ষ জাতিগুলি এবার বুঝিতে পারিল যে, একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশা যুদ্ধব্যবসায় বন্ধ না করিতে পারিলে মানুষের আর পরিত্রাণের পথ নাই। তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধশেষে একটা আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা তীব্র হইয়া উঠে। প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং বৃটিশ ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানদ্বয়ের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামে গঠিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান গঠন ব্যাপারে বিজিত জাতিগুলির কোনপ্রকার প্রভাব ছিল না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য (Objectives of the U. N.)

লীগ অব্ নেশন্সের ন্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও এক মহান্ আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল শান্তিপূর্ণ পন্থায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নানাভাবে জাতিপুঞ্জ সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা এবং মূল্য-সংরক্ষণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের সনদের ভূমিকায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া যাহাতে সকল জাতি পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে পারে তাহার জন্যও জাতিপুঞ্জ সংকল্প করিয়াছে। সংকল্প কার্যে পরিণত হইলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। প্রায় ১০০টি রাষ্ট্র লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত।

সংগঠন—সাধারণ সভা (General Assembly), স্বস্তিপরিষদ্ বা নিরাপত্তা পরিষদ্ (Security Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ্ (Trusteeship Council), দপ্তরখানা (Secretariat) এবং আরও কতকগুলি শাখাসমিতি লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত।

সাধারণ সভা (General Assembly)

এই সভায় বৎসরে একটিমাত্র অধিবেশন বসে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অধিবেশন বসিতে পারে।

ইহা ছাড়া, এই সভা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে।

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করা ও সেই সম্পর্কে সুপারিশ করা সাধারণ সভার কাজ।

নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ্ (Security Council)

পাঁচজন স্থায়ী (সাম্যবাদী চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সদস্য ও দুই বৎসরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত দশ জন—মোট পনের জন সদস্য লইয়া স্বস্তি পরিষদ্ গঠিত। এই পরিষদের প্রধান কার্য হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান করা। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ্ আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে। ১। যে-কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে, ২। বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, ৩। মধ্যস্থতার দ্বারা মীমাংসা করিতে পারে, ৪। সালিশী ব্যবস্থার সুপারিশ করিতে পারে, অথবা ৫। স্বস্তি পরিষদ্ নিজে মীমাংসা করিতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তি-স্থাপনের ক্ষমতা আছে। এই পরিষদের যে-কোন সিদ্ধান্ত পরিষদের স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের একজনের অসম্মতিতে বলবৎ করা যায় না।

কর্মসংস্থা (Secretariat)

একজন প্রধান-সচিবের অধীনে আটটি বিভাগ দ্বারা দপ্তরখানায় কার্য পরিচালিত হয়। প্রধান-সচিব স্বস্তি পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

আন্তর্জাতিক বিচারালয় হল্যাণ্ডের হেগ শহরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত পনর জন বিচারপতিকে লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আদালতের প্রধান কার্য।

অছি পরিষদ্ (Trusteeship Council)

অছি পরিষদের উদ্ভব হয় লীগ অব্ নেশেন্সের সময়ে। কিছু পরিবর্তিত আকারে এই পরিষদ্ নূতনভাবে সংগঠিত হইয়া অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছি শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অছি শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economical and Social Council)

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সাধারণ সভা এই পরিষদের মোট ২৭ জন সদস্য নির্বাচন করে। এই সভার কার্য ইহার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, কৃষি সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, মানবীয় অধিকার সংস্থা প্রভৃতি হইল এইরূপ কয়েকটি সংস্থা।

বিগত কয়েক বৎসরের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এই সংগঠন অনেকটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীমান্ত-সমস্যা, ইরাণের তৈল লইয়া বিরোধ ও কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এখনও পর্যন্ত করিতে পারে নাই। যে জাতীয় চীন সরকারের চীনের মূল ভূখণ্ডে কোন অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না, সেই চীন

বহুদিন পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য ছিল, আর বাস্তব চীন সাধারণ-তন্ত্র সরকার ইংলণ্ড, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াও জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত ছিল। জার্মানি, জাপান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া যে অবস্থায় রাখা হইয়াছিল তাহাতে স্বভাবতই জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও বিশেষ আস্থা থাকিতে পারে না। স্বস্তি পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী পদ পাঁচটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত আছে। এই নীতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সমানাধিকারের পরিচায়ক নহে। আণবিক শক্তি ও হাইড্রোজেন বোমা নিয়ন্ত্রণ করিতে এখনও পর্যন্ত এই সংগঠন সমর্থ হয় নাই।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ

স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ: রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন কিন্তু একই ঐতিহ্য দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একদল মানুষকে স্বজাতীয় মানুষ বলা যাইতে পারে। যখন এই স্বজাতীয় মানুষ বংশগত, ভাষাগত বা অন্য কোন ঐক্য দ্বারা আরও গভীরভাবে একতাবদ্ধ হয়, তখন তাহাদের জাতীয় জনসমাজ বলা হয়। এই জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইলে যখন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র গঠন করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা ভাবগত ঐক্য—এইগুলিকে সাধারণতঃ জাতিগঠনের উপাদান বলা হয়। কিন্তু জাতিগঠনে বাহ্যিক উপাদান অর্থাৎ কুলগত বা ভাষাগত ঐক্য অপেক্ষা ভাবগত ঐক্য অর্থাৎ সম-সুখদুঃখবোধ ও সম আদর্শে অনুপ্রাণিত ঐক্য অধিক সহায়ক।

জাতীয়তা বা সাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির ব্যাপার। ইহা প্রধানতঃ ভাবগত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবগত ঐক্য আছে বলিয়া সুইস্ জাতি কুল বা ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও এক শক্তিশালী ও দেশপ্রেমিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতি ইহার নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য পৃথক্ রাষ্ট্রগঠনের দাবী করে।

জাতির এই স্বাতন্ত্র্যবোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন হইলে জাতিগুলির মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ অনেক হ্রাস পাইবে। প্রত্যেক জাতি নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে সাহায্য করিতে পারে।

আত্মনির্ধারণের নীতি : 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'—এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রগঠনের যে দাবী তাহাকে জাতির আত্মনির্ধারণের দাবী বলা হয়। সম্পূর্ণ পৃথক্ ঐতিহ্যবিশিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের দাবী প্রযোজ্য হইলেও সকল ক্ষেত্রে ইহার অবাধ প্রয়োগ সম্ভব নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। জাতির এই দাবী দ্বিধাশূন্যভাবে স্বীকৃত হইলে বহু প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচীন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। পরস্পরের সহিত কলহবিবাদে বিশ্বশান্তিও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

কোনও জাতিকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ধারণের অধিকার না দিলেও তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা, সামাজিক প্রথা, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়গুলিতে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।

জাতীয়তাবাদ : প্রকৃত জাতীয়তাবাদ একটা উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শ মানুষকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে ও মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা যোগায়। জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি করিয়া এই স্বদেশপ্রেম মানুষকে বিশ্ব-মানবতার ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ যখন বিকৃত হয়—স্বদেশপ্রেম যখন ভিন্ন দেশের প্রতি বিদ্বেষে পর্যবসিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয়তাবোধকে নষ্ট করিতে উদ্যত হয় তখন এই জাতীয়তাবোধ মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। এই বিকৃত জাতীয়তাবোধ হইতে যুদ্ধবাদের উৎপত্তি হইয়া ইহা শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে করায়ত্ত করিয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। এই সাম্রাজ্যবাদ মানবসভ্যতার পরম শত্রু। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের দোষগুলি কিছু পরিমাণে দূর করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিকতা : মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিকতা হইল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপর এই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি

লীগ অব্ নেশেন্স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠন দ্বারা জাতিসমূহ এই আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার কালেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার কল্পনা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আগ্রহাতিশয্যে যুদ্ধ শেষে বিজেতা ও নিরপেক্ষ জাতিসমূহকে লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনা ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে প্রায় একশত জাতি এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যভুক্ত।

নিম্নলিখিত বিভাগগুলি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত:

১। সাধারণ সভা—সদস্য জাতিসমূহ হইতে পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে।

২। স্বস্তি পরিষদ্—পাঁচজন স্থায়ী ও দশজন অস্থায়ী—মোট পনের জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। এই পরিষদ্ই হইল জাতিপুঞ্জের শাসন-বিভাগ। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন।

৩। অছি পরিষদ্—আত্মনির্ধারণের অধিকারহীন জাতিসমূহের শাসন ব্যাপারে এই পরিষদ্ তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে।

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্—সাতজন সদস্য লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। জাতিসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে এই পরিষদ্ আলোচনা করে।

৫। আন্তর্জাতিক আদালত—আন্তর্জাতিক আইন-সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে এই আদালত মীমাংসা করে।

ইহা ছাড়াও খাদ্য, স্বাস্থ্য, শ্রমিক-সম্পর্কিত বিষয়গুলির সমাধান করিবার জন্য বহু শাখা-সমিতি আছে।

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে সাফল্য লাভ করিলেও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা নিরোধ করিতে এখনও পর্যন্ত সফলকাম হইতে পারে নাই।

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

নাগরিক সংজ্ঞা (Definition of a citizen)

সাধারণ অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে যাহারা বাস করে তাহাদের ঐ শহরের নাগরিক বলা হয় ও নাগরিক হিসাবে তাহারা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে 'নাগরিক' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগরিক শব্দটির একটি প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নাগরিক শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বাস করিতেন। এই নগর-রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত না। যে সমস্ত অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও অপর্যাপ্ত সময় ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। সমাজের অবশিষ্টাংশ, যথা, ক্রীতদাস, মজুরশ্রেণী, স্ত্রীলোক প্রভৃতি যাহারা পরনির্ভরশীল বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইত না। এই জাতীয় নিম্নস্তরের লোকগুলিকে সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত না ও সেইজন্য তাহারা নাগরিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত থাকিত। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনাকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই ছিল নাগরিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানকালে নাগরিক শব্দের ব্যবহার আর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নাই। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বহুগুণ বৃহত্তর। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে গেলে আর পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। কোন রাষ্ট্রের সদস্য হইলেই তাহাকে বর্তমানে নাগরিক বলা হয়। যে লোক একটি রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বাস করিয়া সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া

লইয়াছে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের সদস্যরূপে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় এবং অন্যদিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্র ইহার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে কোন কর্তব্যপালনের দাবী করে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি এ কথা মনে করা যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ শুধু কতকগুলি সুযোগ সুবিধার অধিকারী, রাষ্ট্রসম্পর্কে তাহাদের কোনরূপ কর্তব্যসম্পাদনের বাধ্যবাধকতা নাই তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিয়া উন্নততর সমাজ-জীবন প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সমষ্টিগত জীবন যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা আদর্শ স্তরে উন্নীত হইতে পারে সেইজন্য প্রত্যেক নাগরিকই এরূপভাবে তাহার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান না করিলেও প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাকা চাই। প্রত্যেক নাগরিকই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্নবান্ হইবে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নাগরিকতা হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ—যে সমাবেশে সমাজ জীবন সহজ ও সুগম হয়। এইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল—সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা-দ্বারা-প্রাপ্ত মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ। (Citizenship "is the contribution of one's instructed judgment to public good") সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এরূপভাবে তাঁহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয়। এইজন্য অবশ্য প্রত্যেক নাগরিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া চাই।

নাগরিক ও বিদেশী (Citizen and Alien)

নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিদেশী ভিন্নদেশবাসী ও ভিন্ন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে বিদেশী কার্যব্যপদেশে

সাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিতে হয় ও সেই দেশের প্রবর্তিত করও তাহাকে দিতে হয়। বিদেশী কতকগুলি পৌর অধিকার ভোগ করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে না; বা সে দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে অসদাচরণের জন্য দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিদেশীকে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। বিদেশী সাময়িকভাবে যে দেশে বাস করে সে দেশ পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে সে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। নাগরিক স্বদেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক, সর্বত্রই তাহার নিজ রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব—এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান—তাহাকে পালন করিতেই হইবে।

পূর্ণ নাগরিক ও অসম্পূর্ণ নাগরিক (Citizen and National)

অনেক সময় ভোটদান-ক্ষমতাকে নাগরিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করা হয়। যাহাদের এই ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় আর যাহারা এই ক্ষমতার অধিকারী নয় তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় না। কিন্তু এ কথা সব সময় সত্য নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটা নির্দিষ্ট বয়সের জনগণ ভোটদানের অধিকারী হয়। ভারতবর্ষে একুশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ভোটাধিকার জন্মে। একুশ বৎসর বয়সের কম কোন স্ত্রী-পুরুষের এই ভোটদানের অধিকার নাই, সুতরাং উপরি-উক্ত মত অনুসারে তাহারা নাগরিক নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্থায়ী অধিবাসী প্রত্যেকেই এই রাষ্ট্রের নাগরিক। একুশ বৎসরের কম বলিয়া তাহাদিগকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়। তাহারা পূর্ণ নাগরিক না হইলেও নাগরিক পদবাচ্য। এইরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক ভোটদান-ক্ষমতাবিহীন নাগরিককে অসম্পূর্ণ নাগরিক (National) বলা হয়।

নাগরিক ও নির্বাচক (Citizen and Elector)

অনেক রাষ্ট্র বিদেশীকে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভোটদান-ক্ষমতা প্রদান করে। বিদেশী ভোটদান করিতে পারে বলিয়া তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা চলে না, আর অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদান ক্ষমতাবিহীন

বলিয়া তাহাকে নাগরিক বলিয়া গণ্য না করা কোন মতে সমীচীন নয়। যাহা্র ভোটদান ক্ষমতা আছে, তাহাকে নির্বাচন বলা হয়।

নাগরিক ও প্রজা (Citizen and Subject)

নাগরিক ও প্রজা উভয়েই রাষ্ট্রের অধিবাসী। কিন্তু নাগরিক শব্দটির সহিত একটা পদমর্যাদা ও কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত আছে, কিন্তু প্রজাপদবাচ্য লোকের সেইরূপ কোন মর্যাদা বা অধিকারের দাবী স্বীকৃত হয় না। স্বৈরাচারী শাসনে জনগণের উপর শাসক তাহার নিজ ইচ্ছাকে বলপূর্বক কার্যকরী করে। স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। শাসিত শাসকের সম্পূর্ণ পদানত। এই ব্যবস্থায় শাসিতের কোন অধিকার থাকে না আর অধিকার থাকিলেও সেগুলি শাসকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত জনসাধারণকে সাধারণতঃ প্রজা আখ্যা দেওয়া হয়। ইংরাজ শাসনকালে ভারতীয়েরা বৃটিশ রাজ্যের প্রজা বলিয়া অভিহিত হইত। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপে নিকৃষ্ট পদবাচ্য প্রজা শব্দটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Modes of acquisition of Citizenship)

নাগরিক অধিকার দুই উপায়ে পাওয়া যায় :—প্রথম, জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়, অর্জনের দ্বারা। জন্মাধিকার দুই প্রকার—একটি হইল রক্তগত অধিকার (*Jus Sanguinis*), অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (*Jus Soli*)। প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিল সে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশেই হউক না কেন। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সে সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মে জন্মভূমি বিচার করিয়া নাগরিকত্ব স্থির হয়।

যদি কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই দুইটি নীতি প্রয়োগ করিয়া নাগরিকত্ব স্থির করে, তাহা হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া কথা উঠিত পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জাত হউক না কেন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। অপর পক্ষে ভিন্ন দেশের পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত অধিকারের বলে তাহাকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক হইয়া এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে অন্য দেশের নাগরিক হইতে পারে।

স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের স্বামীর নাগরিকত্ব পায়। বৈবাহিক সম্বন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ও সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়া নূতন নাগরিকের অধিকার পাওয়া যায়।

সকল রাষ্ট্রই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইরূপে কোন দেশের জন্মগত নাগরিক যদি ভিন্ন রাষ্ট্রের অর্পিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাহা হইলে তাহাকে অর্জিত নাগরিকত্ব (Naturalized citizenship) বলা হয়। বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয় বা সেনাবিভাগে যোগদান—সবগুলি উপায়ই হইল নাগরিক অধিকার অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অর্পিত নাগরিকত্ব একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশী যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী বিদেশীর সে দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় বসবাস করিতে হয় ও তাহাকে সৎস্বভাবাপন্ন বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়। সে দেশের ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় প্রয়োজন হয়। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে রাষ্ট্র ইহার ইচ্ছামত বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে আবেদন করিতে হইবে এবং কোন বিচারালয় বা শাসন-বিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদন বিচার করিয়া নাগরিকত্ব প্রদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে।

এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জিত হইলে বিদেশীও সেই দেশের জাত নাগরিকদের

সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা আবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলেও তাহাকেও সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে না। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাগরিকত্ব (Citizenship in a Federal State)

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বিবিধ শাসনযন্ত্রের—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়—অস্তিত্ব বর্তমান। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণকে যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। নাগরিকগণ উভয় সরকার-প্রণীত আইন দ্বারা বাধ্য থাকে এবং উভয় সরকার প্রবর্তিত কর তাহাদিগকে প্রদান করিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের এইরূপ দ্বিবিধ নাগরিকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে রাজ্যে বাস করে সেই রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে তাহারা সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া পরিচিত হয় এবং সেই রাজ্য-সম্পর্কিত নির্ধারিত অধিকার ও কর্তব্য দ্বারা তাহাদের পরিচালিত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই দ্বিবিধ নাগরিকত্বের কোন্‌টি মৌলিক ও শ্রেষ্ঠতর? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন আইন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই সংশোধন আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। নাগরিকগণ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে এবং তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়াই যে রাজ্যে বসবাস করে, সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। নাগরিক-গণ এক রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া অন্য রাজ্যের নাগরিক হইতে পারে। শুধুমাত্র বাসস্থান দ্বারাই রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব স্থির হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন করিতে হইলে নির্ধারিত আইনানুযায়ী পদ্ধতিতে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু কোন রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন করিতে কোনরূপ আইনানুমোদিত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ

করিতে হয় না। শুধুমাত্র বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এক রাজ্যের নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া অন্য রাজ্যের নাগরিকত্ব অর্জন করা হয়।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইলে প্রথমে কোন ক্যাণ্টনের নাগরিক হইতে হয়। ক্যাণ্টনের নাগরিক হইলেই স্বভাবতই সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হওয়া যায়। সুতরাং সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাণ্টনের নাগরিকত্ব হইল মুখ্য আর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হইল গৌণ।

জার্মানীতে ওয়াইমার শাসনতন্ত্র অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব মৌলিক ও প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও সমগ্র ভারতে মাত্র একদফা ভারতীয় নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যেখানে দ্বিবিধ নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়, সে সমস্ত দেশে ভোটাধিকার ও সরকারী কার্যে লোকনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ নাগরিকগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু ভারতে এক-নাগরিকত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও নাগরিকগণকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সোভিয়েত নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

নাগরিক অধিকারের অবসান (Loss of Citizenship)

নূতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকত্বের অবসান ঘটে। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকের পূর্ব নাগরিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জমি খরিদ বা বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরীগ্রহণ, দীর্ঘকাল স্বদেশে অনুপস্থিতি বা গুরুতর অপরাধে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে।

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় (Hindrances to good Citizenship)

নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে। যে গুণগুলি থাকিলে সু-নাগরিক হওয়া যায় সেগুলি হইল

বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সকল সময়ে নিজের অধিকার ও কর্তব্যসম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। অধিকারসম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহী আর কর্তব্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে নাগরিক জীবন কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সু-নাগরিক নিজের অধিকার সম্বন্ধে যেরূপ সচেতন, অন্যের অধিকার সম্বন্ধেও তাহার অনুরূপ শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত। এইরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম-সুখদুঃখ-বোধের দ্বারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অভাবে নাগরিক জীবন আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দলাদলি ও কলহে লিপ্ত হইয়া উঠে। পূর্ণ-নাগরিক জীবনের যে সকল অন্তরায় আছে তন্মধ্যে উদাসীনতা (Indolence) হইল প্রধান। উদাসীনতার কারণ হইল কর্তব্যবোধের অভাব। নাগরিক জীবন যে শুধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথা প্রত্যেক নাগরিকেরই স্মরণে রাখিতে হইবে। কি সাধারণ নাগরিক কি সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকেরই স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। সাধারণ নাগরিকের হয়ত অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা না থাকিতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ভোটদান করা, রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধানে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া অংশ গ্রহণ করা, বা যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য করা বিষয়ে কোন নাগরিকেরই উদাসীন থাকা উচিত নয়। নাগরিকেরা যদি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে সাহায্য না করে, তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়া নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষুন্ন করিতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র জনমত ও জনসহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণ যদি এই সহযোগিতা-প্রদানে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (Private Self-interest) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজ জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। নাগরিকগণ অনেক সময় যোগ্যতা বিচার না করিয়া আত্মীয়তা

বন্ধনের জন্য অথবা অর্থলোভে অযোগ্য লোককে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সরকারী চাকুরীতেও অনেক সময়ে যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ না হইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অযোগ্য লোককে নিয়োগ করা হয়। এরূপ স্বার্থপ্রণোদিত কার্যের দ্বারা দেশের ও দশের অনিষ্ট করা হয়। এতদ্ব্যতীত দলগত রাজনীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও (Party spirit) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া দেখা দেয় তখন জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। এই দলীয় স্বার্থের প্রাবল্যে আয়ারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে।

অন্তরায়গুলির প্রতিকার (Remedies)

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ নাগরিক হওয়া যায়। লর্ড ব্রাইস্ এই সম্পর্কে দুইটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন। প্রথম হইল, শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন এবং দ্বিতীয় হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার নৈতিক মানের উন্নয়ন। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটদানে বাধ্য করা, নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করা, অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের শাস্তিবিধান, ইত্যাদি। শাসনব্যবস্থায় এইগুলি বলবৎ করা হইলে লোকের উদাসীনতা, দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজন হইল লোক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা। মানুষের মনে কর্তব্যবোধ জাগরিত করিতে হইবে। কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ যখন কাজ করে তখন তাহার দ্বারা মহৎ অনেক কিছু সম্ভব হয়। মানুষের মধ্যে কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিবার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষার ফলে নাগরিকগণ সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সমাজ-জীবনকে উন্নততর করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা ফলপ্রসূ হইতে হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার বীজ সমাজদেহে একবার প্রোথিত

হইলে আজই হউক আর কালই হউক রাজনৈতিক জীবনে সোনার ফসল ফলাইবে। ভারতীয় জনগণের নৈতিক মান যে আজ এত নীচু হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

সংক্ষিপ্তসার

নাগরিকতা—একটি রাষ্ট্রের আনুগত্যে বদ্ধ স্থায়ী বাসিন্দাকে নাগরিক বলা হয়। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে; আর তাহাদের কতকগুলি দায়িত্বও আছে।

বিদেশী হইল ভিন্নদেশবাসী। যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে বাস করে সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহার অবস্থানকালে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেও বিদেশী সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায়, কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না।

নাগরিক হইলেই নির্বাচক হওয়া যায় না। অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটদান করিবার অধিকার না থাকিলেও অন্য সকল রকম সুযোগ-সুবিধা তাহারা পায়। আবার বিশেষ আইনের বলে বিদেশীও অনেক সময় নাগরিকদের মত ভোটদান অধিকার অর্জন করিতে পারে। বিদেশী শাসনে বা স্বৈরাচারী শাসনে জনগণের শাসনব্যাপারে বিশেষ কোন অধিকার থাকে না বলিয়া তাহাদের প্রজা বলা হয়।

নাগরিকতা অর্জনের উপায়—পুত্রকন্যাগণ পিতৃত্বের ভিত্তিতে অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন দেশ উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহাতে অনেক অসুবিধা হয়। ইহা ছাড়া, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়। ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন করিয়া নূতন নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। এই পদ্ধতিগুলির দ্বারা পূর্বতন নাগরিকত্ব বিনষ্ট হয় ও নূতন নাগরিকত্ব সৃষ্ট হয়।

পূর্ণ-নাগরিক জীবনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার—নাগরিক জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় হইল সাধারণের কাজে

উদাসীনতা, স্বার্থপরতা ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন ও শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা নাগরিকদের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে পারিলে অন্তরায়গুলি দূর হইয়া সু-নাগরিক গঠন সম্ভব হইবে।

নবম অধ্যায়

স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার

(Liberty, Equality and Right)

স্বাধীনতা—সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছানুসারে আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। অন্যের নির্দেশ পালন করিয়া কেহই পরনির্ভরশীল হইতে চায় না। ব্যক্তির এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সাধারণতঃ স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই 'স্বাধীনতা' শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, এই শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞানির্দেশের পূর্বে কি কি বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, 'স্বাধীনতা' শব্দটি **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty)** অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল প্রত্যেক মানুষের অবাধ কার্যক্ষমতা। প্রাকৃতিক স্বাধীনতাবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষ যখন প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত তখন প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া সেইগুলির দ্বারা তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজ্যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত যে স্বাধীনতার অধিকারী মানুষ ছিল, সেই স্বাধীনতাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলা হয়। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার বা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। সুতরাং এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে সবলের স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না।

দ্বিতীয়তঃ, **পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty)** অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার ভোগ করা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাহার নাগরিকগণকে এই পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ

সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর স্বাধীনতা বলা হয়; প্রত্যেক রাষ্ট্র ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া এই স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা বলিতে **রাজনৈতিক স্বাধীনতা** (Political Liberty)-ও বুঝায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারসমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বয়স্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার ও সরকারের অনুসৃত নীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার অধিকারগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতাপর্যায়ভুক্ত। এই স্বাধীনতা মানুষকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার অধিকার ও দায়িত্বসম্বন্ধে সজাগ করে। সুতরাং এই স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

চতুর্থতঃ, স্বাধীনতা বলিতে বর্তমান যুগে **অর্থনৈতিক স্বাধীনতার** (Economic Liberty)-ও উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা স্বাধীনতার সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। অনশনের ভয় বা বেকার হইবার ভয় থাকিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। পৌর স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা একদিকে যেমন মানুষকে তাহার অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন করে অপর দিকে তদ্রূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তাহার অন্যবিধ স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তোলে। সমাজে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের একটা মান স্থির করিতে হইবে। জীবনধারণের এই নির্ধারিত মান অনুযায়ী যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনযাপন করিতে পারে, রাষ্ট্রের সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার, নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

বলা হয়। কতিপয় দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা শব্দটি **জাতীয় স্বাধীনতা** (National Liberty) অর্থেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল ভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারে না। যে স্বাধীনতা অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে সে স্বাধীনতা কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না। বৃটিশ-শাসিত ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সব দিক্ দিয়াই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর ব্যক্তি-স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

স্বাধীনতা সংজ্ঞার মধ্যে দ্বন্দ্ব (Contradiction in the Notion of Liberty)

স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির বিভিন্ন অর্থ সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তির বিভিন্ন পরিচয় বুঝায়। স্বাধীনতার প্রধানতঃ তিনটি রূপ দেখা যায়, যথা, পৌর, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এই প্রত্যেকটি রূপই সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তির কতকগুলি নির্দিষ্ট অধিকার সূচিত করে।

পৌর স্বাধীনতা হইল নিছক ব্যক্তিগত (personal) অধিকার। নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে যে-কোন ব্যক্তি সামাজিক মানুষ হিসাবে এই অধিকার-গুলি ভোগ করিতে পারে। রাজনৈতিক অধিকারগুলি হইল সাধারণ সম্পর্কিত। নাগরিক হিসাবেই এই সুবিধাগুলি পাওয়া যাইতে পারে। শ্রমিক বা কর্মী হিসাবে ব্যক্তি যে অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে, তাহাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। সুতরাং স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির এই তিনটি বিভিন্ন রূপ হইতে ইহার জটিল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ব্যক্তি হিসাবে মানুষ নাগরিক বা কর্মী হিসাবে মানুষ হইতে সব সময়ে পৃথক নাও হইতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা সংজ্ঞাটির এই বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে ঐক্য থাকিলেও প্রায়শই বিরোধ ঘটে। পৌর, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক সময় একে অন্যের প্রতিকূল আচরণ করে। আইনের সহিত স্বাধীনতার যে বিরোধ তাহা অনেক সময় নিষ্পত্তিযোগ্য। কিন্তু

স্বাধীনতার এই তিনটি রূপের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব নহে। বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সব দেশেই বিবেচিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্রষ্টা ও ধারক শাসন কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে ব্যক্তিগত এই পৌর স্বাধীনতার দ্বারা রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হইতেছে তাহা হইলে সরকার ব্যক্তিগত এই পৌর স্বাধীনতা সংকুচিত অথবা বিনষ্ট করিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সহিত সরকারের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংঘর্ষ ঘটে।

অপর পক্ষে পৌর স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাত ঘটিতে পারে। আধুনিক শিল্প-প্রধান উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ সচরাচর ঘটিয়া থাকে। মালিক পৌর স্বাধীনতার বলে নির্দিষ্ট শর্তে শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারেন। আবার শ্রমিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বলে তাহার মজুরী পরিমাণ ও কার্যের অন্যান্য শর্তাদি সম্পর্কে দর কষাকষি করিতে পারে। এইরূপে পৌর ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। এই বিরোধ যদি উভয় পক্ষের আপস দ্বারা মীমাংসিত না হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভিভাবক সরকারের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। সরকারী হস্তক্ষেপ এই বিরোধ বৃদ্ধি বা আপস করিতে পারে, অথবা সরকার নিজে এই বিরোধে জড়িত হইতে পারেন।

স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক
(True Liberty and its relation to Law and Authority)

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার অবাধ ক্ষমতা। ব্যক্তিগত এই অবাধ ক্ষমতাপ্রয়োগের ফলে সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনতা দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। অধিক বলশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করিতে পারে। এইরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারী হইবে; অপরপক্ষে, দুর্বল ও নিরীহপ্রকৃতির লোকদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হইবে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে,

স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকই এই স্বাধীনতার সম-অধিকারী। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের সুযোগ পায়, সেইজন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের অভিভাবক হিসাবে স্বাধীনতা ভোগ করিবার মত অবস্থা সমাজে সৃষ্টি করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাপ্রয়োগকে কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয়, আর আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়া নিজ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি এই বিধি-নিষেধগুলি দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত না করিত, তাহা হইলে মানব-সমাজের অবস্থা হব্‌স্‌-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থার অনুরূপ হইত। সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা এইরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের অন্য লোকের অনুরূপ স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যাহত না হয়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধাবোধের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে রাষ্ট্র সাহায্য করে। আর এইজন্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনতা অধিকতর বলশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী নয় (Sovereignty and liberty are not contradictory)। আইন হইল রাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র, যাহার দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-সাধনের জন্যই রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করে। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র তিন প্রকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনত

যদি অন্য ব্যক্তির অধিকতর শক্তির জন্য ব্যাহত হয়, তাহা হইলে আইন তাহাকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট না হইতে পারে, সেজন্যও রাষ্ট্র বিশেষ ধরণের আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বারা রাষ্ট্র সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এই স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। এই সুযোগসৃষ্টির জন্যই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুপালন ও শিশুরক্ষা, মাদকদ্রব্য-বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতকর আইন প্রবর্তন করিতেছে। সুতরাং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। আইনের নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা হ্রাস না করিয়া স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও নিরংকুশ করে। একে অন্যের পরিপূরক। এইজন্যই বলা হয় যে, আইন হইল প্রকৃত স্বাধীনতার নির্দেশক (Law is the condition of liberty)।

স্বাধীনতা ও সাম্য (Liberty and Equality)

স্বাধীনতা ও সাম্য—রাজনৈতিক জীবনের এই দুইটি মহান্ আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একটি আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ। সাম্য-নীতি প্রবর্তিত না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা কার্যকরী হইতে পারে না, আর স্বাধীনতার অভাবে সমাজে সাম্যনীতিও প্রবর্তিত হইতে পারে না।

সাম্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল সকল মানুষই সমান। এই নীতি মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না। সুতরাং এই অর্থে ব্যবহৃত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের সমান আয় করিবার ও সমান আচরণ পাইবার অধিকারী হয়। কিন্তু সাম্যের প্রকৃত অর্থ সমানত্ব নয়। বাস্তব-জীবনে দেখা যায় কি শারীরিক, কি মানসিক গঠনে কোন দুই ব্যক্তিই সমান নয়। মানুষ অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। বয়োপ্রাপ্তির পরও তাহাদিগের মধ্যে এই সমানত্বের অভাব থাকিয়া যায়। সুতরাং সাম্যনীতির প্রয়োগ করিয়া শ্রেষ্ঠকে নিকৃষ্টের পর্যায়ে বা নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠের পর্যায়ে পরিগণিত করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে না। সকল ব্যক্তিকেই যে সমান হইতে হইবে বা সমান করিতে হইবে এ অর্থেও সাম্য শব্দটি ব্যবহার করা যায় না। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইল, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বংশ, পদমর্যাদা,

জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে সমান সুযোগ দিতে হইবে। এদিকে যেমন রাষ্ট্র সকলকে তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার দান করিবে, অন্য দিকে তদ্রূপ ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে পার্থক্য-মূলক সুযোগ দান করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র সকল নাগরিককেই সমান চক্ষে দেখিবে। কোন কারণে কাহাকেও বিশেষ সুযোগের অধিকারী করিবে না, আর কোন কারণে কাহাকেও ন্যায্য সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে না। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। সমান সুযোগ পাইলেই যে প্রত্যেকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া পূর্ণ নাগরিক হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের পথে যে সমস্ত অন্তরায় থাকে, রাষ্ট্র এই সমান সুযোগ দান করিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথের সেই অন্তরায়গুলি দূর করিতে সাহায্য করে। সমান সুযোগ দান করিবার পরও যদি কোন ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের উন্নতি করিতে না পারে সেজন্য রাষ্ট্র দায়ী হইতে পারে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিরও অসমানত্ব প্রমাণিত হইয়া তাহার যোগ্যতানুযায়ী কার্যে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। সমাজ জীবনে অধিকতর উপযোগী কার্য সম্পাদনের জন্য মানুষে মানুষে যে পার্থক্য করা হয় একমাত্র তাহাই সমর্থনযোগ্য।

সাম্যনীতির উদ্ভব ও বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ (Origin of the Ideal of Equality and its application to Modern States)

মানুষে মানুষে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন সাম্যের দাবী করে—এই বিষয়টির আলোচনা প্রয়োজন। মানুষের এই সাম্যের দাবী ঐতিহাসিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন মানব-সমাজ—স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ প্রজা, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সময়ের পরিবর্তনে এই নির্যাতিত নিম্ন শ্রেণীর লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সুখ-সুবিধার সম-অংশীদার হইবার দাবী জানাইল ও কালক্রমে উভয় শ্রেণীর পার্থক্য দূরীভূত হওয়ায় তাহারা সমান পর্যায়ে উপনীত হইতে লাগিল।

নৈতিক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও সাম্যের এই দাবী অস্বীকার

করা যায় না। প্রত্যেক মানুষই অল্পবিস্তর বুদ্ধির অধিকারী। এদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে একটি পশুর সঙ্গে একজন মানুষের যে পার্থক্য আছে অন্য একজন মানুষের সঙ্গে সে পার্থক্য নাই। বুদ্ধিজীবী বলিয়া সকল মানুষই সমান ও পশুজগৎ হইতে পৃথক্। সমাজে সকল মানুষের বুদ্ধি সমান হয় না। মানুষে মানুষে বুদ্ধির তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু সমষ্টিগত জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ লোকের কর্তব্য হইল তাহার অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসর প্রতিবেশীকে সাহায্য করা। সমাজে সকলকে সমান স্তরে না আনিতে পারিলে সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। তাই অসমর্থ লোককে সমর্থ করিয়া তোলা সমর্থ ব্যক্তির একটি নৈতিক কর্তব্য বলিয়া সকল সমাজেই পরিগণিত হয়। সুতরাং নৈতিক দিক্ দিয়াও এই সাম্যের দাবী সমর্থিত হয়। সমাজে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শুধু রাজনৈতিক সাম্য অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের সমান ভোটদানক্ষমতা প্রদান করিলেই চলিবে না, সাম্যনীতি সমাজ-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দেশেই সমগ্রভাবে এই সাম্যনীতি প্রবর্তিত হইতে পারে নাই। সমাজব্যবস্থায় যতদিন জাতিভেদ থাকিবে ততদিন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই এই সাম্যভাব কার্যকর হইতে পারে না। ইংলণ্ড দেশে অভিজাত ও সাধারণ সম্প্রদায় থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জন্মগত পার্থক্য খুব কম। ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী দেশ হইতে মানুষে মানুষে এই প্রভেদ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যভাব এখনও প্রায় কোন দেশেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সাম্যনীতির অভাব বিশেষরূপে দেখা যায়। অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে রাজনৈতিক বা সামাজিক সাম্য কার্যকর হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে জনগণ আইনের দিক্ দিয়াও সুবিচার পাইতে পারে না। বিত্তশালী ব্যক্তিগণ অন্যায় করিয়াও অর্থের বলে শাস্তি এড়াইতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তিগণ অর্থের অভাবে সুষ্ঠুভাবে তাহাদের মামলা পরিচালনা না করিতে পারায় অনেক সময় ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সাম্যনীতি প্রবর্তিত না হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজে এই

সাম্যপ্রতিষ্ঠার পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূর করিয়া পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties of Citizenship)

সাধারণ অর্থে নাগরিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা না করিবার অবাধ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যাহাতে কার্যকরী হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এই নাগরিক অধিকার আর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তস্কর মনে করে চৌর্যবৃত্তিতে তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সমাজ যদি তস্করের এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া উঠিবে। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থায় তস্করের এই অধিকার অনধিকার বলা হয়। রাষ্ট্র তস্করের এই অধিকার স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহা খর্ব করিয়া দেয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আইনের দ্বারা সমাজে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করা যে-পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিয়া সমষ্টিগত জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল অধিকার প্রয়োজন, সেগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহায়ক সেইগুলি প্রকৃত অধিকার, আর যেগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এই অধিকারের দাবীতে। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ রাখে ও পরিবর্তে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক (Correlation of Rights and Duties)

কোন নাগরিক অধিকারই অবাধ বা অসীম নয়। সমাজ-জীবনে প্রত্যেকটি অধিকার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, আর এই গণ্ডির সীমারেখা স্থির হয় অন্য লোকের অধিকারের দ্বারা। নাগরিকের

যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্বও আছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আমার যেমন বাঁচিয়া থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার অধিকার আছে, অন্যেরও সেইরূপ অধিকার আছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই বলিয়া অন্যের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না। আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অন্য সকলেরও সেইরূপ অধিকার আছে এবং অন্যের সেই সকল অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিবার দায়িত্ব আমার রহিয়াছে। আমার অধিকার রক্ষা করা যেমন অন্যের কর্তব্য, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না-করা তেমনি আমার কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ। প্রথমতঃ, বলা যায়, আমার যেটি অধিকার অন্যের পক্ষে তাহা কর্তব্য। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, অপর সকলের কর্তব্য হইল আমার জীবননাশ না-করা। দ্বিতীয়তঃ, অন্যের যাহা অধিকার আমার তাহা কর্তব্য। অন্য লোকের জীবনের অধিকার ক্ষুণ্ণ না-করা আমার কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, আমার ও অন্য লোকের অধিকারগুলিকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, যেহেতু রাষ্ট্রই আমাদের অধিকারগুলির স্রষ্টা ও রক্ষক সেই হেতু আমাদের সকলের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, সময়মত কর দেওয়া ও সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা। ব্যক্তির পক্ষে যাহা কর্তব্য রাষ্ট্রের পক্ষে সেগুলি অধিকার। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধিকারগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে অন্যের অধিকার কোনমতে ক্ষুণ্ণ না হয়। অধিকারের এইরূপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিয়া সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়।

নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ (Classification of Rights)

যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা করে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হয়। এই

আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও বলা হইয়া থাকে, যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতামাতা পুত্রের দ্বারা পালিত হইবেন—এই অধিকার তাঁহারা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভঙ্গ করিলে আইনতঃ কেহ শাস্তি পায় না। সেইজন্য এইগুলিকে নৈতিক অধিকার (Moral Rights) বলা হয়।

প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights)

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করা হয়, .যেগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বা মানুষের স্বভাবজাত অধিকার বলিয়া পরিচিত।

প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি সহজাত, চিরন্তন ও অপরিত্যাজ্য অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং এই অধিকারগুলি সে সমাজ বা রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে উপভোগ করে। মানুষের গাত্রচর্মের বর্ণ ও মানুষের চলৎশক্তি যেরূপ তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রাকৃতিক অধিকারগুলিও তদ্রূপ মানুষের প্রাকৃতর অংশ (They are as much a part of his nature as the colour of his skin and the power of locomotion") মানুষের এই সহজাত ও অপরিত্যাজ্য অধিকারগুলির মধ্যে 'জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সুখের অনুসরণ করিবার অধিকার' উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক দার্শনিকগণের লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ থাকিলেও এই মতবাদ চুক্তিবাদী দার্শনিক হবস্, লক্ ও রুশো কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়। উপরি-উক্ত তিনজন লেখক রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে এক প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানব-জীবনের সূত্রপাত করেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল, তাহাকে ইঁহারা প্রাকৃতিক বা স্বভাবজাত অধিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হবস্ মানুষের যে অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কোন দিক্ দিয়াই গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল তাহা শুধু শ্রেষ্ঠতর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত মানুষ এই অধিকারগুলির প্রয়োগ করিত। হবস্-বর্ণিত প্রাকৃতিক স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র।

লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারী

ছিল এবং এই স্বাধীনতা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাকৃতিক অধিকারগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার যে অসুবিধা ছিল তাহা দূর করিবার নিমিত্তই মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। তাহারা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলিকে—যথা, জীবন, ধন ও স্বাধীনতা—সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবশিষ্ট অধিকারগুলি সমর্পণ করিল।

রুশোর মতেও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যে পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারী ছিল চুক্তি দ্বারা তাহারা সেই অধিকারগুলি সমষ্টিগত ইচ্ছায় (General will) সমর্পণ করিয়া সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রত্যেকে পুনঃপ্রাপ্ত হইল। রুশোর মতে প্রাকৃতিক অধিকারগুলি অপরিত্যাজ্য নহে। সমষ্টিই হইল সকল অধিকারের উৎস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসী দেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় এই প্রাকৃতিক অধিকার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মার্কিন দেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে, স্রষ্টা কর্তৃক মানুষের উপর কতকগুলি অপরিত্যাজ্য অধিকার অর্পিত হইয়াছে ("endowed by their creator with certain inalienable rights")। ফরাসী দেশে স্বাধীনতার ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, সকল মানুষই স্বাধীন ও সমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল মানুষের এই জন্মগত সাম্য ও সমানাধিকার সংরক্ষণ করা। এই অধিকারগুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার এবং অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কালের সমাজ-বিজ্ঞানিগণ এই মতবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে গিডিংস (Giddings) বলেন যে, প্রাকৃতিক অধিকার হইল সেই সমস্ত অধিকার যে অধিকারগুলি সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম দ্বারা প্রযুক্ত সমাজের পক্ষে প্রয়োজনের অধিকার এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, আইনানুমোদিত অধিকারগুলি যদি উপরি-ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক অধিকারগুলির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাহারা স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। সুতরাং গিডিংসের মতে প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সহজাত, চিরন্তন বা অপরিত্যাজ্য হইতে পারে না। সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয়ের

ক্ষেত্রেই একমাত্র এইগুলি প্রযোজ্য। সমাজনীতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এই অধিকারগুলি উপভোগ করা যায়।

সমালোচনা (Criticism)

প্রাকৃতিক অধিকারগুলির বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, 'প্রাকৃতিক' শব্দটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, 'প্রাকৃতিক' শব্দটির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অবর্তমানে কোন্ কোন অধিকারগুলি মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার-পর্যায়ভুক্ত তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকারের দাবী সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, চুক্তিবাদী লেখকগণ রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে যে অধিকারগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। সত্য বটে যে, মানুষ জন্মের সময় হইতে কতকগুলি অধিকার লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু অধিকারগুলিকে প্রকৃত অধিকার না বলিয়া শক্তিসম্ভূত কতকগুলি ক্ষমতা বলা অধিকতর সমীচীন। মানুষের এই সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে অধিকারে রূপান্তরিত হয়। মানুষ সামাজিক পরিবেশে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। মানুষের সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়া অধিকারে পর্যবসিত হয় এবং এই অধিকারগুলি যুগপৎ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উৎকর্ষসাধনে সহায়ক হয়। মানুষের সমাজ-জীবনের ধারা পরিবর্তনশীল—সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্বে যাহা অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইত বর্তমানে তাহা শুধু অনধিকার বলিয়া বিবেচিত হয় না—বর্তমানে সেগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। পূর্বে ভূম্যধিকারিগণের কৃষিভৃত্য রাখিবার অধিকার সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে ভূম্যধিকারিগণের এই অধিকার অন্যায় ও অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

উপরি-উক্ত সমালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ-নিরপেক্ষ কোন অবাধ বা চিরন্তন অধিকার মানুষের থাকিতে পারে না। সমাজ হইল সকল অধিকারের উৎস ও রক্ষক। যে সামাজিক পরিবেশে মানুষ

যাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনে সক্ষম হয়, সেই পরিবেশের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ হইল রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং প্রাকৃতিক অধিকার হইল সেই অধিকারগুলি, যে অধিকারগুলির সাহায্যে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সমষ্টির কল্যাণের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ব্যক্তিগত কল্যাণসাধন করা সম্ভব হয়।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার

আইনগত অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—পৌর অধিকার (Civil Rights) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)। পৌর অধিকারগুলি মানুষের সভ্য জীবন যাপন করিবার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এগুলির অভাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা মানুষ দেশের শাসন-পরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

পৌর অধিকার (Civil Rights)

নাগরিকগণের যে-সমস্ত পৌর অধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

১। জীবন রক্ষার অধিকার (The Right to Life). ২। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (The Right to personal Freedom). ৩। কাজ করিবার অধিকার (The Right to Work). ৪। সম্পত্তির অধিকার (The Right to Property). ৫। স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার (The Right to Contract). ৬। বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (The Right to Speech, Press and Assembly). ৭। ধর্মাচরণের অধিকার (The Right to Religion and Conscience). ৮। বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার (The Right to Marriage and Family life). ৯। শিক্ষার অধিকার (The Right to Education).

১। **জীবন রক্ষার অধিকার**—বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারই হইল মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অধিকার। অন্যান্য অধিকারগুলির ভোগ এই অধিকারটির উপর নির্ভর করে। এই কারণে আত্মহত্যা করা সর্বদেশে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। আত্মরক্ষা করিবার অধিকারও

জীবন ধারণের অধিকারের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের সম্মান রক্ষার জন্য কোন আততায়ীর জীবন নাশ করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক হত্যাকারী বলিয়া বিবেচিত হয় না। মানবজাতির অস্তিত্ব যাহাতে বজায় থাকে, সেজন্য বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করাও জীবন রক্ষার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক পৈতৃক বা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, রাষ্ট্র সে সমস্ত লোকের বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

২। **ব্যক্তিগত অধিকার**—এই অধিকারটির তাৎপর্য হইল স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা ও দৈনন্দিন জীবনের কার্যসূচী স্থির করিবার অধিকার। মানুষের যদি এই অধিকারটি না থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। এই অধিকারটির মর্ম হইল যে, কোন ব্যক্তিকে আইনসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনভাবে গ্রেপ্তার বা আটক রাখা চলিবে না। শাসনকর্তৃপক্ষ যদি বে-আইনীভাবে কাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে বিচারালয়ের সাহায্যে (Writ of Habeas Corpus) শাসনকর্তৃপক্ষের কাজে বাধা দিবার ব্যবস্থা থাকে। তবে আপৎকালে বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকিতে পারে।

৩। **কাজ করিবার অধিকার**—কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার জীবন রক্ষার অধিকারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমর্থ বেকার লোক সমাজের গলগ্রহস্বরূপ। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমস্ত সমর্থ লোকের হিতকর কর্মসংস্থান সাহায্যে সকলকেই বাঁচিয়া থাকিবার এই প্রাথমিক অধিকারটি দান করা। যে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে এই অধিকার দানে অক্ষম সে রাষ্ট্র নাগরিকগণের আনুগত্য দাবী করিতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক বিন্যস্ত হওয়া উচিত, যে ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের ব্যাপক পার্থক্য দূর হইয়া সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অনুকূল পরিবেশে নির্ধারিত সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ মজুরি পাইবার অধিকারও কাজ করিবার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। বহু দেশে বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও এক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য

কোন দেশে কাজ করিবার অধিকার আইনসঙ্গত অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

৪। **সম্পত্তির অধিকার**—এই অধিকারের বলে লোকে তাহার আয়ত্তাধীন দ্রব্যসমূহ স্বাধীনভাবে ভোগ-ব্যবহার করিতে পারে। সম্পত্তির ভোগ-দখল ব্যতীতও লোকের নিজ সম্পত্তি দান, বিক্রয় ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতাও এই অধিকারটির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকারটি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, যেহেতু এই অধিকারটি সমাজে অসাম্য সৃষ্টি করিয়া শ্রমবিমুখ এক নিষ্কর্মা সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ চিরস্থায়ী করে, সেইহেতু এই অধিকারটির কোন নৈতিক সমর্থন থাকিতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অসদ্ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি সমর্থন-যোগ্য না হইলেও সমাজহিতকর কার্য সম্পাদনের পারিশ্রমিকরূপে যে সম্পত্তি অর্জিত হয়, তাহা সর্বক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। সদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তির ভোগ-দখলের অধিকার স্বীকৃত না হইলে লোকের কাজের অনুপ্রেরণা নষ্ট হইবে এবং গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া বিভিন্ন লোকের বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সম্ভাবনা রহিত হইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন না করিয়া সম্পত্তির ন্যায্য বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এমন কি, সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশেও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তবে এই অধিকারও অবাধ নহে। সরকার কর ধার্য করিয়া সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সম্পত্তির মালিকানা ও ভোগ-দখল সরকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। জাতীয় সংকটকালে সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাময়িকভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

৫। **চুক্তি করিবার অধিকার**—এই অধিকারের ভিত্তিতে লোকে অপরের সহিত সমানভাবে ন্যায়সঙ্গত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। এই অধিকারটি হইল আভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি এবং এই অধিকার সাহায্যেই একটি জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হইতে পারে। কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ বা দাস-ব্যবসায় প্রভৃতি বে-আইনী চুক্তি করিবার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না।

৬। **বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা**—বাক্-স্বাধীনতা সর্বদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ,

এই অধিকারটি ব্যতীত মানুষের চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইয়া মানুষ পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে না। এই অধিকারটির অবর্তমানে মানুষ চিন্তা ও ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদান দ্বারা উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠন করিতে পারে না, ফলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হইল বাক্-স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা প্রয়োগ করিয়া জনগণ তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা ও সরকারী অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়।

বাক্-স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার তাৎপর্য হইল যে, লোকে যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়াই দেশের এই মতামত অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচারিত হওয়া সম্ভব। এইজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

অনেকের মতে যুদ্ধের সময় এই বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষাকল্পে সংকুচিত বা স্থগিত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু এ যুক্তি শর্তহীনভাবে সমর্থনযোগ্য নহে। কোন সরকার যদি অন্যায়ভাবে বা দলীয় স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অহেতুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল এই সরকারের কার্য প্রতিরোধ করা। কোন ব্যক্তিকে বলপূর্বক সরকারী নীতি বা সরকারী কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিতে বাধ্য করা গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে যুদ্ধাবস্থায়ও নাগরিকগণের এই বাক্-স্বাধীনতার কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা সমর্থনযোগ্য নহে।

নানাবিধ সংঘ গঠন করা ও সভা-সমিতিতে একত্রিত হইয়া আলাপ আলোচনা করা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সাধারণ স্বার্থের উপরই এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাষ্ট্র শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকল্পে লোকের এই অধিকার সংকুচিত করিতে পারে।

৭। **ধর্মাচরণের অধিকার**—ইহার অর্থ হইল যে, অন্যের ধর্মমতে হস্তক্ষেপ না করিয়া বা শান্তি-শৃংখলা বা প্রচলিত নীতিবোধ লংঘন না করিয়া লোকে যে-কোন ধর্মমত পোষণ বা প্রচার করিতে পারে। ধর্ম হইল

ব্যক্তিগত জীবনের একটি নিজস্ব ব্যাপার এবং এই কারণে রাষ্ট্র সাধারণতঃ লোকের ধর্মীয় জীবনে হস্তক্ষেপ করে না।

৮। **বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার**—পরিবার গঠনের অধিকারের অর্থ হইল বিবাহ করিয়া সন্তান-সন্ততির পিতা হওয়া এবং পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, কারণ পরিবারই হইল সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এই পারিবারিক সম্পর্কের অলংঘনীয়তা ও পবিত্রতার উপর সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃংখলা নির্ভর করে। কিন্তু সামাজিক শান্তি-শৃংখলার পরিপন্থী কোন পারিবারিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। এই কারণে রাষ্ট্র অস্থায়ী বিবাহ-বন্ধন (**Temporary Marriage**) অনুমোদন করে না এবং অনেক রাষ্ট্র বহু-বিবাহ সমর্থন করে না। রাষ্ট্র কতকগুলি পারিবারিক অধিকার স্বীকার করিলেও বিবাহিত জীবনের কতকগুলি বিশেষ করিয়া সন্তান-পালন সম্পর্কে কর্তব্য বলবৎ করে।

৯। **শিক্ষার অধিকার**—শিক্ষা ব্যতীত মানবচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে, তাই বর্তমান যুগে এই অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলিয়া সভ্যদেশে পরিগণিত হয়। শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক চেতনার উন্মেষ হয় না। তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার সুবিধা দান করা।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনতঃ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করিতে পারে, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকার-গুলির কোনটিই অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে না। প্রত্যেক অধিকারই কর্তব্যের গণ্ডির দ্বারা সীমায়িত। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু আমি যদি অন্যের জীবননাশ করি তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইব। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া মনে করি তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে; কিন্তু আমার স্বাধীন মতামত এরূপভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্যের মতামত অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় না হয়, বা অন্যের সুনাম নষ্ট না হয়, বা

সমাজের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকে। সেইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাকল্পে সরকার অনেক সময় এই অধিকারগুলিকে সংকুচিত করিতে পারে। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজবিরোধী হিংসাত্মক-কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে বা শান্তি-শৃংখলাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, জনকল্যাণের জন্য সরকার সে অধিকারগুলিও খর্ব করিতে পারে।

বর্তমান যুগে নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, কোন অধিকারই অবাধ বা সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সর্বকালের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এই অধিকারগুলির সংজ্ঞা নির্ণয় করা বা এইগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করা যায় না। যেহেতু এই অধিকারগুলি একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়, সেই হেতু সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অধিকারগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। মানুষের শিক্ষার অধিকার বা জীবিকা অর্জনের অধিকার পূর্বে স্বীকৃতিলাভ করে নাই বা বর্তমান জগতে বহুদেশে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত হয় নাই, কালের বিবর্তনে বহুদেশে এই অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিয়া মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সুতরাং অধিকারগুলি গতিশীল—স্থিতিশীল নহে।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অধিকারগুলি আপেক্ষিক ও প্রত্যেকটি অধিকার অন্যের অনুরূপ অধিকার ও সামাজিক হিতবোধ দ্বারা সীমায়িত—অর্থাৎ প্রত্যেকটি অধিকার ব্যক্তি কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রযুক্ত হইবে। অধিকারগুলি অবাধ, অসীম বা চিরন্তন না হইলেও মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয় এবং এইজন্য এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন ধর্মমত

পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকার-গুলি সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অন্য ব্যক্তি বা শাসনকর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাহত না হয় তজ্জন্য অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে একটি অধিকারের সনদ (Bill of Rights) সংযোজনা করা হয়। অধিকারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক অধিকারগুলি—যেগুলির অভাবে কোন মানুষেরই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে না—স্থান পায়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করা হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। যদি কোন কারণে এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনদ দ্বারা অধিকার-গুলি সুরক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে প্রধান বিচারালয়ের বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের উপর এই অধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত না হইলেও সে দেশের প্রচলিত আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে। আইনের দ্বারা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। গ্রেট বৃটেনের জাতীয় জীবনের নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাগরিক অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করিয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলি ব্যাহত হইতে পারে—এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারগুলি সম্পর্কে ব্যক্তি যেরূপ অবহিত ও সচেতন থাকে, অন্যদিকে সেইরূপ শাসনকর্তৃপক্ষও এই অধিকারগুলিকে কোনক্রমে ব্যাহত করিতে বিরত থাকে। এইরূপে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যক্তিগত অধিকার ও শাসনকর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)

নাগরিকগণ নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিয়া থাকেন :—

১। প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার (Right to vote). ২। সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার (Right to hold Public Offices). ৩। সরকারের অনুসৃত নীতি ও কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করিবার অধিকার (Right to criticise the Government).

১। **ভোটদান করিবার অধিকার**—এই অধিকারের অর্থ হইল যে, প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি নির্বাচনকালে ভোটদান করিয়া কোন্ ব্যক্তি সরকারী কার্যে উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে পারিবে। ভোটদান ক্ষমতা হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল নীতি। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়ও এই ভোটদান অধিকার সকল নাগরিকের উপর অর্পিত হয় না। নাবালক, দেউলিয়া, কয়েক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত এবং অনেক দেশে স্ত্রীলোকগণকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ-ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ বা শিক্ষা ও সম্পত্তির মালিকানা-নির্বিচারে এই ভোটদান ক্ষমতা অর্পিত হওয়া উচিত। যে শাসনব্যবস্থায় ভোটদানের অধিকার নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণ ব্যাহত হয়।

২। **সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার**—উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে জাতি, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। সকলকেই এ সম্পর্কে সমান অধিকার দান করিতে হইবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি একজন ধনী ব্যক্তির সমান বিবেচিত হইবে।

৩। **প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার অধিকার**—প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যেরূপ ভোটদান করিবার অধিকার আছে, তদ্রূপ তাহার ভোট পাইবার অধিকারও আছে। আইনসভায় বা স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সভায় প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্বাচিত হইতে পারে। তবে নির্বাচিত হইতে গেলে তাহাদের একটা নির্দিষ্ট বয়স্ক হওয়া চাই ও প্রয়োজনীয় অন্য যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়।

৪। **সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার অধিকার**—নাগরিকগণ অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ও শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য আইনসঙ্গতভাবে সরকারের কার্যের সমালোচনা করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকবর্গ শেষ পর্যন্ত শাসিতের নিকট দায়ী। সুতরাং শাসকশ্রেণী শাসিতের ন্যায়সঙ্গত অভাব-অভিযোগ উপেক্ষা করিতে পারে না।

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার সার্থক হইতে পারে না। মানুষ যদি সর্বদা অনশন, বেকার ও আশ্রয়হীন হইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তির নিকট ভোটাধিকার বিড়ম্বনা মাত্র।

যোগ্যতা অনুসারে কার্যে নিযুক্ত হইবার, নির্ধারিত সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবার ও উপযুক্ত অবসর লাভের দাবী অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির ভোটদান ক্ষমতা থাকিলেও সে ক্ষমতা সে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে অক্ষম। তাহার পক্ষে জাতীয় বা স্থানীয় আইনসভাগুলিতে সদস্য নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা মূল্যহীন।

অর্থনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সমাজে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সকলের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অভাব পূরণের সামগ্রী না হওয়া পর্যন্ত মুষ্টিমেয়ের জন্য প্রাচুর্য থাকিতে পারিবে না। এরূপ সমাজব্যবস্থায় কোন শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য থাকিতে পারিবে না। অর্থনৈতিক অধিকার-যুক্ত সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শুধু শ্রমের বিক্রেতা ও অপরের আজ্ঞাবহ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এরূপ সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক সমাজ-হিতকর উৎপাদক হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সুতরাং অর্থনৈতিক অধিকারের তাৎপর্য হইল উৎপাদন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রবর্তন। উৎপাদন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবর্তন দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, শ্রমিকগণের কাজ করিয়া উপযুক্ত মজুরি

পাইবার, বিশ্রামলাভের, অসুস্থ, বেকার বা আকস্মিক বিপদ অবস্থায় সাহা্য্য পাইবার, শ্রমিক সংঘ গঠন করিবার প্রভৃতি অধিকার। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক-গণের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার। শ্রমিকগণের যদি উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার না থাকে তাহা হইলে তাহাদের কর্মে অনুপ্রেরণা নষ্ট হইয়া তাহারা উৎসাহহীন নিস্পৃহ কর্মীতে পর্যবসিত হইবে। যে উৎপাদন ব্যবস্থা অনশন বা বেকার ভয়ে ভীত কর্মিবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত হয়, সে উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই দক্ষ বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থায় মানবিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হইয়া শুধু ক্ষুণ্ণ হয়।

অধিকারের আইনগত ভিত্তি (Legal basis of Rights)

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অর্থাৎ অবাধ ও অসীম ক্ষমতা হইল ব্যক্তিগত অধিকারের একমাত্র উৎস। এই মতবাদে বলা হয় যে, ব্যক্তির অধিকারের অর্থ হইল ব্যক্তির এমন কতিপয় দাবী যাহা বিচারালয়ের নির্দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া ইহার পরিধি ও কার্যক্ষেত্র স্থির করিয়া দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অধিকারগুলি রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত এবং রাষ্ট্র ব্যতীত কার্যকর করা যায় না। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া এই আইনের সাহায্যে অধিকারগুলি ব্যক্তির পক্ষে সহজলভ্য করে। যেহেতু আইনের সাহায্যে অধিকারগুলির সৃষ্টি হয় এবং বলবৎ করা হয়, সেই হেতু আইনের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিলে, অধিকারগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্যের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অধিকারগুলি একান্তভাবে আইনের উপর নির্ভরশীল।

অধিকারের উপরি-উক্ত নিছক আইন-ভিত্তিক ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকারগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। কোন নির্দিষ্ট কালে কোন সমাজে ব্যক্তি যে অধিকারগুলি আইনের বলে কার্যতঃ ভোগ করিতে পারে তাহা নিশ্চয়ই তাহার যে সমুদয় অধিকার ভোগ করা উচিত তাহার সমান নাও হইতে পারে। বর্তমানে শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার বলিয়া সকল সভ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেক সমাজে শিক্ষা ইএ অধিকার আইনের সাহায্যে সৃষ্টি হয় নাই বা স্বীকৃতি লাভ করে নাই

সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সমুদয় অধিকার একান্তভাবে অপরিহার্য তাহা শুধুমাত্র আইন দ্বারা সৃষ্ট ও স্বীকৃত অধিকারের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। ইহা ব্যতীত বলা যায় যে, মানুষ প্রকৃতি ও প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ মধ্যে বহুবিধ সংঘ গঠন করিয়াছে। এই বিভিন্ন সংঘগুলি সম্পর্কেও মানুষের বিভিন্ন অধিকার আছে যে অধিকারগুলিও তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্থিরীকৃত অধিকারগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, অধিকারের ধারণার প্রকৃত উৎস হইল সামগ্রিকভাবে সামাজিক হিতাহিত বোধ। আইন নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক চিন্তাধারার প্রতিবিম্ব মাত্র। সুতরাং অধিকারগুলিও এই সামাজিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তি মাত্র—রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সৃষ্ট নহে।

শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকারের নিছক আইন-ভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নহে। আইন-ভিত্তিক অধিকার ব্যতীতও নৈতিক অধিকার সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় অপরিহার্য।

অধিকারের অর্থনীতিভিত্তিক সংজ্ঞা (Economic View of Rights)

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকার সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অধিকার সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করা হউক না কেন, অধিকার সম্পর্কে প্রধান কথাটি হইল যে, যেহেতু রাষ্ট্র প্রণীত আইন সাহায্যে অধিকারগুলি স্বীকৃত ও বলবৎ করা হয়, সেই হেতু অধিকারগুলির রূপ ও প্রকৃতি আইনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং অধিকারগুলির প্রকৃতি জানিতে হইলে আইনগুলির প্রকৃতি জানা প্রয়োজন।

কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত আইনগুলির কোন সার্বজনীন রূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কার্ল মার্কস প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের মতে আইন হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে রচিত কতিপয় আচরণ-বিধি। যে শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম সেই শ্রেণীর স্বার্থেই আইন রচিত হয়। সাধারণভাবে

বলিলে বলা যায় যে, যে শ্রেণীর হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে। ইহাদের মতে দেশের ধনবণ্টন ব্যবস্থার উপরই আইনের কাঠামো নির্ভর করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা যদি স্বল্প সংখ্যক ভূম্যধিকারী ও ধনিক শ্রেণীর হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে এই শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের শ্রেণীস্বার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। এরূপ ক্ষেত্রে অধিকারের অর্থ হইল শ্রেণীবিশেষের আইন দ্বারা সুরক্ষিত কতকগুলি বিশেষ সুবিধা। এক্ষেত্রে বিত্তহীন শ্রেণীর অধিকার বিশেষভাবে সংকুচিত হয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গঠিত না হইলে সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

অধিকারের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা সাহায্যে ধনবণ্টন ব্যবস্থায় যে গুরুতর বৈষম্য আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায় এবং এই বৈষম্য দূরীভূত না হইলে অধিকারের সার্বজনীন রূপায়ণ সম্ভব নয় তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুগে অধিকারগুলির স্রষ্টা ও প্রবর্তনকারী আইন শুধু একটি মাত্র শ্রেণীর প্রভাবে রচিত হয় না। আইন প্রণয়নে অল্পবিস্তর পরিমাণে সামাজিক অন্যান্য শক্তিরও প্রভাব দেখা যায়। তাই প্রায় সব দেশেই আইন প্রণয়নে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যায়।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of Citizens)

নাগরিক কর্তব্য বলিতে বুঝায়, যে কর্তব্যগুলি নাগরিকের পক্ষে অবশ্য করণীয়—যেগুলি পালন না করিলে আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি পাইতে হয়। নাগরিক যেরূপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট্রও তদ্রূপ নাগরিকের নিকট কতকগুলি কর্তব্যপালনের দাবী করিতে পারে। এই কর্তব্যগুলি হইল—

আনুগত্য (Allegiance)

প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করা। আনুগত্যের অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া

সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার কার্যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে, অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্র রক্ষা-কার্যে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকেরই গুরুদায়িত্ব বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলা (Obedience to laws)

রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়া চলা উচিত। কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের মতে যদি কোন আইন অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে জনমত সৃষ্টি করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে।

করপ্রদান (Payment of taxes)

আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনহিতকর কার্যসম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনা-কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেইজন্য প্রত্যেকের দেয় কর সময়মত রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে। ভোটদান করা শুধু একটা নাগরিক অধিকার নয়, ইহা নাগরিকের পক্ষে একটা গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং সততা ও সুবিবেচনাসহকারে এই দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সমাজ-জীবন যাহাতে উন্নততর হয় সেইজন্য নাগরিকগণের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত। প্রয়োজনমত সরকারী কার্যে সাহায্য করা নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য সর্বদেশে জুরীর বিচার প্রবর্তিত আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কোন কারণে বিপন্ন হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস। রাষ্ট্রের অবর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ্য কর্তব্য।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় (Safeguards of Liberty)

স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়, সেইজন্য সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একটা সুনির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি সুসংবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য দ্বারা ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে ও এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই বা সেখানকার উচ্চ বিচারালয়ের শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্যের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা নাগরিক অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্য ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (Rule of Law) বিশেষ কার্যকরী হইয়া নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে। যদি কোন নাগরিক বিনা বিচারে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালয় ঐ ব্যক্তির বিচার করিবার জন্য তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। বিনা বিচারে কাহারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলণ্ডে আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান।

ক্ষমতার বিভাগ করিয়া (Separation of Powers) অনেক সময় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতার এই বিভাগ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়া সর্বক্ষেত্রে গণ্য হইতে পারে না। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডবাসী স্বাধীন।

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা (Independence of the Judiciary) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। বিচারালয়গুলি যদি শাসনবিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে ন্যায়বিচার সম্ভব হয়। ন্যায়বিচারের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ইহা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় (Democracy) ব্যক্তি-স্বাধীনতা সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়। এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী হইয়া স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে। স্বাধীনতা কোন দিক্ দিয়া একটু বিপন্ন হইলে নিজেই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্যই বলা হয় নাগরিকগণের আত্মচেতন ভাবই হইল তাহাদের স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ।

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার

স্বাধীনতা—স্বাধীনতা শব্দটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। তাহা হইলে সমাজে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। এইজন্য রাষ্ট্র কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা সীমায়িত করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনতা প্রয়োগ করা যায় তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেন-না স্বাধীনতা প্রয়োগের এই সীমারেখা স্থির করিয়া রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দেয়। সুতরাং আইন না থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে।

সাম্য—সাম্য বলিতে সকলেই সমান এ কথা বুঝায় না বা সকলকেই সমান হইতে হইবে ইহাও সাম্যের প্রকৃত অর্থ নয়। সাম্যের প্রকৃত অর্থ

হইল, সকলকেই সমান সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায় গুলি দূর করা। সমাজে সাম্যনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপরিচালনায় কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের জন্য কোনরূপ বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সকলকেই সমান চক্ষে দেখিবে। আভিজাত্য, ধর্ম বা বিত্ত প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদ থাকিবে না। একমাত্র সমাজকল্যাণকর অধিকতর যোগ্যতা ব্যতীত মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হইবে না। তাহা হইলেই পূর্ণ-স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বহু রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্যনীতির অভাবে রাজনৈতিক সাম্য কার্যকর হইতে পারে না।

অধিকার—অধিকারের সাধারণ অর্থ হইল ক্ষমতা। কিন্তু অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে বিশৃংখলা আনয়ন করে। সেইজন্য এই ক্ষমতাগুলি কতকগুলি কর্তব্যের দ্বারা সীমায়িত করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে সমাজের অন্য লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। কাজেই ব্যক্তিবিশেষের অধিকারপ্রয়োগ অন্যের প্রতি তাহার কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। এক ব্যক্তির যাহা অধিকার, অন্যের তাহা কর্তব্য। এই পারস্পরিক সম্বন্ধ রাষ্ট্র আইনের দ্বারা অব্যাহত রাখে।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য—অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। জীবন-ধনসম্পত্তির অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রভৃতি পৌর অধিকার। ভোটদান-ক্ষমতা, সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। কিন্তু এই অধিকারগুলির কোনটিই শর্তহীন নয়।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, যথাযথভাবে ভোটদান করা, সময়মত কর প্রদান করা ও প্রয়োজনমত অন্যভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা, নাগরিকদের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই সকল কর্তব্যপালনে উদাসীন হইলে অধিকারের দাবী রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উপায়—লিখিত শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা, আইনের অনুশাসন, ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ প্রভৃতি নাগরিক অধিকার রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই হইল স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায়।

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্র-সমবায় ও সরকারের বিভিন্ন রূপ
(Union of States and Forms of Government)

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই উপাদানে গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে সরকারের প্রকারভেদ দেখা যায়। এই প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল্। তাঁহার রচনায় দুই প্রকারের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—স্বাভাবিক ও বিকৃত (Normal and Perverted)। জনকল্যাণের জন্য যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেই ব্যবস্থাকে তিনি স্বাভাবিক আখ্যা দেন, আর যেগুলি শুধু শাসকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য পরিচালিত হয়, সেগুলিকে তিনি বিকৃত আখ্যা প্রদান করেন। তারপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ-কারীদের সংখ্যানুসারে তিনি স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে আরও কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন।

অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে:—

সার্বভৌমত্ব পরিচালনাকারীর সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃত
এক ব্যক্তি	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচার
একাধিক ব্যক্তি (একটি সংসদ)	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহু ব্যক্তি (জনসাধারণ)	গণতন্ত্র	বিকৃত গণতন্ত্র

অ্যারিস্টট্‌লের এই শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই শ্রেণীবিভাগ কোন মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শুধু ক্ষমতা পরিচালনাকারীর সংখ্যা অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এ যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক বা কতিপয় ব্যক্তি হইতে পারে না। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগ-নীতি বর্তমান রাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে

প্রকৃতপক্ষে অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসনব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিক লক্ষ্য রাখিয়া অ্যারিস্টট্‌ল এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। যে শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় সেগুলিকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়াছিলেন, আর যেগুলি শাসকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিচালিত হয় সেগুলিকে তিনি বিকৃত আখ্যা দিয়াছিলেন। বার্কারের মতে অ্যারিস্টট্‌লের নৈতিক ভিত্তি বর্তমান যুগেও একেবারে অচল হইয়া যায় নাই। বর্তমান যুগে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচিতির জন্য বিভিন্ন নামকরণ করা হয়, যথা—কল্যাণ রাষ্ট্র, যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র, পুলিশ রাষ্ট্র, বাণিজ্যিক রাষ্ট্র, তখন পরোক্ষভাবে অ্যারিস্টট্‌লেরই নৈতিক মান প্রয়োগ করা হয়।

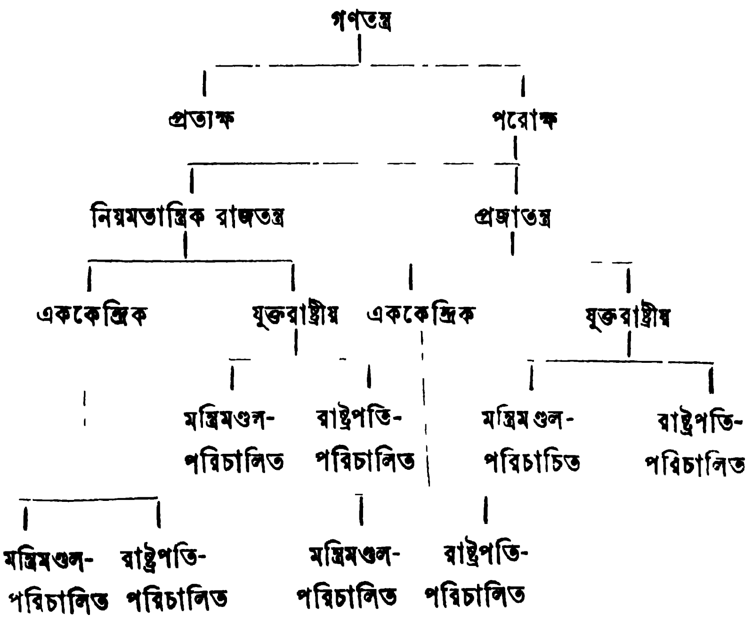
বর্তমানকালে নিম্নলিখিত প্রকারে শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ করা হয়:—

১। রাজতন্ত্র—Monarchy. ২। অভিজাততন্ত্র—Aristocracy.

৩। গণতন্ত্র—Democracy. ৪। আমলাতন্ত্র—Bureaucracy

৫। একনায়কতন্ত্র—Dictatorship

লিকক্ তাঁহার গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে সরকারের প্রকারভেদ করিয়াছেন:—



রাজতন্ত্র (Monarchy)

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসনক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে, সেই শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় রাজাই হইলেন শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয়। রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে। কদাচিৎ রাজা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন। প্রাচীন রোম ও পোল্যাণ্ড দেশে এইরূপ নির্বাচিত রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়।

রাজতন্ত্র দুই প্রকারের হইতে পারে; অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ও নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Constitutional or Limited Monarchy)। অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজতন্ত্রে একমাত্র রাজার ইচ্ছায় শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। এই শাসনব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি রাষ্ট্র'; সুতরাং রাজা ও রাষ্ট্রে এই শাসনব্যবস্থায় কোনও ভেদ থাকে না।

অবাধ রাজতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, রাষ্ট্রীয় চরম ক্ষমতা এক হস্তে ন্যস্ত থাকার ফলে শাসনব্যাপারে দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়। রাজা প্রজাবৎসল হইলে তাঁহার স্বকীয় উদ্যমে তিনি প্রজার বহু হিতসাধন করিতে পারেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা জনগণের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিয়া তাহাদিগকে আইনশৃংখলা মানিবার শিক্ষা দিতে পারেন।

কিন্তু এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও একথা বলিতে হইবে যে, শাসনব্যবস্থার যতগুলি প্রকারভেদ আছে তন্মধ্যে এইটিই হইল নিকৃষ্টতম। তাহার কারণ, এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ববিকাশের কোন সুযোগ নাই। রাজা প্রজার সর্ববিধ হিতসাধন করিলেও স্বাধীনতা ও সাম্যের অভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। শাসনকার্যে প্রজাসাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকায় তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক বুদ্ধি পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় সু-নাগরিকের সৃষ্টি হইতে পারে না। আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে জনসাধারণ ক্রীতদাসের পর্যায়ে পরিণত হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন রাজা শাসনব্যবস্থার শীর্ষদেশে অবস্থান করেন সত্য, কিন্তু কার্যত: তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নামসর্বস্ব হ্রস্বরূপে বিরাজ করেন। তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাজার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এইজন্য এই শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়—রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু তিনি শাসন করেন না।

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)

দেশের শাসনব্যবস্থা যখন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া অ্যারিস্টট্‌ল্ এই অভিজাততন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতেন। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সংখ্যা স্বভাবতই কম, সেজন্য অনেক সময় অভিজাততন্ত্রকে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়। অভিজাততন্ত্র গুণবাচক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসনকার্যে গুণ বলিতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ বুঝাইত। অভিজাত বংশে জন্মলাভ, প্রভূত বিত্তের অধিকার, সামরিক খ্যাতি প্রভৃতি নানা গুণের সমাবেশে অভিজাততন্ত্রের সৃষ্টি হয়। অভিজাততন্ত্রের পক্ষে বলা যায় যে, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিগণের হস্তেই এই ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। শাসকবর্গ যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে শাসনকার্যের উন্নতি হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় শাসনব্যাপারে শিথিলতা বা দ্রুত পরিবর্তনশীলতা আসিতে পারে না। সদ্‌গুণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা জন্মে।

আধুনিককালে আর অভিজাততন্ত্রের স্থান নাই। রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির ফলে মানুষ আর এখন শাসকের প্রাধান্য স্বীকার করিতে চায় না—তাহারা চায় আইনের প্রাধান্য ও আইনের শাসন। তাই গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র সমূলে উৎপাদিত হইয়াছে। সমাজে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদিগকে নির্বাচিত করা সহজ নয়। তাহা ছাড়া, মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে অবাধ ক্ষমতা ন্যস্ত করিলে তাহাদের পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়া স্বাভাবিক।

অভিজাততন্ত্রের প্রভাব (Influence of Aristocracy)

বর্তমান যুগে অভিজাততন্ত্র অচল হইলেও কোন দেশের শাসনব্যবস্থাই অভিজাততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত নহে। অতীতে ও বর্তমানে সকল দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতীত যুগে রাজার হস্তে সমুদয় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকিলেও শাসনব্যাপারে রাজা তাঁহার মুষ্টিমেয় সামন্ত রাজন্যবর্গের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। শাসনকার্যে অধিকাংশ লোকের অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার তখন ছিল না। সামন্তপ্রথা উচ্ছেদের পরও বহুদিন পর্যন্ত শাসনক্ষমতা সংখ্যালঘিষ্ঠের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহার কারণ হইল ভোটদান-ক্ষমতা প্রবর্তিত হইলেও এই ক্ষমতা সমাজের একটা নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থার এই অভিজাততান্ত্রিক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আইন-প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগেও একদল লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকে—যাহারা সমগ্র জনসংখ্যার এক অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ। অকিঞ্চিৎকর অংশ হইলেও এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই অধিকতর যোগ্যতার দাবীতে তাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করে। এক সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সমর্থনে দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। দলীয় সংগঠন ও দলীয় নীতি এরূপভাবে পরিচালিত হয় যে, সাধারণ লোকের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ খুব কমই হয়। জনসাধারণের অধিকাংশ নানাকারণে ভোটদান ক্ষমতাবিহীন ভোটদাতৃগণ দলের নির্দেশে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া আইনসভা গঠন করে আর দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্ব-নির্বাচিত পদ্ধতিতে মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য-রূপে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া দলের সমর্থন-পুষ্ট হইয়া তাঁহাদের শাসননীতি বলবৎ করেন। গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে উপরি-উক্ত শাসনব্যবস্থা ঈষৎ তারতম্যের সহিত পরিলক্ষিত হয়। মুষ্টিমেয় লোক জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি ও কর্মতারমক্ষ অভাবের সুযোগ লইয়া অধিকতর যোগ্যতার দাবীতে শাসন-

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো অভিজাততান্ত্রিক হইলেও বর্তমান অভিজাততন্ত্র জনসাধারণের ইচ্ছা-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না।

প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র (Republic)

যে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ও যে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়, তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। গঠনের দিক দিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের একটা প্রভেদ থাকিলেও ক্ষমতার দিক দিক উভয় শাসনব্যবস্থায়ই সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব সূচিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন জন্মগত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রতিষ্ঠিত রাজা থাকেন, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। প্রজাতন্ত্রে নির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রনায়ক থাকেন। ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার বিশাল ক্ষমতা আইনসভার তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গণতন্ত্র (Democracy)

'গণতন্ত্র' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক সরকার বুঝায়। কিন্তু কেহ কেহ আবার গণতান্ত্রিক সমাজ বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং গণতন্ত্র শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য উপরি-উক্ত শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Democratic State)

যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাহাকে সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ব্যাপারে জনগণই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং জনগণই দেশের শাসনপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকে। শাসকশ্রেণীর নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

গণতান্ত্রিক সমাজ (Democratic Society)

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জাতি, বংশ, ধন বা পদমর্যাদা নির্বিচারে সকলের সমানাধিকার। এই ব্যবস্থায় মানুষ হিসাবে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় না। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাই হইল গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল আদর্শ। ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রে কতিপয় মূলনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা-বর্জন ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

গণতান্ত্রিক সরকার (Democratic Government)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি-গণের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ব্যাপারে জনসাধারণের সমানাধিকার ও সাম্যনীতি স্বীকৃত হয়।

উপরি-উক্ত পার্থক্য করা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, গণতন্ত্র এমনই একটি অখণ্ড আদর্শ যে, সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বা শাসনব্যবস্থায় এই আদর্শ কার্যকরী না হইলে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজ-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অ-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হিট্‌লারের সময়ে জার্মানী, স্ট্যালিনের সময়ে রুশ দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অ-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সূচিত করে। অপরপক্ষে ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হস্তে যে সমুদয় বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-বিরোধী বলা যাইতে পারে।

গণতন্ত্র—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (Democracy—Direct and Indirect)

'গণতন্ত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল গণ-শাসন অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। এই শাসনব্যবস্থার স্বরূপ এব্রাহাম লিন্‌কন্ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন-সাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয় (A government of the people, for the people and by the people)। জনসাধারণকে

লইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ দ্বারা শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হইতে পারে—ইহা চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোম দেশের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিত। তখনকার রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্র ছিল। জনসংখ্যাও ছিল স্বল্প। আর জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক ও মজুর শ্রেণীর লোক। ইহাদের বর্জন করিয়া পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন নাগরিকগণই আইন-সভার সদস্যরূপে রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিত। শুধু নাগরিকদের সম্পর্কে গ্রীক শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা হইত। সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তির রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণ। তাহারা একত্রে মিলিত হইয়া আইন-প্রণয়ন ও কর ধার্য করিত। আধুনিককালে সুইস দেশের চারিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্যাণ্টনে এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলবৎ দেখা যায়। এই শাসনব্যবস্থায় আইনানুগ সার্বভৌম ও রাজনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

বর্তমান রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় নগর রাষ্ট্র হইতে বহুগুণ বৃহত্তর। ইহাদের সমস্যাগুলি অনেক বেশী জটিল। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে একত্রিত হইয়া শাসনপরিচালনা-কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা বর্তমান যুগে সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, সাধারণ নাগরিকদের সেরূপ অপর্যাপ্ত সময়ও নাই, যোগ্যতাও নাই। সেইজন্য আধুনিককালে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। পরোক্ষ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় আইনানুগ সার্বভৌম ও রাজনৈতিক সার্বভৌম, একে অপর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পরোক্ষ-গণতন্ত্রে পূর্ণবয়স্ক ও নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী জনগণ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া শাসনব্যবস্থা এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর মতানুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্যে যদি নির্বাচকমণ্ডলী সন্তুষ্ট না হয় তাহা হইলে নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত হইলে নির্বাচকমণ্ডলী নূতন শাসন-কর্তৃপক্ষ গঠন করিতে পারে। এইরূপে জনসাধারণ পরোক্ষভাবে শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং কোন শাসনব্যবস্থাই শুধুমাত্র ভোট

দ্বারা প্রকাশিত জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই গণতন্ত্র আখ্যা পাইতে পারে না। জনগণের এই সম্মতি সক্রিয় ও সদা-জাগ্রত হওয়া চাই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ সক্রিয়ভাবে শাসনব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, একমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক আদর্শ সার্থক হয়। বর্তমান গণতন্ত্র সম্পর্কে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন বুঝায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হইলেও এই শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মতামত উপেক্ষিত হয় না। তাহারা নির্ভয়ে তাহাদের আইনসম্মত অধিকার ভোগ করিতে পারে।

গণতন্ত্র—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী (Democracy—Liberty, Equality and Fraternity)

এখন দেখা যাউক গণতন্ত্র কি? বর্তমানে গণতন্ত্রের যে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে জনগণের কল্যাণে জনগণ দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন গণতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী হইল গণতন্ত্রের আদর্শ এবং এই আদর্শত্রয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুইটি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য শর্ত এবং এই দুইটি আদর্শের পূর্ণ পরিণতি হইল মৈত্রী বা ভ্রাতৃভাব।

আধুনিক গণতন্ত্রের শাসন কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি হইল: প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বারা পরোক্ষ গণশাসন প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, দায়িত্বশীল সরকার, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন (alternation of power) এবং ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার সাহায্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

দেশের আইনানুসারে নির্ধারিত প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাগণের দ্বারা আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তাঁহারা সরকার গঠন করিয়া দলের সমর্থনে শাসনকার্য পারিচালনা করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমত জাগ্রত রাখে। সরকার গঠনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইহার জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের ফলে জনসমর্থন হারাইলে বিরোধী দল পুনঃনির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া বিকল্প সরকার গঠন করে। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল জনসমর্থন

এই শাসনব্যবস্থায় সরকার যে শুধু জনগণ অথবা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নিকট দায়ী তাহা নহে, এই শাসনব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলই দীর্ঘস্থায়ী হইয়া দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও সাবলীল গতি রুদ্ধ করিবার সুযোগ পায় না। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইবার অর্থ হইল গণতন্ত্রের অপমৃত্যু। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন। সুতরাং যত অধিক সংখ্যায় ও অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাসনব্যবস্থার সহিত যুক্ত করা যায়, গণতন্ত্র হয় তত ব্যাপক। গণতন্ত্রের নীতি হইল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power)। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীত নানা স্তরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল করিয়া তোলা। কেন্দ্রীয় পরামর্শ ও কেন্দ্রীয় সাহায্য কাম্য হইলেও এই স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকাই হইল গণতন্ত্র-সম্মত নীতি। মানুষের রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাও সুরক্ষিত করাই হইল প্রকৃত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

উপরে গণতন্ত্রের যে রূপরেখার বর্ণনা দেওয়া হইল তাহা শুধু গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর একটি চিত্র। এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে অ-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, গণতন্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিয়া সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের ও সাফল্যের অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং সমাজব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশের বিচার ব্যবস্থায় যাহাতে স্বাধীনতা ও সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে সে পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন প্রতি এক ভোট প্রবর্তিত করিয়া স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না অর্থাৎ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-বিহীন স্বাধীনতা ও সাম্য অর্থহীন।

গণতন্ত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ ও সংগতি নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিসত্তার সমান স্বীকৃতি, মূল্য ও মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং ইহার ফলে আত্ম ও পর অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল এক বলিষ্ঠ মানবগোষ্ঠী জন্মলাভ

করে। সকলেই যদি সমান স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ পায় তাহা হইলে সকলেই পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল হয়। ইহার ফলে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্বভাবজাতভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তাৎপর্য হইল কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার। গণতন্ত্রে সকলেই কাজ করিয়া গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। গণতন্ত্রে ব্যক্তিমাত্রই অনশন, বেকার ও সহানুভূতিহীন মালিকের ভয়মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া সমাজকে উপকৃত করিতে পারে এবং প্রতিদানে সমাজও ব্যক্তিকে তাহার কাজের ন্যায্য মূল্য প্রদান করিতে কার্পণ্য করে না। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র হইল সেই ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার ফলে সমাজে সকলের জন্য পর্যাপ্তের ব্যবস্থা না হওয়ার পূর্বে মুষ্টিমেয় লোক অনাবশ্যক আধিক্যের অধিকারী হইতে পারিবে না। ("There must be sufficiency for all before there is superfluity for the few")

গণতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য শর্ত হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেরই সমভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার পাইবার অধিকার স্বীকৃত ও সুরক্ষিত করা হয়। গণতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থা এরূপভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয় যে, ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অনভিজাত সকলেই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাবান থাকিয়া সমভাবে সুবিচার পাইতে পারে। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় যেন অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় অধিকতর সুবিচার ক্রয় করিতে না পারে।

এতদ্ব্যতীত গণতন্ত্রের আর একটি রূপ আছে যাহার অবর্তমানে গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকে। এই রূপটি হইল ইহার পররাষ্ট্র সম্পর্কিত অথবা আন্তর্জাতিক রূপ। গণতন্ত্র হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্রষ্টা ও রক্ষক। যে গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্রষ্টা ও রক্ষক হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির দাবি রাখে সেই গণতন্ত্রের পক্ষে পররাষ্ট্র সম্পর্কে যুদ্ধবাদ নীতি গ্রহণ করিয়া সভ্যতা বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া মারাত্মক গণতন্ত্র বিরোধী কার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

যে গণতন্ত্র পররাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি উদাসীন সে গণতন্ত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ও সাম্যের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র ও যুদ্ধবাদ পরস্পর-বিরোধী, কারণ গণতন্ত্র হইল সৃষ্টিকামী (creative) আর যুদ্ধবাদ হইল ধ্বংসাত্মক (Destructive)। দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র যেরূপ সাম্যের ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানাধিকার সৃষ্টি করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিতে সাহায্য করে আন্তর্জাতিক জীবনেও তদ্রূপ সাম্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকার সৃষ্টি দ্বারা বিশ্ব-মৈত্রী স্থাপনে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy)

অধুনা গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রথম কারণ হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী শাসিতের নিকট দায়ী থাকে। ইহাতে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ও জনগণের নিকট দায়ী বলিয়া শাসন-কর্তৃপক্ষকেও সর্বদা সতর্ক থাকিয়া সুদক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়

দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়। জনস্বার্থ এই শাসনব্যবস্থায় যেরূপভাবে সংরক্ষিত হয়, অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসন-কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়তা করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবিতে শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অংশ। এই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জনগণ দেশকে ভালবাসিতে শিখে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফলে, তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ সামর্থ্যমত সমষ্টিগত কল্যাণসাধনে সাহায্য করে। ফলে, ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েই লাভবান হয়।

পঞ্চমতঃ, এই শাসনব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষে মানুষে ভেদ দূর করিতে সাহায্য করে। কোন ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের শাসন স্থায়ী হইতে পারে না। লর্ড ব্রাইসের মতে এই শাসনব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, মূঢ় ও মূক জনগণকে ভোটদান ক্ষমতা প্রদানপূর্বক উহা তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া তাহাদের মনুষ্যত্ববিকাশে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রের দোষ (Demerits)

গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহা একেবারে দোষবিমুক্ত নয়। গণতন্ত্রের বিপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, বলা যায়, গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে, গুণের উপর নয়। গণতন্ত্র সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনব্যবস্থায় 'জন প্রতি এক ভোট' এই নীতি প্রবর্তিত হইয়া যোগ্যতার সমাদর হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, এই শাসনব্যবস্থা অক্ষম বিকৃত গণতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাধিক্যের শাসন বুঝায়। আর এই সংখ্যাধিক্য গঠিত হয় অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকের দ্বারা। সুতরাং অক্ষম ও অশিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা কখনই সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোন শ্রেণীবিভাগ স্থান পায় না। সকল মানুষই সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, গণতন্ত্রের কার্য পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় চতুর ও বিবেকবর্জিত লোক দ্বারা। ইহারা ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণের ভোট সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে।

চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, যে সম্প্রদায় বা যে-দল সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে তাহারাই নিজেদের সুবিধার জন্য আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং এইরূপ আইনের দ্বারা সার্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষিত না হইয়া দলগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

পঞ্চমতঃ, মেইন, লেকি প্রমুখ লেখকগণ ইহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গণতন্ত্র অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষের প্রতিকূলতা করে। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেগুলির চর্চা অধ্যাত্ম জীবনগঠনের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমাদৃত হয় না। অজ্ঞলোক পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত জ্ঞান ও গুণের বিকাশ সম্ভব হয় না।

ষষ্ঠতঃ, এই শাসনব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর এই শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে, সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলীর খুশিমত সরকার পরিবর্তিত হয়। স্বল্পকালস্থায়ী সরকার কোন দূরপ্রসারী নীতি বা জনহিতকর গঠনমূলক কার্য করিতে পারে না। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল্ ইহাকে বিকৃত গণতন্ত্র আখ্যা দিয়াছিলেন। আধুনিককালে ওয়েল্‌স্ বলেন যে, এই শাসনব্যবস্থা এত ভঙ্গুর যে, ইহাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিনষ্ট করা যায়।

পরোক্ষ গণতন্ত্রব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ
(Methods of Direct Democracy as applied to Indirect Democracy)

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাইতে থাকে। নানাকারণে গণতন্ত্রের ভিত্তি শিথিল হইতে থাকে। প্রথম কারণ হইল, নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কার্য করেন। দ্বিতীয়তঃ, অবস্থার পরিবর্তনে জনমত এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষেও সকল সময়ে জনমতের সহিত সমান গতিতে চলিয়া তাহাদের মতের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাবিস্তারের ফলে জনমতও অনেকটা সুসংবদ্ধ ও সুশিক্ষিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কারণে অনেক দেশেই আইন-প্রণয়নে ও শাসনকার্যে জনগণ যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এই উপায়ে জনগণ শাসনব্যবস্থায় প্রতিনিধিগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া মিলিতভাবে

তাহাদের মতামত কার্যকর করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চারিটি প্রকারভেদ হইতে পারে, যথা—

গণনির্দেশাধিকার (Referendum)

ইহার অর্থ হইল যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনের খসড়াকে চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত করিতে হইলে সে খসড়া-আইন জনগণের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক প্রবর্তিত খসড়া-আইন জনসাধারণের নিকট বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। যদি জনসাধারণ অধিক ভোটে খসড়াটি সমর্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়। আইন সভার আর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। জনগণের এই নির্দেশ অধিকার বাধ্যতামূলক (Compulsory) বা ঐচ্ছিক (Optional) হইতে পারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে এই নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হইবে শাসনতন্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন, বা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইন, বা অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে এই অধিকার বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ঐচ্ছিক গণনির্দেশ গ্রহণ করা হয় তখনই যখন (ক) একটি নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক এই অধিকার দাবী করে, অথবা (খ) আইনসভার একাংশ ইহার দাবী করে, বা (গ) শাসন-পরিষদ এই দাবী করে।

গণ-প্রস্তাব অধিকার (Initiative)

অনেক সময় আইনসভা হয়ত কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক বা উদাসীন থাকিতে পারে। সেজন্য জনগণই আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অগ্রণী হয়। নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের একটা খসড়া আইনসভায় বিবেচনার্থ পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়া নির্বাচক-মণ্ডলীর নিকট বিবেচনা করিবার জন্য পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি জন-সাধারণ সেই খসড়াটি ভোটাধিক্যে অনুমোদন করে তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে। আইন-প্রণয়নের এই সরাসরি অধিকার দুই

প্রকারের হইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী যে খসড়া-আইনটি আইনসভার নিকট পেশ করিবে, সেটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয় অর্থাৎ বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত হয় তাহা হইলে তাহাকে সুপরিকল্পিত গণ-প্রস্তাব বা Formulated Initiative বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণবর্জিত আইনের প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ প্রস্তাব বা Unformulated Initiative বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাপারে উপরি-উক্ত দুই প্রকারের গণ-প্রস্তাব প্রয়োগ করা হয়। পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা মিলিতভাবে যদি শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব করে, আর এই প্রস্তাবটি যদি বিস্তারিত বিবরণ সমন্বিত খসড়া আকারে আইনসভার নিকট পেশ হয় তাহা হইলে ইহাকে সুপরিকল্পিত প্রস্তাব বলা হয়।

গণভোট (Plebiscite)

গণভোট অনেকটা গণনির্দেশাধিকারের অনুরূপ। গণভোট দ্বারা শাসন-কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত জনমত গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ শাসনবিভাগীয় সমস্যার সমাধানকল্পে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে জনমত গ্রহণ করা হয় গণ-নির্দেশাধিকারের মাধ্যমে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবিভাগের সময় আসাম রাজ্যের শ্রীহট্ট জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে, না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা নির্ণয়ের জন্য গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল।

প্রত্যাবর্তনের আদেশ (Recall)

কোন কোন দেশে ভোটদাতৃগণ যদি নির্বাচিত প্রতিনিধির আচরণে সন্তুষ্ট না হন বা নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি তাঁহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ভোটদাতৃগণ তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিতে পারেন। পুনর্বার ভোট গ্রহণ করিয়া এই প্রত্যাবর্তনের দাবী কার্যকরী করা হয়। ঐ প্রতিনিধিকে অপসারিত করিতে হইলে কিছু সংখ্যক ভোটদাতা তাঁহার অপসারণের দাবী করিবেন এবং যদি ভোটদাতৃগণ দ্বিতীয়বার ভোটে তাঁহাকে নির্বাচন না করিয়া অন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পদত্যাগ করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত উপায়গুলি গণতন্ত্রের সাফল্য সূচিত করে। এই উপায়গুলির

মধ্যে গণনির্দেশাধিকার ও গণ-প্রস্তাব-অধিকার গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমধিক সাহায্য করিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক উপায়গুলি সুইস দেশে বহুদিন হইতে কার্যকরী করা হইয়াছে ও সুইস আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অধুনা স্বাধীন আয়ার প্রভৃতি দেশ ইহার অনুকরণ করিয়াছে। গণনির্দেশ ও গণ-প্রস্তাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অন্যটির পরিপূরক। গণ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল অপ্রস্তাবিত আইনের সূচনা করা আর গণনির্দেশের উদ্দেশ্য হইল প্রস্তাবিত আইনকে না-মঞ্জুর করা। আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক, গণ-প্রস্তাব আইনসভাকে সেই জাতীয় আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য করে। অপরপক্ষে জনমতের বিরুদ্ধে যদি আইনসভা কোন আইন জনগণের উপর প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে গণনির্দেশ প্রয়োগ করিয়া সেরূপ আইনকে কার্যকরী করিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং উভয় পদ্ধতিই জনমতের বিজয় ঘোষণা করে।

গণতান্ত্রিক উপায়গুলির গুণাগুণ (Merits and Demerits of the Direct Methods)

গণতান্ত্রিক উপায়গুলির প্রধান গুণ হইল যে, উহারা সাধারণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তিকেও শাসনকার্যে অধিকতর উৎসাহী করিয়া তাহাকে তাহার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সতত সজাগ থাকে, তাহা হইলে আইনসভা বা শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না। কোন কায়েমী স্বার্থ বা দলবিশেষ তাহাদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কোন আইন প্রবর্তন করিতেও পারে না।

কিন্তু এই উপায়গুলি সম্পূর্ণ দোষবিমুক্ত নহে। আইন-প্রণয়নে বা শাসনকার্যে এই উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে আইনসভার বা শাসন-কর্তৃপক্ষের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। আইনসভা একটি বিতর্কসভায় পরিণত হয়, ফলে আইন-প্রণয়নে অনেক গলদ থাকিয়া যায়। বর্তমানকালে শাসনব্যবস্থায় এত বিভিন্ন প্রকারের জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে যে, সে সমস্যাগুলির সমাধান করিবার মত শিক্ষা, বুদ্ধি ও জ্ঞান সাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায় না। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও সূক্ষ্ম জ্ঞানের

প্রয়োজন হয়। সেইজন্য কি শাসনব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়নে অভিজ্ঞ ও কর্মপটু লোকের প্রয়োজন। গণপ্রবর্তিত আইন সকল সময়ে জনহিতকর নাও হইতে পারে। ক্ষুদ্রকায় সুইস দেশে এই পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া বৃহদায়তনের অন্য দেশেও যে কার্যকরী হইবে তাহার আদৌ কোন নিশ্চয়তা নাই।

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান (Conditions essential for the success of Democracy)

গণতন্ত্র একটি বিশেষ প্রকারের শাসনব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা সার্বজনীন অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে বা একনায়ক-তন্ত্রে এক ব্যক্তির হস্তে অথবা মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে; কিন্তু গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় জনসাধারণের দ্বারা। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য যে জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও কর্মদক্ষতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে একথা সহজেই অনুমেয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণের শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার মত সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে জনসাধারণের সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণকে তাহাদের নাগরিক কর্তব্য পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দৃঢ়সংকল্প ও কর্তব্য-পালনে তৎপরতা—এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে। নাগরিকগণ যদি তাহাদের কর্তব্য-পালনের কথা ভুলিয়া গিয়া শুধু অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র কার্যকর হইতে পারে না। অপরপক্ষে, নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে যদি তাহারা সতর্ক না হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে অভিজাততন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হইতে পারে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য জনগণের অধিকার রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ও কর্তব্য-পালনের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। যেখানে জনগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন

এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে, সেখানে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব। এই মনোভাবের অবর্তমানে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। জাতি-ধর্ম-ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলকেই সাধারণ হিতার্থে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। গণতন্ত্রের সাফল্যের আর একটি আবশ্যিক উপাদান হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও আপসমূলক মনোভাব। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যদি এইরূপ মনোভাব দ্বারা পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের মূল আদর্শ ব্যাহত হয়। এজন্য চাই বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক। সু-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত সু-নাগরিকের সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যে কর্তব্যবুদ্ধি ও বিচারবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমত। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা জনমতকে সুসংবদ্ধ ও শিক্ষিত করিতে পারিলে গণতন্ত্র পরিচালনার আর অন্তরায় থাকিতে পারে না।

বর্তমান যুগে ল্যাস্কি প্রমুখ অনেক লেখকের মতে অর্থনৈতিক সাম্যের অভাব গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়। ধনবণ্টন-ব্যবস্থায় অত্যধিক বৈষম্য থাকিলেও গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র যাহাতে সফল হইতে পারে সেজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy)

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে নানা কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যুদ্ধোত্তরকালীন অবস্থায় কোন দেশেই জাতীয় জটিল সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই। সেজন্য কোন কোন দেশে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। অপরপক্ষে, কোন কোন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ গণ-প্রস্তাব, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি অধিকারগুলি

সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত কারণে লোকের মনে স্বভাবতঃই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু উপরি-উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে। একনায়কতন্ত্র একটা সাময়িক পরিবর্তন মাত্র। কোন দেশেই একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আধুনিককালে জার্মানি ও ইতালী ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্র অনেকদিন হইতে জনকল্যাণের অনুকূল বলিয়া আজও পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, ধনতন্ত্র, প্রভৃতি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মানুষের সাধারণ অধিকারগুলি যেভাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় নাই। সত্য বটে গণতন্ত্র এখনও পর্যন্ত মানুষকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে এই শাসনব্যবস্থা পূর্বতন শাসনব্যবস্থাসমূহ হইতে নানাদিক দিয়া উৎকৃষ্টতর। বার্ণস্ তাঁহার 'Democracy' নামক পুস্তকের একস্থলে বলিয়াছেন যে, মোটরগাড়ী সব সময়ে ভাল কাজ করে না বলিয়া গো-যান ব্যবহার করা যেরূপ নির্বোধের কার্য, আধুনিক গণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিহার করিয়া ভিন্ন জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা তদ্রূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আসল কথা হইল আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া ইহার প্রকৃত সার্বজনীন রূপ কার্যকর করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের মূল কথা হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যদি গণতান্ত্রিক নীতি প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'জন প্রতি এক ভোট' নীতির দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং সমাজ-জীবন মহত্তর করিবার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের সাফল্য একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছে

যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই ব্যক্তিত্ববিকাশের চরম সুযোগ প্রদান করিতে পারে। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য গণদাবী উত্থিত হইয়াছে। এই দাবী প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং গণতন্ত্রের জয় অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

প্রাচীনকালের গণতন্ত্র ও আধুনিক গণতন্ত্র (Ancient and Modern Democracies)

প্রচীন যুগেও গণতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমকগণের গণতন্ত্রা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের গণতন্ত্র প্রাচীনকালের গণতন্ত্র হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্।

প্রথমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন নাগরিকগণ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমান যুগের গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। পূর্ণবয়স্ক নাগরিকগণ বর্তমান যুগে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি ছিল ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্র। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বর্তমান রাষ্ট্র অপেক্ষা সেগুলি বহুগুণে ক্ষুদ্রতর ছিল। নাগরিকগণ যাহাতে শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য জনসংখ্যা নির্ধারিত করা হইত। বর্তমান রাষ্ট্র আয়তনে ও লোক-সংখ্যায় বিশালকায়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্রের আয়তন বা লোকসংখ্যা সংকুচিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয়তঃ, প্রাচীনকালের রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় বিশ্রামভোগী, পরজীবী অভিজাতসম্প্রদায় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত ও তাহারাই নাগরিক সুখ-সুবিধার অধিকারী ছিল। স্ত্রীলোক, মজুর-সম্প্রদায় ও ক্রীতদাসগণ পরনির্ভরশীল বলিয়া নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল। বর্তমান গণতন্ত্রে মানুষে মানুষে এতটা ভেদ দেখা যায় না। সকলেরই সমান নাগরিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

চতুর্থতঃ, প্রাচীনকালের গণতন্ত্রে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়া হইত। ব্যক্তি রাষ্ট্রের একটি অকিঞ্চিৎকর অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত।

সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রবেদীমূলে বলি দেওয়া হইত। রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু রাষ্ট্রের জনকল্যাণ-ক্ষমতার দ্বারাই সমর্থিত হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না। বর্তমান যুগে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট। এখন সরকার শুধু রাষ্ট্রপ্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রগুলিকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায় না। যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী একটি নিকৃষ্ট স্তরের জীব বলিয়া পরিগণিত হইত, যে শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না, তাহাকে বর্তমান গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্তমানে গণতন্ত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের সকল স্থায়ী অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয় ও বর্তমান গণতন্ত্র সর্ববিধ উপায়ে নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে তৎপর থাকে।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র সমধর্মী। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা নয়। একনায়কতন্ত্রের আলোচনা করিলে এই সত্যটি উপলব্ধি করা যাইবে। বিগত প্রথম মহাসমরের পরবর্তী কালে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়। যুদ্ধোত্তরকালে ইয়ুরোপের কয়েকটি দেশের পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটে যে, ঐ সমস্ত দেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্র বেকার-সমস্যা, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-অধিকার প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধানে তৎকালীন সরকারগুলির অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত অনেক দেশে বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁহাদের দলীয় নীতি বিসর্জন দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য একমত হইতে পারেন না। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে,

জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। লোকের ধারণা জন্মে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আর অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম নয়। দেশের এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। যুদ্ধোত্তরকালে অনেক দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এত দ্রুত অবনতি ঘটে যে, একনায়কতন্ত্র একান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠে।

একনায়কতন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা সামরিক (Military), সাম্যবাদী (Communist) ও ফ্যাসিবাদী (Fascist)। সামরিক একনায়কতন্ত্র বহু পুরাতন হইলেও বর্তমান যুগেও এই শাসনব্যবস্থা লোপ পায় নাই। যখনই সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক সৈন্যগণের সাহায্যে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তখন এই শাসনব্যবস্থাকে সামরিক একনায়কতন্ত্র বলা হয়। ফরাসী দেশে নেপোলিয়নের শাসন, বর্তমানে স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসন ও অতি আধুনিককালে পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি হইল একজাতি, একরাষ্ট্র ও একনায়ক। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একক নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় ও রাষ্ট্রের সকল কার্যকলাপ একক নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে যে-কোন উপায়েই হউক একত্রিত করিয়া দেশকে একটা উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে একনায়কতন্ত্র সাহায্য করে। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটিমাত্র দল থাকে ও নেতা হইলেন দলের সর্বময় কর্তা। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয়া হয় না—বলপ্রয়োগ করিয়া অন্য দলগুলিকে বিনষ্ট করা হয়।

অবাধ দলীয় কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রের অধীনে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান নাই। ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়।

একনায়কতন্ত্র-অনুসারে রাষ্ট্র সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং ব্যক্তির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

কোন অভিযোগ দূরের কথা, কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়। রুশিয়ায় সাম্যবাদী, ইতালীতে ফ্যাসিবাদী ও জার্মানীতে নাৎসীবাদী সিদ্ধান্তের উপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রুশিয়ার এই সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র ইহার গঠনমূলক কার্য দ্বারা পৃথিবীর বহুদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (Democracy and Dictatorship)

গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল স্বাধীনতা ও সাম্য। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এই নীতির কোন স্থান নাই। গণতন্ত্রে একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্ভবপর, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটিমাত্র দল থাকে। অন্য দলের অস্তিত্ব আদৌ বরদাস্ত করা হয় না। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্মতি, সুবিধা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একনায়কতন্ত্র হইল দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য একনায়কতন্ত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু দলগত এই দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে শুধু দলগত স্বার্থের হানি হয় তাহা নয়, সমস্ত জাতীয় জীবন এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিপর্যস্ত হইতে পারে। রুশীয় একনায়কতন্ত্রে এবং নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কার্যতঃ যাহাই হউক না কেন, রুশীয় একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল ধনিক শ্রেণীকে নির্মূল করিয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করা। অপরপক্ষে, নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল কোন সম্প্রদায়কে উৎখাত না করিয়া সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক জাতীয় স্বার্থকে পরিপুষ্ট করা। কার্যক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী বা নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র এবিষয়ে কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, তাহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ।

একনায়কতন্ত্রের গুণ (Merits of Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে সকলেই স্বভাবতঃ একটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকিলেও একনায়কতন্ত্রের যে কোন গুণ নাই, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

একনায়কতন্ত্রের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এই শাসনব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে যে দল বা উপদলের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়া জনমতের প্রাধান্য প্রমাণ করা হয়, তাহা বহুক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয় এবং দলগত বিরোধ জাতীয় স্বার্থকে অনেক সময়ে ক্ষুণ্ণ করে। প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশেই জনগণ দলের নেতাকে অন্ধভাবেই অনুসরণ করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি শেষ পর্যন্ত নেতার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। একনায়কতন্ত্র জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান করিতে পারে, যাহা গণতন্ত্রে সকল সময়ে সম্ভব হয় না। জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে অধিকতর কার্যকরী হয়। মানুষের নৈতিক উৎকর্ষসাধনেও একনায়কতন্ত্রের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। রুশ দেশে এই একনায়কতন্ত্র জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তাহাদের আত্মত্যাগ দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার শিক্ষা দিয়াছে। একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তাহা বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে জার্মানী, ইতালী ও বিশেষ করিয়া রুশিয়া একনায়কতন্ত্রের অধীনে অতি অল্পকালের মধ্যে যে উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহা গণতন্ত্রে কোথায়ও সম্ভব হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্ত্র পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য কখনই নয়। বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। একনায়কতন্ত্রের কার্যাবলী যদি ক্রমাগত জনস্বার্থবিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচার একার্থবোধক হইতে পারে না।

দোষ (Demerits)

একনায়কতন্ত্রের পক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক না কেন, তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, এই শাসনব্যবস্থা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের সুবিধা দান যদি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রেই একনায়কতন্ত্র সমর্থনযোগ্য নয়। একনায়কতন্ত্র যে শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা অস্বীকার করা

পায় না। মানুষ আইনের শাসন মানিতে চায়, কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের প্রতি স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। একনায়কতন্ত্র এই ব্যক্তিবিশেষের শাসনই প্রতিষ্ঠিত করে, সুতরাং জনকল্যাণকর হইলেও এই শাসনব্যবস্থা কাম্য নহে। অনগ্রসর ও অপরাধপ্রবণ জনগণ শাসনের পক্ষে সহায়ক হইলেও একনায়কতন্ত্র জ্ঞানী, গুণী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমূহের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময় এই একনায়কত্ববাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর কর্তৃক স্থাপন করিতে ব্যগ্র হয়। সুতরাং একনায়কতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলে। জার্মানী ও ইতালির একনায়কতন্ত্রের এই ছিল প্রধান দোষ। এই দোষের জন্যই তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালিত হয় স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের দ্বারা। এই কর্মচারীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতা স্থির করিয়া সরকারী কার্যে নিয়োগ করা হয়। একটা নির্দিষ্ট বয়স হইতে কার্য আরম্ভ করিয়া একটা নির্দিষ্ট বয়সে তাঁহাদের শাসনকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহারা ভরণপোষণের জন্য ভাতা পান। এই সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের বাঁধা নিয়মে দিনের পর দিন কাজ করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রেই ধরাবাঁধা নিয়মের গণ্ডির বাহিরে আর কোন কিছুই করিতে রাজী হন না। সরকারী কার্যে নিযুক্ত বলিয়া তাঁহারা নিজেদের বিশিষ্ট পদমর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন ও সেজন্য সাধারণ লোকের সহিত তাঁহাদের প্রায়ই যোগাযোগ থাকে না। ফলে, সরকারী কর্মচারী হইলেও তাঁহাদের জনগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি থাকে না। তাঁহারা এক বিশেষ আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া জনসাধারণ হইতে সকল সময়ে তাঁহাদের পার্থক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হন। শাসনকার্যে দীর্ঘসূত্রতা আমলাতান্ত্রিক সরকারের আর একটি প্রধান দোষ। সম্ভব হইলেও ইহারা নিয়মবহির্ভূত কোন কার্য করিতে নারাজ। এইজন্য আমলাতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে মিল্ বলিয়াছেন যে, এই সরকার অস্বাভাবিক-

রূপে নিয়মানুবর্তী ও এই রোগেই ইহার মৃত্যু ঘটে। এই অস্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতার জন্য অনেক সময় জনস্বার্থও ব্যাহত হয়।

দীর্ঘসূত্রী ও অত্যধিক পরিমাণে নিয়মানুবর্তী হইলেও আমলাতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘদিনের সরকারী কার্যের অভিজ্ঞতার ফলে ইহাদের সরকারী কার্যের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানে এই জাতীয় কর্মচারীরা সিদ্ধহস্ত অনেক সময় মন্ত্রিপরিষদ, কি আইন-প্রণয়নে আর কি নীতিনির্ধারণে, এই কর্মচারীদের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। আমলাতন্ত্রের উপর মন্ত্রি-পরিষদের এই নির্ভরশীলতা অনেক দেশে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের বিশেষ দোষ হইল দায়িত্ববোধের অভাব। সু-শাসন ব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ববোধ এই দুইটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। আমলাতন্ত্র কর্মদক্ষ, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জনগণের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণের স্বার্থসম্পর্কে একটু অবহিত হইলে আমলাতন্ত্র আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমলাতন্ত্রের গঠন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের শ্রেণীবিভাগ—অ্যারিস্টট্‌ল গুণবাচক ভিত্তির উপর সরকারকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাহার পর শাসকের সংখ্যানুসারে উক্ত দুই শ্রেণীর ছয়টি বিভিন্ন নামকরণ করেন। জনকল্যাণের জন্য যে শাসন পরিচালিত হয়, তাহাকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়াছিলেন এবং স্বাভাবিক সরকারকে সংখ্যানুসারে রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র এই তিন আখ্যা দিয়াছিলেন। বিকৃত শ্রেণীকেও সংখ্যানুসারে তিনটি ভাগ করিয়াছিলেন: যথা—স্বৈরাচার, ধনিকতন্ত্র ও বিকৃত গণতন্ত্র। এই প্রকার শাসনের উদ্দেশ্য হইল শাসকশ্রেণীর স্বার্থ পরিপুষ্ট করা।

বর্তমানকালে নিম্নলিখিত শাসনব্যবস্থাগুলি দেখা যায়:

রাজতন্ত্র—জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তির শাসনকে রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে যখন অবাধে ক্ষমতা পরিচালনা

করেন, তখন তাহাকে অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অবাধ রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজার ক্ষমতা যখন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু নামসর্বস্ব রাজা হিসাবে অবস্থান করে, তখন তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা হয়।

অভিজাততন্ত্র—স্বল্পসংখ্যক গুণী ও জ্ঞানী লোকের দ্বারা যখন শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র নাম দেওয়া হয়। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের হস্তে শাসনকার্যের ভার থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু প্রকৃত যোগ্য লোক নির্বাচন করা কষ্টসাধ্য।

প্রজাতন্ত্র—রাষ্ট্রের প্রধান যখন রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইয়া থাকেন, তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। এই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছাই পরোক্ষভাবে কার্যকরী।

গণতন্ত্র—এই শাসনব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। তাহারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বৃহৎ বলিয়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকর করা সম্ভব নয়। সেইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রবর্তন হইয়াছে। গণতন্ত্র সফল করিবার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য অপরিহার্য।

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। এই শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিত্ববিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। গণতন্ত্র কার্যকর করিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়।

অধুনা গণতন্ত্রকে বিশেষভাবে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনে গণপ্রস্তাব-অধিকার, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

একনায়কতন্ত্র—প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের কতকগুলি দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্য দলগুলিকে বলপ্রয়োগে নির্মূল করিয়া একটি মাত্র দল শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই দলের নেতাই হইলেন সর্বশক্তিমান্ পুরুষ, যাঁহার নির্দেশে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। নেতার পশ্চাতে দলের সমর্থন থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালি, জার্মানী ও রুশিয়ায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

একনায়কতন্ত্র সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু আংশিকভাবে কার্যকরী হইলেও বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না।

আমলাতন্ত্র—প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন স্থায়ী কর্মচারী লইয়া আমলাতন্ত্র গঠিত হয়। জনসাধারণের সহিত বিশেষ কোন সংযোগ না থাকার দরুণ এই কর্মচারিবৃন্দ আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ইহারা অত্যধিক পরিমাণে ধরাবাঁধা নিয়মের দাস হইয়া পড়েন, সেজন্য সরকারী কার্য সম্পাদনে বিলম্ব অনিবার্য। আমলাতান্ত্রিক সরকার সাধারণতঃ সুদক্ষ হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

একাদশ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Unitary and Federal Governments)

শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদি একটিমাত্র উচ্চতম কর্তৃপক্ষের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। অপরপক্ষে সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদি বিভক্ত হইয়া একাধিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায়:—

১। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল সরকারের ক্ষমতাসমূহের কোনরূপ ভাগ করা হয় না। সমুদয় ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। শাসনকার্যে সুবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রাদেশিক সরকারে ভাগ করা হয়। কিন্তু এই প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলির কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র অধিকার বা দায়িত্ব কিছু থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে ইহারা কার্য পরিচালনা করে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে স্থানীয় সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ১৯৩৫ সালের পূর্বে ভারত শাসনব্যবস্থা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রদেশ বা রাজ্যে বিভক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়ের উপর স্বাধীন ক্ষমতা অর্পিত হয়। দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। অপর পক্ষে, স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনা করিবার ভার থাকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলির হস্তে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সরকারগুলি স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে। স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনব্যাপারে কেন্দ্রীয়

সরকার সাধারণতঃ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুইটি ক্ষমতাবিশিষ্ট সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলি এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার স্থানীয় সরকারগুলির মত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন প্রতিনিধি মাত্র নয়। ইহাদের নিজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ ক্ষমতা থাকে।

২। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সর্বেসর্বা—সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি—উভয়েই শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট হয় এবং শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত বা অলিখিত, নমনীয় বা অনমনীয় হইতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সর্বদা লিখিত ও অনমনীয় হয়।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রই হইল উভয়বিধ সরকারের ক্ষমতার উৎস। সেইজন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত সর্ববিধ মতভেদের নিষ্পত্তি হয়। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন উচ্চ বিচারালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব (Marks or Characteristics of a Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা ইহাকে এককেন্দ্রীয় সরকার হইতে সহজে পৃথক্ করা যায়। ডাঃ ফাইনার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিয়াছেন :—

১। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহ-অবস্থান (Co-existance of two Governments)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার থাকে আর স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জন্য কতকগুলি স্থানীয় সরকার থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে তাহাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ও শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলির উপর পরস্পরের প্রভাব-মুক্ত হইয়া উহারা শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলি সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকে।

২। সরকারের ক্ষমতাসমূহের বিভাগ ও বণ্টন (Division and Distribution of Powers)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা ভাগ করিয়া একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয়, আর স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ভার দেওয়া হয় আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর। উভয় সরকারই তাহাদের নির্ধারিত এলাকায় পরস্পরের প্রভাব-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution which is Written and Rigid)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। এই বণ্টনকার্য শাসনতন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ভবিষ্যতে ক্ষমতার ভাগ লইয়া যাহাতে উভয় সরকারের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ বা কলহ সৃষ্টি না হয়, সেজন্য ক্ষমতার বিভাগ সুস্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকে। অলিখিত শাসনতন্ত্র অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল বলিয়া অনেক সময় শাসনব্যাপারে

নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিতে পারে, একের ক্ষমতা যাহাতে অন্যের দ্বারা নষ্ট না হয়, সেজন্য শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে উভয় সরকারের ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত হইলেই হয় না, এই শাসনতন্ত্র অনমনীয় হওয়াও একান্ত আবশ্যক। সহজ-পরিবর্তনীয় হইলে উভয় সরকার বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাহার শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতার বলে নিজ ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে যে-কোন সময়ে নির্ধারিত ক্ষমতাবণ্টনের পরিবর্তন করিতে পারে। যদি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ভিন্ন একটি সরকারের ইচ্ছা অনুসারে ইহার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়।

৪। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন উচ্চ বিচারালয়ের অবস্থিতি (Existence of an independent and impartial Supreme Court)

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য হইল যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রধান বিশেষত্ব। শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির শাসনতন্ত্র নির্ধারিত পারস্পরিক সম্পর্ক যাহাতে কোনক্রমে ব্যাহত না হয়, সেজন্য উচ্চ আদালত শাসনতান্ত্রিক আইনসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করে। অপরপক্ষে, শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ শাসনতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপ দ্বারা যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে না পারে, সেজন্য উচ্চ আদালত শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের নির্দেশগুলিকে অনেক সময় বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। এক কথায় উচ্চ আদালতকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

৫। দ্বিনাগরিকত্ব (Double citizenship)

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারেরই আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকগণের দ্বিবিধ আইন মান্য করিতে

হয়। যে যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে, সেই সেই বিষয়-গুলির জন্য প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় ও স্থানীয় ব্যাপারগুলির জন্য নাগরিকগণ যে প্রদেশের অধিবাসী, সেই প্রাদেশিক সরকারের আইন মানিতে বাধ্য থাকে। শাসন-তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ভারতের অধিবাসীদের শুধু একনাগরিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের নাগরিকত্ব ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই।

৬। রাজস্বের বণ্টন-ব্যবস্থা (Separate allocation of revenues)

যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলি সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে অর্থাৎ স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাহারা স্বায়ত্তশাসনশীল সরকার বলিয়া পরিগণিত হয়। সেইজন্য ক্ষমতাবণ্টনের সঙ্গে রাজস্বও বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি তাহাদের নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে।

৭। আনুগত্য ও ব্যবচ্ছেদ (Allegiance and Secession)

আঞ্চলিক সরকারসমূহের সম্মিলিত ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্র একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকার থাকিলেও তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয় না। সুতরাং প্রত্যেক আঞ্চলিক সরকারকেই মূল রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শুধু আনুগত্য স্বীকার করে তাহা নয়, কোন আঞ্চলিক সরকারই যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। কোন আঞ্চলিক সরকারের এই দাবী স্বীকৃত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার বলপ্রয়োগে আঞ্চলিক সরকারের এই প্রচেষ্টা দমন করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইজারল্যাণ্ডে আঞ্চলিক সরকারের এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইবার প্রচেষ্টা বল-প্রয়োগে দমন করা হয়। একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে

আঞ্চলিক সরকারগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

১। অবিমিশ্র ঐক্য হইল এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করে সেই নবগঠিত রাষ্ট্রে অবিমিশ্র ঐক্য বা সমরূপতা থাকে না। এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সর্বত্র একই আইন ও একই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কতিপয় বিষয়ে সমরূপতা থাকিলেও অনেক বিষয়ে আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

২। যে সমস্ত রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেই সেই সমুদয় আঙ্গিক রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা লোপ পাইয়া তাহারা নবগঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই জাতীয় শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় একদিকে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার, অপরদিকে রাজ্য সরকারগুলি নির্ধারিত ক্ষেত্রে স্ব স্ব শাসনকার্য পরিচালনা করে।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ ব্যাপারগুলির শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির শাসন রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রাকৃতিক বিবর্তনে আপনা হইতে গড়িয়া উঠে না, প্রয়োজনমত মানুষ ইহা সৃষ্টি করে। সুতরাং ইহার গঠনতন্ত্র লিখিত থাকে।

৬। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক উভয় সরকারের ক্ষমতাই ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। কোন সরকারই নির্ধারিত পদ্ধতির সাহায্যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ব্যতীত নিজ ইচ্ছানুযায়ী অন্যের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

৭। শাসনতন্ত্রের সংশোধনপদ্ধতি শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করা থাকে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলিয়া পরিগণিত হয়।

৮। যুক্তরাষ্ট্র হইল আঞ্চিক রাজ্যগুলির একটি স্থায়ী সমবায়। সন্ধি-সমবায় বা সন্ধিবন্ধন রাষ্ট্রগুলির মত অস্থায়ী নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী (Formation of Federation)

দুইটি ভিন্ন পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অনেক সময়ে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অথবা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্বসম্মতিক্রমে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে তাহারা সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (Residuary Powers) আঞ্চলিক সরকার-গুলির কর্তৃত্বাধীনে রাখে। এইরূপে বহু রাষ্ট্রের স্থলে একটি মাত্র জাতি-সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিকে কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Process of Centralisation) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। আদি তেরটি উপনিবেশ কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও নবগঠিত আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার-গুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা সাধারণতঃ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়; অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে থাকে। এই পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Process of Decentralisation) বলা হয়। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত হয়। ক্যানাডায় একটি এক-কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। এই এককেন্দ্রীয় সরকারকে নয়টি পৃথক্ প্রাদেশিক সরকারে ভাগ করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের শাসন-পরিচালনা করিবার ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে প্রধানতঃ

দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে সেখানে বিকেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইজন্য সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলির নির্দিষ্ট গণ্ডি স্থির করিয়া আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়। আবার ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বজায় রাখা হয়। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাফল্যের উপায় (Conditions essential to the success of a Federal Union)

যে পদ্ধতিতেই গঠিত হউক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একটি হইল কেন্দ্রীভাব (Centripetal tendency), অপরটি হইল বিকেন্দ্রীভাব (Centrifugal tendency)। একটিতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে, অপরটিতে তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে। পরস্পর-বিরোধী এই দুইটি শক্তির প্রকৃত সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সাফল্যের জন্য কতকগুলি বাহ্যিক পরিবেশ ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical contiguity) থাকা একান্ত আবশ্যক। ভৌগোলিক নৈকট্যের অবর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি দূরত্বের দ্বারা যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে না। ফলে জাতীয়ভাবোধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অংশগুলি বিচ্ছিন্ন থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী-নির্বাচন-ব্যাপারেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এক অঞ্চলের লোক দূরত্বের জন্য অপর অঞ্চলে গিয়া, জাতীয় ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। পূর্বতন পাকিস্তান

রাষ্ট্রে এই অসুবিধা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই রাষ্ট্রের পূর্ব-অঞ্চল রাজধানী-সমন্বিত পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সহস্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এইজন্য ভৌগোলিক নৈকট্যের অভাবে শাসনব্যবস্থার নানাবিধ জটিল সমস্যা দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উপর। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণ ভাষা, ধর্ম বা সংস্কৃতির ঐক্য সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধ দ্বারা যদি অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, এই জাতীয়তাবোধ নির্ভর করে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা ভাবগত ঐক্যের উপর। সুতরাং উপরি-উক্ত ঐক্যগুলি বিশেষ করিয়া ভাবগত ঐক্য যুক্তরাষ্ট্রগঠনে একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক অধিকারের সমতা থাকা একান্ত অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আয়তন ও সম্পদের সমতা সব সময়ে কার্যকরী করা সম্ভব হয় না, কিন্তু প্রদেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা (Political equality) বা অন্ততঃপক্ষে আনুপাতিক সমতা রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রদেশগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায়, ক্ষুদ্র হউক, আর বৃহৎ হউক, জাতীয় ব্যাপারে তাহাদের সমান অধিকার থাকা চাই। এই সমতার অভাব হইলে একাধিক বৃহৎ প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে এই রাজনৈতিক সমতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ প্রুসিয়া ভোটাধিক্যের বলে সমগ্র জার্মান দেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। সমতার অভাবেই জার্মান যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ক্যানাডায় প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সরকারকে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়তন, সম্পদ বা জনসংখ্যা নির্বিচারে প্রত্যেকটি প্রদেশ জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের উচ্চপরিষদ্ সিনেট সভায় দুইজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। ক্যানাডার সিনেট সভা প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কোন প্রাদেশিক সরকারকেই

সংখ্যাধিক্যের বলে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী করা যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের প্রধান অন্তরায়।

পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই আদর্শ হইল ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠন। জাতীয়তাবোধ ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের মধ্যে যাহাতে সংঘর্ষ না হয়, সেজন্য জনগণের মধ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা ও সহনশীলতা থাকা চাই। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা জটিল ও নানা সমস্যাপূর্ণ। নাগরিকগণেরও যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য যে অনেক পরিমাণে নাগরিকদের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও রাজনৈতিক চেতনার উপর নির্ভর করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদানগুলি কি ভারতে বর্তমান (Are those conditions present in India ?)

এই সম্পর্কে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদানগুলি কি বর্তমান আছে ? ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম-পর্যায়ভুক্ত ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে সিকিমসহ রাজ্যসংখ্যা হইল ২২টি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইল ৯টি। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হইল যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ভৌগোলিক ঐক্য। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আমিনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য প্রধান অংশগুলির মধ্যে এই ভৌগোলিক ঐক্য বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেকটি অংশের সহিত অপরাপর অংশের ঘনিষ্ঠ যোগ সূত্রের ফলে ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ ও আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছে। অধিকন্তু এই ভৌগোলিক ঐক্যের জন্য ভারত তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের দ্বিতীয় উপাদান হইল অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি-গত, ভাষাগত, ধর্মগত, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত ঐক্যের অবস্থিতি। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে এরূপ

কোন ঐক্য নাই। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বহু জাতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাস করে। এই ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ অনেক সময় যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অপরপক্ষে এই বিভিন্ন জাতিগুলি এরূপ মিশ্রভাবে পরস্পরের সহিত একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে যে, এই বিভিন্ন জাতিগুলিকে একত্র সমাবেশ করিয়া ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করাও সম্ভব নহে।

কিন্তু এই বিভেদ থাকা সত্ত্বেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিভিন্ন জাতিগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একই ভৌগোলিক পরিবেশে পরস্পরের সন্নিকটে বাস করিবার ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, চিন্তাধারা এবং অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে এক নাগরিকত্ব প্রবর্তন করিয়া এবং ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া এই অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যদি এক জাতীয়তা-বোধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের ক্ষেত্রে এক জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি না পাইবার কোন সংগত কারণ নাই।

ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয়তাবোধ যে নাই, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বৃটিশ শাসকগণ কর্তৃক অনুসৃত দুষ্ট বিভেদমূলক শাসন-নীতির (Divide and rule) ফলে এই জাতীয়তাবোধ এখনও পর্যন্ত দুর্বল, কিন্তু এই জাতীয়তাবোধ ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারতের বিভিন্ন অংশগুলি বুঝিতে পারিয়াছে যে, একতাই তাহাদের প্রধান বল এবং বিভেদই হইল তাহাদের ধ্বংসের কারণ। একতাবৃদ্ধির জন্য বর্তমান ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক মতভেদ ও বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন ও প্রায়শই রাজ্যগুলির শাসনকর্তাদের সম্মিলিত বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর হইয়া সহযোগিতামূলক মনোভাব

সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমন কি সুদূর আন্দামান দ্বীপে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচায়ক। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আজ সর্বভারতীয় সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তরাষ্ট্রসুলভ জাতীয় ঐক্য নাই একথা বলা আদৌ সমীচীন নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমতা বা অন্ততঃপক্ষে আনুপাতিক সমতা থাকা একান্ত আবশ্যক। ভারতের ক্ষেত্রে এই সমতার একান্ত অভাব দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলি আয়তনে লোকসংখ্যায় ও সম্পদে অন্যান্য রাজ্যগুলি হইতে শুধু বৃহত্তর নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ভারতের পার্লামেণ্ট সভায় এই রাজ্যগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং এই রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অভিমতকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হইল আঙ্গিক রাজ্যগুলির সমানাধিকার এবং এই সমানাধিকার নীতি স্বীকৃত না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য অসম্ভব। ভারতের ২২টি আঙ্গিক রাজ্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও মার্কিন বা ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ন্যায় ইহাদের সমান প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত হয় নাই। প্রতিনিধিত্বের দিক দিয়া শুধুমাত্র আনুপাতিক সমতা রক্ষিত হইয়াছে।

পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য নাগরিকগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা, দায়িত্ববোধ ও কর্মপটুতা একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া, যেহেতু আঙ্গিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সম-অংশীদার সেই হেতু প্রত্যেকেরই সমান কর্মদক্ষতার অধিকারী হওয়া চাই। যুক্তরাষ্ট্র একটা জটিল শাসনব্যবস্থা নাগরিকগণ যদি জটিল শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকার্যে অনভিজ্ঞ হন তাহা হইলে এই শাসনব্যবস্থা সাফল্যলাভ করিতে পারে না। ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর কিছুদিন পর্যন্ত অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ শাসকের অভাবে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে

দেশরক্ষা বিভাগে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী আজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। শাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, ...ন প্রভৃতি বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণই পরিচালনা করিতেছেন। শুধু মূলধনের মালিক ও যন্ত্র-বিশেষজ্ঞরূপেই বর্তমানে বিদেশীয়গণের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও কর্মপটুতা ইতিমধ্যেই শিশুরাষ্ট্র ভারত তাহার আয়ত্তাধীন করিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য সুনিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ক্ষমতাবণ্টনের নীতি ও পদ্ধতি (Principle and Method of Distribution of Powers in a Federal Union)

নীতি

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষমতাবণ্টনের মূলনীতি হইল যে, জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি এবং যে-সকল বিষয় সম্পর্কে একই রকমের আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ের ভার সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। অপরপক্ষে, শুধু স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন আইন-কানুন ও পরিচালনা-ব্যবস্থা দরকার সেই সব বিষয়ের ভার আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর দেওয়া হয়। এই নীতি অনুসারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, ডাক ও তার বিভাগ, যুদ্ধ ও শান্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দেওয়া হয় এবং শিক্ষা, সমবায়, কৃষি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

এই রীতি অনুযায়ী সকল যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন করা হইলেও কোন্ বিষয়টি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট আর কোন্ বিষয়টি স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেউলিয়া ও শ্রমিকসংঘ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত আছে, কিন্তু ক্যানাডায় এই বিষয়গুলির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের

উপর দেওয়া হইয়াছে। ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি হইয়া আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাদেশিক সরকারগুলি তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা পৃথকভাবে প্রাদেশিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের সহিত বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন, বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানেও ইহাদের পৃথক্ প্রতিনিধি আছে।

পদ্ধতি

উপরি-উক্ত ক্ষমতাবণ্টনের নীতি বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকরী করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনে সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসৃত হয়।

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কোন্ কোন্ বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে তাহার উল্লেখ থাকে। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অবশিষ্ট অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলির অধিকারী করা হয়। এই প্রণালীতে ক্ষমতার বণ্টন কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা সূচিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনের এই প্রণালী কার্যকরী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্যানাডায় অন্য প্রণালীতে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে। এই প্রণালী অনুযায়ী স্থানীয় সরকারগুলিকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী করিয়া অবশিষ্ট অনুল্লিখিত বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ফলে, এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর শক্তিশালী হয়।

অধুনা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবণ্টনে এক তৃতীয় প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে

সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত থাকে। ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে কতকগুলি যুগ্ম বিষয়ের (Concurrent List) উল্লেখ থাকে, যে বিষয়গুলির উপর উভয় সরকার একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কিন্তু উভয় সরকারের প্রণীত আইন পরস্পর-বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা বলবৎ হইয়া প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থা বাতিল হয়। ক্যানাডার কৃষি ও দেশান্তরে বাসের নিয়ম (Immigration) যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি, শ্রমিকসংঘ, বিদ্যুৎ, ছাপাখানা, সংবাদপত্র প্রভৃতি সাতচল্লিশটি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব (Federal Control over Local Governments)

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। সকল যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর আধিপত্য সমান হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলিতে প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা বলবৎ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। অন্তর্বিপ্লব বা প্রাদেশিক বিদ্রোহ নিরোধ করিবার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ক্যানাডা ও ভারতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসকপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উভয় দেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইনগুলি কেন্দ্রীয় শাসকপ্রধানের সম্মতিসাপেক্ষ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক রচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিধিগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিসাপেক্ষ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে আইন বলবৎ ও রাজস্ব আদায় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, আবার জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে উপরি-উক্ত বিষয়গুলির জন্য অনেক সময় প্রাদেশিক সরকারগুলির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক প্রবণতা (Modern Tendencies in Federations)

যুক্তরাষ্ট্র বলিতে দেশের সাধারণ সম্পর্কিত কাজের জন্য কেন্দ্রে অবস্থিত একটি জাতীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন-সম্পর্কিত কাজের জন্য কিছু সংখ্যক স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের এক সঙ্গে অবস্থিতি বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র কর্তৃক উভয় সরকারের কার্যক্ষেত্র সুনির্ধারিত থাকিলেও বর্তমানে মার্কিনী, ক্যানাডীয় বা মিশ্র—সকল যুক্তরাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থায়ই একদিকে যেরূপ কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারের ক্ষমতার প্রাবল্য দেখা যায় অপর দিকে তদ্রূপ স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির গুরুত্ব হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ ইহা নহে যে, তাহারা প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা হরণ করিয়া অধিকতর শক্তিশালী অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীতও নূতন ক্ষমতা পাইয়া শক্তিশালী হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, কালক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পর্যবসিত হইবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিণতি ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয় না। প্রায় কোন যুক্তরাষ্ট্রই এ পর্যন্ত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয় নাই। জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল যে, এই সরকারগুলি ইহাদের শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি বিশেষভাবে সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র কিছু নূতন ক্ষমতা পাইয়াও অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অধ্যাপক হুওয়ার (Prof. Wheare) চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ (War), অর্থনৈতিক সংকট (Economic depression), রাষ্ট্রের সমাজসেবামূলক কার্যের প্রসার (Growth of social services) এবং শিল্প ও পরিবহন জগতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন (Mechanical revolution in transport and industry)।

বর্তমান যুদ্ধ হইল সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই জাতীয় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ এক-নিয়ন্ত্রণাধীন করা একান্ত আবশ্যক এবং জাতীয় সরকারই হইল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা সাফল্যের সহিত এই কার্য করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক যুদ্ধগুলি এত ব্যয়সাধ্য যে, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে সক্ষম। উপরি-উক্ত কারণে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আধুনিক যুগে প্রায় কোন দেশই অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব-মুক্ত নহে। অর্থনৈতিক সংকটকালে একমাত্র কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারই জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সংকটমুক্ত হইতে পারেন। এ কারণে জাতীয় সরকারের প্রাধান্য ও ক্ষমতাবৃদ্ধি স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

সমাজসেবামূলক কার্য বলিতে সাধারণতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কার্যগুলিকে বুঝায়। প্রায় প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে এই কার্যগুলি স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এই সমাজসেবামূলক কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারগুলির জাতীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ও উপদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। মার্কিন, সোভিয়েত, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে সমাজসেবামূলক কার্যের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলি জাতীয় সরকারগুলির নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পায়। এই ব্যবস্থার দ্বারাও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আন্তঃরাজ্য ভৌগোলিক বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়াছে। আন্তঃরাজ্য নানা জাতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত সংস্থা গঠিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি স্থানীয় সমস্যা হইতে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে এবং এই কারণে এই সমস্যাগুলির স্থানীয় স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে সমাধান করিবার প্রয়োজন হয়। তাই স্থানীয় ব্যাপারেও জাতীয় সরকারের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান রাষ্ট্রগুলি হইল সমাজসেবামূলক সংগঠন এবং এই কার্য একান্তরূপেই পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত

হয়। পরিকল্পনার (Planning) সাফল্য কেন্দ্রীকরণ, সংযোগ ও বিভিন্ন অংশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। এ কারণেও কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু জাতীয় সরকারের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয় যে, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রাদেশিক সরকারের পর্যায়ে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় সরকারগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা ক্রমশঃই অপহরণ করিতেছে। আসল কথা হইল যে, প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপরাপর সমবায় রাষ্ট্রের পার্থক্য
(Distinction between a Federation and other forms of Composite State)

সন্ধি-বন্ধন (Alliance)

যখন একাধিক রাষ্ট্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাষ্ট্রসমবায়কে সন্ধি-বন্ধন বলা হয়। সন্ধি বন্ধন হইল কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাব। একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হয় ও একযোগে নির্দিষ্ট বিষয়ে কার্য সম্পাদন করে। সম্পাদিত চুক্তি তাহাদের মধ্যে ঐকমত্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু চুক্তির ফলে কোন নূতন জাতি বা নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হয় না। সন্ধিবদ্ধ প্রত্যেকটি রাষ্ট্র অন্যান্য সকল বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখে। সন্ধি-বন্ধনে উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ গঠিত হয় না। সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ সদস্য রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছামত সন্ধি বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রেও সন্ধি-বন্ধন এক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয় না। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে বা অন্য কোন কারণে সন্ধি-বন্ধনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং সন্ধি-বন্ধনকে একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সাময়িক

সহযোগিতার মনোভাব বলা যাইতে পারে। এই সহযোগিতার মনোভাবের স্থায়িত্ব খুব কম বলিয়া সন্ধি-বন্ধনকে সমবায় রাষ্ট্রের দুর্বলতম প্রকাশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র সংঘবদ্ধ হইয়া একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকে এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র একটিমাত্র রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি সন্ধি-বন্ধনের সদস্যগুলির ন্যায় ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারে না। সন্ধি-বন্ধন অস্থায়ী; যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থায়ী।

ব্যক্তিগত বন্ধন (Personal Union)

একাধিক রাষ্ট্র যখন একজন রাজার অধীনে সম্মিলিত হইয়া ইহাদের শাসনকার্য রাজার নামে পরিচালিত করে, তখন এই রাষ্ট্রসমবায়কে ব্যক্তিগত বন্ধন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র ইহার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র ঐক্যসূত্র হইল সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এক রাজা। একটি রাষ্ট্রের রাজা যদি নাবালক হন, তাহা হইলে তাঁহার সাবালক না হওয়া পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের রাজাকে সাময়িকভাবে শাসন-বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। অনেক সময় চুক্তিসম্পাদন দ্বারা বা উত্তরাধিকারের বলে একাধিক রাষ্ট্র একজন রাজার অধীনে সাময়িকভাবে মিলিত হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি একজাতি বা একরাষ্ট্রে পরিণত হয় না। ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে সে যুদ্ধকে অন্তর্বিপ্লব না বলিয়া আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বলা হয়। ১৭১৪ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও হ্যানোভার ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

প্রকৃত বন্ধন (Real Union)

প্রকৃত বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে মিলিত হয়, কিন্তু প্রকৃত-বন্ধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন হইলেও বৈদেশিক ব্যাপারে ইহাদের কোন পৃথক্ সত্তা থাকে না,

সুতরাং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রসমবায় একটি মাত্র রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রকৃত বন্ধনের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে সে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয় না, সে যুদ্ধকে অন্তর্বিপ্লব বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকালে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি দেশ দুইটি প্রকৃত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

সন্ধি-সমবায় (Confederation)

যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য সমবায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সন্ধি-সমবায় হইল সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সংগঠন। একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সন্ধি-সমবায়ের উৎপত্তি হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তির উপর সন্ধি-সমবায় প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত বা অন্য কোন ব্যাপকতর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সন্ধি-সমবায়ের সৃষ্টি হয় এবং এই সমবায়কে শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়। সন্ধি-সমবায় অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। সুতরাং সন্ধি-সমবায়কে যুক্তরাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক স্তর বলা যায়। সন্ধি-সমবায়, সন্ধি-বন্ধন বা ব্যক্তিগত বন্ধন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী সমবায় রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, যে রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তাহারা তাহাদের স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়া একটিমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সন্ধি-সমবায়ে প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র ইহার স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব বজায় রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অনেকগুলি জাতি ও রাষ্ট্রের সম্মিলনে এক নূতন জাতি ও নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সন্ধি-সমবায়ে কোন নূতন একাত্মবোধ-সম্পন্ন জাতির বা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসমষ্টি থাকে। এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাধে প্রযুক্ত হয়। সন্ধি-সমবায়ের এরূপ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ বা জনসমষ্টি থাকে না। প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রের পৃথক্ ভৌগোলিক সীমা থাকে ও এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার বাহিরে ইহার ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্র একটা লিখিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসনতন্ত্র সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিশেষত্ব হইল ক্ষমতা বিভাগ। অপরপক্ষে সন্ধি-সমবায় হইল একটা আন্তর্জাতিক চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি একটি পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের সমস্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির সমাধান করে। সুতরাং সন্ধি-সমবায়ে সরকারের ক্ষমতাবিভাগের কোন প্রশ্ন উঠে না।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতার বিভাগ করা হয় বলিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু সন্ধি-সমবায়ে শাসন-ক্ষমতার কোনপ্রকার ভাগ হয় না বলিয়া উচ্চ বিচারালয়ের আদৌ কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের অধিবাসী সমস্ত নাগরিকের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার-প্রবর্তিত আইন সকল অঞ্চলে সকল অধিবাসীর উপর প্রত্যক্ষভাবে বলবৎ করা হয়। কিন্তু সন্ধি-সমবায়ের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য কোন আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই। সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাগরিক ব্যতীত সন্ধি-সমবায়ের নিজস্ব কোন খাস নাগরিক থাকে না। সুতরাং সন্ধি সমবায়ের কেন্দ্রীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানের কোন নির্দেশ কার্যকরী করিতে হইলে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মারফতে করিতে হয়।

সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র একটি স্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠন, সুতরাং আঞ্চলিক সরকারগুলি কোনক্রমেই যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। তাহাদের বিচ্ছিন্ন হইবার প্রচেষ্টা বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হয় ও বলপ্রয়োগে এই বিদ্রোহ দমন করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে, সন্ধি-সমবায় অস্থায়ী। সদস্য রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজেদের কতকগুলি সাধারণ স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। উদ্দেশ্য সাধন হইলে অথবা অন্য কোন কারণে ইহারা ইচ্ছামত সন্ধি-সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন

হইতে পারে। আবার, অনেক সময় মার্কিন দেশ ও সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় সন্ধি-সমবায় যুক্তরাষ্ট্রেও পরিণত হইতে পারে।

জার্মান ভাষায় যুক্তরাষ্ট্র একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র (Bundestaat) বলিয়া পরিচিত, আর সন্ধি-সমবায়কে বলা হয় রাষ্ট্রের সম্মেলন বা সমবায় (Staatenbund)। যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন একটিমাত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সূচিত করে, আর সন্ধি-সমবায়ে পৃথক্ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন বহুসংখ্যক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র ও সন্ধি-সমবায়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণ (Merits of Unitary Government)

এককেন্দ্রীয় ব্যবস্থায়, কি শাসনব্যাপারে বা কি আইন-প্রণয়নে, কেন্দ্রীয় সরকারের অবাধ আধিপত্য থাকে। সেইজন্য দেশের সর্বত্র একই প্রকারের আইন প্রচলিত হয়; শাসনপদ্ধতিতেও সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হয়। সুতরাং অখণ্ডতার জন্যই এককেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য-পরিচালনায় বা বৈদেশিক ব্যাপারে এককেন্দ্রীয় সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয় না। জরুরী ব্যাপারে তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত করা এককেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। তৃতীয়তঃ, দেশে একটিমাত্র শাসনব্যবস্থা চালু থাকার জন্য কোন বিষয়ে মতভেদ বা অনৈক্যের সম্ভাবনাও কম থাকে। চতুর্থতঃ, দেশের শাসনকার্য একটিমাত্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বলিয়া ব্যয়সংকোচ করা সম্ভব হয়।

অপগুণ (Demerits)

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এককেন্দ্রীয় সরকারের উপযোগিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শকে কার্যকর করা সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলির আদৌ কোন ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং স্থানীয় ব্যাপারগুলির শাসনপরিচালনায়ও স্থানীয় লোকের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকে না। ফলে,

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দোষ হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার দূরে অবস্থিত বলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলগুলির নানাবিধ স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। শাসনব্যাপারে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুণ জনগণও রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহ বোধ করে না। তৃতীয়তঃ, শাসন পরিচালনার সমস্ত ভার একটিমাত্র সরকারের হস্তে ন্যস্ত বলিয়া ইহার উপর অত্যধিক পরিমাণে কার্যের চাপ পড়ে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব (Merits of Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই শাসনব্যবস্থা দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেশকে একত্রিত করা সম্ভব হয়, অথচ এই একত্রীকরণের দরুণ বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ হানি হয় না। এরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করিয়াও বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিরাট নানা ভাষাভাষী ও নানা জাতি-অধ্যুষিত দেশকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করিয়া আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেদের প্রয়োজনমত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারে। এইজন্য তাহাদের দূরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর করিবার একমাত্র পন্থা হইল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার শাসনকার্যে জনগণকে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকতর সুযোগ দেয়। এই সুযোগের ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। তাহারা শাসনব্যাপারে উৎসাহী হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র

ব্যবস্থায় শাসনকার্যের নানাবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাগ হওয়ার দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর শাসনকার্যের সমস্ত ভার থাকে না। এইরূপে শাসনব্যাপারে গুরুভার মুক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলিতে অধিকতর মনোযোগ দিয়া সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা (Demerits)

যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান দুর্বলতা হইল যে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলির জন্য পৃথক পৃথক শাসনব্যবস্থা চালু থাকার নিমিত্ত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল ও ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাবিভাগের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে, ফলে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ও বিশেষ করিয়া বৈদেশিক ব্যাপারে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সমস্ত আঞ্চলিক সরকারগুলির মত অনুসারে সর্বসম্মত নীতি নির্ধারণ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলেও কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চল একত্রিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিতে পারে। এই দল ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যে বাধা দিতে পারে। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পৃথক হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়াসও পাইতে পারে।

উপরি-উক্ত দুর্বলতাগুলি থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা দিন দিন জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। উল্লিখিত দুর্বলতাগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে কোথাও সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হইয়া উঠিতে দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার উদাহরণ আধুনিক কালে বিরল। পরন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হইল একমাত্র শাসনব্যবস্থা, যাহার দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা—এই দুইটি বিপরীত শক্তির সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হইয়াছে। মার্কিন দেশে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে সে দেশ আজ জগৎসভায় এত উচ্চ আসনের অধিকারী হইতে পারিত না। সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্যান্টনগুলি একত্রিত না হইলে ইয়ুরোপ মহাদেশের শান্তি আরও বহুবার বিঘ্নিত হইত।

ক্যানাডায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত না হইলে ইংরাজ ও ফরাসী জাতি আজ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়া সুখে ও সম্প্রীতিতে বাস করিতে পারিত না। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, যেদিন বিশ্বরাষ্ট্রসমূহকে এই যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হইবে সেদিন জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Form of Government)

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের শাসনবিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিসভাই এই সমুদয় ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থায় আইনতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন নামসর্বস্ব রাজা কিংবা নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি। রাজা বা রাষ্ট্রপতির নামে সমস্ত কার্য পরিচালিত হইলেও তাঁহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। মন্ত্রিসংসদই শাসন পরিচালনা করেন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারা মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিসভার কার্য যদি আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল, শাসনবিভাগীয় ও আইনবিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় না। মন্ত্রিগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হয়। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করিতে পারেন ও শাসনবিভাগীয় সমুদয় কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আইনসভা যদি মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর হয় পদত্যাগ করিতে হয় নতুবা আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই নূতন নির্বাচনের ফলের উপর মন্ত্রিসংসদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। নূতন নির্বাচনে যদি বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের পদত্যাগ বাধ্যতামূলক হয়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ মন্ত্রিসংসদ

প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকেন—এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) বলা হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের উৎপত্তি হয় ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশসমূহ ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে প্রয়োজন অনুসারে এই শাসনব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রবর্তন করিয়াছে। ফরাসী দেশ, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের পর আইনসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল মন্ত্রিসংসদ গঠন করে। দলের প্রধান নেতা প্রধান মন্ত্রিরূপে পরিচিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর সংহতি বজায় রাখেন। মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন ও আইনসভা কর্তৃক তাঁহাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া এই সরকারকে আইনসভা-প্রধান (Parliamentary Government) বলা হয়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার (Presidential or Non-Parliamentary Government)

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার একজন রাষ্ট্রনায়ক নির্দিষ্ট কালের জন্য পরিচালনা করেন। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র অনুসারে আইনসভার কর্তৃত্বাধীন নহে। অপরপক্ষে, আইনসভাও শাসন-কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়া কার্য পরিচালনা করে। এই শাসনব্যবস্থা ক্ষমতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে নামমাত্র যোগাযোগ থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহার এই চারি বৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারে না। তাঁহার সহকারী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে

তিনি নিয়োগ করেন এবং বরখাস্তও করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারী। রাষ্ট্রপতির নিদেশ ব্যতীত তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমত বা দায়িত্ব কিছুমাত্র নাই। রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র নাই। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন ও আইন-প্রণয়নে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। এক কথায়, রাষ্ট্রপতিকে গ্রেট্ বৃটেনের মন্ত্রিসংসদের ন্যায় আইনসভার উপর নির্ভর করিতে হয় না। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার শাসনতন্ত্রানুমোদিত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। এইজন্য আইনসভার নিকটে তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। অপরপক্ষে, আইনসভার কার্যেও রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নাই।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের পার্থক্য (Points of difference between Parliamentary and Presidential Forms of Government)

১। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় নামসর্বস্ব বংশানুক্রমিক একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। ইনি শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কার্যতঃ ইনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন। ইংলণ্ডের রাজা, ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, রাষ্ট্রপতি শুধু নামসর্বস্ব শাসক-প্রধান নহেন, পরন্তু তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

২। মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রি-সংসদ। মন্ত্রিসংসদের নির্ধারিত কার্যকাল থাকিলেও তৎপূর্বে আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে ইহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি ও কার্যকালের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা

নির্ধারিত হয়। বিশেষ বিচারব্যবস্থা ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত কর যায় না।

৩। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল—যতদিন তাঁহারা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে আইনসভা নিরপেক্ষ ও আইনসভার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া তাঁহার শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত কার্যকাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। আইনসভার আস্থা বা অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহার পদমর্যাদা বা কার্যকাল ক্ষুণ্ণ হয় না।

৪। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবর্গের দ্বারা গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী এই নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইলেও প্রধানমন্ত্রিসহ সমুদয় সদস্য সমপর্যায়ভুক্ত সহকর্মী। মন্ত্রিসংসদের সিদ্ধান্তগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় একমাত্র রাষ্ট্রপতিই হইলেন শাসনক্ষমতার অধিকারী—সুতরাং তাঁহার মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ অধস্তন কর্মচারী মাত্র। এক রাষ্ট্রপতি স্বয়ং ব্যতীত দলের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী অন্যান্য নেতৃবর্গ সাধারণতঃ আইনসভার সদস্য থাকেন—কদাচিৎ তাহাদের মন্ত্রণাসভায় দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন ও রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্তগুলি একমাত্র রাষ্ট্রপতির মতামতের উপর নির্ভর করে।

৫। মন্ত্রিসংসদ চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার কোন স্বাতন্ত্রীকরণ পরিদৃষ্ট হয় না। মন্ত্রিসংসদের সমুদয় সদস্যকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন-প্রণয়ন, নীতি-নির্ধারণ ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ইহারা আইনসভার নিকট ইহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন—আবার আইনসভার সহিত মতভেদ হইলে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রপ

আইনসভার সদস্য নহেন। তিনি বে-সরকারী সদস্যের সাহায্য ব্যতীত আইন-প্রণয়ন কার্যে যোগদান করিতে পারেন না বা প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না বা আইনসভাও বিশেষ বিচারপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Cabinet Government)

মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল যে, শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শাসনকার্য বিনা বাধায় সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন বলিয়া শাসনব্যবস্থায় কোনরূপ শৈথিল্য বা স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রিসভা যে শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহা সংখ্যাধিক্যের বলে আইনসভার অনুমোদন লাভ করে। দলগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদের সর্বদাই দলের নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনরূপ কার্য করিলে ভবিষ্যতে ইঁহারা জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইতে পারেন—এইজন্য জনস্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা বা জনমত উপেক্ষা করা ইঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আলাপ-আলোচনার দ্বারা মতভেদ দূর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলিয়া এই শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় হয়। পঞ্চমতঃ, মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার সহজেই প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যায় বলিয়া জরুরী অবস্থায় ইহা বিশেষ কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধকালে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না।

উল্লিখিত সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি দেখা দেয়। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ যদি একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা পদে পদে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা

থাকে। বিশেষ করিয়া আপৎকালে এই ঐকমত্যের অভাবে শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে, সে সমস্ত দেশে মন্ত্রিমণ্ডলী পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের ফলে শাসনব্যবস্থায় কোনরূপ প্রকৃত প্রগতিশীল নীতি অনুসৃত হইতে পারে না। ফরাসী মন্ত্রিসভার এইটি ছিল প্রধান ত্রুটি। দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দলগঠনের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলেই মন্ত্রিসভার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থার বিশেষ কোন স্থায়িত্ব নাই। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা দুই দিক দিয়া প্রকটিত হয়। ইংলণ্ডে এই শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিসংসদের বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। মন্ত্রিসংসদের আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকায় আইনসভা বর্তমানে একটি তাঁবেদার আইন-সভায় পরিণত হইয়াছে। ফলে, মন্ত্রিসংসদ সর্ববিষয়ে অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়াছে। ফরাসী দেশে আবার আইনসভার হস্তে মন্ত্রিসংসদকে ইচ্ছামত অপসারিত করিবার ক্ষমতা থাকায় সেখানে কোন মন্ত্রিসংসদই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Presidential Government)

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ঐ সময় পর্যন্ত তিনি নিজের নীতি অনুসরণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় বা জটিল পরিস্থিতিতে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক সেখানে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার অধিকতর উপযোগী। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীকে আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না, সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডলী একাগ্রচিত্তে শাসন পরিচালনা কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারেন। ইহাতে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়। চতুর্থতঃ, আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়া দেশের প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের জন্য ইহারা সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করিতে পারে না। কোন কারণে যদি শাসনকর্তৃপক্ষের সহিত আইনসভার মতবিরোধ বা সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। ফলে, জাতীয় স্বার্থের হানি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ দায়িত্বহীন হইয়া পড়িতে পারে। যে নির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যের জন্য কাহারও নিকট তাঁহার কার্যকালে দায়ী নহেন। জনগণ বা আইনসভা বা মন্ত্রিসংসদ তাঁহার কার্যের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহার খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র না থাকার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হইয়া দলীয় ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া শাসনকার্য অনেক পরিমাণে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে।

বিকেন্দ্রন বা বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation)

বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্ত হইতে কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা। বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই নীতি অনুসারে প্রশাসন ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত বিষয়ে ক্ষমতা স্থানীয় সরকারগুলিকে হস্তান্তরিত করে এবং হস্তান্তরিত ক্ষমতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোন হস্তক্ষেপ করে না। কেন্দ্রীকরণ (centralisation) ব্যবস্থায় ইহার বিপরীত ঘটে। সরকারের সমগ্র ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। স্থানীয় সরকারগুলি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। ইহাদের কোন স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীয়

সরকারগুলি যেরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল (autonomous) হয়, কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলি সেরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল নহে—ইহারা সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই দুইটি বিপরীতমুখী প্রবণতা পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। শাসনব্যবস্থাকে সুদক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। আবার শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামো অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে কোথাযও বা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অবলম্বন করা হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় এই উভয় নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে, অপর পক্ষে দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েৎরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা (Need for Decentralisation)

আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ব্যাপকতা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কোন একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সর্ববিষয়ে পুংখানুপুংখরূপে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যাপার পরিচালনা করা সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। এজন্য তিনটি কারণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় তথাকথিত নেতাগণের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে অধিকাংশ লোকই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া শাসন ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়ে। এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সরকারের প্রতি যে আনুগত্য দেখা যায় তাহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইতে পারে না। যে আনুগত্য সহযোগিতামূলক নহে তাহা কখনই সৃজনশীল হইতে পারে না। বিকেন্দ্রীকরণ সাহায্যে অধিকসংখ্যক লোককে প্রশাসনিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে অধিকারপ্রাপ্ত জনগণের মধ্যে আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে তাহারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সুনাগরিকে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান পরিচালনা দ্বারা কার্যকর ফল পাওয়া সম্ভব হয়। কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার সমরূপতার (uniformity) পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনমত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সর্ববিধ আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করা একান্তরূপে অসম্ভব। এজন্য বিকেন্দ্রীকরণ সাহায্যে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত ও সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকারগুলির হস্তে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা ক্ষমতা ন্যস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার সাহায্যে একদিকে যেরূপ কেন্দ্রীয় সরকারকে গুরু কার্যভার মুক্ত করা সম্ভব হয় অপরদিকে তদ্রূপ জনসাধারণকে প্রশাসনিক ব্যাপারের সহিত যুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় ও প্রসারিত করা সম্ভব হয়।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার অসুবিধা (Difficulties of Classification of Governments)

অ্যারিষ্টটলের সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শাসনব্যবস্থাগুলিকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা বর্তমান যুগে কতদূর প্রযোজ্য সে সম্পর্কে আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে। শুধু শাসনব্যবস্থার গঠনরূপ বা শাসনব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ভিত্তি করিয়া যে-কোন শ্রেণী বিভাগ করা হউক না কেন এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ত্রুটিহীন নহে। সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার বহু অসুবিধা আছে।

উপরি উক্ত অসুবিধা সম্পর্কে তিনটি শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটি হইল আধুনিক কালের বহু-পরিচিত এবং বহু-বিতর্কিত সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা। সাধারণতঃ প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ নীতি অনুযায়ী সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান (Federal Parliamentary) শাসনব্যবস্থা বলিয়া কথিত হয়। শুধু শাসনব্যবস্থার কাঠামোর দিক দিয়া দেখিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা বলিয়া মনে হইলেও সমগ্রভাবে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা বলা যায় না। এই শাসন-

ব্যবস্থার একদলীয় শাসন এবং শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে এই একটি দলের সীমাহীন প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থার মূলনীতি-বিরোধী। সুতরাং সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা এক অভিনব শাসনব্যবস্থা যাহাকে প্রচলিত কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

দ্বিতীয় উদাহরণ হইল প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্মভূমি বহু-প্রশংসিত সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রটির সংবিধানগত নামকরণ হইল সুইস সন্ধি সমবায় (Swiss Confederation), সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র (Swiss Federation) নহে। ক্যাণ্টনগুলির স্বাধীনতা ও আংশিক সার্বভৌমিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে এই নামকরণ করা হইয়াছে। পার্লামেণ্ট-প্রধান বৃটিশ শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি-প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এই উভয়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সুইস্ শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত এই শাসনব্যবস্থার অভিনবত্ব হইল অন্যান্য দেশের একজন সর্বোচ্চ শাসনকর্তৃপক্ষের স্থলে সাতজন সদস্য-সমন্বিত এক সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষের অবস্থিতি। সুতরাং সুইস্ শাসনব্যবস্থাকেও প্রচলিত কোন নীতি অনুযায়ী কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

তৃতীয় উদাহরণ হইল বর্তমান ফরাসী শাসনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থা ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৮৭৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের শাসন কাঠামোকে এককেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট-প্রধান (Unitary Parliamentary) বলা যাইতে পারে। বহু রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি সত্ত্বেও তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা সাধারণভাবে বলিতে গেলে বৃটেনের পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থার অনুরূপভাবেই পরিচালিত হইত। কিন্তু ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র (Fifth Republic) প্রবর্তিত হইবার পর এবং বিশেষ করিয়া জেনারেল দ্য গল রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার ফলে ফরাসী শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতীতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে পারিতেন—তিনি জাতীয় পরিষদ (National Assembly) ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপে ফরাসী শাসনব্যবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়। সুতরাং ফরাসী শাসনব্যবস্থাকেও পার্লামেণ্ট-প্রধান বা রাষ্ট্রপতি-প্রধান

শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ভারত ও নবগঠিত বাংলা দেশের শাসনব্যবস্থা দুইটিকে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা ও বিচার করিলে প্রচলিত কোন শ্রেণীভুক্ত করা সুকঠিন।

সুতরাং শাসনব্যবস্থার সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ আদৌ সহজসাধ্য নহে। এই কারণে শুধু শাসন-কাঠামোর ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ না করিয়া সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার (Political System) ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে।

সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,

১। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Liberal Democratic Systems)

২। একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Totalitarian Systems)

৩। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Autocratic Systems)

১। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল, এই ব্যবস্থাপনায় বাক্‌স্বাধীনতা, চলা-ফেরার স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত ও সুরক্ষিত হয় এবং সাধারণভাবে বলিতে গেলে বিচার বিভাগও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে কোন বাধা নাই। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সরকার অনুসৃত নীতির সমালোচনা করা যায়। সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের একচেটিয়া আয়ত্তে থাকে না। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, ভারত প্রভৃতি দেশগুলির শাসনব্যবস্থাগুলিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা গেলেও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হইল উপরি-উক্ত চারিটি দেশেই এই বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্য দেখা যায়।

২। একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হইল যে, জনজীবনের বিভিন্ন দিক কার্যতঃ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থাপনায় একটি বিস্তারিত আদর্শ থাকে এবং এই আদর্শই রাষ্ট্রের সমগ্র রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করে। একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার অধীনে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল হইল

আইনতঃ ক্ষমতার অধিকারী এবং এই ব্যবস্থাপনাকে একটি গণতান্ত্রিক রূপ দিবার অভিপ্রায়ে নানা উপায়ে জনসাধারণকে এই ব্যবস্থাপনার সমর্থক করিয়া তোলা হয়। ইহা ছাড়া, বিচারবিভাগ ও জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রও রাষ্ট্র কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

স্টালিন শাসনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, হিট্‌লারের নেতৃত্বে জার্মানী ও মুসৌলিনি-শাসিত ইতালী হইল একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থাপনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একনায়কতন্ত্রী হইলেও এই তিনটি দেশের বিশেষ করিয়া সোভিয়েত ও জার্মান-ইতালীও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল এবং এই পার্থক্যের জন্য এই তিনটিকে সঠিকভাবে এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের পর একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থাপনার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একজন নেতার অবিসংবাদী নেতৃত্বের পরিবর্তে দলীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। স্বৈরতন্ত্রী-ব্যবস্থাপনার কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই ব্যবস্থাপনায় শাসকবর্গ ঐক্য ও আনুগত্য আদায় করিবার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বলপ্রয়োগ নীতি গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অর্থাৎ দল গঠন ও নির্বাচনের ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। এই ব্যবস্থাপনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থাপনার অনুরূপ ইহার কোন আদর্শ নাই তবে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সময় সময় জাতীয়তাবাদ বা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির অবতারণা করা হয়। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমাজের একদল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করিয়া থাকেন এবং নাগরিক অধিকার ও জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমেই প্রত্যক্ষভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সময় আবার এই স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থাপনা সেনাদল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ইথিওপিয়া, নেপাল, আলজিরিয়া প্রভৃতিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা গেলেও ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত অপরটির মূলগত পার্থক্য আছে

সুতরাং দেখা যায় যে, উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে অধিকন্তু এই শ্রেণীবিভাগেরও ত্রুটি আছে। তবে এই শ্রেণীবিভাগের সপক্ষে বলা যায় যে, এই শ্রেণীবিভাগ সমগ্র শাসনব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত (System analysis) এবং শুধুমাত্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত (Institutional analysis) উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

সংক্ষিপ্তসার

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—এককেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার কোনরূপ ভাগ হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার হইল সরকারের সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। স্থানীয় সরকারগুলি হইল কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্ট আজ্ঞাবহ সংগঠনমাত্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা হয়। একটি লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয়। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য নহে এবং কোন উচ্চ বিচারালয়ের প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন ও উভয় সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখিবার জন্য একটি উচ্চ আদালত অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলির অবস্থিতি, (২) ক্ষমতার বিভাগ, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ের অবস্থিতি, (৫) রাজস্বের বণ্টন ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী—১। কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া তাহাদের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়া একরাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ২। দ্বিতীয়তঃ, একটি এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপায়—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল। এইজন্য ইহার সাফল্য কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। অবস্থাগুলি হইল—১। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক নৈকট্যের অবস্থিতি। ২। অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিদ্যমানতা। ৩। কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও ঐতিহ্যগত ঐক্যের বিদ্যমানতা।

৪। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা। ৫। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও পারস্পরিক সহনশীলতা।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনের নীতি ও পদ্ধতি—জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি, যথা, বৈদেশিক ব্যাপার, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি, যথা, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি আঞ্চলিক সরকারগুলির হস্তে ন্যস্ত থাকে। দেশভেদে এই বণ্টন-নীতির পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ড অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অবাধ ক্ষমতা থাকে ও এইজন্য আঞ্চলিক সরকারগুলিকে মূল রাষ্ট্রীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও সন্ধি-বন্ধন—সন্ধি-বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে আবদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মত তাহারা তাহাদের পৃথক্ সত্তা বিসর্জন দিয়া একটিমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় না।

ব্যক্তিগত-বন্ধন—ব্যক্তিগত-বন্ধনে একাধিক রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে সম্মিলিত হইলেও তাহাদের পৃথক্ সত্তা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখে।

প্রকৃত-বন্ধন—একাধিক রাষ্ট্র যখন একই রাজার অধীনে মিলিত হইয়া পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারে তাহাদের স্বাধীন পৃথক সত্তা লোপ করিয়া একরাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন তাহাকে প্রকৃত-বন্ধন বলা হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহাদের স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে।

সন্ধি-সমবায়—সন্ধি-সমবায়ে একাধিক রাষ্ট্র একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শাসনসংগঠন সৃষ্টি করিয়া সম্মিলিত হয়। কিন্তু এই সম্মেলনের ফলে তাহাদের স্বাধীন সত্তা লোপ পাইয়া কোন নূতন জাতি বা নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছামত এই সম্মেলন হইতে সম্পর্ক ছেদ করিতে পারে।

এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের গুণাপগুণ—এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হইল ইহার অখণ্ডতা, এবং এই অখণ্ডতার জন্য ইহা অধিকতর শক্তিশালী

হইয়া আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ও বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বেসর্বা বলিয়া এই শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও তদ্দ্বারা লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাপগুণ—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুসারে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একটি অখণ্ড জাতিসংগঠনে ইহা সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর স্থানীয় শাসনপরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গুরু শাসনভার হইতে মুক্ত হইয়া দেশের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহের উন্নতিসাধনে অধিকতর তৎপর হইতে পারে।

কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, শাসনক্ষমতা-বিভাগের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক ব্যাপারে দুর্বল হইয়া পড়ে। বৃহত্তর আঞ্চলিক সরকারগুলির সংঘবদ্ধ হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিতে পারে ও বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টাও দেখা দিতে পারে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার ও ইহার গুণাপগুণ—মন্ত্রিসংসদ্-চালিত সরকার-ব্যবস্থার শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইনসভার মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। আইনসভার ও শাসন-কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ না থাকার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। দলীয় শাসনের ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবারও সম্ভাবনা থাকে।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার ও ইহার গুণাপগুণ—রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় আইনসভা

ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র থাকে না, সুতরাং প্রত্যেক বিভাগই পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য করিবার সুযোগ পায়। আইনসভার প্রভাবমুক্ত হইয়া স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে ও জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। কিন্তু দায়িত্বশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। আর ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের ফলে সহযোগিতার অভাবে গুরুতর মতদ্বৈধ ঘটিয়া শাসনকার্যে অচল অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

বিকেন্দ্রীকরণ—বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্ত হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা। এই ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষভাবে কার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুভার মুক্ত হয়। অধিক সংখ্যক লোক সক্রিয়ভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহাদের সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত কার্যে উৎসাহ জন্মে এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। গণতান্ত্রিক আদর্শ সফল করিতে হইলে শাসন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (১)

(Organs of the Government)

আইনসভা (The Legislature)

সরকারের সমুদয় কার্য সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় ও এই তিনটি কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রত্যেক সরকারই তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত হয়। বিভাগ তিনটি হইল—আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। অনেক লেখক আবার নির্বাচকমণ্ডলীকে সরকারের চতুর্থ বিভাগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী আইনসম্মতভাবে সরকারের দৈনন্দিন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া সাধারণতঃ ইহাকে সরকারের একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত হয়। আইনসভার কার্যের বিশদ আলোচনা করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আইনসভার কার্য (Functions of the Legislature)

আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। আইনসভাকে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় আইনসভার মাধ্যমে। আইনসভা-প্রণীত আইন অনুসারে শাসনবিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং বিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে সেই অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং আইনসভার কার্য হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভা অনুপযোগী পুরাতন আইনগুলিকে বাতিল করিতে পারে, বা পুরাতন আইনগুলির সংশোধন করিতে পারে এবং দেশের প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নূতন আইন প্রবর্তন করিতে পারে।

আইনসভা বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন আইন অনুমোদন করে না। শাসনকর্তৃপক্ষের মত আইনসভা কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। এইজন্য আইন-প্রণয়নকার্য একটি জটিল ও দীর্ঘ পদ্ধতির মধ্য দিয়া সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে। আইন কার্যকর হইলে জনস্বার্থের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক না করিয়া কোন আইনই বলবৎ করা যায় না। বিরোধিদলের মতামত, জনমত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণপূর্বক নানা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত আইন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারের একটা প্রধান অঙ্গ হইল বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা (Deliberation)। এইজন্য বিশেষরূপে বিচার-বিবেচনা করা আইনসভার আর একটি কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সরকারী আয়-ব্যয়ের আলোচনা ও মঞ্জুরী করা আইনসভার আর একটি প্রধান কার্য। সরকারের আয় কি পরিমাণে হইবে, কি কি কর ধার্য করা হইবে এবং করপদ্ধতি কি হইবে ও কিভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্য আদায়ীকৃত রাজস্ব ব্যয় করা হইবে, এই সকল বিষয় আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। এক কথায়, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য নানাভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আহরণ করা হয়। অর্থের অপচয় ও ব্যয়বাহুল্য রদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় সকল দেশের আইনসভা সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আইনসভা শাসনবিভাগীয় নীতি ও বিভিন্ন কার্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত করে।

ইংলণ্ডে সরকারী হিসাব সংস্থা (Public Accounts Committee), ব্যয়ের হিসাব সংস্থা (Estimates Committee) এবং হিসাব পরীক্ষক প্রধান সংস্থা (Office of the Comptroller and Auditor General) সাহায্যে পার্লামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ কার্য বলবৎ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কংগ্রেস সভা প্রয়োজনীয় কর আহরণ ব্যবস্থা ও ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি যে পরিমাণ অর্থ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য দাবী করেন

কংগ্রেস সাধারণতঃ তদপেক্ষা কম পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর করে। উদ্দেশ্য হইল যে, সরকারকে পুনরায় অর্থের জন্য আইনসভার দ্বারস্থ হইতে হইবে এবং এইরূপে ব্যয়ের পরিমাণ পুনরায় আইনসভা কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে। কংগ্রেসের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সাধারণতঃ সাধারণ হিসাব সংস্থা (General Accounting Office) দ্বারা পরিচালিত হয়।

ভারতেও বৃটিশ ব্যবস্থার অনুরূপভাবে সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। এখানেও সরকারী হিসাব সংস্থা, ব্যয়ের হিসাব সংস্থা এবং হিসাব পরীক্ষক প্রধান সংস্থার মাধ্যমে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কার্য বলবৎ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ প্রত্যক্ষভাবে ইহার শাসনকার্য ও শাসননীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ত্রিসংসদকে অপসারিত করিতে পারে। প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ও অন্য নানা উপায়ে আইনসভা শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা পরোক্ষভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগগুলি সিনেট সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। উভয় পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যুদ্ধঘোষণ করিতে পারেন না।

অনেক দেশে আইনসভার হস্তে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার অধিকার ন্যস্ত থাকে। ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সভার শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকিলেও পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা আছে।

আইনসভা অনেক ক্ষেত্রে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনায় কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় সরকারী চাকুরীতে রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন তাহা উচ্চ পরিষদের অনুমোদন-সাপেক্ষ। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিও উচ্চ পরিষদের অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয় না ও সেগুলিকে বলবৎ করা যায় না। অনেক দেশে আইনসভা নির্বাচনক্ষমতার অধিকারী থাকে

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনসভার নির্বাচিত সদস্যবর্গের ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া আইনসভায় কিছু বিচারবিভাগীয় কার্যও সম্পাদন করিতে হয়। মন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে অভিযুক্ত করিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা আইনসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার হস্তে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আইন-প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভার আরও নানাবিধ কার্য করিতে হয়।

আইনসভার সংগঠন (Organisation of the Legislature)

আইনসভা এক-কক্ষ অথবা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইতে পারে। যে সমস্ত দেশে দ্বি কক্ষ অর্থাৎ দ্বি-পরিষদ্‌বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত আছে, সে সমস্ত দেশে একটি পরিষদ্‌কে উচ্চ পরিষদ্ (Upper House or Second Chamber) বলা হয়, অন্যটিকে নিম্ন পরিষদ্ (Lower House or Popular Assembly) বলা হয়। প্রায় সকল দেশেই নিম্ন পরিষদ্ ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উচ্চ পরিষদের সংগঠন পদ্ধতি সর্বত্র সমান হয় না। উচ্চ পরিষদের সংগঠনে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব জাপান ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে উচ্চ পরিষদ্ উত্তরাধিকার-সূত্রের (Hereditary principle) দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে অবশ্য এই উত্তরাধিকার-সূত্র ব্যতীত অন্য নীতিরও প্রয়োগ দেখা যায়। ক্যানাডার উচ্চ পরিষদ্ মনোনয়ন-নীতির (Principle of Nomination) উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে উচ্চ পরিষদের সমস্ত সদস্যই ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক আজীবন সদস্যরূপে মনোনীত হইয়া থাকেন। ফরাসী, ভারত প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদের সদস্যবৃন্দ জনগণ কর্তৃক পরোক্ষ-ভাবে নির্বাচিত (Indirect election) হইয়া থাকেন। জনগণ কর্তৃক

নির্বাচিত রাজ্য আইনসভাগুলি উচ্চ পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ্ সিনেট সভা ভোটদাতৃগণ-কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত (Direct election) প্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদ্ মনোনয়ন ও নির্বাচন (Partly elected and partly nominated) এই দুইটি নীতির সমন্বয়ে গঠিত হইত। উচ্চ পরিষদের কিয়দংশ সদস্য শাসনকর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত, এবং অপর অংশ জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারে।

এক-কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা (Unicameral Vs. Bicameral Legislature)

আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট না দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইবে এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে, সেগুলিকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। অপরপক্ষে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, তাহা এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে অধিকাংশ সভ্যদেশের আইনসভাই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য দ্বিপরিষদ আইনসভা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বি-কক্ষের সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয় :—

লেকি তাঁহার *Democracy and Liberty* নামক গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলিয়াছেন যে, যত প্রকারের শাসনব্যবস্থা আছে বা হইতে পারে তাহাদের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক-কক্ষ আইনসভাবিশিষ্ট সরকার হইল নিকৃষ্টতম। এই ব্যবস্থায় আইনপরিষদের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহা পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার এই স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধা দিবার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন অপরিহার্য। দ্বিতীয় কক্ষের অবর্তমানে এক-কক্ষ আইনসভা অসংযত ও পক্ষপাতমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা দুইটি পরিষদ্ লইয়া গঠিত হইলে প্রত্যেকটি আইন উপযুক্তভাবে বিবেচিত হইতে পারে। একটিমাত্র কক্ষ থাকিলে বিশেষ বিচার-বিবেচনাহীন ও দ্রুত আইন রচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আইন-সভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে সাময়িক উত্তেজনার বশে বা সতত পরিবর্তনশীল জনমতের চাপে কোন আইন-প্রণয়ন সম্ভব হয় না। দুইটি পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে কোন আইন বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং একটি পরিষদ্ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব আনয়ন করিলেও অপর কক্ষ তাহাকে বাধা দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন হইল জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু এই বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য সময়ের প্রয়োজন। আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে আইনের প্রস্তাব ও শেষ অধ্যায়ের মধ্যে এত অবসর পাওয়া যায়, যাহাতে প্রত্যেকটি প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, আইনসভা দুইটি পরিষদ্ দ্বারা গঠিত হইলে একটি পরিষদ্ দ্বারা আনীত আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অপর পরিষদ্ কর্তৃক সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। একটি পরিষদ্ থাকিলে অনেক সময় আইনের প্রত্যেক প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত সময় বা যোগ্যতা সেই পরিষদের না থাকিতে পারে। কিন্তু আইনসভা দ্বি-কক্ষ হইলে অপর পরিষদ্ প্রস্তাবিত আইন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া ইহার গলদ দূর করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হয়। প্রায় সকল দেশেই এমন সমস্ত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা নির্বাচনব্যাপারে বীতস্পৃহ অথচ শাসন-পরিচালন কার্যে তাঁহাদের এরূপ যোগ্যতা আছে যে, তাঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশ জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হয়। উচ্চ পরিষদ্ থাকিলে এই সকল যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বারা উচ্চ পরিষদের সদস্য করা যাইতে পারে। ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া উচ্চ পরিষদ্ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চ পরিষদ্ বিভিন্ন 'অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইয়া

গঠিত হয় বলিয়া আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও স্বার্থসংরক্ষণে ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে পারে। ল্যাস্কি প্রভৃতি অনেক প্রগতিশীল লেখক ইহার সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে আইন-প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদ্‌ই যথেষ্ট। উচ্চ পরিষদ বাহুল্যমাত্র। আধুনিককালে কোন আইনই দ্রুত ও বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া প্রণয়ন করা হয় না। এইজন্য আইন প্রণয়নের পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই জটিল ও দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য একটি উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চ পরিষদ্‌ কার্যকরীভাবে নিম্ন পরিষদের আইন-প্রণয়নকার্যে বাধা দিতে পারে না। প্রায় সকল দেশেই নিম্ন পরিষদ্‌ অধিক ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং নিম্ন পরিষদ্‌ ইচ্ছা করিলে উচ্চ পরিষদের আপত্তি সত্ত্বেও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে উচ্চ পরিষদের কোন সার্থকতা নাই। তৃতীয়তঃ, উচ্চ পরিষদ্‌ থাকিলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বারা উচ্চ পরিষদের সদস্য করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের জন্য পৃথক্‌ নীতি অনুসৃত হয়। সেইজন্য মনোনয়ন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চ পরিষদ্‌ অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বিচারালয়ের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা হয়। উচ্চ পরিষদ্‌ কোনক্রমেও আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা সংরক্ষণে সাহায্য করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেও উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ ভোটদান দ্বারা তাঁহাদের নিজ প্রদেশ অপেক্ষা দলীয় নির্দেশের প্রতি অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। পঞ্চমতঃ, দুইটি পরিষদ্‌ ব্যয়সাপেক্ষ ষষ্ঠতঃ, দুইটি পরিষদ থাকিলে অনেক সময় উভয়ের মধ্যে বিরোধের ফলে কার্যে অযথা বিলম্ব হয়। সপ্তমতঃ, উচ্চ পরিষদ কিভাবে সংগঠিত হইবে সে সম্বন্ধেও এখন পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক নীতি উদ্ভাবিত হয় নাই। উক্ত

পরিষদের মধ্যে ক্ষমতাবন্টনের ব্যাপারেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এই সমস্ত কারণে ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ে (Abbe Seieyes) বলেন, উচ্চ পরিষদ্ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত একমত হয় তবে তাহা বাহুল্যমাত্র, আর উচ্চপরিষদ্ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে তাহা অত্যন্ত হানিকর। উচ্চ পরিষদ্ যতই কার্যকরী হউক না কেন, জনগণের প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত নিম্ন পরিষদের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিতে পারে না। উল্লিখিত কারণগুলির জন্য দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উপযোগিতা অনেকে অস্বীকার করেন।

উচ্চ পরিষদের সংগঠন ও কার্যকলাপ (Organisation and proper functions of Second Chambers)

অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, উত্তরাধিকার-সূত্র বা মনোনয়ন বা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা সংগঠিত উচ্চ পরিষদ্ আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন যে, উচ্চ পরিষদের অধিকাংশ সদস্য নিম্ন পরিষদ্ দ্বারা নির্বাচিত হওয়া উচিত, আর কিছুসংখ্যক সদস্য যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত।

উচ্চ পরিষদ্ যদি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা যায় তবে উচ্চ পরিষদের উপর নিম্নলিখিত কার্যগুলির ভার দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির গলদ দূর করা। দ্বিতীয়তঃ, যে আইনগুলি সম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না, সে জাতীয় আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা। তৃতীয়তঃ, সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া নিম্ন পরিষদ্ যাহাতে দ্রুত আইন প্রণয়ন করিতে না পারে সেজন্য আইন-প্রণয়নে সাময়িক বাধা সৃষ্টি করিয়া জনমতকে সজাগ রাখা উচ্চ পরিষদের একটি প্রধান কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রেট বৃটেনে লর্ড সভা বর্তমানে এক বৎসরকাল পর্যন্ত সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বাধা দিতে পারে। চতুর্থতঃ, উচ্চ পরিষদের আর একটি কার্য হইল প্রস্তাবিত আইনগুলির বিশদ আলোচনা করিয়া সেগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করা। কিন্তু উচ্চ পরিষদের কার্যকলাপ

এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে নিম্ন পরিষদের ইচ্ছা কোনক্রমে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

ভারতের রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা (Utility of Second Chamber in the Indian States)

নূতন সংবিধান অনুসারে ভারতে ছয়টি রাজ্যে -বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ— দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার প্রবর্তন করা হইয়াছিল। রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে বর্তমানে মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য দুইটির আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ২৭নং বিধান পরিষদ্ আইন অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ও বর্তমানে নূতন মহারাষ্ট্র রাজ্যের জন্য দ্বি-পরিষদের ব্যবস্থা হইয়াছে। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য দুইটির উচ্চ পরিষদ লোপ করা হইয়াছে! কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে দ্বি-পরিষদের উপযোগিতা থাকিলেও রাজ্য সরকারের ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল কার্যতঃ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্য সরকারগুলির এরূপ বিশেষ কোন দায়িত্ব নাই, যে জন্য বিশেষ বিচার-বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন হইতে পারে। পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দেশবিভাগের ফলে এই রাজ্যগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা এত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র রাজ্য দুইটির পক্ষে একটি অতি-ব্যয়সাপেক্ষ উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। একটি উচ্চ পরিষদ্ পোষণের গুরু ব্যয়ভার জনসাধারণকে অনর্থক বহন করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ পরিষদ্ ১৯৬৯ সালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

খসড়া আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Bills)

আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত আইনের প্রস্তাবকে খসড়া আইন বলা হয়। খসড়া আইনকে উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা, সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট খসড়া আইন (Public Bills) ও বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট খসড়া আইন (Private Bills)। সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট আইনের প্রস্তাব সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হইলে তাহাকে সরকারী খসড়া আইন

(Government Bills) বলা হয়, আর বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত হইলে তাহাকে বে-সরকারী সদস্য-প্রস্তাবিত খসড়া আইন (Private Members' Bills) বলা হয়। সরকারী খসড়া আইনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়: সাধারণ স্বার্থবিষয়ক প্রস্তাব (Ordinary Bills) ও অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব (Money Bills)। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সাধারণতঃ শাসন-বিভাগীয় কোন সরকারী সদস্য ব্যতীত আইনসভার বে-সরকারী সদস্যগণ উত্থাপন করিতে পারেন না। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির দুইটি শ্রেণী আছে। ব্যয়বরাদ্দের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব আনীত হয় তাহাকে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর বিল (Appropriation Bills) বলা হয়, আর কর ধার্য করিবার প্রস্তাবগুলিকে রাজস্ব বিল (Finance Bills) বলা হয়।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি (Process of Law-making)

আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। আইন প্রণয়নে আইনসভাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বিচার-বিবেচনাপূর্বক আইন প্রণয়ন করিতে হয়। এইজন্য প্রত্যেক দেশে আইন-প্রণয়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রণয়ন-পদ্ধতিও জটিল এবং দীর্ঘ হয়।

খসড়া আইনকে আইনে পরিণত করিবার পূর্বে কয়েকটি নির্ধারিত পর্যায়ে উহার বিশদ-আলোচনা করা হয়। আইনসভার যে সদস্য আইনের প্রস্তাব আইনসভায় আনয়ন করিতে ইচ্ছুক, প্রথমে তাঁহাকে নিজে অথবা অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে খসড়াটি প্রস্তুত করিতে হয়। আইন-প্রণয়নে শব্দবিন্যাসে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। খসড়াটি প্রস্তুত হইলে আইন-সভায় উহা পেশ (Introduction) করিতে হয়। পেশ করিবার পর প্রথম পর্যায়ে আইনের প্রস্তাবক সভাপতির অনুমতিক্রমে খসড়াটির শিরোনামা মাত্র পাঠ করেন. জরুরী আইন না হইলে পাঠের পর কোন প্রকারের আলোচনা হয় না। ইহাকে আইনের প্রথম পাঠ (First Reading) বলা হয়। তারপর খসড়াটি মুদ্রিত হইয়া সদস্যগণের মধ্যে বিলি করা হয় ও একটি নির্ধারিত দিনে খসড়াটির দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) হয়। দ্বিতীয়বার পাঠের সময় খসড়াটির মৌলিক নীতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের অনুষ্ঠান চলে, কিন্তু খসড়াটির ধারা-উপধারা সম্পর্কে

কোনরূপ বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। খসড়াটি যদি সংখ্যাধিক্যের অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে ইহা একটি বিশেষ সংস্থার (Committee) নিকট প্রেরিত হয়। এই সংস্থা কর্তৃক খসড়াটির ধারা-উপধারা প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হয়। সংস্থা ইচ্ছামত খসড়াটির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। এই ব্যবস্থাকে Committee Stage বলা হয়। সংস্থা যদি খসড়াটির কোন পরিবর্তন করে তবে পরিবর্তিত আকারে খসড়াটি আইনসভায় প্রেরিত হয় (Report Stage)। শেষ পর্যায়ে খসড়াটির তৃতীয় পাঠ (Third Reading) হয়। এই পর্যায়ে খসড়াটিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে হয় নতুবা সমগ্রভাবে ইহাকে বাতিল করিতে হয়—এই পর্যায়ে খসড়াটির কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না।

নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে খসড়াটি উচ্চ পরিষদে বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। উচ্চ পরিষদেও একই পদ্ধতিতে খসড়াটির আলোচনা হয়। উচ্চ পরিষদ্ পুনর্বিবেচনার জন্য খসড়াটিকে নিম্ন পরিষদে ফেরৎ পাঠাইতে পারে। উভয় পরিষদের মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশন হয়, অথবা মতবিরোধ দূর করিবার অন্য পন্থা সকল দেশেই আছে। সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের ইচ্ছাই সর্বত্র বলবৎ হয়। উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলে রাজা, রাষ্ট্রপতি বা শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অনুমোদন লাভ করিয়া খসড়াটি আইনে পরিণত হয়। এইরূপে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া আইনসভার মাধ্যমে জনগণের সমবেত ইচ্ছা আইনরূপে মূর্ত হইয়া উঠে।

সার্বভৌম ও অ-সার্বভৌম আইনসভা
(Sovereign and Non-Sovereign Law-making Bodies)

আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার দিক দেখিতে গেলে আইনসভাগুলিকে সার্বভৌম আইনসভা ও অ-সার্বভৌম আইনসভা—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা, কিন্তু এই আইন প্রণয়ন ক্ষমতার তারতম্যের ভিত্তিতে আইনসভাগুলিকে উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

সার্বভৌম আইনসভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, (১) এই আইনসভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে স্বৈর ও আদিম ক্ষমতার অধিকারী। ইহার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে উদ্ভূত নহে। (২) দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন আইন নাই যাহা এই সার্বভৌম আইনসভা প্রণয়ন করিতে পারে না। (৩) তৃতীয়তঃ, এমন কোন আইন নাই যাহা এই সভা সংশোধন বা বাতিল করিতে পারে না। এক কথায়, আইন-প্রণয়নে এই আইনসভা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী। (৪) চতুর্থতঃ, দেশের মধ্যে এরূপ কোন আইনগ্রাহ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ্ থাকে না যে বা যাহারা এই আইনসভা-প্রণীত আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই আইনসভা কার্যতঃ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সর্বেসর্বা এবং ইহার দ্বারা প্রণীত আইনগুলি দেশের সর্বত্র প্রযোজ্য।

অপরপক্ষে অ-সার্বভৌম আইনসভার বৈশিষ্ট্য হইল যে, (১) এই আইনসভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা অন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে উদ্ভূত—ইহার আদিম বা স্বৈর ক্ষমতা থাকে না। (২) দ্বিতীয়তঃ, এই আইনসভা সর্বপ্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে না বা সব আইন সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারে না। (৩) তৃতীয়তঃ, এই আইনসভা-প্রণীত আইন শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নাকচ করিতে পারে বা বিচারবিভাগ ইহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভা হইল সার্বভৌম আইনসভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা এতই দুর্ভেদ্য যে, এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট সভা একমাত্র নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ও পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ব্যতীত আর সবই পারে। পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা স্বৈর—ইহা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডের কোন কর্তৃপক্ষেরই বা কোন বিচারালয়ের নাই। পার্লামেণ্ট সভা সকলপ্রকার আইনই—কি সাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক—প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করিতে পারে। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য।

পার্লামেণ্ট সভার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসকে

অ-সার্বভৌম আইনসভা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা আদিম নহে—ইহা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতর আইন অর্থাৎ শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত ও এই শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কংগ্রেসের আইন-প্রণয়নক্ষমতা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস-প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনসাপেক্ষ। তিনি ইহা নাকচ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী আইন বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এইরূপ বে-আইনী ঘোষিত আইন কার্যকর হয় না। পরিশেষে বলা যায় যে, কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা বিভিন্ন রাজ্যগুলির স্বাধীন আইন-প্রণয়নক্ষমতার দ্বারাও সংকুচিত হইয়াছে। এইজন্য বলা হয় যে, মার্কিন দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (কংগ্রেস) দুই দিক দিয়া সীমাবদ্ধ (Doubly restricted), কিন্তু ইংলণ্ডের আইনসভা (পার্লামেণ্ট) আদৌ সীমাবদ্ধ নয়।

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নীতিগতভাবে পার্লামেণ্ট সভার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ বর্তমানে পার্লামেণ্ট সভাকে আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা সমীচীন নহে। পার্লামেণ্ট বলিতে রাজা-সহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা বুঝায়। বর্তমানে রাজা ও লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বর্তমানে কমন্স সভার প্রাধান্য সূচিত করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কমন্স সভা হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সুতরাং পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বলিতে কেবিনেটেরই প্রাধান্য বুঝায়। ইহা ব্যতীত, অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসন-বিভাগ কর্তৃক আইন-প্রণয়ন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক আইন-ব্যাখ্যাকালীন পরোক্ষ আইন-প্রণয়ন দ্বারাও পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়নক্ষমতা বহুলাংশে সংকুচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইনগুলির বিরোধী কোন আইনও পার্লামেণ্ট সভা প্রণয়ন করিতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, পার্লামেণ্ট-প্রণীত কোন আইনই ডোমিনিয়নগুলির বিনা সম্মতিতে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং দেখা যায় যে, পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বর্তমানে একটি নিছক কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে।

অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন (Delegated Legislation)

আইন প্রণয়ন করা একমাত্র আইনসভার কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু আইনসভা যখন এই আইন প্রণয়ন কার্য শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে হস্তান্তরিত করে, তখন শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত আইন অর্পিত ক্ষমতা বলে প্রণীত আইন বলিয়া কথিত হয়। আইন প্রণয়ন করা শাসনকর্তৃপক্ষের মৌলিক ক্ষমতা নহে—ইহা উদ্ভূত বা প্রাপ্ত (derivative) ক্ষমতা মাত্র। সুতরাং শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইনকে প্রয়োজনীয় কিন্তু অপ্রধান আইন বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় এইরূপ আইন প্রচলিত আছে। এই আইনগুলি মন্ত্রিগণ কর্তৃক নিয়ম (Rules), বিধি (Regulations) ও উপ-বিধি (Bye-laws) প্রভৃতি আকারে প্রণীত হয়।

অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা (Need for Delegated Legislation)

নানা কারণে এই ধরনের আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, বর্তমান যুগে কল্যাণ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা ও কার্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। নিত্য নূতন আইন-প্রণয়নের বর্ধিত চাহিদা একটিমাত্র আইনসভা পূরণ করিতে পারে না—কারণ ইহার সেরূপ পর্যাপ্ত সময়ও নাই ও যোগ্যতাও নাই। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনসভা আইনের পরিধি-রেখা (outline) অংকন করে, বিশদ বিবরণ সন্নিবেশ করিতে পারে না। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে যে তথ্য-সংক্রান্ত ও প্রায়োগিক জ্ঞান প্রয়োজন তাহা আইনসভার নাই। এই কারণে রচিত আইনকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ করা প্রয়োজন হয়। এই পূর্ণাঙ্গ করিবার ভার শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ নানা নিয়ম, বিধি, উপ বিধি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া প্রয়োগযোগ্য করে। পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের এই পূর্ণাঙ্গকরণ কাজকে অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রণয়ন বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন একটি জটিল কার্য। ইহার জন্য বিশেষ বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রতিনিধিমূলক আইনসভা আইনের নীতি

ও গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হইলেও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অধিকারী নহে। সুতরাং যাহারা এই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, সেই শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে আইন-প্রণয়নের জটিল অংশ অর্পণ করা হয়।

তৃতীয়তঃ, বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন। আইনসভা সমরূপ (uniform) আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় অবস্থা অনুসারে আইন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনেক সময় স্থানভেদে আইনের কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। নূতন নিয়ম, বিধি বা উপ-বিধি প্রণয়ন সাহায্যে শাসনকর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগযোগ্য করে। ইহাতে আইনের নমনীয়তাও বৃদ্ধি পায়।

অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আইনসভার সময়ের মিতব্যয়িতা হইয়াছে। আইনের বিশদ তথ্য বা জটিল বিষয়ের আলোচনায় সময়ক্ষেপ না করিয়া আইনসভা এখন আইনের নীতি ও গুণাগুণ বিচারে অধিক সময় ব্যয় করিতে পারে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়াও সম্ভব।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়নের প্রধান অসুবিধা হইল যে, শাসনকর্তৃপক্ষ তাহাদের নির্ধারিত ক্ষমতা সংঘন করিয়া আইন প্রণয়ন করিবার নীতিও নির্ধারণ করে। ইহার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। শাসনকর্তৃপক্ষের সাধারণতঃ জনসাধারণের সহিত কোন যোগাযোগ থাকে না। সুতরাং শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন জনস্বার্থ-বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া, এই অপ্রধান আইনগুলি যখন বিচারালয়ের আওতা-মুক্ত হয়, তখন এই আইনগুলি বিপজ্জনক হয়।

আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস (Decline of the Legislature)

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ আইনসভা-প্রণীত আইনই হইল শাসন ও বিচার বিভাগদ্বয়ের কার্যাবলীর পথনির্দেশক। এতদ্ব্যতীত শাসন ও বিচার—এই দুইটি বিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়বরাদ্দের উপর নির্ভর করিতে হয়।

কিন্তু বর্তমান যুগে আইনসভার প্রাধান্য ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে, অপর দিকে শাসনবিভাগের গুরুত্ব অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সমস্ত কারণে আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পাইতেছে তাহা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের ফলে দলের তথা দলীয় নেতার ক্ষমতা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দলীয় সংহতি এরূপ কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় যে, দলের সদস্যগণকে অন্ধভাবেই দলীয় নির্দেশ পালন করিতে হয়। দলের সদস্যপদ গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া আইনসভায় ভোটদান ব্যাপার পর্যন্ত সমস্ত কিছুই দলীয় নির্দেশে পরিচালিত হয়। সুতরাং আইনসভার সদস্যগণের কোন অনুপ্রেরণা বা ব্যক্তিত্ব থাকে না। যে আইনসভার কোন সদস্য নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে আলাপ-আলোচনা বা কাজ করিতে পারে না, সে আইনসভা শুধুমাত্র ভোটদান যন্ত্রে পরিণত হয়। এরূপ নিষ্ক্রিয় আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভার সদস্যগণ প্রধানতঃ কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের ধারক বলিয়া নির্বাচিত হন। তাঁহাদের কোন বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বর্তমানে আইন-প্রণয়ন কার্য যে শুধু জটিল হইয়াছে তাহা নহে, এই কার্যে অনেক সময় বিশেষ বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আইনসভার অধিকাংশ সদস্যই এই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী নহেন, সেইজন্য সদস্যগণ আইন-প্রণয়ন কার্য রূপায়ণের ভার শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করেন। আইন-প্রণয়ন কার্যে আইনসভার এই অক্ষমতা জনিত ঔদাসীন্যের ফলেও ইহার প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, প্রায় সব দেশেই দলের নেতৃবর্গ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। দলীয় অনুশাসন অমান্য করিলে দল হইতে বহিষ্কার এবং আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা নেতৃবর্গ আইনসভার দলীয় সদস্যগণকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ফলে আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের তাঁবেদারে পরিণত হয়।

চতুর্থতঃ, অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রণয়ন (Delegated Legislation) প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার ফলেও আইনসভা আরও ক্ষমতাহীন হইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইনসভার প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার বিচার বিভাগীয় পুনর্বিচার (Judicial Review) দ্বারাও কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস বিশেষরূপে দেখা যায়। পার্লামেন্ট আজ আর শাসন করে না বা শাসন করা ইহার উদ্দেশ্য বলিয়াও পরিগণিত হয় না। শাসনকর্তৃপক্ষ-কেবিনেট সব ক্ষমতাই আত্মসাৎ করিয়াছে। ভারতে আইনসভার প্রাধান্য কোনদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা ছাড়া, পার্লামেন্ট সভায় বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বহুদলের অবস্থিতির জন্য পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজেই ক্ষমতাসীন শাসনকর্তৃপক্ষই পার্লামেন্টের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সভার উপর শাসনকর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভিটোক্ষমতা, বাণী প্রেরণ, প্রেস সম্মেলন, টেলিভিসন বক্তৃতা এবং কংগ্রেস সভায় তাঁহার দলের সাহায্যে আইন-সভার কাজ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। এতদ্ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা আইনসভার প্রাধান্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

আইনসভার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইলেও বলিতে হইবে যে, আইন-সভা জনমতের প্রতিনিধি ও জনমত জাগ্রত করিতে সাহায্য করে। ইহার বিভিন্ন কমিটিগুলির মাধ্যমে এই সভা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। যুগের চাহিদা মিটাইবার জন্য আজ আইনসভা ইহার পূর্ব ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ—(১)

আইনসভা—আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ—সরকারের এই তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভা সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হয়।

আইনসভার কার্য—১। পুরাতন আইন সংশোধন করা ও নূতন আইন প্রণয়ন করা। ২। বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা। ৩। আয়-ব্যয়ের তদারক ও মঞ্জুর করা। ৪। শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করা। ৫। বিচার-বিভাগীয় কিছু কার্য সম্পাদন করা।

আইনসভার সংগঠন—আইনসভার নিম্ন পরিষদ সাধারণতঃ নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা গঠিত হয়। উচ্চ পরিষদের গঠন-প্রণালী সর্বত্র সমান নহে। উত্তরাধিকার-সূত্র, মনোনয়ন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচন প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা উচ্চ পরিষদ সংগঠিত হয়।

এক কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা—বর্তমানে প্রায় সকল দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হইয়াছে। দ্বি কক্ষের সপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান হয়।

সপক্ষে যুক্তি—১। উচ্চ পরিষদ্ বর্তমান থাকিলে নিম্ন পরিষদ্ যথেচ্ছ-ভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। ২। নিম্ন পরিষদের বিবেচনাহীন ও দ্রুত আইন-প্রণয়নে বাধা দিয়া উচ্চ পরিষদ্ জনমত জাগ্রত করিতে পারে। ৩। আইন-প্রণয়নে নিম্ন পরিষদের ভুলত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। ৪। বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য দ্বিতীয় পরিষদ্ অপরিহার্য।

বিপক্ষে যুক্তি—১। আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি বর্তমান যুগে এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, কোন আইনই দ্রুত পাস করা যায় না। আর নিম্ন পরিষদ্ অধিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইচ্ছা করিলে যে-কোনও আইন পাস করিতে পারে, তাহাতে উচ্চ পরিষদ্ বাধা দিতে পারে না। ২। উচ্চ পরিষদে বিশেষ স্বার্থ ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়। ৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ আদালতই আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকারের রক্ষাকবচের কার্য করে, সেজন্য উচ্চ পরিষদের কোন আবশ্যকতা নাই। ৪। উচ্চ পরিষদের সর্ববাদিসম্মত কোন সংগঠন-প্রণালী আজও পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। ৫। ক্ষমতাবণ্টনের দিক দিয়াও উচ্চ পরিষদ্ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত

একমত হয় তাহা হইলে ইহা বাহুল্যমাত্র, আর যদি নিম্ন পরিষদের কার্যে বাধা দেয় তাহা হইলে ইহা ক্ষতিকর।

উচ্চ পরিষদের প্রকৃত কার্য হইল নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের ভুলত্রুটি সংশোধন, মতবিরোধহীন আইনের প্রস্তাব আনয়ন ও উপযুক্তভাবে প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাব বিবেচনা করা।

ভারতে রাজ্য-সরকারের ক্ষেত্রে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা—পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই ছয়টি রাজ্যে প্রথমে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হইয়াছিল—ইহার বিপক্ষে বলা হয় যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং কেন্দ্রে দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও রাজ্যসরকারগুলিতে ইহার আবশ্যকতা খুব কম। অনেক রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়াছে—তাহাদের পক্ষে দ্বি-কক্ষ আইনসভা পোষণ করা ব্যয়সাপেক্ষ।

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি বর্তমানে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। আইনের প্রস্তাবককে খসড়া আইন প্রণয়ন করিয়া আইনসভায় পেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রথম পাঠ হয়। তাহার পর দ্বিতীয় পাঠ। দ্বিতীয় পাঠের পর বিশেষ একটি সংস্থার বিবেচনার্থ আইন সেই সংস্থার নিকট পাঠান হয়। সংস্থা খসড়াটিকে পরিবর্তিত আকারে বা পরিবর্তন না করিয়া পুনরায় আইন-পরিষদে প্রেরণ করে। তখন তৃতীয় পাঠ হয়। তৃতীয় পাঠের পর খসড়াটি অন্য পরিষদে প্রেরিত হয়। অন্য পরিষদ একই পদ্ধতিতে খসড়াটি বিবেচনা করে। অন্য পরিষদের সমর্থন লাভ করিলে রাজ্য বা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া খসড়াটি আইনে পরিণত হয়।

অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন

আইনসভা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন এই নামে অভিহিত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইন নিয়ম, বিধি, উপবিধি আকারে বলবৎ করা হয়।

ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বহু আইন প্রচলিত দেখা যায়।

আইনসভার সময় স্বল্প। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আইন পূর্ণাংগরূপে প্রণয়ন করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব নয়। আইনসভার সদস্যগণের সেরূপ বিশেষ জ্ঞানও নাই। তাই নানা বিধি, উপবিধি সংযোজন দ্বারা আইনসভা প্রণীত আইনকে পূর্ণাংগ করিবার ভার শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থার সাহায্যে প্রত্যেকটি আইনকে স্থান ও কালের ভিত্তিতে রূপায়িত করিয়া অধিকতর উপযোগী করা সম্ভব। আইনসভারও সময়ের মিতব্যয়িতা হয়। কিন্তু অনেক সময় শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত আইন জনস্বার্থ বিরোধী হয়। এইরূপ আইন বিচারালয়ের আওতামুক্ত হইলে আরও বিপজ্জনক হয়।

আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার অগ্রাধিকার স্বীকৃত হইলেও বর্তমানে নানা কারণে আইনসভার এই প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। আইনসভার প্রভাব ও ক্ষমতা আজ দলীয় নেতৃত্বের চাপে অবরুদ্ধ। দলীয় নির্দেশ পালন করা ব্যতীত আইনসভার সদস্যগণের আর কোন কর্তব্য নাই। দল হইতে বহিষ্কার ও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলীয় নেতৃবর্গ আইনসভাকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করিয়াছে। অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় পুনর্বিচার প্রবর্তন ফলেও আইনসভার অগ্রাধিকার ও মর্যাদা বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (২)

শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগ (The Executive and the Judiciary)

ব্যাপক অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশবিভাগের অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বুঝায়। আইন-পরিষদ্ ও বিচারবিভাগ ব্যতীত সরকারী কার্যে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীই শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত হয়। সংকীর্ণ অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনবিভাগের নীতি ও কার্যক্রমনির্ধারক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ্ বুঝায়।

শাসনকর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ ও নিয়োগ-পদ্ধতি (Classification and Appointment of the Executive)

শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক একজন রাজা অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন।

বংশানুক্রমিক রাজা (Hereditary King) অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি (Elected President) নামসর্বস্ব (Nominal) শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে পারেন। ইংলণ্ডের বংশানুক্রমিক রাজা ও ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন শাসনকর্তৃপক্ষের আইনসভার সহিত যোগসূত্র থাকে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আইনসভা-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ (Parliamentary Executive) বলা হয়। ইংলণ্ডে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। শাসনকর্তৃপক্ষের যদি আইনসভার সহিত কোন প্রকার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র না থাকে এবং আইনসভাও যদি শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ (Non-Parliamentary Executive) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন-

ব্যবস্থা চালু দেখিতে পাওয়া যায়। শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যখন একটিমাত্র ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তখন তাহাকে একক শাসনকর্তৃপক্ষ (Single Executive) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি শাসন-পরিষদের সর্বাধিনায়ক থাকেন ও পরিষদের অপর সদস্যগণ তাঁহার নির্দেশে পরিচালিত হইয়া থাকেন। একনায়কতন্ত্রে ও রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। শাসনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সহকারী নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু সহকারিবৃন্দ তাঁহার নিম্নতম কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসনবিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে তিনিই নিয়োগ করেন ও সদস্যগণ তাঁহার নির্দেশেই পরিচালিত হন। নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিবাদী ইটালীতে এক-নায়কতন্ত্র ব্যবস্থায় একব্যক্তিই সমস্ত ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকারী ও সমস্ত দায়িত্ববহনকারী বলিয়া পরিগণিত হইত।

শাসন-পরিষদ্ যদি একব্যক্তি দ্বারা গঠিত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হয় এবং শাসনকার্য যদি একাধিক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে শাসন-পরিষদকে সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ (Plural Executive) বলা হয়। মন্ত্রিসংসদ্-চালিত শাসনব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তি যৌথ-ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায়ও একজন নেতা বা প্রধানমন্ত্রী থাকেন। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম হইলেও অনেক বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমষ্টিগত শাসন পরিষদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুইজারল্যাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। সুইস্ শাসন-পরিষদ্ (Federal Council) সাতজন সমক্ষমতাবিশিষ্ট সদস্য লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে একজন এক বৎসরের জন্য সভাপতি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিলে এই সভাপতি অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা উচ্চতর বা কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব শাসন-পরিষদের সাতজন সদস্যই সমভাবে বহন করেন।

একক শাসন-পরিষদ্-ব্যবস্থায় একজন মাত্র ব্যক্তি শাসনক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় বলিয়া অবস্থা অনুসারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। শাসনক্ষমতা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হইলে দৃঢ়তার সহিত কোন কার্যকরী পন্থা

অবলম্বন করা যায় না, সুতরাং শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। একক শাসন-পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, শাসনকর্তৃপক্ষ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় কার্যসমূহ সময়মত সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু একহস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

সমষ্টিগত শাসন-পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, একাধিক ব্যক্তির আলাপ-আলোচনা ও ভাববিনিময়ের দ্বারা শাসনব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত হইতে পারে। সময়সাপেক্ষ হইলেও আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থিরীকৃত নীতি অধিকতর কার্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। ক্ষমতা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত থাকার ফলে ইহার স্বৈরপ্রয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলা হয় যে, শাসনক্ষমতা যদি একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা শুধু দুর্বল হইয়া পড়ে তাহা নয়, শাসকগণের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানেরও অভাব হইতে পারে। এইজন্য মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ-দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং একজন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিসংসদ্ পরিচালিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডে এই সমষ্টিগত শাসন-পরিষদ্ সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিলেও অন্যত্র এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নাই।

শাসনবিভাগীয় কার্য (Functions of the Executive)

শাসনবিভাগীয় কার্য পাঁচটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

১। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Administrative Power)

শাসন বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনসমূহ প্রয়োগ করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং দেশে যাহাতে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেজন্য জনসাধারণকে আইন মানিতে বাধ্য করা। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে পুলিশবাহিনী পরিচালনা করিতে হয় এবং আইনভঙ্গকারীদের বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত কারাবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়।

২। কূটনৈতিক ক্ষমতা (Diplomatic Power)

বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নানা কারণে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক হইবে

তাহা শাসনবিভাগ স্থির করে। বৈদেশিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত দূতবিনিময় করে ও এই দূতের মাধ্যমেই রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক শক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদন করা ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় কার্য শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

৩। সামরিক ক্ষমতা (Military Power)

পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধকার্য পরিচালনা করা শাসন-বিভাগের আর একটি প্রধান ক্ষমতা। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শাসনবিভাগ স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের পরিচালনা করে। যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতাও শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করা বা যুদ্ধ পরিচালনা করিবার ব্যয়ের জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে আইন-পরিষদের অনুমোদন লাভ করিতে হয়।

৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative and Ordinance-making Power)

শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও থাকে। মন্ত্রি-সংসদ্-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদের প্রত্যেকটি সদস্য আইনসভার সদস্য হিসাবে আইনসভায় আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব করিতে পারেন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারাই মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করেন। সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইনগুলি সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনে আইনে পরিণত হয়। অনেক সময় আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিসংসদ্ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ পরোক্ষ উপায়ে আইন-প্রণয়নকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বাতিল করিতে বা স্থগিত রাখিতে পারে। আপৎকালে শাসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রবর্তন করিতে পারে।

৫। বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Power)

শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচারবিষয়ক ক্ষমতাও থাকে। অধিকাংশ দেশে উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষের দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতাও থাকে।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (Permanent Civil Service)

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ হইল শাসনবিভাগের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রত্যেক দেশেই এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ লইয়া শাসনবিভাগ গঠিত হয়। শাসন-বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমন্ত্রিপরিষদ্ রাজা বা রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রিপরিষদ্ নির্ধারিত কালের জন্য নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং নির্দিষ্ট কাল অন্তে কার্যভারমুক্ত হন এবং নূতন শাসকগণ নিযুক্ত হন। ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন এবং তাঁহারা নির্ধারিত নীতি ও কার্যের জন্য পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। এইরূপে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকগণ শাসিতের নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম স্থির করাই শাসন পরিচালনার একমাত্র কাজ নহে। নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমকে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য আর এক দল দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন। এই কর্মচারিগণের শুধু দক্ষ ও কর্মকুশল হইলেই চলে না—তাঁহাদের কার্যের স্থায়িত্বও থাকা আবশ্যক। নতুবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তনের সঙ্গে এই কর্মচারিবৃন্দের পরিবর্তন ঘটিলে শাসনবিভাগের কার্য একেবারেই অচল হয়। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর শাসক দেখা যায়—প্রথম শ্রেণীর শাসকগণ শাসনবিষয়ক নীতি নির্ধারণ করিলেও নির্ধারিত কার্যকালের জন্য নিযুক্ত হন। দক্ষতা অপেক্ষাও দায়িত্বশীলতা হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসকগণ দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত হন। দায়িত্বশীলতা অপেক্ষা কর্মকুশলতাই হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহারা নির্দিষ্ট বয়সে নিযুক্ত হইয়া একটা নির্দিষ্ট বয়সে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর কর্মচারিগণ যাহাতে

নিরপেক্ষভাবে দক্ষতার সহিত সরকারী কার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ইঁহাদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বেতন প্রভৃতি একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ সংসদ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। সুশাসনব্যবস্থা দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে এবং শাসনবিভাগের এই দুইটি অঙ্গের সুসামঞ্জস্যের উপর শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে।

বিচারবিভাগ ও ইহার কার্য (The Judiciary and its Functions)

লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে, কোন দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণ করা যায় একমাত্র সেই দেশের বিচারব্যবস্থার উৎকর্ষ দ্বারা। একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই উক্তিটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ভার থাকে বিচারকদের উপর। বিচারপতিগণ শুধু যে আইনগুলি প্রয়োগ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন তাহা নয়, প্রয়োজনমত তাঁহারা প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এরূপভাবে প্রয়োগ করেন যাহাতে দোষী ব্যক্তি যথাযথভাবে দণ্ডিত হয় ও নির্দোষ ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। বিচারকার্য একটা লৌকিক ব্যবস্থামাত্র নহে। অপরাধীর উদ্দেশ্য ও অপরাধের গুরুত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করিয়া শাস্তিবিধান করা উচিত। বিচারব্যবস্থা এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে, একাধিক অপরাধী অব্যাহতি লাভ করুক, কিন্তু একজনও নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায়। সুতরাং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রক্ষাকল্পে ন্যায় বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হয়।

বিচারপতিগণ আইনের প্রয়োগ করেন ও আইনের কি ব্যাখ্যা হওয়া উচিত তাহা স্থির করেন। এইরূপে ব্যাখ্যাত আইনগুলি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। একাধিক বিচারক যখন তাঁহাদের পূর্ববর্তী বিচারক-কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইন অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন, তখন এই নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা নূতন আইন সৃষ্টি হয়। বিচারকগণ অন্য আর এক প্রকারে আইন সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি কোন বিরোধের বিষয় প্রচলিত আইনের গণ্ডির মধ্যে না পড়ে, তাহা হইলে বিচারকগণ তাঁহাদের বিবেক ও

ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণকে আর এক প্রকারের কার্য সম্পাদন করিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করা। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা আঞ্চলিক সরকারগুলির শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অপরের কার্যক্ষেত্রে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের উভয় সরকারের কার্যকলাপ শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা থাকে।

বিচারকগণ নির্দিষ্টক্ষেত্রে প্রয়োজনমত আইন-পরিষদ্ ও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় উচ্চ বিচারালয়ের অভিমত জানিবার জন্য যে-কোন বিষয় উপস্থিত করিতে পারেন।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা (Independence and Impartiality of the Judiciary)

স্বাধীনতা ও সাম্য হইল গণতন্ত্রের আদর্শ। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই অপরিহার্য দুইটি উপাদান সুরক্ষিত করা হইল গণতন্ত্রের প্রধান কার্য। এই কার্য বহুলাংশে দেশের বিচার বিভাগ সংগঠন, বিন্যাস ও বিচার বিভাগের শুচিতা, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে শাসন বিভাগ ও আইনসভার সহিত বিচার বিভাগের পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণে বিচার বিভাগের রাজনৈতিক মত-নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়।

ন্যায়বিচার করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা বিচারকের পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃত হয়। বিচারকগণ যাহাতে আইন অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, বিচারকগণ আইন প্রয়োগ করিয়া দোষী ও নির্দোষ স্থির করেন ও অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তিবিধান করেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারক যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হন, তাহা হইলে হয়ত

নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইতে পারে ও দোষী অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ন্যায়ধর্ম অনুসারে বিচারকের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, শাসনকর্তৃপক্ষের বে-আইনী কার্যকলাপের হস্ত হইতে নাগরিক অধিকারগুলি রক্ষা করা বিচারকগণের আর একটি গুরু দায়িত্ব। যে ক্ষেত্রে বিচারকগণের আইনসভা বা শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বিচারপতিগণের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হয়। যথা, (১) বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি, (২) অপসারণ পদ্ধতি, (৩) বিচারপতিগণের কার্যকাল, (৪) যোগ্যতা, (৫) বেতন পরিমাণ ও (৬) শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ।

(১) বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি (Mode of Appointment of the Judges)

বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বহুল পরিমাণে তাঁহাদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশে বিচারক নিয়োগে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যেহেতু মার্কিন শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত, সেই হেতু বিচারক নিয়োগ ব্যাপারে দলীয় প্রভাব কার্যকর হইয়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগে অনেক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডে প্রধান বিচারালয় লর্ড সভার বিচারপতিগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রকৃত পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড চ্যান্সেলর বিচারপতিগণের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করেন।

ভারতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি করেন তবে তিনি এই সমুদয় নিয়োগ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিগণের ও রাজ্যগুলির উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের কিছু সংখ্যকের সহিত তাঁহার ইচ্ছামত পরামর্শ করিতে পারেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সমুদয় বিচারপতি নিয়োগক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অবশ্যই সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেনই। ভারতের রাজ্য উচ্চবিচারালয়-গুলির বিচারপতিগণ ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাজ্য উচ্চবিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য উচ্চবিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির সহিতও পরামর্শ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যের বিচারপতিগণ গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং কিছু সংখ্যক রাজ্যে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

সুইস্ ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সুতরাং বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে সাধারণতঃ তিনটি নীতি অনুসৃত হয় —প্রথমটি হইল শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনয়ন। দ্বিতীয়টি হইল জনগণ দ্বারা নির্বাচন আর তৃতীয়টি হইল আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন। এখন প্রশ্ন হইল যে, কোন্ পদ্ধতিটির দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ সম্ভব?

ডঃ গার্ণারের মতে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা বিচারপতি-গণের নিয়োগ হইল সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণ দলাদলির ও জনপ্রিয়তা লাভের উর্ধ্বে থাকিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। যুক্তির দিক দিয়া আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য হইলেও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারপতি মনোনয়ন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মনোনয়ন অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণ এই মনোনয়ন করিয়া থাকেন। সর্বক্ষেত্রে যে তাঁহারা ব্যক্তিগত

তামতের ঊর্ধ্বে থাকিয়া কঠোরভাবে একমাত্র যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ রেন তাহা সত্য নহে। ইংলণ্ডে রাজা ও ভারতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচার-তিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত হইলেও উভয় দেশেই এই নিয়োগ ্যাপারে প্রধানমন্ত্রিগণের প্রভাব অনতিক্রমণীয় এবং এই উভয় দেশের ধান মন্ত্রী বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের নেতা। সুতরাং বিচারপতি নয়োগ ব্যাপারে তাঁহাদের কতদূর দল-নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব তাহা বিতর্কের বষয়।

আইনসভা কর্তৃক বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই দ্ধতিতে বহুলোক তর্ক-বিতর্কের দ্বারা যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া বিচারপতি-ণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ আইনসভা প্রণীত আইনগুলির াখ্যা ও প্রয়োগ করেন। সুতরাং শাসনকর্তৃপক্ষ অপেক্ষা বিচার বিভাগ াইনসভার সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত। সেই হেতু আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুইস্ দেশে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সোভিয়েত দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকার ফলে এই পদ্ধতি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় বিচারপতিগণ দলাদলির সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। বিচারপতিগণ তাঁহাদের নির্বাচন ও পদের স্থায়িত্বের জন্য দলীয় স্বার্থে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

একই কারণে জনসাধারণের হস্তে বিচারপতি নিয়োগের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হওয়া উচিত নয়। যোগ্য বিচারক নির্বাচন করিবার অনুরূপ বুদ্ধি বা যোগ্যতা সাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায় না। অপরপক্ষে বলা যায় যে, ভোটদাতাগণ যদি আইনসভার সদস্যগণকে নির্বাচন করিতে পারেন তাহা হইলে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের অযোগ্য বিবেচনা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ভুল করিতে পারে কিন্তু অসংখ্য ভোটদাতা সমবেতভাবে সাধারণত ভুল করে না। ইহা ছাড়া বলা যায় যে, ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচন অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত নীতি।

সুতরাং দেখা যায় যে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে তিনটি পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। শেষ পর্যন্ত বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও শিক্ষার উপর নির্ভর

করে। যে দেশে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেই পদ্ধতির উপর যদি বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলেই সেই দেশে সেই পদ্ধতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা যায়।

(২) অপসারণ পদ্ধতি (Mode of Removal)

বিচারপতিগণ যাহাতে ভীতি বা প্রলোভনের দ্বারা কর্তব্য সম্পাদনে পরিচালিত না হন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সামান্য কারণে পদ হইতে অপসারণ না করা যায় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কাহারও খুসীমত যখন তখন অপসারণের ভয় থাকিলে বিচারপতিগণ ন্যায়বিচার করিতে পারেন না। এই কারণে একবার বিচারপতি নিযুক্ত হইলে কোন দেশেই সহসা তাঁহাদের পদচ্যুত না করিবার ব্যবস্থা থাকে। ইংলণ্ডে বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী থাকেন (during good behaviour) ততদিন পর্যন্ত (একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত) তাঁহাদিগকে অপসারণ করা যায় না। কোন বিচারককে পদচ্যুত করা হউক এই মর্মে যদি পার্লামেণ্ট সভা রাজার নিকট আবেদন করে তাহা হইলে একমাত্র সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারককে পদচ্যুত করা যায়। সুতরাং ইংলণ্ডের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে একমাত্র অভিশংসন পদ্ধতি (Impeachment) ব্যতীত রাষ্ট্রপতি নিজে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কোন বিচারপতিকে অপসারণ করিতে হইলে নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ অভিযোগ আনয়ন করিবে ও উচ্চকক্ষ সিনেটসভা সেই অভিযোগের বিচার করিবে। ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে কোন বিচারপতির অসদাচরণ বা অযোগ্যতা সম্পর্কে প্রস্তাব পাস করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত হইলে তিনি অপসারণের আদেশ দান করিবেন। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণ ছয় বৎসরের জন্য আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইলেও তাঁহাদের পুনর্নির্বাচনে কোন বাধা নাই—তাঁহারা ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন।

৩) কার্যকাল (Tenure of off

কার্যকালের স্থায়িত্ব না থাকিলে কোন লোকই কোন কাজ নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতে পারে না। বিচারকগণের গুরু দায়িত্বের জন্য তাঁহাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন। কারণ বিচারপতিগণ যত অধিক দিন স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ততই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বা আইনের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভারতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত ও উচ্চ বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর পর্যন্ত বিচারপতির কার্য করিতে পারেন।

৪) যোগ্যতা (Qualifications)

বিচারকের যোগ্যতা আইনসভার বা শাসনকর্তৃপক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বিচারপতিগণের আইনবিশেষজ্ঞ হওয়া বাধ্যতামূলক এবং বিচারপতিগণ রাজনীতি-নিরপেক্ষ হইবেন ও সদা-পরিবর্তনশীল জনমত দ্বারা প্রভাবিত হইবেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারা সদাচারী ও নিষ্ঠাবান হইবেন। এই কারণে অনেক দেশে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে বিশিষ্ট আইনজীবিগণের মধ্য হইতে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। যাঁহারা অন্তত পাঁচ বৎসর কোন উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতির কাজ করিয়াছেন অথবা রাষ্ট্রপতির মতে যে ব্যক্তি আইনসম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ভারতে তাঁহাদিগকেই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। সুইস্ দেশে শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইবার জন্য কোন আইনগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। জাতীয় সভায় নির্বাচনের যোগ্যতাসম্পন্ন যে-কোন সুইস্ নাগরিক উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু কার্যতঃ উচ্চমানের আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই বিচারপতিপদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

(৫) বেতন পরিমাণ (Salaries)

উপযুক্ত যোগ্যতা-সমন্বিত ব্যক্তিগণকে বিচারকার্যে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বেতন পরিমাণ যদি

তাঁহাদের পদমর্যাদা, দায়িত্বভার ও উচ্চমানের জীবনযাত্রার সহিত সংগতিপূ না হয় তাহা হইলে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। তাঁহাদের বেতন পরিমাণ এরূপ হওয়া চাই যাহাতে তাঁহার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থাকিয়া নির্ভয়ে ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদ করিতে পারেন। তাঁহাদের কার্যকালের মধ্যে বেতন পরিমাণ পরিবর্তন করা কাম্য নহে। বেতন পরিমাণ উপযুক্ত না হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিচারপতিপদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে অথবা গ্রহণ করিয়া কিছুদিন পর পদত্যাগ করেন।

(৬) শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকিকরণ (Separation of the Judiciary from the Executive)

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও সংরক্ষিত করিবার একটি অপরিহার্য শর্ত হইল বিচারবিভাগের শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকা। এই নিয়ন্ত্রণ মুক্তি না থাকিলে বিচারবিভাগ নির্ভীকভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ নিরোধ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। বহুদিন পূর্বে ফরাসী লেখক মণ্টেস্কু বিচারবিভাগের এই স্বাধীনতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বৃটিশ শাসনকালে ভারতে বিচারবিভাগের এ স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ধীরে ধীরে বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুপ্রীম কোর্টের কার্যপ্রণালী ও কর্মী নিয়োগ প্রধান বিচারপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট পরিচালনাব্যয়ও আইনসভার বাৎসরিক সম্মতি নিরপেক্ষ করিয়া এই ব্যয়কে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়-বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পার্লামেণ্ট সভায়ও এই বিচারালয়ের কোন কার্য বা ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা হইতে পারিবে না।

আইনসভার সহিত শাসনকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক (Relation between the Legislature and the Executive)

সরকারের বিভিন্ন কার্য তিনটি পৃথক্ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইলেও প্রশাসনিক দক্ষতা অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত এই তিনটি বিভাগের সম্পূর্ণ

পৃথকীকরণ সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। প্রত্যেক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ়তর ও সুদক্ষ করিতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দেশেই আইনসভার সহিত শাসন-বিভাগের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যোগসূত্র বর্তমান।

প্রথমতঃ, গ্রেট বৃটেন, ফরাসী দেশ বা ভারত, যেখানে পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে, সেখানে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রি-পরিষদের সমুদয় সদস্যই আইনসভার সদস্য এবং যতদিন তাঁহারা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন তাঁহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। নিছক নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিপরিষদ্ আইনসভার উপর নির্ভরশীল হইলেও কার্যতঃ বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কি নীতিনির্ধারণে, কি আইন-প্রণয়নে—সর্ববিষয়েই মন্ত্রিপরিষদ্ হইল সর্বেসর্বা। কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিতে পারেন। ফরাসী দেশের পূর্বতন পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সেখানে আইনসভার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত এবং আইনসভা ইচ্ছামত মন্ত্রিপরিষদ্ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত। এইজন্য ফরাসী মন্ত্রিপরিষদ্ অতিমাত্রায় আইনসভার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার স্থায়িত্ব গড়ে তিনমাসের অধিক হইত না। ভারতে আইনসভার সহিত মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক বহুল পরিমাণে গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ করিয়া গঠিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সেখানে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক চরম কর্মবিভাগ-নীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। উভয় বিভাগই পারস্পরিক প্রভাব হইতে যথাসম্ভব মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্য পরিচালিত করে। তবে রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার বিশেষ করিয়া উচ্চকক্ষ সিনেট সভার কিছু সম্পর্ক বিদ্যমান।

তৃতীয়তঃ, সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন করিয়া

শাসনব্যবস্থাকে যুগপৎ স্থায়ী ও দক্ষ করিয়া গঠন করা হইয়াছে। সুই· শাসনকর্তৃপক্ষের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা একাধিক সম-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি লইয়া গঠিত এবং আইনসভা কর্তৃক তাঁহাদের নীতি বা কার্যক্রম গৃহীত ন হইলেও তাঁহারা আইনসভার মতের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

আইনসভার সহিত বিচারবিভাগের সম্পর্ক (Relation between the Legislature and the Judiciary)

অনেক লেখক বিচারবিভাগকে সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মর্যাদা না দিয়া আইনসভারই একটি প্রশাসনিক অংশ বলিয়া বিবেচনা করেন কিন্তু এরূপ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়—কারণ বিচারবিভাগ শুধু আইনসভা-প্রণীত আইনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ অন্য নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা ও তাহাদের বিবেক, বুদ্ধি ও ন্যায়বোধ প্রয়োগ করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি দ্বারা আইনসভা-প্রণীত আইনগুলিকে পরিপুষ্ট করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের উচ্চ বিচারালয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করে এবং শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু গ্রেট বৃটেন বা ফরাসী দেশের বিচারবিভাগ শেষোক্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে।

অপরপক্ষে আইনসভার উচ্চকক্ষ আপীল মামলার প্রধান বিচারালয় রূপে কার্য করে—যথা, গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা। এতদ্ব্যতীত ইহা শাসনকর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের অপরাধ বিচার করিবার অধিকারী। সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। গ্রেট বৃটেন ও ভারতে বিচারপতিদের অপসারিত করিতে হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের রাজা বা রাষ্ট্রপতিসকাশে যুক্ত আবেদন করিতে হয়।

শাসনকর্তৃপক্ষের সহিত বিচারবিভাগের সম্পর্ক (Relation between the Executive and the Judiciary)

বিচারবিভাগ যাহাতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে ইহার কার্য পরিচালন

রিতে পারে, তজ্জন্য এই বিভাগকে শাসনকর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ করা হয়। অনুরূপ কারণে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকেও বিচারবিভাগের প্রভাবমুক্ত রাখা হয়। রাজা, রাষ্ট্রপতি বা গভর্ণরগণ সাধারণ বিচারালয়ের এলাকাবহির্ভূত বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ফরাসী দেশে শাসনবিভাগীয় কর্মচারিগণের শাসন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য সাধারণ বিচারালয়ে বিচার হইতে পারে না। শাসন সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য পৃথক্ বিচারালয় আছে।

কিন্তু উভয় বিভাগের মধ্যে উপরি উক্ত স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও উভয় বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র বর্তমান। প্রথমতঃ, শাসনকর্তৃপক্ষ অনেক দেশে বিচারক নিযুক্ত করেন ও কিছু বিচারবিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন, যথা, প্রাণদণ্ড মকুব করা। অপরপক্ষে, বিচারবিভাগও অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসনবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্টপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচারপতিগণ তাঁহাদের বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সংকোচ বা সম্প্রসারণ করিতে পারেন।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ

শাসনকর্তৃপক্ষ—শাসনকার্যে নিযুক্ত কর্মচারিসমূহকে লইয়া শাসনবিভাগ গঠিত হয়। শাসনকার্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদকে সাধারণতঃ শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়।

শাসনকর্তৃপক্ষীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক রাজা অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন। এইরূপ ব্যক্তি নামসর্বস্ব প্রকৃত ক্ষমতাশূন্য অথবা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভা-প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি-প্রধান হইতে পারে। সাধারণতঃ শাসনকর্তৃপক্ষ একক হয়। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শাসনকর্তৃপক্ষ হইল সমষ্টিগত। এরূপ ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা একহস্তে ন্যস্ত না হইয়া একটি সংসদের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়।

সুইজারল্যাণ্ডে সাফল্যমণ্ডিত হইলেও সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ-ব্যবস্থা অন্যত্র সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

শাসনবিভাগীয় কার্য—১। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রভৃতি শাসনবিভাগীয় কার্য; ২। বৈদেশিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করিবার জন্য কূটনৈতিক কার্য; ৩। যুদ্ধ পরিচালনা ও শান্তিস্থাপনের জন্য সামরিক কার্য ৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা; ৫। বিচার-বিষয়ক কার্য।

বিচারবিভাগ ও ইহার কার্য—১। বিচারকগণ আইন প্রয়োগ করিয়া আইন-ভঙ্গকারীদের শাস্তি প্রদান করেন, ২। আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া নূতন আইনের সৃষ্টি করেন; ৩। অনেক সময় তাঁহাদের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াও নূতন আইন প্রণয়ন করেন, ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা তাঁহাদের আর একটি প্রধান কার্য।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা—প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা ও নিরপরাধকে অব্যাহতি দিয়া বিচারকগণ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করেন। এজন্য বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া একান্ত আবশ্যক ছয়টি উপায় দ্বারা বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা যায়, ১। নিয়োগ পদ্ধতি, ২। কার্যকালের স্থায়িত্ব, ৩। উপযুক্ত বেতন; ৪। অপসারণ পদ্ধতি; ৫। যোগ্যতা ও ৬। শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ।

বিচারক নিয়োগ-পদ্ধতি—(১) জনগণ কর্তৃক অথবা (২) আইনসভা কর্তৃক বিচারকগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা দ্বারা বিচারপতিগণের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেজন্য (৩) শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ-পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি

(Theory of Separation of Powers)

রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রান্তর্গত জনসমষ্টির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। এই কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে সমাজ-মধ্যে এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে, যে পরিবেশে ব্যক্তিমাত্রই স্বীয় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। এইজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তিকে কতকগুলি অধিকার অর্পণ ও কর্তব্যের নির্দেশ দান করে। রাষ্ট্র-নির্ধারিত আইনের সাহায্যেই এই অধিকার ও কর্তব্য বলবৎ করা যায় ; সুতরাং আইন-প্রণয়ন, আইন বলবৎ ও পক্ষপাতশূন্যভাবে আইন প্রয়োগ করা হইল রাষ্ট্রের কার্য।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা (Necessity for Separation of Powers)

সরকারের কার্যাবলীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, আইনবিষয়ক, শাসনবিষয়ক ও বিচারবিষয়ক। এই তিন শ্রেণীর কার্য তিনটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। শাসনবিভাগ এই আইনগুলিকে বলবৎ করে, এবং বিচারবিভাগ আইনগুলির ব্যাখ্যা করে ও বিচারার্থ আনীত বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির জন্য আইনগুলির প্রয়োগ করে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগ স্বীয় কার্য পরিচালনার ব্যাপারে অপরের প্রভাব-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকারী হয়। যদি একাধিক ক্ষমতা অথবা তিনটি ক্ষমতাই একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তিসংসদের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচারের উদ্ভব হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

মতবাদের উৎপত্তি (Development of the Theory)

প্রাচীনকালে রাজা একাধারে এই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

তিনি আইন প্রণয়ন করিতেন, আবার শাসক হিসাবে জনগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন এবং বিচারকশ্রেষ্ঠ হিসাবে রাজাই আইনের প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে বিচারব্যবস্থা প্রহসনে পর্যবসিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার কবল হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই মতবাদ প্রবর্তিত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল ও রোমক দার্শনিকদের লেখার মধ্যে অস্পষ্টভাবে এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়। এই মতবাদকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া প্রথম প্রবর্তন করেন ফরাসী লেখক মন্টেস্ক। মন্টেস্ক তাঁহার '*L'Espirit De Lois*' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মূল নীতি বলিয়া প্রচার করেন। মন্টেস্ক বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সরকারী সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহা হইলে নাগরিক জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। স্বৈরাচারের সম্ভাবনা রহিত করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনার অধিকারী হওয়া উচিত। সুতরাং মন্টেস্ক ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মন্টেস্কের পর ইংলণ্ডে ব্ল্যাক্‌স্টোনও এই মতের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি বিভাগকে বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ও স্বাধীন করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই নীতি অনেক দেশের শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী করা হইয়াছিল। বিপ্লবের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়, তাহাতে এই নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে বলবৎ দেখা যায়। মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণও এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া শাসনব্যবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই নীতির উপর আর পূর্বের মত বাস্তব গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

সমালোচনা (Criticism)

সরকারী ক্ষমতা ও কার্যসমূহ তিনভাগে ভাগ করিয়া তিনটি পৃথক্ বিভাগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া

লওয়া হইলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক হইতে দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। সরকারের প্রত্যেক বিভাগেরই অন্য দুইটি বিভাগ-সংক্রান্ত কিছু-না-কিছু কার্য করিতেই হয়। বর্তমান শাসন ব্যবস্থা এত জটিল যে, কোন বিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কার্য করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু আইনসভা একাদিক্রমে দুই-তিন মাস অধিবেশন পরিচালনা করিয়া কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে। তাহাব পর পুনরায় দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। আইনসভার এই দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী কালে জরুরী প্রয়োজনে শাসনকর্তৃপক্ষই সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিয় থাকে। বিচারবিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনের প্রয়োগ করা। কিন্তু অনেক সময় বিচারকগণ আইনের নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা বা আইনের অস্পষ্টতার জন্য নিজেদের ন্যায়বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন। অপরপক্ষে, আইনসভাকেও অনেক সময় বিচার বিষয়ক কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কর্তব্যের ত্রুটি হইলে সাধারণতঃ আইনসভাব উচ্চ পরিষদ্ এই বিচারকার্য করিয়া থাকে। শাসনকর্তৃপক্ষেরও অনেক সময় বিচারবিষয়ক কার্য সম্পাদন করিতে হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই দুইটি বিভাগের কার্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি মন্ত্রিসংসদ চালিত শাসনব্যবস্থায় এই দুইটি বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দেখা যায় না যেখানে সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করা সম্ভব হইয়াছে। কি মন্ত্রিসংসদ্-চালিত শাসনে, কি রাষ্ট্রপতি শাসনে, সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার কার্যকারিতা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে উপরি-উক্ত উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অনুযায়ী তিনটি বিভাগ দ্বারা

সরকারের তিনটি প্রধান কার্য পরিচালিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রেট বৃটেনে শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সর্বাপেক্ষা কম অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রিসংসদের সদস্যগণ সকলেই আইনসভার সদস্য ও আইন-প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার আছে। মন্ত্রিমণ্ডলী আবার শাসনকার্যের প্রকৃত পরিচালক। লর্ড সভা আইনসভার একটি অংশ, কিন্তু ইহার কিছু কিছু বিচারক্ষমতাও আছে। ইংলণ্ডের রাজা শাসনকার্যের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনি আবার আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁহার কিছু বিচারক্ষমতাও আছে। লর্ড চ্যান্‌সেলর লর্ড সভার সভাপতি, মন্ত্রি-মণ্ডলীর সদস্য ও ইংলণ্ডে প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। তিনি একাধারে তিনটি বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইংলণ্ডে কর্মবিভাগের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, অধিকন্তু অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক্। রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন বা প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখানেও তিনটি বিভাগের মধ্যে কিছু যোগসূত্র রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন, কিন্তু বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আইনসভার আইন বাতিল করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন ও পররাষ্ট্রের সহিত যে সমস্ত সন্ধি স্বাক্ষর করেন সেগুলি আইনসভার উচ্চপরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হওয়ার ফলে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদল একই রাজনৈতিক দলভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে সরকারের কর্মবিভাগ নীতি কিছু পরিমাণে কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শাসনপরিচালনা ব্যবস্থার ক্ষমতার সংমিশ্রণ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে তিনি অর্ডিন্যান্স নামে অভিহিত বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন ও প্রাণদণ্ড মকুব প্রভৃতি কয়েকটি বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকার তাঁহার আছে। ভারতের আইনসভা ও মন্ত্রি-মণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যদের আইনসভার সদস্য হইতে হইবে ও তাঁহাদের শাসনকার্যের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। অপরপক্ষে, মন্ত্রিসভার নির্দেশে রাষ্ট্রপতি আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইনসভাকে আহ্বান করা ও সাময়িকভাবে আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতে জিলার শাসনব্যবস্থায় কর্মবিভাগ নীতির অভাব বিশেষ-ভাবে দেখা যায়। জিলাশাসক একাধারে জিলার শাসনব্যাপারে সর্বময় কর্তা ও তিনি ফৌজদারী মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন বিচারপতি। শাসনবিভাগের কর্তা হইলেও জিলাশাসকের বিচারক্ষমতা আছে। বর্তমানে অবশ্য এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিতেছে। ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইন-সভার মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি প্রযুক্ত না হইলেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ যাহাতে শাসনকর্তৃপক্ষ-নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বিচারপতিগণের যে বেতন ও অন্যান্য ভাতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা আইনসভার বাৎসরিক অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না। নির্দিষ্ট বেতনে বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পর তাঁহাদের কার্যকালে (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) তাঁহাদের নির্ধারিত বেতনের পরিমাণ পরিবর্তন করা যায় না। পার্লামেণ্ট সভার প্রত্যেক কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যের আবেদনে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিচার-বিষয়ক কর্তব্যসম্পাদন বিষয়ে কোন আইনসভায় কোনপ্রকার আলোচনা চলিতে পারে না। এইরূপে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র বিচারবিভাগকে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ও নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি প্রকাশ্যতঃ অস্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং শাসনব্যবস্থায় এই নীতি কোন স্থান পায় নাই। সাম্যবাদী নেতৃবর্গ এই তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পুঁজিপতিদলের জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার একটি রাজনৈতিক কৌশল বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী দল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বিত্তহীনদের নানাভাবে শোষণ করে এবং এই পুঁজিপতিদল রাষ্ট্রের প্রকৃত ধনতান্ত্রিক রূপকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদের অবতারণা করেন। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের শাসনব্যবস্থায়ই এই নীতি কার্যতঃ প্রযুক্ত হয় নাই। মুষ্টিমেয় লোক এই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী।

সাম্যবাদিগণ এই নীতিতে আস্থাহীন। তাঁহারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া বিত্তহীন শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প। সুতরাং সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থায় তিনটি ক্ষমতাই প্রকাশ্যতঃ দলীয় নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সোভিয়েত দেশের শাসনব্যবস্থা বা পূর্বতন নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহার সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র সাম্যবাদী দল ক্ষমতার অধিকারী। এই দলের পলিট্ ব্যুরো নামক সংস্থা বিভিন্নভাবে সমগ্র শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সভার সংগঠন ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই নীতিতে আদৌ আস্থাবান্ নহেন এবং সেই কারণে তাঁহারা প্রকাশ্যতঃ এই নীতি বর্জন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত। কোন জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেরূপ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া কর্মক্ষম থাকিতে পারে না, তদ্রূপ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা চলে না। অত্যধিক পরিমাণে কর্মবিভাগের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া শাসনকার্যে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। ইহাতে শাসনকার্য ব্যাহত হয়।

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যের অবর্তমানে স্বৈরাচারী শাসন-

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এ যুক্তি সত্য নয়। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই কম অনুসৃত হইয়াছে, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অত্যধিক পরিমাণে কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের অপেক্ষা কম স্বাধীনতার অধিকারী নয়। গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যবিধানের উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীরা কখনই স্বাধীনতার অধিকারী হইতে পারিত না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হইল জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার আন্তরিক প্রয়াস ও আত্মসচেতনভাব।

পঞ্চমতঃ, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সম-ক্ষমতার অধিকারী হইতে হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই তিনটি বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বিভাগকে সম-ক্ষমতাবিশিষ্ট করাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশে আইনসভাই হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ অনেক বিষয়ে আইনসভার উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি বিভাগ সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন না হইলে শাসনকার্য বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য আইনসভার নির্দেশ সর্বত্র চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতির চূড়ান্ত প্রয়োগের ফলে বিচারবিভাগ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিচারবিভাগকে আইনসভা ও শাসন-বিভাগের প্রভাবমুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যের বিচারপতিগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত বিচারকগণ যোগ্যতা অপেক্ষা জনপ্রিয়তার জোরেই নির্বাচিত হন। এইরূপে নির্বাচিত বিচারকেরা পুনর্নির্বাচনের জন্য জনমতকে খুশি করিবার উদ্দেশ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। নির্ভীক পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচার এইরূপে নির্বাচিত বিচারকদের নিকট হইতে আশা করা দুরাশা মাত্র। একটি রাজনৈতিক মতবাদকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগকে পঙ্গু করা হইয়াছে।

উপসংহার (Conclusion)

উল্লিখিত সমালোচনাগুলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নিছক নীতি হিসাবে অথবা শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী শক্তি হিসাবে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলবৎ হইলে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, অপরপক্ষে, ক্ষমতার একত্রীকরণে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। সুতরাং ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের প্রকৃত তাৎপর্য কি ?

বর্তমানে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগগুলি সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের নীতি বা প্রযোগ বুঝায় না। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বর্তমানে দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, ক্ষমতার আংশিক স্বাতন্ত্র্য-করণ ও দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগগুলির কার্যাবলীর পৃথকীকরণ, কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী বা প্রয়োগকারীর পৃথকীকরণ অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয় না।

শাসনকার্যে সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী বিভিন্ন ধরনের। আইনসভার কার্য হইল সাধারণ ধরনের। আইনসভার সদস্যের কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হইলেও চলিতে পারে। সাধারণ জ্ঞান ও দায়িত্বসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তি আইনসভার সদস্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের ও বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগের সদস্যদের কোন কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া একান্ত আবশ্যক। শাসনকর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণে তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ধীর ও স্থির, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন এবং আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকটি বিভাগের কার্যেই কিছু বিশেষত্ব আছে এবং সেইজন্য একই ব্যক্তির দ্বারা এই তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। বিচারকের কার্য আইনসভার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না, কেন না বিচারপতিদের যে যোগ্যতা থাকা দরকার আইসভার সদস্যদের সেই জাতীয় যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। তিনটি কার্য বিভিন্ন বলিয়া এই কার্যগুলি বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিসংসদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই উচিত। কিন্তু এই পৃথকীকরণেরও একটা সীমা আছে। একটি যন্ত্র যেরূপ কতকগুলি প্রাণহীন অংশবিশেষের সমাবেশ, সরকারকে সেইরূপ কতকগুলি

ব্যক্তির সমষ্টি বলিয়া মনে করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। একটি ব্যাপক ও মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সরকার গঠিত হয় ও সরকারের কার্যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি কার্য প্রত্যেকটি বিভাগ কর্তৃক একই উদ্দেশে পরিচালিত হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে যোগসূত্রের অভাবে দেহের বিনাশ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্রের অবর্তমানে সরকারেরও বিনাশ সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। এই যোগসূত্রের জন্য বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকা একান্ত আবশ্যক। যাহারা নীতিগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সেই সমস্ত অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। এইরূপ কর্মবিভাগের দ্বারা কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও সরকারী কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানকে ধনবিজ্ঞানের শ্রমবিভাগ নীতির একটি প্রয়োগ বলা যাইতে পারে।

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার যুগে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যকরণ দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত করিবার প্রয়োজন আর নাই। বর্তমান যুগে সরকারের কার্যাবলী এত জটিল হইয়াছে যে, সরকারের সমুদয় কার্যই একব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। সেহেতু বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা অপেক্ষাও সরকারের কার্য যাহাতে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় সেইজন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন। কিন্তু এই কর্মবিভাগ এইরূপভাবে সাধিত হইবে যে, বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র, সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা বিনষ্ট না হয়।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা (Modern Interpretation of the Theory of Separation of Powers)

রাষ্ট্র-সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের পরিবর্তন অনুভূত হইতেছে।

ক্ষমতার আধার রাষ্ট্র বর্তমান যুগে কল্যাণ-রাষ্ট্রে রূপান্বিত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রের শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বর্তমানে রাষ্ট্রের জনহিতকর কার্যকলাপের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রধানতঃ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিছক শক্তি-ভিত্তিক রাষ্ট্র জনকল্যাণ সাধন করিতে পারে না। কল্যাণ-রাষ্ট্রের সহিত পশুবলের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। সুতরাং উপরি-উক্ত নীতিটিকে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নামে অভিহিত না করিয়া রাষ্ট্রের কল্যাণকর কার্যকলাপের স্বাতন্ত্র্যবিধান নামে অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি বর্তমান রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের এই কল্যাণসাধন কার্য বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা আংশিকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না—এই কল্যাণসাধনের নিমিত্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে সমগ্রভাবে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সমুদয় কার্যকলাপই একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী সম্পাদিত হয়। পরিকল্পনার মূল নীতি হইল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে এক নিয়ন্ত্রণাধীনে একত্রিত করিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সমষ্টির মঙ্গল সাধন করা। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ পৃথকীকরণনীতি অপেক্ষা সহযোগিতার উপর অধিকতর নির্ভরশীল। এইজন্য আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপে উপরি-উক্ত নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

কিন্তু তাই বলিয়া শাসনব্যবস্থায় যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমান যুগে সর্বদেশে সর্ববিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসনকর্তৃপক্ষকে সংযত রাখিবার জন্য বিচারবিভাগীয় নির্দেশ (judicial review) ও নিয়মতান্ত্রিক বিধিনিষেধ বলবৎ থাকা একান্ত আবশ্যক।

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান—সরকারের তিনটি প্রধান কার্য আছে ও এই তিনটি কার্য তিনটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা সাধারণতঃ পরিচালিত হয়। আইনসভার কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। শাসনকর্তৃপক্ষ আইন বলবৎ

করে এবং বিচারবিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করিয়া বিরোধের মীমাংসা করে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অনুসারে সরকারের এই তিনটি কার্য পৃথক্‌ভাবে ভাগ করিয়া তিনটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। নতুবা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অপরিহার্য।

অ্যারিস্টটল প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদের লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ থাকিলেও ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্ককে এই মতবাদের জন্মদাতা বলা যায়। তিনি ও তৎপরবর্তী ইংরাজ লেখক ব্লাকস্টোন ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগেরই অন্য বিভাগের কিছু কার্য করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবক্ষেত্রে কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান না থাকিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোনরূপ হানি হয় নাই। পরন্তু ইংলণ্ডের নাগরিকগণ এই বিষয়ে অন্য দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে সেখানে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয় ও এই নীতির প্রবর্তনে সেখানকার প্রাদেশিক বিচারবিভাগের অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমতঃ, জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে যেরূপ সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, সরকারের কর্মবিভাগের মধ্যেও সেইরূপ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে পরিমাণে কর্মবিভাগ প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সরকারের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কার্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ

(Ends and Functions of the State)

প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম পরিণতি বা উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তি রাষ্ট্রগঠনের উপাদানমাত্র ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত স্বার্থ রাষ্ট্রবেদীমূলে অনায়াসে বলি দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা রাষ্ট্রবিহীন মানুষকে অতিমানব অথবা অতি নিম্নস্তরের জীব বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা সমগ্র মানব-জীবনের উপর রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রাষ্ট্র শুধু অপরাধ-নিবারণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গঠিত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত এক মনুষ্যসমাজ মাত্র নহে—ইহার আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানব-জীবনের নৈতিক উৎকর্ষসাধন করা যাহাতে মানুষ স্বাধীন ও সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং গ্রীক দার্শনিকদের মতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার একমাত্র উৎস ছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ব্যতীত ব্যক্তির অন্য কোনপ্রকার মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। গ্রীক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হইলেও রোমকগণ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর ধর্মযাজকগণ মানুষের ধর্মজীবনকে রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। টিউটন জাতি অতিমাত্রায় স্বাধীনতা-প্রিয় ছিল। তাহারা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। ফলে মানব জীবনের উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব হ্রাস পাইয়া রাষ্ট্রসম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আর মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা চরম পরিণতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্তমান রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির একটা প্রধান সহায়ক বা উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়

রাষ্ট্র মানুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ রাষ্ট্রের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বর্তমানে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য (True end of State)

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি—এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। যতদিন পর্যন্ত বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল এবং রাষ্ট্র বংশানুক্রমিক শাসকগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন স্থায়ী মতবাদ গঠিত হইতে পারে নাই। শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থসাধনই ছিল রাষ্ট্রপরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল রাজনীতির অবসান ঘটিয়া ক্রমশঃ উদারনৈতিক রাজনীতির প্রবর্তন হয়। ফলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পাইয়া নানারূপ মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে।

রাষ্ট্রমধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নিয়মিত ব্যবস্থা করা, অথবা প্রগতিমূলক কার্য করা, অথবা ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করাকে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া অনেক লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। আবার মানুষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা অথবা জনহিতকর কার্য করা অথবা জাতীয় শক্তি বা মানব সমাজের সভ্যতা বৃদ্ধি করাকেই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। জার্মান লেখক ব্লুনৎস্লির মতে জনসাধারণের কল্যাণসাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। হিতবাদী (Utilitarian) দার্শনিকদের মতে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা বলেন যে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকার্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অধুনা অনেক লেখক রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটা সমাজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জনস্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি নানারূপ সমাজহিতকর কার্য করা।

কিন্তু বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির কোনটিই রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

সম্পর্কে ঐগুলি আংশিকভাবে সত্য হইলেও রাষ্ট্র যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সংগঠিত হইয়াছে, উপরি-উক্ত মতবাদগুলির কোনটির দ্বারাই সেই মহান্ উদ্দেশ্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। ডাঃ গার্ণার ও অধ্যাপক বার্জেস্ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—প্রাথমিক উদ্দেশ্য (Primary end), মাধ্যমিক উদ্দেশ্য (Secondary end) ও শেষ বা চরম উদ্দেশ্য (Ultimate end)। রাষ্ট্রের প্রাথমিক বা আপাত উদ্দেশ্য হইল শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ন্যায়পরতার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়তা করা। কিন্তু একমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষসাধনের সহায়তার দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সমষ্টিগত জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনের সাহায্য করা রাষ্ট্রের মাধ্যমিক উদ্দেশ্য, সমষ্টির উন্নতি ব্যতীত এককভাবে ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রকে সমাজের কল্যাণসাধন করিতে হইবে। ব্যক্তি যেরূপ সমাজদেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও ব্যক্তিগত উন্নতি যেরূপ সামাজিক উন্নতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কোন একটি জাতির জীবনও তদ্রূপ সমগ্র মানবসমাজের অংশ-বিশেষ ও জাতীয় জীবনের উন্নতিও তদ্রূপ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির উপর নির্ভরশীল। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে সমগ্র মানবসমাজের হিতকর কার্য করা রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের মধ্যে কোনরূপ সংঘাত না ঘটে।

জনকল্যাণ নীতি বা কল্যাণ-রাষ্ট্রের ভিত্তি (Welfare Theory or the basis of the Welfare State)

রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে একদিকে যেরূপ রাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে অপর দিকে তদ্রূপ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আকারে যেরূপ বৃহৎ, উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও তদ্রূপ ব্যাপক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরবর্তী কাল হইতে বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি সম্পর্কে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বতন রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণী-বিশেষ,

বিশেষ করিয়া শাসকশ্রেণীর স্বার্থসাধন করা। কোন রাষ্ট্রই জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং জনকল্যাণের জন্য কোন রাষ্ট্রই বিশেষ কোন প্রয়াস পায় নাই। কিন্তু জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থার ধারণা জনসমাজে বদ্ধমূল হইবার পর হইতেই জনকল্যাণ নীতি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু স্বীকৃতি লাভ করিলেও কোন দেশেই এই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে রূপদান করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইল এই জনকল্যাণ নীতি কী? জন বলিতে রাষ্ট্রান্তর্গত সমগ্র জনসমষ্টিকে বুঝায়, কল্যাণ বলিতে এই জনসমষ্টির সামগ্রিক মঙ্গল বুঝায়। যে রাষ্ট্র মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির পার্থিব, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য করে, সেই রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State) বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ জনকল্যাণ সাধন করাই হইল সে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথায় বলিতে হয়, জনকল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সকল মানুষকে সুখী করা (To make all men happy)।

জনকল্যাণ নীতি যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রকর্ম-পরিধির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নয়। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন রাষ্ট্র তাহাই করিবে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কোন ক্ষেত্রে জনকল্যাণের প্রতিকূল বিবেচিত হইলে রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মসম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতেই বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশগুলির সরকারী কর্মসূচী এই জনকল্যাণ নীতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির প্রচারমধ্যে ভারতে এই কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State) গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। জনকল্যাণ-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ নানারূপ আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রও এরূপ নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন

করিতেছে। অস্পৃশ্যতা বর্জন, জমিদারী প্রথার বিলোপ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি নানা বিষয়ে জনকল্যাণমূলক আইন প্রবর্তিত হইতেছে।

কল্যাণরাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে সমস্ত অন্তরায় দূর করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যাহাতে আদর্শ স্তরে উন্নীত হয়, সেজন্য সচেষ্ট থাকে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষা করে। দস্যু-তস্কর বা বিদেশী আক্রমণ হইতে জনগণকে রক্ষা করা কল্যাণরাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নহে। সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সুষম ব্যবস্থা করা, সুশিক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা কল্যাণরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বৃদ্ধাবস্থায়, বেকার অবস্থায় বা আকস্মিক বিপদকালে অসহায় নর-নারীগণকে সাহায্য করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

কল্যাণরাষ্ট্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই রাষ্ট্র শিক্ষাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ধিত হইবার সুযোগ দান করে। যে রাষ্ট্র শিক্ষা-প্রসারের অজুহাতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারী কুক্ষিগত করিয়া সরকারী নীতির সমর্থক করিতে চায়, সে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষের কৃষ্টিগত জীবনের উন্নয়ন কল্যাণরাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে কল্যাণরাষ্ট্র গ্রন্থাগার, নাট্যশালা, চলচ্চিত্র, যাদুঘর প্রভৃতি স্থাপনে সাহায্য করে এবং লেখক ও শিল্পী সম্প্রদায়কে পরোক্ষভাবে সরকারের স্তাবকে পর্যবসিত না করিয়া নানাভাবে তাহাদের সৃজনীশক্তি বৃদ্ধির সাহায্য করে।

দেশে ধনী-দরিদ্র থাকিলে উৎকট ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং এই ধনবৈষম্য হইল অশান্তির মূল কারণ এবং জাতীয় প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কল্যাণরাষ্ট্র সুষম কর ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সাহায্যে ধনবৈষম্য হ্রাস করিতে চেষ্টা করে।

কল্যাণরাষ্ট্র কৃষি, শিল্প, খনি, পরিবহণ, যোগাযোগ প্রভৃতি আর্থিক আয়ের উৎসগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণ সাহায্যে জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ সুগম করে। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মিশ্র অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, কল্যাণরাষ্ট্র হইল শ্রেণী স্বার্থের ঊর্ধ্বে। এই রাষ্ট্র ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিচালিত হয় না। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুবিধা সৃষ্টি করিয়া সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করা।

নীতি হিসাবে জনকল্যাণ নীতি গৃহীত হইলেও ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এই নীতি যদি নিছক এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা নির্ধারিত হয়—জনসাধারণকে এই নীতি নির্ধারণে কোন বক্তব্য না দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই নীতি শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীগত স্বার্থের দ্বারা দুষ্ট হইবে। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-প্রণীত আইন বা কোন কর্মসূচী জনসাধারণ যদি পীড়াদায়ক ও জনস্বার্থ-বিরোধী বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত হইলেও এরূপ নীতিকে জনকল্যাণ নীতি বলা যায় না এবং এরূপ নীতি-নির্ধারক রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ট্র বলা চলে না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা নিহিত আছে।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of State Function)

রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে লেখকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সুদূরবিস্তারী হইবে, না ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে—এ সম্পর্কে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র কর্তব্য সম্বন্ধে যে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহারা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—১। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ২। সমাজতন্ত্রবাদ। এই দুইটি মতবাদ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্র (Anarchism)

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ রাষ্ট্রের উপযোগিতা আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র মানব-জীবনের একটি প্রধান অভিশাপ। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্রের

কর্তৃত্ব নিছক পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পশুবল প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্র-মানুষকে তাহার বিবেকবুদ্ধিসম্মত কার্যে বাধা প্রদান করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নিজের হিতসাধনে সমর্থ। সুতরাং মানুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন নাই। তাই তাঁহারা যে-কোন উপায়েই হউক না কেন রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিয়া পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ দুই দলে বিভক্ত—দার্শনিক অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী (Philosophical Anarchist) ও বিপ্লবপন্থী অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী (Revolutionary Anarchist); উভয় দলই রাষ্ট্র-বিরোধী ও যথাসম্ভব শীঘ্র রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু দার্শনিক অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রের বিনাশসাধন করিতে চাহেন না। তাঁহারা শিক্ষা দ্বারা জনমতকে রাষ্ট্রের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের বিলোপসাধনের পক্ষপাতী। রুশীয় দার্শনিক টলস্টয় এই মতের একজন প্রধান সমর্থক। বাকুনিন্, ক্রোপট্কিন প্রভৃতি দার্শনিকেরা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আদৌ বরদাস্ত করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির দ্বারা রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিতে বদ্ধপরিকর।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—একথা স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না। রাষ্ট্রবিহীন সমাজে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ মানুষের হিতাহিতবোধের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু কার্যতঃ মানুষ এতটা হিতাহিতবোধসম্পন্ন নহে। সুতরাং মানুষকে সংযত ও ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া সমাজ-জীবনকে সফল করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অ-রাষ্ট্রতন্ত্রবাদের একটি মার্জিত সংস্করণ মাত্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি অভিশাপ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীদের মতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই। তাঁহাদের মতে মানুষের যতদিন স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের

অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রবণতা থাকিবে, ততদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে। মানুষ যেদিন নিষ্পাপ ও নিরহঙ্কার হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হইবে, সেদিন আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে রাষ্ট্র একটি অপরিহার্য পাপ। যতদিন মানব-সমাজে দুষ্কার্য থাকিবে ততদিন রাষ্ট্র একান্ত অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন যে, রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি যতই কম হয়, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের কার্যকলাপ কমাইয়া ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা। এতদতিরিক্ত কোন কার্যই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারিবে না। অন্য সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিবার পক্ষপাতী।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ শক্তিশালী মতবাদ বলিয়া অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিশারদগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়া রাষ্ট্র কর্তৃত্বের অত্যধিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ দেখা দেয়। উপরি-উক্ত লেখকগণ উৎপাদন ও বিনিময়ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিলোপ করিয়া শ্রমিক ও মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল্‌ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। মতামত-প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়াও মিল্ ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র নিছক ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটাইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ অভিরুচি অনুযায়ী কার্য করিবার সুযোগ দান করিলে প্রত্যেক মানুষ প্রকৃত সুখের সন্ধান পাইবে। মিল্ ব্যক্তিস্বাধীনতার একটিমাত্র সীমারেখার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা যদি অপরের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য ব্যক্তিগত আচরণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মিল্-প্রদত্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ডারউইন্-প্রদত্ত বিবর্তনবাদের সমন্বয়-

সাধন করিয়া প্রসিদ্ধ লেখক হার্বার্ট স্পেনসার্ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁহার মতে সমাজ-জীবনে মানুষ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় রত। এই প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া থাকে, আর যাহারা দুর্বল ও অক্ষম তাহারা অপসারিত হয়। জীবনযুদ্ধের এই স্বাভাবিক পরিণতিকে স্পেন্সার সমাজ-জীবনের অগ্রগতির সহায়ক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে আর্ত ও অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদান করিয়া এই স্বাভাবিক নিয়মকে ব্যাহত করা রাষ্ট্রের পক্ষে দূষণীয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Individualism)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতবাদের সমর্থনে অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহাদের প্রথম যুক্তি সহজাত ন্যায়পরতার (Ethical argument) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা বলেন, মানুষ হিতাহিত-বোধসম্পন্ন জীব। স্বীয় ইষ্ট সম্বন্ধে মানুষ সর্বদা সচেতন। সুতরাং রাষ্ট্রকর্তৃত্ব বিমুক্ত হইলে মানুষ নিজের অভিরুচি অনুযায়ী কার্য করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা ও সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ফলে মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও কর্মক্ষমতা বিনষ্ট হয়। সুতরাং সুস্থ ও সবল ব্যক্তিত্ব-বিকাশের নিমিত্ত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অবসান হওয়া ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক।

দ্বিতীয়তঃ, ডারউইন-প্রদত্ত বিবর্তনবাদ (Biological argument) প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন জীবনযুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি হইল যোগ্যতমের জীবনধারণ ও দুর্বলের মৃত্যুবরণ। সুতরাং এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যোগ্যতমের বাঁচিয়া থাকা ও অক্ষমের মৃত্যুবরণ করা সমাজ-জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক। রাষ্ট্রের সাহায্য না পাইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে শুধু যোগ্যতম ব্যক্তিরা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিবে, অযোগ্য ব্যক্তিগণ অপসারিত হইবে। ফলে সামাজিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক যুক্তির (Economic argument) অবতারণা করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করেন। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা

অপেক্ষা প্রতিযোগিতার উপর তাঁহারা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহারা বলেন, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষসাধন ও মূল্যহ্রাস হইবে। দ্রব্যমূল্য, মজুরির হার ও সুদের হার প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া স্বাভাবিক স্তরে থাকিবে।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা অতীতের অভিজ্ঞতার (Argument based on experience) দ্বারা তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র যে ব্যক্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে নাই, ইতিহাস তাহার প্রধান সাক্ষ্য। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই সরকারী প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাই তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ না করিয়া ব্যক্তিকে যদি পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রদান করে তাহা হইলে ব্যক্তি রাষ্ট্রনিরপেক্ষ হইয়া আত্মবিকাশের চরম সুযোগ লাভ করিতে পারে।

পরিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের অক্ষমতার (Argument of State incompetency) উল্লেখ করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার অপরিহার্যতা প্রমাণিত করেন। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থ যতটা সুরক্ষিত হইতে পারে, রাষ্ট্র কর্তৃক সেরূপ সুরক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাষ্ট্রের উপর অত্যধিক পরিমাণে কার্যের ভার অর্পিত হইলে রাষ্ট্র কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারে না। ফলে, সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণের সম্ভাবনা অধিক হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যে সীমিত করিয়া মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলে তাহার চিত্তবৃত্তিগুলির চরম বিকাশ সম্ভব হইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Individualism)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অসারতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে অনেক যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি পাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ-কথা প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্র-

প্রবর্তিত কোন কোন নীতি বা কার্যক্রম ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য রাষ্ট্রের অবসান দাবী করা আর সময় সময় এরোপ্লেন-দুর্ঘটনা হয় বলিয়া এরোপ্লেনকে বাতিল করা একই মনোভাবের পরিচায়ক। রাষ্ট্র মানবজীবনের অগ্রগতিকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে নাই বলিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা আর পুত্র কর্তৃক দরিদ্র পিতার পিতৃত্বদাবী উপেক্ষা করা একই মনোভাবের পরিচায়ক। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রগতিতে রাষ্ট্রের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। সকল দেশের ইতিহাসেই এই সাক্ষ্য প্রদান করে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তিই তাহার নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সকল সময়ে অবহিত নহে। কোন্‌টি স্বার্থের অনুকূল ও কোন্‌টি স্বার্থের প্রতিকূল মানুষ সর্বদা তাহা স্থির করিতে পারে না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দূষিত খাদ্য ও অনিষ্টকর আমোদ-প্রমোদের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে অশিক্ষিত ও অজ্ঞলোকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও অনেক সময় পরিণাম চিন্তা না করিয়া অনেক আত্মঘাতী কার্যে লিপ্ত থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের অজুহাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় না। ব্যক্তির প্রকৃত সুখের জন্যই ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকা উচিত।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ যত অধিক হয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা সেই পরিমাণে হ্রাস পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থনযোগ্য নয়। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। রাষ্ট্র-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দুর্বল, অসহায় ব্যক্তির দাসত্বের কারণ হইয়া পড়ে। সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান ঘটাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে সহায়তা করে।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিবর্তনবাদের সাহায্যে তাঁহাদের মতবাদ-সমর্থনের যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও বর্তমানে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে যাহাতে শুধু যুদ্ধক্ষম যোগ্য ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারে ও অক্ষম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য তাঁহারা দুর্বল ও অক্ষমের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তস্করকে শাস্তি দেওয়া যদি রাষ্ট্রের

অবশ্যকরণীয় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে দুর্বলকে সাহায্য দ্বারা সবল করিয়া তোলা রাষ্ট্রকর্তব্য হিসাবে কি কারণে পরিগণিত হইবে না—ইহার কোন সদুত্তর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা দিতে পারেন না। সামাজিক সবশ্রেষ্ঠ সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য শুধু দুষ্টের দমনে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না—শিষ্টের পালনও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

পঞ্চমতঃ, তাহারা অনাবশ্যকরূপে সরকারী কার্যের ভুল-ত্রুটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু রাষ্ট্র-কার্যকলাপের দ্বারা এযাবৎ মানব-সমাজের যে অপরিসীম উন্নতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ও নীরব থাকেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থা এরূপভাবে গঠিত যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত স্বার্থসংরক্ষণ সম্ভব নয়। বাস্তবক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে প্রায় সকল দেশেই কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ গঠনমূলক কার্য সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

পরিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, সুযোগ-সুবিধার অভাবে অধিকাংশ লোক তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সকল সময় সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয় বলিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির স্বার্থসংরক্ষণ ও হিতসাধনের জন্য সর্ববিধ কার্যে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলি তাহাদের কার্যকলাপ দ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহা দ্বারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আধুনিক ব্যাখ্যা (Modern Individualism)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়ারূপে রাষ্ট্রের যে আদর্শবাদ (Idealism) ও সমষ্টিবাদের (Collectivism) সৃষ্টি হয় তাহার ফলে ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এই আদর্শবাদ ও সমষ্টিবাদের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। সুতরাং প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বর্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জন্মলাভ করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পুনরভ্যুত্থানের প্রথম ও প্রধান কারণ হইল হেগেল প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণের প্রবর্তিত আদর্শবাদ—যাহার ফলে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক ও অতিমানবীয় অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া রাষ্ট্র এক সর্বশক্তিমান্ ও চরম ক্ষমতার অধিকারী সংগঠনের মর্যাদা লাভ করে। ফলে, ব্যক্তিগত জীবনের প্রাথমিক অধিকারগুলিও রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন হয়। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে গণতন্ত্রের নামে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তথা রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের সংখ্যালঘু দলের উপর অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার আরম্ভ হইল, তাহাতে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের অধিকার রক্ষায় তৎপর হয়। তৃতীয়তঃ, প্রথম বিশ্ব-মহাসমরের ফলে জীবন ও ধনের ব্যাপক অপচয় লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণ রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠে,—এমন কি রাষ্ট্রের উপযোগিতা সম্পর্কেও জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়। চতুর্থতঃ, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। মানুষের সামাজিক, ধর্মসম্পর্কীয়, কৃষ্টিগত বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পাদন করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত বিশাল আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্রের অভ্যুত্থানে ব্যক্তিস্বাধীনতা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। উপরি-উক্ত কারণগুলির সমন্বয়ে বর্তমান রাষ্ট্রগুলি যে সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

আধুনিক যুগে নরম্যান্ এঞ্জেল, গ্রাহাম্ ওয়ালেস্, মিস্ ফলেট্ প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ এই মতবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। নরম্যান্ এঞ্জেল তাঁহার 'Great Illusion' নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রকে একটি শাসনযন্ত্র-বিশেষ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, যখনই বর্তমান শাসনযন্ত্র অপেক্ষা কোন অধিকতর উপযোগী শাসনযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে তখনই বর্তমান ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে। প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বর্তমান রাষ্ট্র মানুষের কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হয় নাই বা নাগরিক জীবনের উপর বর্তমান রাষ্ট্রের যে দাবী তাহা কোন

নৈতিক বা ঐশ্বরিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। রাষ্ট্রভুক্ত জনসমূহের ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন পৃথক্ অতিমানবীয় অস্তিত্ব বা ইচ্ছা নাই। গ্রেহাম ওয়ালেস্ পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রথাকে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার একটি কৌশলমাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিসমষ্টি লইয়া গঠিত সমাজস্থিত নানা জাতীয় বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক সংঘগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, বর্তমান যুগের বিশালায়তন ও বিশাল জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা একরূপ অসম্ভব। সেইজন্য প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংঘগুলি প্রথমতঃ, ব্যক্তিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহারা ইহাদের সদস্যগণের বিশেষ চিন্তাধারা ও স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের সহায়তা করে। সুতরাং রাষ্ট্র অপেক্ষা এই সংঘগুলিই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অধিকতর সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি লইয়া গঠিত সংঘ ও রাষ্ট্র—এই তিনের সম্পর্কের সামঞ্জস্যবিধানের উপর প্রত্যেকটির স্থায়িত্ব ও অধিকার নির্ভর করে। বহুত্ববাদিগণ (Pluralists) সংঘগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু মিস্ ফলেট্ প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে এই তিনটির কোনটিরই গুরুত্ব কম নহে। মানুষের মধ্যে যে অগ্রগতির ও মনুষ্যত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা আছে, তাহা একমাত্র সমষ্টিগত জীবনের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তি ও সমষ্টি—কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। ("Man discovers his true nature, gains his true freedom only through the group.")

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপসম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষলাভের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং এই কারণে

তাঁহারা রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সকল সময় ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য সমাজের অধিকাংশ লোক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পূর্ণ-সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সমস্ত ব্যক্তির আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক কল্যাণসাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই ব্যক্তিগত জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না, তাই তাঁহারা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী। অপরপক্ষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তিগত ক্ষমতায় আস্থাবান্, তাই তাঁহারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন। সুতরাং ব্যক্তির সর্ববিধ কল্যাণ-বিধান করাই হইল উভয় দলের উদ্দেশ্য। কিন্তু একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও কার্যক্রমের দিক দিয়া উভয় দলের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা মূলতঃ নির্দিষ্ট কার্যক্রমসমন্বিত একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া ইহা একটি রাজনৈতিক মতবাদ বলিয়া পরিগণিত হয়।

অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, প্রধানতঃ তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমি-জায়গা, কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হওয়ার ফলে সমাজে যে ধনবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ দেখা দেয়, সমাজতন্ত্রবাদীরা সর্বসাধারণের হিতার্থে তাহা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার অবসান ঘটাইতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। ব্যক্তিগত মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সম্পদ্-উৎপাদন ও বণ্টনের যে ব্যবস্থা

বর্তমানে সমাজে প্রবর্তিত আছে, সমাজতন্ত্রবাদীরা তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রচলিত করিয়া সামাজিক প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া ধনবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইলে মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য বর্তমানে যে অধিকাংশ লোককে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহার অবসান ঘটিবে। পরন্তু অর্থনৈতিক জীবনে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হইবে, যাহার ফলে সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের পরিবর্তে সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-সমিতি সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে। ফলে, প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, মূল্য-হ্রাস বৃদ্ধি, বাণিজ্যচক্র, বেকারসমস্যা প্রভৃতি ব্যক্তিগত মালিকানা-পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইয়া অর্থনৈতিক জীবনে অপেক্ষাকৃত স্থিতাবস্থা আনীত হইবে। রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জাতীয় জীবনে যে অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহার ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই এই মতবাদ অল্পবিস্তর পরিমাণে প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ (Different Forms of Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদীরা একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং কার্যপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে সমাজতন্ত্রবাদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

১। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ (Utopian Socialism)

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি 'রিপাব্‌লিক' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। প্লেটো কর্তৃক পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক বন্ধনমুক্ত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। শাসকশ্রেণী যাহাতে আপন-পর-ভেদবুদ্ধি-মুক্ত হইয়া অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ

করিতে পারেন সেজন্য প্লেটো তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক বিবাহবন্ধন দ্বার পরিবার-সংগঠন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দ্বারা পরবর্তী যুগের যে সমস্ত লেখক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে টমাস্ মূরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর তাঁহার 'ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মূরের পরবর্তী কালে ফরাসী লেখক সেণ্ট সাইমন, ইংরাজ লেখক রবার্ট ওয়েন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা বর্জিত নিছক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া এই দার্শনিকদের কাহারও পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই।

২। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Scientific or Marxian Socialism)

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ মুখ্যতঃ কার্ল মার্কস্-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মার্কস্ 'দাস ক্যাপিটাল' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রবাদের এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পরবর্তী যুগের সমাজতন্ত্রবাদীরা মার্কসীয় নীতি দ্বারা বহুল পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানতঃ তিনটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হইল উদ্‌বৃত্ত মূল্যের সূত্র (Theory of Surplus Value); দ্বিতীয়টি হইল ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of History) এবং তৃতীয়টি হইল শ্রেণী-সংগ্রাম মতবাদ (Theory of Class Struggle)।

মার্কসের মতে একটি সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে উহা উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় করা হইয়াছে তাহার উপর। যে সামগ্রী উৎপাদন করিতে অধিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার উৎপাদন-ব্যয় হয় অধিক এবং সেইজন্য তাহার বিনিময়মূল্যও হয় অধিক। অপরপক্ষে, স্বল্প পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময়মূল্য কম। সুতরাং মার্কসের মতে সামগ্রীমূল্যের একমাত্র নির্ধারক হইল সমগ্র-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ। কিন্তু শ্রমিকেরা যে-পরিমাণ মজুরি পায় তাহা তাহাদের প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম অর্থাৎ একটি

সামগ্রী বাজারে যে মূল্যে বিনিময় হয় তদপেক্ষা শ্রমিকেরা কম হারে মজুরি পায়। সামগ্রীর বিনিময়মূল্য, যাহা প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরির পরিমাণ এই উভয়ের পার্থক্যকেই মার্কস্ উদ্বৃত্ত মূল্য আখ্যা দিয়াছেন। উৎপাদিত সামগ্রীর এই উদ্বৃত্ত মূল্য অন্যায়ভাবে মালিকগণ আত্মসাৎ করিয়া শ্রমিকদের তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্তমান থাকার জন্য মালিকগণ উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি, যথা—বিভিন্ন কৃষি-জাত ও খনিজ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, কল কারখানা, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতির উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উৎপাদনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি ব্যতীত উৎপাদন অসম্ভব এবং এই উপাদানগুলি মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর করায়ত্ত বলিয়া শ্রমিকগণ মালিকশ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শ্রম দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মূল্যের সামান্য একটি অংশ মালিকগণ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ তাহারা মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করিয়া থাকে। মার্কসের মতে মুনাফা আইনসিদ্ধ চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা দ্রব্যমূল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের উপর। যাহারা এই শ্রম প্রযোগ করে, মালিকেরা তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রযুক্ত শ্রমের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রদান করে। উৎপাদনের এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে নূতন আকারে এক নূতন দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করিয়া অধিকতর ধনবান্ হইতেছে ও শ্রমিকগণ ক্রমশঃই অধিকতর নির্ধন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এরূপ অসম ব্যবস্থা সমাজ-জীবনে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে সমাজ-জীবনে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, যাহার ফলে পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়া নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। ইতিহাসে এরূপ নজির দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য মার্কস্ ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মার্কস্ বলেন, মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন তাহার অর্থ-নৈতিক জীবনের একটা প্রতিবিম্বমাত্র অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক

জীবনের কাঠামো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে-কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাসমাত্র। এই **শ্রেণী-সংগ্রাম-ই (Class War)** হইল মার্কস-প্রদত্ত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার ভিত্তি। মার্কস্ বলেন, প্রত্যেক দেশে যে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীভেদ ছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রাচীন রোমে প্যাট্রিসীয়, প্লিবীয় ও ক্রীতদাস শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। মধ্যযুগে ভূম্যধিকারী অভিজাত ব্যারনশ্রেণী ও ভূমিহীন কৃষি ভৃত্যশ্রেণী দেখা যায়। বর্তমান যুগে মালিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত। অতীত যুগে যেরূপ প্যাট্রিসীয় ও ব্যারনশ্রেণী সমাজের সমস্ত সুখ-সুবিধার অধিকারী ছিল, বর্তমানেও সেইরূপ মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী আধিপত্য ভোগ করে। বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক রূপ হইল ধনতান্ত্রিক; ফলে, সমাজ-জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনের কাঠামোও সেইরূপে গঠিত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় ধনিক মালিক তাহাদের অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন সমাজের সকল শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য পরিচালিত না হইয়া মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর মুনাফাবৃদ্ধিকল্পে পরিচালিত হইতেছে। ফলে, সমাজ-জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে অন্যায়, অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। এইরূপে যুগে যুগে শ্রেণীতে শ্রেণীতে অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে। মার্কস্ আশাবাদী ছিলেন। তাই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার ধ্বংসের বীজ উপ্ত আছে। কালক্রমে বিত্তবান্ ও বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইবে তখন বিত্তহীনেরা সংঘবদ্ধ হইয়া বিত্তবানের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে চরম আঘাত হানিবে সেই আঘাতের ফলে ধনতন্ত্রের বিনাশ ঘটিবে।

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Marxian Socialism)

মার্কসীয় মতবাদের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। সমালোচনাগুলির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ তাঁহার উদ্বৃত্ত

মূল্য-সূত্রের অসারতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন, 'শ্রম' শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট। কারণ, এরূপ বিভিন্ন ধরণের শ্রম আছে যাহাদিগকে এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া এক মাপকাঠিতে তাহাদের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যদি বলা হয় যে, সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন শ্রমই হইল প্রকৃত শ্রম, তাহা হইলেও এই জাতীয় শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়, কারণ অধিকতর সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন হইলেও চাহিদার তীব্রতা না থাকিলে সে শ্রমের মূল্য অধিক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণে যোগান বা সরবরাহের প্রভাব আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। দ্রব্যের সরবরাহ দ্রব্যটির সহজ-প্রাপ্যতা অথবা দুষ্প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। যে দ্রব্য যত অধিক দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান্, তাহা যে অধিক শ্রমপ্রয়োগের দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহা সকল সময় সত্য নয়। সুতরাং একটি দ্রব্য-সরবরাহ যে-সমস্ত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, সেগুলিকে মার্কসীয় সূত্র সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। তৃতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য যে সম্পূর্ণরূপে দ্রব্য-উৎপাদনের প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, ইহাও গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিযোগিতার হ্রাস-বৃদ্ধি, মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ, উৎপাদনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণ প্রভৃতি নানা বিষয় মূল্যনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।

মার্কস্-প্রবর্তিত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা যে একমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, এ কথা বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়। মানুষ শুধু তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জীবনধারণ করে না, আরও মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত মানুষ যুগে যুগে বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। মার্কস্ মানব-ইতিহাসের শুধু দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দিকটাই দেখিয়াছেন, কিন্তু মানুষ এই দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া কিরূপভাবে গঠনমূলক কার্য দ্বারা ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মহাপুরুষগণের আবির্ভাব, ধর্মসংগঠনের অভ্যুত্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা মানবজাতির ইতিহাসের ধারা যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে ইহা অনস্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত মার্কস্ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ

অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই বা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবার প্রয়োজনও নাই। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি দেখা যায়, সে সমস্ত দোষ-ত্রুটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ দ্বারা বহুল পরিমাণে দূর করা সম্ভব হইয়াছে এবং অনেক দেশে নিছক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা নিছক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে উভয়ের সমন্বয়ে প্রয়োজনানুরূপ মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তনে অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, মার্কসীয় নীতিতে পূর্ণ আস্থাবান্ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হয় নাই।

মার্কসীয় মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হইলেও এ-কথা সত্য যে, মার্কস্ তাঁহার উদ্বৃত্ত-মূল্যতত্ত্ব প্রচার দ্বারা শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করেন। মার্কসের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তথাপি এ-কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনজনিত কর্মপ্রচেষ্টা মানুষের ইতিহাসের গতিকে অনেক পরিমাণে সুনির্দিষ্ট করিয়াছে। শ্রমিকেরা যে মালিকগণ কর্তৃক পূর্বে শোষিত ও নির্যাতিত হইত এবং শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া এই নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধ করিতে বর্তমানে সমর্থ হইয়াছে, ইহাও অনস্বীকার্য।

মার্কসের পরবর্তী সমাজতন্ত্রবাদিগণ মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও টীকা করিয়াছেন। তাহার ফলে মার্কসীয় নীতি নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা প্রধানতঃ দুই জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে, যথা—**বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Evolutionary Socialism)** ও **বিপ্লবপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ (Revolutionary Socialism)**। বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকগণ সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী ও রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া পরিচিত; অপরপক্ষে বিপ্লবপন্থীদের অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদী, সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদী বলা হয়।

৩। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (Collectivism)

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত-

করণ দাবী করেন। ইঁহারা বলপ্রয়োগ নীতি পরিহার করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। ইঁহাদের মতে উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে; অপরপক্ষে বিনিময় ও ভোগব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হইবে। তাঁহাদের মতে সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী কোন শ্রেণী থাকিতে পারিবে না। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীরা আইনসভা-প্রধান গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়াই তাঁহারা বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিসাধন করিবার পক্ষপাতী।

৪। রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism)

জার্মান লেখকগণ সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদকে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মূলতঃ, উভয় মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। শ্রমিকেরা তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণ করিতে অক্ষম, সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রকেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রধান রক্ষক বলিয়া বিবেচনা করেন। এইজন্য তাঁহারা উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। বৃদ্ধবয়সের ভাতা, শ্রমিক-জীবনবীমা, কারখানা-সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি শ্রমিক-কল্যাণকর নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিয়া শ্রমিকের কল্যাণসাধন করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন।

৫। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ (Fabian Socialism)

জর্জ বার্ণাড শ' প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ মনস্বীর হস্তে সমাজতন্ত্রবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীদের মত ইঁহারাও জবরদস্তিমূলক উপায় দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যপ্রচারের মধ্য দিয়া জনমতকে সুশিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অধিকতর সমীচীন। এইজন্য ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদীরা নূতন এক ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়া এই অভিযানের ফলে ইংলণ্ডের জনমত কিছু পরিমাণে

ধনতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদীরা অবশ্য সাহিত্যের মারফত প্রচারকার্য ছাড়া সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন নাই। ইংলণ্ডের শ্রমিকদল ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ কর্তৃক প্রবর্তিত অনেকগুলি নীতি কার্যকরী করিয়াছেন।

৬। খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Christian Socialism)

খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থার প্রধান কারণ হইল প্রতিযোগিতা। তাই তাঁহারা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকদের মধ্যে সমবায়-পদ্ধতিতে উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন।

৭। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism)

এই মতবাদ তিনটি মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, শ্রমই হইল ধনোৎপাদনের একমাত্র উপাদান। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানার অধিকারী হইল শ্রমিকেরা। তৃতীয়তঃ, এই মালিকানাস্বত্ব-লাভের জন্য ধর্মঘট প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্য ন্যায়সঙ্গত। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীরা শ্রমিকসংঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির দ্বারা বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকসংঘের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর। ইহারা রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় আদৌ বিশ্বাসী নহেন, সেইজন্য ইহারা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পুনঃপুনঃ সর্বাত্মক ধর্মঘট চালাইয়া রাষ্ট্রসংগঠনকে বিপর্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন করিয়া ইহারা মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে একমাত্র শ্রমিকসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই মতবাদ ফরাসী দেশে প্রাধান্য লাভ করে।

৮। সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism)

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়সাধন করিয়া সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা

প্রদান করিয়াছেন। তাহারা রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় আদৌ আস্থাবান্ না হইলেও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীদের মত রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিতে চাহেন না। তাঁহারা সমাজস্থিত বিভিন্ন সংগঠনগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা উৎপাদনব্যবস্থার জাতীয়করণ স্বীকার করিলেও রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার অভাবের নিমিত্ত উৎপাদনব্যবস্থা রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত না করিয়া শ্রমিক, পরিচালক ও কারিগর লইয়া গঠিত সমিতিগুলির হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সংগঠিত সমিতিগুলি ছাড়াও ইঁহারা সমাজের অন্য নানাবিধ সমিতিগুলির উপযোগিতা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, অর্থনৈতিক সমিতিগুলির এবং সামাজিক অন্যান্য সমিতিগুলির সহযোগিতায় মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভব হয়। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের হস্তে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে অর্থনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও অযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এইজন্য তাঁহারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা বণ্টন করিয়া সমিতিগুলির হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছুক।। জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই সমিতিগুলির কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এইরূপে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা তাঁহারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

৯। সাম্যবাদ (Communism)

সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের পরিকল্পিত নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপেক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের দল পুষ্ট করিবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে সাম্যবাদী দল গঠন করিয়া ধীরে ধীরে সমাজের সর্বক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন। এরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার পর তাঁহারা বলপ্রয়োগপূর্বক ধনিক ও মালিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক প্রভৃতি বিত্তহীনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সাম্যবাদিগণ ধনিক মালিকশ্রেণীকে নির্মূল করিয়া সমস্ত বিরোধিতার অবসান ঘটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর। ইহার

ফলে এমন এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র প্রভৃতির কোন পার্থক্য থাকিবে না। শ্রেণীহীন যে নূতন সমাজব্যবস্থা গঠিত হইবে তাহাতে কি উৎপাদনে, কি ভোগে কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকিবে না। প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত পরিশ্রম করিবে, কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। মানুষের সমগ্র জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসাবে তাহার নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করিবে ও রাষ্ট্রনির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট মান অনুসারে তাহার খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। সন্তানসন্ততিগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বেকারসমস্যা, বাণিজ্যচক্র বা শ্রমিক মালিক বিরোধের চিরতরে অবসান ঘটিবে। এরূপ ব্যবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কোনরূপ বিনিময়ের প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভূত হইবে না। অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে মানুষ আর মুনাফার লোভে ধনোৎপাদন করিবে না। এইরূপে সমাজব্যবস্থায় পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সাম্যবাদী ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইলে রাষ্ট্রসংগঠন বিলীন হইবে।

শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলেও সাম্যবাদিগণ অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীদের ন্যায় রাষ্ট্রকে অচিরাৎ ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। সাম্যবাদিগণ মনে করেন, বর্তমান রাষ্ট্রসংগঠনের শক্তির সাহায্যে সাম্যবাদী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে মানুষ যখন পূর্ণ-সমাজচেতনাসম্পন্ন হইবে, তখন রাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিলুপ্ত হইবে। মানুষ হিতাহিত-জ্ঞানসম্পন্ন হইলে বহির্নিয়ন্ত্রণের আর কোন প্রয়োজন অনুভূত হইবে না। সমাজতন্ত্রবাদিগণ শুধু উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, কিন্তু সাম্যবাদিগণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের উগ্র সমর্থক। সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবন উভয়েরই বিনাশসাধন করিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদেবতার বেদীমূলে উপহার দিবার পক্ষপাতী।

মার্কসীয় মতবাদ ও পরবর্তী কালে লেনিন-প্রদত্ত মার্কসীয় মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই উভয় চিন্তাবীরই সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাকে দুইটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল বিপ্লব যুগ (Revolutionary Stage) এবং দ্বিতীয়টি হইল বিপ্লবোত্তর যুগ (Post-Revolutionary Stage)। বিপ্লব যুগে ধনিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শ্রমিকগণ ধনিকশ্রেণীর নিকট হইতে বলপূর্বক সমুদয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবে। এই অবস্থায় প্রকৃত কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রক্ষক হইবে। কাজ অনুসারে বেতন নির্ধারিত হইবে এবং নির্ধারিত বেতন অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিবার ফলে এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ তাহার পরিশ্রমলব্ধ আয় হইতে বঞ্চিত হইবে না। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনব্যবস্থা কোন শ্রেণী-বিশেষের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বজনের হিতার্থে পরিচালিত হইবে। এই শ্রেণীহীন অবস্থাকে বিপ্লবোত্তর যুগ বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রত্যেকে সামর্থ্যানুসারে কাজ করিবে ও প্রয়োজনানুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় অর্থের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদানের প্রথা বিলুপ্ত হইবে। এইরূপে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে লোপ পাইবে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদ (Bolshevism or Communism in the U. S. S. R.)

একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অভিব্যক্তি দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মার্কস্-প্রবর্তিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উদ্বৃত্তমূল্যের সূত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া মার্কস্ সমাজতন্ত্র-বাদের যে অভিনব রূপ দিয়াছিলেন, রুশীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ নির্বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া সাম্যবাদের গোড়াপত্তন করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর রুশীয় সাম্যবাদিগণ পূর্বতন সমাজব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করিয়া এক অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁহারা বল-

প্রয়োগে জারতন্ত্রের সহিত সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া যে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা মানুষের আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পাইল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর রুশীয় সাম্যবাদিগণ মার্কস্‌-প্রবর্তিত নীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জমি-জায়গা, কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে কিছুদিনের পরে দেশের উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গেল, কারণ কৃষকশ্রেণী তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ শস্য উৎপাদনে বিরত থাকিল। ইহা ছাড়া, নবগঠিত সরকার পূর্বতন সংগঠক ও কারিগরদের সহযোগিতা-লাভে বঞ্চিত হইল। বিদেশ হইতেও প্রয়োজনের অনুরূপ উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী আমদানি করিবার সম্ভাবনা রহিল না। ফলে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যে, সাম্যবাদিগন তাঁহাদের অনুসৃত নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক নববিধান প্রবর্তন করিয়া একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রবর্তন করিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রুশীয় সাম্যবাদের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীনে অতিকায় বহরে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য বৃহদায়তনের যৌথ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কৃষকদের আপত্তি সত্ত্বেও অনেক-ক্ষেত্রে নির্মমভাবে তাহাদিগের জমি-জায়গা ও গৃহপালিত পশু-পক্ষিসহ এই যৌথ-কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিতে বাধ্য করা হয়। এইরূপে পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা সাম্যবাদিগণ কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিয়া দেশকে বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন। দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে বেকার-সমস্যা, বাণিজ্যচক্র, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য কুফলগুলি দূর হইয়া জাতীয় জীবনের মান অনেক পরিমাণে উন্নত হইল। বহুদিনব্যাপী অন্যায়, অত্যাচার, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে রুশ-

জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; সাম্যবাদিগণ রাষ্ট্রপ্রবর্তিত সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার করিয়া জাতীয় চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। শিক্ষাবিস্তারের ফলে জাতীয় জীবন যখন কুসংস্কারমুক্ত হইয়া স্বাধীন ও সাবলীল হইল তখন সাম্যবাদিগণ এই নূতনভাবে অনুপ্রাণিত জনগণের সাহায্যে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্যবিদ্যা, খেলাধুলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে এরূপ অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিলেন যে, শত্রু মিত্র সকলেই চমৎকৃত হইল। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন করিবার উদ্দেশ্যে সাম্যবাদিগণকে অনেক নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করিতে হইয়াছে। সাম্যবাদী নীতিতে আস্থাহীন বিরোধী পক্ষকে বর্বরোচিত পদ্ধতিতে অপসারিত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক বিবেচিত হইলে যে-কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রচলিত লোকধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া সাম্যবাদিগণ জাতীয় জীবনে যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির পর সাম্যবাদিগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় জীবন যখন নানাভাবে সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন তখন জনসাধারণ ধীরে ধীরে সাম্যবাদের মূল নীতির প্রতি আস্থাবান্ হইয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করিল। যৌথ কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিতে প্রথমতঃ কৃষকগণ আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু যৌথ কৃষিক্ষেত্রের উপযোগিতা যখন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল তখন তাহারা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইহাতে যোগদান করিল। এইরূপে একদিকে বলপ্রয়োগ ও অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা সাম্যবাদিগণ জনসাধারণকে যে শুধু রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা নয়, পরন্তু জনসাধারণের মধ্যে এক স্বাভাবিক সমাজচেতনা ও গভীর দেশাত্মবোধের উন্মেষ করিয়া সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব করিয়াছেন।

মার্কসীয় নীতি ও রুশীয় সাম্যবাদী নীতির পার্থক্য (Difference between Marxian Socialism and Russian Communism)

মার্কসের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও পরবর্তী কালে রুশীয় সাম্যবাদিগণ বাস্তবক্ষেত্রে মার্কসের নীতিকে বহুল পরিমাণে বর্জন করিতে

বাধ্য হইয়াছেন। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পারিবারিক সংগঠনকে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে পারেন নাই। বিনিময়ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রমের মজুরি নির্ধারিত হয় প্রযুক্ত শ্রমের দুষ্প্রাপ্যতা ও দক্ষতার দ্বারা। সাধারণ শ্রমিক জীবনধারণের উপযোগী একটা নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইলেও পারিশ্রমিকের পার্থক্য সোভিয়েত রাষ্ট্র হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সাম্যবাদিগণ বলেন যে, সাম্যবাদের প্রথম পর্যায়ে যোগ্যতানুসারে পারিশ্রমিকের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রবর্তিত হইয়া উৎপাদন যখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠিত হইয়া যখন জনগণের মধ্যে ভেদাভেদ তিরোহিত হইবে, তখন আর পারিশ্রমিকের পার্থক্য থাকিবে না। প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কার্য করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরি পাইবে। মজুরির পার্থক্য থাকা সত্বেও এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্যবাদী ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা সম্ভব নয় বা অনুপার্জিত আয় ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। নিজে পরিশ্রম না করিয়া পরজীবী হিসাবে সমাজে কেহ বাস করিতে পারে না।

মার্কসীয় মতবাদ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে মার্কস্ জগতের সকল দেশের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। রুশীয় সাম্যবাদিগণ পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র তাঁহাদের নিজ দেশে এই নীতি কার্যকরী করিয়াছেন। স্ট্যালিন কাজের লোক ছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের অসুবিধা বুঝিতে পারিয়া মার্কসীয় নীতি পরিহার করেন। রুশীয় সাম্যবাদ বর্তমানে কার্যতঃ জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হইয়াছে।

সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়ে রুশীয় সাম্যবাদিগণ প্রচলিত লোকধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে বর্জন করিয়া রাষ্ট্রকে যে শুধু সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ করিয়াছিলেন তাহা নয়, রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অনেকক্ষেত্রে ধর্মসংগঠনগুলিকে ধ্বংসও করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের বর্তমান নীতি

হইল সহনশীলতা। জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছামত ধর্মসংগঠনে যোগদান করিতে পারে বা ধর্মের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারকার্য চালাইতে পারে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও বর্তমানে বহুলাংশে পাশ্চাত্ত্য অন্যান্য দেশের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ হইয়া গঠিত হইযাছে। পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বতমানে অন্যান্য দেশগুলির সহিত নানা প্রকারে আদান-প্রদান করিতেছে। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের সময় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিরূপে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সোভিয়েত নেতৃবর্গ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ-প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা বর্তমানে স্বদেশের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সোভিয়েত সাম্যবাদের মূল্যনির্ধারণ (Evaluation of Soviet Communism)

সোভিয়েত সাম্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে এত অধিক প্রচারকার্য হইয়া থাকে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রচারকার্য দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক,—বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর পর্যন্তও বিদেশী পর্যটকেরা অবাধে সোভিয়েত দেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা পাইত না। বর্তমানে এ বিষয়ে সরকারী বিধিনিষেধ অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েত দেশে পর্যটকের যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, সোভিয়েত সরকার তাঁহাদের পূর্বতন তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বিদেশী গুপ্তচরদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ রহিত করিবার জন্যই এই গণতন্ত্র-বিরোধী বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সোভিয়েত সাম্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি পরস্পর-বিরোধী মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত সাম্যবাদের অনুরক্ত ভক্তগণ সোভিয়েত দেশকে মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি যাহা-কিছু মানবজীবনে শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার সব-কিছুই সোভিয়েত

দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, সোভিয়েত সাম্যবাদের উগ্র বিরুদ্ধবাদীরা সোভিয়েত দেশকে নরকের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সোভিয়েত দেশে বিভীষিকার রাজত্ব বর্তমান; সাম্য, মৈত্রী দূরের কথা, সেখানে মানুষের কোন বিষয়েই স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই। এই উভয় মতবাদই অজ্ঞতা ও অশিক্ষাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই চরম সাধুবাদ বা নিন্দাবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হইয়াও বর্তমানে সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা সোভিয়েত সাম্যবাদ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

বহু ভাষাভাষী, বহু জাতি-সমন্বিত সোভিয়েত দেশকে একটি উপ-মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এই বিশাল আয়তনের, বিপুল জনসংখ্যা দ্বারা অধ্যুষিত উপ-মহাদেশ একটিমাত্র রাজনৈতিক অর্থাৎ সাম্যবাদী দল দ্বারা শাসিত হয়। এদেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না—জবরদস্তিমূলক উপায়ে অন্য দলগুলিকে উৎসাদিত করিয়া সাম্যবাদী দল তাঁহাদের একাধিপত্য অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। সাম্যবাদী নেতৃগণ তাঁহাদের নীতি সমর্থনের জন্য বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ধনিক ও মালিকশ্রেণী-পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রমিকরাজের পরিবর্তে কার্যতঃ দলীয় অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র সক্রিয়ভাবে সাম্যবাদী দলে যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোককেই এই সাম্যবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। সাম্যবাদী দলব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুষ্টিমেয় লোক সাম্যবাদী দল পরিচালনা করিয়া দলের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যতদিন ষ্ট্যালিন জীবিত ছিলেন ততদিন সাম্যবাদী দল বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। আর সাম্যবাদী দলের নেতা ষ্ট্যালিন এই বিশাল জনসংখ্যার ভাগ্যনিয়ন্তারূপে এক-নায়কত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেরূপ কঠোর ও নির্মম উপায়ে সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের দলীয় সংহতি ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন তাহা মানবধর্মবিরোধী বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। উদ্দেশ্য মহৎ

হইতে পারে, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত হীন ও অমানুষিক পন্থা অবলম্বন করা কোনরূপ যুক্তি দ্বারাই সমর্থনযোগ্য নয়। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত মালিকানা, ধর্মসংগঠন নানাবিধ প্রথা ও আচার সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিগুলির বিরুদ্ধ সমালোচনা না করিয়াও এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের অনুসৃত নীতি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া সমষ্টির অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অনেকাংশে রুদ্ধ করিয়াছেন। ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া সমষ্টির উৎকর্ষসাধন কতদূর সম্ভবপর সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু সাম্যবাদী কার্যক্রম একমাত্র চীন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ না করিলেও কোন দেশই সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের অনুসৃত কার্যক্রম দ্বারা সমগ্র সোভিয়েত নাগরিকদের সর্ব নৈতিক ও সংস্কৃতিগত জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জার-শাসনের সময়ে দেশের জনসংখ্যার শতকরা আশী জন লোক ছিল নিরক্ষর। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এমন অনেক জাতি ছিল যাহাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না। সাম্যবাদিগণ ক্ষমতাগ্রহণের পর নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া নেহাৎ অসমর্থ বৃদ্ধ ব্যতীত সমগ্র জনসংখ্যাকে লিখন-পঠন-পটু করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী এমন কোন ক্ষুদ্র জাতিও দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাদের নিজস্ব জাতীয় লিপি ও জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে সাম্যবাদিগণ বিজ্ঞান-বিষয়সমূহে যে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব হয় নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক ও কার্যকরী বিষয়সমূহে সোভিয়েত নাগরিকগণের ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিদেশী বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন পর্যটকেরাও তাহার স্তুতিগান না করিয়া পারেন নাই। নানাপ্রকার দুষ্কার্যের নিমিত্ত শাস্তিপ্রাপ্ত অসাধু ব্যক্তিদের চরিত্র সংশোধন

করিয়া তাহাদের সু-নাগরিক করিবার জন্য সোভিয়েত সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে লক্ষ লক্ষ পতিত মানব পুনর্জীবন লাভ করিয়া সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে সাম্যবাদিগণ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই। পতিতাবৃত্তি নিরোধ করা সোভিয়েত সরকারের অন্যতম প্রধান কীর্তি। সোভিয়েত রাষ্ট্রে স্ত্রীজাতি আজ পুরুষের সমানাধিকারের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সমস্যাগুলি সোভিয়েত সরকার এরূপ নিপুণভাবে সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, সংখ্যালঘু জাতিগুলি আজ রাষ্ট্রের প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংস্কৃতিগত জীবনের উৎকর্ষসাধন ব্যতীত অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন-ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের প্রচেষ্টা অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পে সোভিয়েত সরকার যে অভাবনীয় উন্নতিসাধন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত করিয়া তাঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচুর্য না হইলেও জন-সাধারণকে অনশনের ভয় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের জীবনধারণোপযোগী জীবিকার একটা নির্দিষ্ট মান স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রে আজ বেকার সমস্যার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। কৃষি, শিল্প ও উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে যৌথ-পরিচালনার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সোভিয়েত সরকার অর্থনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছেন। কৃষি ও শিল্পের যৌথ পরিচালনা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষক ও শ্রমিকগণ আত্মসচেতন হইয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে সজাগ হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব, সোভিয়েত দেশে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সমাজচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত নাগরিকগণের দেশাত্মবোধও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোভিয়েত সরকার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহার পিছনে মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী আছে—এ কথ

মনস্বীকার্য। এই বিরাট সাফল্য অর্জনের জন্য যে কত নির্মম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কত শত লোক জীবন দান করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যায়, অত্যাচার ও রক্তপাতের কাহিনী পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ভারত, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া আয়ারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিকে যে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহাও সভ্যমানবের কার্যকলাপের নিদর্শন হিরোসিমা ও নাগাসাকি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্ত্য জাতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধ্বংসাত্মক কার্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসিগণের উপর পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্যের সহিত রুশ জাতির অত্যাচারের উদ্দেশ্যের তুলনা করিলে রুশ জাতিকে বোধ হয় বিশেষ হীন প্রতিপন্ন করা যায় না। রাশিয়া অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির প্রতিবেশী রাষ্ট্র, সুতরাং সমধর্মী।

চৈনিক সাম্যবাদ (Chinese Communism)

বর্তমানে একমাত্র মহাচীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর অত্যাচারে এই অতি-প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। সোভিয়েত সাম্যবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই মৃতকল্প জাতি নবজীবন লাভ করিয়া তাহার 'মহাচীন' নাম সার্থক করিতে চলিয়াছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর পূর্বতন জাতীয় সরকারের উচ্ছেদসাধন করিয়া, চীনে সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ফরমোজা ও আর কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ব্যতীত মূল ভূখণ্ডের সহিত মহাচীনের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে আজ সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার অত্যল্পকালের মধ্যে গ্রেট বৃটেন, ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি একুশটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিতে মহাচীন সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই নবগঠিত সরকার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সোভিয়েত সাম্যবাদীদের মত চৈনিক সাম্যবাদিগণ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তত ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রি ব্যবস্থা দ্বারা জাতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর। সামন্ততান্ত্রি ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তে তাঁহার চাষীপ্রধান ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা তাঁহাদের অর্থনৈতি কার্যক্রমের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। চৈনিক সাম্যবাদিগণ নিজেদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণ করেন, তাই তাঁহারা শান্তিকামী জাতিগুলির সহিত মৈত্রীসূত্রে আব হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। কিন্তু চীনের বর্তমান আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্র নীতি তাহার সহ-অবস্থান নীতিকে অসার প্রমাণিত করিয়াছে। সোভিয়ে সাম্যবাদের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইলেও মহাচীন তাহার প্রাচী ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছেদ করে নাই। প্রধানতঃ, সাম্যবাদী দল কর্তৃক সরকার গঠিত হইলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অস্তি বিলুপ্ত করা হয় নাই বা পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে একেবারে বিতাড়ি করা হয় নাই। বর্তমান সরকার দেশের সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা দ্বার সার্বজনীন উন্নতিসাধন করিতে চান।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদিগণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মতের সারবত্তা প্রমাণ করেন। তাঁহারা বলেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করায় মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী অধিকতর ধনশালী হয়, অপরপক্ষে শ্রমজীবীরা ক্রমশঃই দরিদ্রতর হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে দরিদ্রের স্বার্থ যথোচিতভাবে সংরক্ষিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে অনেক ক্ষতি ও অপচয় ঘটে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের পরিবর্তে প্রয়োজনের অনুরূপ সহযোগিতামূলক উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন ও কম মূল্যে বিক্রয়জনিত ক্ষতি ও অপচয় দূরীভূত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদিগণের মত ও তাঁহাদের অনুসৃত নীতি ন্যায়ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। জমি-জায়গা, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ্‌গুলি ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত না হইয়া জনসাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। এই ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের স্বার্থ অধিকতরভাবে সংরক্ষিত হইবে।

চতুর্থতঃ, তাঁহারা বলেন মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একমাত্র সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভবপর। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারাই এই সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষসাধন অধিকতর সহজসাধ্য হয়।

পঞ্চমতঃ, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করা সম্ভব। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বিফল হইবে। মানুষ যদি ভয় ও অভাবমুক্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। অন্যনিরপেক্ষভাবে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে অভাবমুক্ত করিয়া তাহার অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করিয়া দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া মানুষের সহজাত সমাজচেতনাকে দৃঢ়তর করে। সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা সকল দেশেই প্রসারলাভ করিয়া উৎপাদনক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি হইল 'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'। সুতরাং ইহা একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলির কার্যক্রম লক্ষ্য করিলে সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্য প্রমাণিত হয়। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিয়া জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয় তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি হইল যে, সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর

অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্ট্র মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট একটি সামাজিক সংগঠনমাত্র। কোন মানবীয় প্রতিষ্ঠানই নির্ভুল বা ত্রুটিহীন হইতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান্ বিবেচনা করিয়া মানবজীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করিয়া রাষ্ট্র-মালিকানা প্রবর্তিত হইলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা অন্তর্হিত হইবে। মানুষ যদি ইচ্ছানুযায়ী কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া সেই পরিশ্রমলব্ধ ফল স্বাধীনভাবে উপভোগ করিতে না পারে তাহা হইলে সে কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে না। ফলে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইবে। ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তির অভিরুচি অনুযায়ী পরিচালিত না হইয়া পদে পদে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইবার ফলে সমগ্র সমাজ-জীবন বৈচিত্র্যহীন হইয়া নিয়মানুবর্তী সৈনিকজীবনে পরিণত হইবে।

চতুর্থতঃ, সমাজতন্ত্রবাদিগণ সাধারণ মানুষকে যতটা সমাজচেতনাসম্পন্ন ও পরার্থপর বলিয়া মনে করেন কার্যতঃ তাহা নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্রত্যেক লোকের যে পরিমাণ পরার্থপর হইতে হয়, সাধারণ মানুষের নিকট তাহা আশা করা দুরাশামাত্র। মানবচরিত্রের এই সহজাত স্বার্থবুদ্ধির আধিক্যহেতু সোভিয়েত সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির আংশিক পুনঃপ্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অবশেষে বলা যায় যে, এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহার আদৌ কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। এই মতবাদের দ্বারা কর্মবিমুখতা, অযোগ্যতা ও দারিদ্র্য প্রশ্রয় পায়। অপরপক্ষে, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম-ক্ষমতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি সংকুচিত হয়।

সত্যসিদ্ধান্ত (Correct view)

উপরি-উক্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নিছক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বা নিছক সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ পরিচালিত

হইতে পারে না। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। অপরপক্ষে, মানুষের বহুমুখী জীবনের একমাত্র নিয়ামক হিসাবেও রাষ্ট্র পরিগণিত হয় না। বাস্তব-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ কোন একটা নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় না। বর্তমানে দেশের অবস্থা বা প্রয়োজনানুসারে রাষ্ট্রের কর্তব্য স্থির হয়। অনগ্রসর দেশগুলিতে, যেখানে জনসাধারণ অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেখানে রাষ্ট্রকেই নানাবিধ প্রগতিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়া জনসাধারণের অগ্রগমনে সহায়তা করিতে হয়। অপরপক্ষে, যে সমস্ত দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত ও সমাজচেতনাসম্পন্ন, সেখানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণশক্তির পরিধিও কম। ইংলণ্ডে সামাজিক জীবনের নানাবিধ প্রগতির জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সাধারণতঃ কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত সম্ভব হয় নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সীমা দেশের অবস্থা বা প্রয়োজন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়ে যদি কোন নূতন মতবাদ গঠন করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রকর্তব্য এই মিশ্র মতবাদ দ্বারা অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হইতে পারে।

বর্তমান রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি (Proper Sphere of the Modern State)

সমাজতন্ত্রবাদ কোথাও সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হইলেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কার্যকলাপের দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ-প্রবণতা সূচিত হয়। আধুনিক অধিকাংশ রাষ্ট্রই খনি, রেলপথ, যোগাযোগব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালনা প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, অহিফেন ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থা লক্ষ্য করিলেও এই সমাজতন্ত্রবাদ-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক ও অন্যান্য বিত্তহীন শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখানা ও প্রজাস্বত্ব-সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত সমাজব্যবস্থা-সংস্কারের

উদ্দেশ্যে আধুনিক অনেক রাষ্ট্রই নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিতেছে। ভারত সরকার অস্পৃশ্যতা বর্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন। ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা ধর্ম-সম্পর্কীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র কখনই হস্তক্ষেপ করিবে না—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এই মতবাদ আধুনিক রাষ্ট্রগুলি গ্রহণ করে নাই। বর্তমান যুগে সামাজিক ব্যবস্থা এত জটিলতাপূর্ণ যে, কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ না করিয়া রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়াও জনগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা আধুনিক রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সমাজহিতকর এরূপ অনেক আইন প্রণয়ন করে যদ্দ্বারা মানুষের নৈতিক জীবনের মান উন্নীত হয় অথবা নৈতিক জীবনের উন্নয়ন-পথে যে অন্তরায় থাকে তাহা দূরীভূত হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক উপদেশ দান করিয়া জনসাধারণকে মদ্যপানে বিরত করা সম্ভব নয়, কিন্তু মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া রাষ্ট্র মদ্যপানের প্রলোভন হইতে জনগণকে রক্ষা করিতে পারে। সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে নাগরিক জীবনের নৈতিক মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য রাষ্ট্রকে সমাজব্যবস্থায় এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যেখানে উন্নত নৈতিক জীবনযাপনের পক্ষে সকল বাধা দূরীভূত হইয়া নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব হইবে। এইজন্যই আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, মদ্যপান, অশিক্ষা প্রভৃতি প্রগতিবিরুদ্ধ যে সমস্ত কু-প্রথা প্রচলিত আছে সেগুলি আইনের দ্বারা দূর করিয়া প্রগতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপের পরিধি লক্ষ্য করিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, রাষ্ট্র অহেতুক ব্যক্তিগত জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতেছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্যাসীবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা ক্রমবর্ধমান বলিয়া অনুভূত হয়। ইংলণ্ড, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলিতেও উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্তের অধীন হইতেছে। সুতরাং পূর্বতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ যে পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাস্তবক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের এই ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের প্রধান কারণ হইল গণতান্ত্রিক আদর্শের বহুল প্রসার। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক কালে রাষ্ট্র আর অসীম ক্ষমতার আধার বলিয়া বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কার্যের দ্বারা সমর্থিত হয়। যে রাষ্ট্র জনকল্যাণ সাধন করিতে অসমর্থ, সে রাষ্ট্র জনসমর্থন-লাভেও বঞ্চিত। সমগ্র জনসংখ্যার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন হইল বর্তমান রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্যই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State) বলিয়া দাবী করে। সেই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত সমগ্র মানবজীবনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রকর্তব্যের সীমারেখা স্থির করা সম্ভবপর নয়।

রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের শ্রেণীবিভাগ (Classification of the State Functions),

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সেই দেশের অবস্থা বা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুলি কার্য অত্যাবশ্যকীয় বা প্রাথমিক (Essential or Primary) বলিয়া বিবেচিত হয় ; আর কতকগুলি কার্য আছে যেগুলি অবশ্যকরণীয় নয়, প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্র এইগুলি করিয়া থাকে। এইগুলিকে প্রয়োজনানুযায়ী বা ইচ্ছামূলক (Non-essential or Optional) কার্য বলা হয়।

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশেরক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই প্রাথমিক বা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের এই কার্য সম্পাদন করিতে হয়। নতুবা কোন রাষ্ট্রই বাঁচিতে পারে না। শান্তি

শৃংখলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা ছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্রের আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক কর্তব্য আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থির করিয়া নিজস্ব অস্তিত্বকে নিরাপদ রাখা বর্তমান রাষ্ট্রের একটা প্রধান কর্তব্য। পারিবারিক সম্পর্ক স্থির করিয়া অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী, পিতা মাতা ও সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া পারিবারিক জীবনকে স্থিতিশীল করা রাষ্ট্রের আর একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া উৎপাদন ও বিনিময়কার্যে সাহায্য করা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট-পরিমাপের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা রাখা অবশ্যকর্তব্য। এইজন্য রাষ্ট্র পুলিশ, বিচার ও জেল বিভাগগুলি প্রবর্তন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন-সংক্রান্ত বিষয়গুলিও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

যে কার্যগুলি রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় নয় অর্থাৎ রাষ্ট্র যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে করিয়া থাকে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক বা ইচ্ছাকৃত কার্য বলা হয়। এই ইচ্ছাকৃত কার্যগুলির মধ্যে কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিচালনা অনেক রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করে। লবণ, তামাক, মুদ্রা, রেলপথ প্রভৃতি অনেক শিল্পব্যবসায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করিয়া থাকে। আবার অনেক সময় রাষ্ট্র শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া সেগুলিকে বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক কল্যাণমূলক বহুবিধ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ডাক, তার ও টেলিফোন-ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিয়াছে। পূর্তকার্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি, বেতার-প্রচারকার্য, ট্রাম, বাস প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ এবং সর্বোপরি শিক্ষাবিস্তারকার্যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধ ও পঙ্গু লোকদের সাহায্যদান-কার্যও বর্তমান রাষ্ট্রগুলি স্বহস্তে

গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আধুনিক কালে রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য ও ইচ্ছাকৃত কর্তব্যের মধ্যে সীমারেখা ক্রমশঃই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের সীমা (Limits to State intervention over individual life)

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যের পরিধি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, রাষ্ট্রকর্তব্যের কোন সীমা নাই—মানবজীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহার উপর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করাই যদি রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এইরূপ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সাহায্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ কতদূর সম্ভবপর, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, সে সমস্ত কার্যকলাপ কখনই রাষ্ট্রকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, জনমত নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে দূষণীয় কার্য। জনমত যদি ভ্রান্ত পথেও পরিচালিত হয়, তাহা হইলেও এই জনমত যত সময় পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত হইবে তত সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র এই জনমত দমনের চেষ্টা করিবে না। জনমত হইল জনগণের নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তাশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। জনমত দমন করার তাৎপর্য হইল মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিতে বাধা সৃষ্টি করা। যে মানুষ তাহার চিন্তা প্রকাশ করিতে পারে না, সে মানুষ চিন্তা করিতে শিখে না। আর যে মানুষ চিন্তা করিতে পারে না, সে মনুষ্যপদবাচ্য নহে। সুতরাং স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও চিন্তার বিষয় ব্যক্ত করাই হইল মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল মানুষের এই স্বাধীন চিন্তাশক্তির উৎকর্ষসাধনে সাহায্য করা। যে রাষ্ট্র নাগরিকগণের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অন্তরায় সৃষ্টি করে, সে রাষ্ট্রকে কখনও কল্যাণ রাষ্ট্র বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সাধারণতঃ সমাজে প্রচলিত নানাবিধ আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিবে না। কারণ, এই সামাজিক আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলি দীর্ঘকালব্যাপী জনমতের সমর্থনপুষ্ট হইয়া রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে প্রবর্তিত থাকে। এগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিলে জনমত ক্ষুব্ধ হয়।

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এ মত সব সময়ে গ্রহণযোগ্য নহে। প্রত্যেক সমাজেই এমন কতকগুলি কু-প্রথা, আচার ও অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে যেগুলি দূর না করিলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ বাধাহীন করা সম্ভব নয়। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল যে, সামাজিক অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সামাজিক আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধন করা। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া প্রভৃতি জনমত-সমর্থিত প্রথা হইলেও কোনও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রথাগুলি মানিয়া লওয়া রাষ্ট্রকর্তব্য নহে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ অতিমাত্রায় বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র সাধারণতঃ মানুষের রুচিবোধ ও প্রচলিত অভ্যাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে। রাষ্ট্র কখনও মানুষের খাদ্য বা পরিধেয় সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করিবে না। কারণ, এই অভ্যাসগুলি বহুদিন ধরিয়া মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যুবকগণের মধ্যে প্রয়োজনের তাগিদে ধুতির পরিবর্তে প্যাণ্টালুন ব্যবহৃত হইতেছে। এজন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী যে পোশাক ব্যবহার করেন, তাহা জনসাধারণের ভাল লাগিলে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্যবহার করিবে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করেন বলিয়া উক্ত পোশাক জনসাধারণের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা সমীচীন নহে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র এরূপ একটি সংগঠন যাহা শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—সুতরাং রাষ্ট্র মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস পাইবে না। মানুষের ধর্মমত ও নীতিবোধের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

নূতন মতবাদ (New Theories)

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার নিমিত্ত প্রচলিত আরও দুই-একটি মতবাদের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।' বাস্তব-

ক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র পূর্বনির্ধারিত একটি নীতির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি বিশেষ নীতি বা মতবাদ দ্বারা রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়া থাকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ছাড়াও ধনতন্ত্রবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি নূতন কতকগুলি মতবাদের আবির্ভাবে রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের আবির্ভাব হয়। প্রথম পর্যায়ে গান্ধীবাদ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলেও বর্তমানে এই মতবাদ ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারলাভ করিতেছে।

ধনতন্ত্রবাদ (Capitalism)

মানুষের সমাজব্যবস্থায় বিত্তশালী ও বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব আদিমকাল হইতে পরিদৃষ্ট হইলেও ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি আধুনিককালে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে ইহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পূর্ববর্তী যুগে পাওয়া যায় না। ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি বর্তমান যুগে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যে ব্যবস্থাকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার সমুদয় ত্রুটির জন্য দায়ী করা হয়। সুতরাং বর্তমানে ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি একটি তিরস্কার বা অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় তাহার ফলে উৎপাদনব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনীত হয়। ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প-গুলির পরিবর্তে বিরাট আকারে উৎপাদনের নিমিত্ত যন্ত্রপরিচালিত কারখানা প্রবর্তিত হয়। বিরাট পরিমাণ উৎপাদনের নিমিত্ত বহু মূলধনের প্রয়োজন। সাধারণ মজুরশ্রেণীর এই মূলধন না থাকার জন্য অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি তাহাদের মূলধনের সহায়তায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রমিকদের শ্রম অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে দাস শ্রেণীতে পরিণত করিয়া কালক্রমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হইল, তাহাই সাধারণতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া পরিচিত। অর্থনৈতিক

ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই ক্ষমতার বলে তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া শাসনব্যবস্থায় তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ফলে, সমগ্র সমাজজীবনের উপর এই ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আদর্শ হিসাবে ধনতন্ত্রবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে ব্যক্তিগত লাভের জন্য স্বাধীনভাবে উৎপাদনকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ওয়েবস্ ধনতন্ত্রবাদের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধনতন্ত্রবাদ বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এমন একটি সমাজব্যবস্থা, যেখানে শিল্প ও অন্যান্য আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি স্তরে উন্নীত হয় যে, অধিকাংশ শ্রমজীবী উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা হইতে বঞ্চিত হইয়া দিনমজুরে পরিণত হয় এবং তাহাদের জীবনধারণের সংস্থান, নিরাপত্তা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা—ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত জমি-জায়গা ও কল-কারখানার মালিক ও অগণিত শ্রমিকের পরিচালক মুষ্টিমেয় লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ও উপভোগের সমগ্রীগুলি যে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের এইগুলির উপর মালিকানা স্বীকৃত হয়। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানগুলি বংশপরম্পরাক্রমে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। ফলে, ভূমি ও শিল্পের মালিকগণ ধনবান্ হইতে অধিকতর ধনবান্ হইতে থাকেন ও সাধারণ লোক দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হয়। এইরূপে কালক্রমে সমাজে বিত্তবান্ ও বিত্তহীন—এই দুই শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া পারস্পরিক স্বার্থসংঘর্ষের সূত্রপাত করে। এই ব্যবস্থায় যে-কোনও ব্যক্তি যে-কোনও উৎপাদনকার্যে স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। যে-কোন লোক ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া নিজ সম্পত্তি পরিচালনা করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদক যেরূপ অবাধ

প্রতিযোগিতা করিবার অধিকারী, উপভোগের ক্ষেত্রে ক্রেতা বা উপভোগকারী সেইরূপ অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী। ক্রেতা তাহার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতার এই অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইয়া চাহিদা ও যোগানের সমতা আনয়ন করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও উপভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না। উৎপাদন, বিনিময়, উপভোগ প্রভৃতি দ্রব্যমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হইয়া অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিরাট পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থায় ঝুঁকি ও দায়িত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা উৎপাদনকার্যের জন্য মূলধন সরবরাহ করে তাহারা সাধারণতঃ এই ঝুঁকি বহন করে, কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করিতে তাহারা অসমর্থ। সুতরাং বিরাট পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার নিমিত্ত নূতন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহাদিগকে সংগঠক বা পরিচালক বলা হয়। সংগঠকেরা ঝুঁকি বহন করেন না বলিয়া উৎপাদনক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁহারা ভ্রান্ত নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতা, বিক্রেতা ও শ্রমিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলেও অনেক সময় শ্রেণীস্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত ইহারা একতাবদ্ধ হয়। এই একতার ফলে শ্রমিকসংঘ, ক্রেতাসংঘ ও নানাজাতীয় উৎপাদকসংঘের আবির্ভাব হইয়াছে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল (Merits of Capitalism)

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন, এই ব্যবস্থায় উৎপাদকেরা ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া পারস্পরিক অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে, উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস হয়। প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র যোগ্য উৎপাদক টিকিয়া থাকে। ক্রেতাগণ স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্য পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় ক্রেতাগণ তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। দ্রব্যক্রয়-ব্যাপারে ক্রেতার পূর্ণ-স্বাধীনতার ফলে

উৎপাদকগণ ক্রেতার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করিতে বাধ্য হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার এই স্বাধীন ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদনকার্য বিশেষ বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে হয়। দক্ষ পরিচালনার ফলে উৎপাদনে কম অপচয় হয়।

চতুর্থতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানতঃ মূল্যনিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যক্তিগত মুনাফা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় দুর্নীতি, অযোগ্যতা, পক্ষপাতিত্ব বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি প্রশ্রয় পায় না। কি ধনতান্ত্রিক, কি গণতান্ত্রিক সকল ব্যবস্থায়ই সমর্থ পরিচালকের প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে, যাহারা যোগ্যতম তাহারা টিকিয়া থাকে ও পুরস্কৃত হয়। যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কারলাভকে গণতন্ত্র বিরোধী আদর্শ বলা সমীচীন নহে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল (Evils of Capitalism)

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল, ইহাতে সমাজে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। ফলে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ধনীর ক্রীতদাসে পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধনবৈষম্যের ফলে সাধারণ লোক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উপযোগী সমান সুযোগ পায় না। সমান সুযোগের অভাবে যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারায় দরিদ্র ব্যক্তির জীবনধারণোপযোগী জীবিকা-অর্জনেও অন্তরায় ঘটে। তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতার যে স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়, কার্যক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। নানাজাতীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের দ্বারা ক্রেতার ক্রয়স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে উৎপাদকগণ সংঘবদ্ধ হইয় একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে ও উচ্চমূল্য নির্ধারণ করিয়া ক্রেতাকে দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য করে। চতুর্থতঃ, প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ ব্যক্তিগত মুনাফার পরিমাণ দ্বার নির্ধারিত হয়। সমাজকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজের অধিকাংশ

লোকের যাহা প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত দ্রব্য সব সময়ে উৎপাদিত হয় না। যে সমস্ত দ্রব্য যেভাবে উৎপাদন করিলে উৎপাদকের ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনকার্য ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হয়। ফলে উৎপাদনকার্যে নানাবিধ অপচয় ঘটে। পঞ্চমতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বেকারসমস্যা, বাণিজ্য-চক্র ও শ্রমিক-মালিক বিরোধ আবির্ভূত হয়। ফলে সামাজিক শান্তি ও প্রগতি ব্যাহত হয়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমটি হইল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু অনেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ প্রবর্তন সমর্থন করেন না। দ্বিতীয়টি হইল, মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত না করিয়া কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রবর্তন ও প্রয়োজনমত অন্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন দ্বারা ধনবৈষম্য প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অনেক রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ও মৃত্যুকর এবং অনিষ্টকর দ্রব্য-উৎপাদনের উপর কর ধার্য করিয়াছে। বেকারসমস্যা, বাণিজ্যচক্র ও শ্রমিক-মালিক বিরোধ অবসানকল্পে অনেক রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ফলে রাশিয়া ও চীনদেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়াছে। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ধর্মঘট ব্যতীত এখনও পর্যন্ত অন্য কোন গণ-অভ্যুত্থান হয় নাই। তথাপি এই সমস্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয়ে মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতেছেন।

ফ্যাসীবাদ (Fascism)

প্রথম বিশ্বমহাসমরের অব্যবহিত পরে ইতালী দেশে ফ্যাসিষ্ট মতবাদের অভ্যুত্থান হয়। ফ্যাসিষ্ট মতবাদের প্রবর্তক ও ফ্যাসিষ্ট দলের একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন বেনিটো মুসোলিনী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালীতে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সে সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে তৎকালীন ইতালীয় গণতান্ত্রিক সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় ও জনসাধারণ

সরকারের ক্ষমতায় ক্রমশঃ আস্থাহীন হইয়া পড়ে। রুশ-বিপ্লবের অনুকরণে ইতালীয় কৃষক ও মজুরশ্রেণী জমি ও কল-কারখানা দখল করিতে আরম্ভ করে। ইতালী দেশ যখন ক্রমশঃ সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন মুসোলিনী ইতালীয় জনসাধারণের নিকট এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ প্রগতি-মূলক কর্মসূচী উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের ফ্যাসিষ্ট মতবাদে দীক্ষিত করিতে সাফল্যলাভ করেন। এইরূপে মুসোলিনীর প্রভাবে ইতালী সাম্যবাদনীতি গ্রহণ না করিয়া ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। এই সময়ে ইতালীতে একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন ছিল। মুসোলিনী তাঁহার অল্পসংখ্যক অনুচরের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি ও বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালীয় নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন।

ফ্যাসীবাদ শব্দটি একটি রোমান শব্দ হইতে উদ্ভূত। এই শব্দটির অর্থ হইল 'একসঙ্গে একখানি কুঠারসহ আবদ্ধ কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড'। ইহাই ছিল প্রাচীন রোমে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের নিদর্শন। ইতালীয় ফ্যাসিষ্ট দলও এই প্রতীকচিহ্ন গ্রহণ করে।

ফ্যাসিষ্ট মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ হইতে অভিন্ন এক সর্বাত্মক সংগঠন। রাষ্ট্ররূপ সংগঠন হইল সর্বশক্তির আধার—ইহার বিনাশ নাই। ফ্যাসীবাদিগণ সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিগত জীবনের উত্থান-পতনে জাতীয় জীবনের গতি কোনক্রমে ব্যাহত হয় না। ফ্যাসীবাদীরা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার করেন না। ফ্যাসীবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন, সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাহীন। তাঁহারা নেতৃত্বে বিশ্বাসী ও সেইজন্য ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রের কাঠামো মূলতঃ অভিজাততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী। ফ্যাসীবাদীরা গণ সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে জাতীয় স্বার্থের একমাত্র রক্ষক হইল রাষ্ট্র, আর এই রাষ্ট্র সর্বতোভাবে জনসাধারণকে পরিচালন করিবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালিত হইবে মুষ্টিমেয় যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা।

ফ্যাসীবাদিগণ শান্তিবাদের উগ্র বিরোধী। ফ্যাসীবাদের জন্মদাতা মুসোলিনীর মতে যুদ্ধ করা জাতীয় জীবনের একটি স্বাভাবিক কর্তব্য। যুদ্ধ

বর্জন করিলে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে। ফ্যাসীবাদ সাম্যবাদেরও বিরোধী। ফ্যাসীবাদীরা শ্রেণীসংগ্রাম বিশ্বাস করেন না বা একটিমাত্র দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, ইহাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ফ্যাসীবাদীরা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সমর্থন করেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়-সাধন করিয়া উভয় ব্যবস্থার সুবিধাগ্রহণের পক্ষপাতী। এইজন্য মুসোলিনী জমি-জায়গা প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্তে আনয়ন না করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়, তজ্জন্য কঠোর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা ব্যাহত হয় নাই, অপর দিকে সেইরূপ শ্রমিক ও ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া হয় নাই।

মুসোলিনীর কর্তৃত্বাধীনে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অতি অল্পকালের মধ্যে ইতালী অনেক প্রগতিমূলক কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইতালী তাহার নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া একটা বৈশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু জাতীয় জীবনের নানাদিকে নানা উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইলেও ফ্যাসীবাদ আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইতালীয় জনসাধারণ এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে সমষ্টির উন্নতিসাধন সম্ভবপর নয়। ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া একমাত্র পশুবলের উপর মহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় না। ফ্যাসীবাদ সম্পূর্ণরূপে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই যেরূপ আকস্মিকভাবে ইহার অভ্যুত্থান হইয়াছিল ততোধিক আকস্মিকভাবে এই নীতিজ্ঞান-বিরোধী মতবাদের অবসান ঘটিল।

নাৎসীবাদ (Nazism)

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানীর জাতীয় জীবনে যে দুঃখ, দৈন্য ও গ্লানি দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতিবিধানকল্পে নাৎসীবাদের আবির্ভাব হয়।

সুতরাং ইতালীয় ফ্যাসীবাদ ও জার্মানীর নাৎসীবাদ এবং এই উভয় মতবাদের জন্মদাতাদ্বয়ের মধ্যে যে একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। নাৎসীবাদ মূলতঃ ফ্যাসীবাদের সমধর্মী হইলেও ইহার একটা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নাৎসীবাদের জন্মদাতা হের হিট্‌লার, জার্মান জাতি যে বিশুদ্ধ আর্যবংশ-সমুদ্ভূত—ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার মতবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নাৎসীবাদ অতি অল্পকালের মধ্যে জাতীয় জীবনে অনেক পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ফ্যাসীবাদের মত নাৎসীবাদও ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের একাধিকার বিস্তারের পক্ষপাতী। একদলীয় শাসন ও দলীয় নেতার হস্তে সর্বময় কর্তৃত্ব সমর্পণ, ইহাই হইল নাৎসীবাদের মূলমন্ত্র। নাৎসী রাষ্ট্রে ব্যক্তির কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ামক, সর্বক্ষমতার আধার নাৎসীনায়ক হইলেন জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। নাৎসীবাদ সর্বদিক দিয়াই ফ্যাসীবাদের অনুরূপ। নাৎসীবাদ ফ্যাসীবাদের মতই এই সত্য প্রমাণিত করিয়া গেল যে, নীতিজ্ঞান-বিরোধী কোন মতবাদই স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না।

গান্ধীবাদ (Gandhism)

গান্ধীবাদ ভারতে তথা সমগ্র জগতে এক নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে বহু পূর্ব হইতেই রাজনীতি ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়াছিল। গান্ধীবাদ মানুষের সহজাত ন্যায়বুদ্ধিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে মহত্তর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। গান্ধীবাদ মূলতঃ ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় আদর্শের মূল কথা হইল অহিংসা। কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক জীবনে মানুষ হিংসা দ্বারা কখনও তাহার শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ এই অহিংসানীতির উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। গান্ধীবাদ অনুসারে প্রকৃত গণতন্ত্র কখনও হিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গান্ধীজীর মতে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে যে

তথাকথিত গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, সেগুলি ধনিকশ্রেণী কর্তৃক দরিদ্রশ্রেণীকে পোষণ করিবার যন্ত্রবিশেষ মাত্র। এইরূপ অন্যায় ও হিংসাত্মক ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। হিংসাত্মক কার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়। কারণ, হিংসাত্মক কার্য দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে জনসাধারণ এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং গান্ধীবাদে ক্ষমতাপ্রয়োগের কোন স্থান নাই। এইজন্য গান্ধীজী সমাজকে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ করিয়া গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীদের মত গান্ধীবাদ রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে আস্থাহীন। তাই গান্ধীবাদ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণমুক্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বাধীন মানুষের স্বাধীন সমাজগঠনের পক্ষপাতী। গান্ধীজীর মতে কোন রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। সাম্য ও মৈত্রীভাব মানুষের সহজাত ন্যায়বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কখনও স্থায়ী হয় না।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনব্যবস্থার পক্ষপাতী। আধুনিককালে জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে অতিকায় কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে মানুষ এই যন্ত্রদানবের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য গান্ধীজী যন্ত্রবিরোধী ছিলেন। যন্ত্রবিরোধিতা গান্ধীবাদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও উৎপাদনকার্যে যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজী অস্বীকার করেন নাই। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি মানুষের দৈহিক শ্রমের লাঘব করে এবং যেগুলি শ্রমিকগণ অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারে, সেগুলির ব্যবহার গান্ধীবাদ অনুমোদন করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির উৎপাদনের নিমিত্ত ইস্পাত ও লৌহশিল্পের বড় কারখানা থাকা প্রয়োজন। এই জাতীয় দু-চারটি বড় আকারের শিল্পসংগঠন গান্ধীজীর অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বড় আকারের কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রয়োজনীয়তাও গান্ধীবাদ সমর্থন করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলি দূর করিয়া এরূপ একটা সহজ ও সরল উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল, যে ব্যবস্থায় যন্ত্র ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু যন্ত্রের মালিক ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞগণ ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির জন্য যেন মানুষকে

শুধু ভোগের উপকরণ-উৎপাদনের উপাদানে পর্যবসিত করিতে না পারে। বড় বড় কল-কারখানায় যে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদিত হয়, তাহাতে শিল্পী মজুরী পাইলেও সৃষ্টির আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকে। যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় শিল্পী যন্ত্রের একটি ক্রীড়নক হইয়া উৎপাদনের একটি গৌণ উপাদানে পরিণত হয়, সেরূপ উৎপাদনব্যবস্থা কখনও সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পারে না। জনগণের অর্থনৈতিক তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই হইল উৎপাদনের উদ্দেশ্য। কিন্তু যে উৎপাদনব্যবস্থা ভোগের উপকরণ উৎপাদন করিবার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে, গান্ধীবাদ কখনই তাহাকে সমর্থন করে না।

গান্ধীবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। অহিংস আদর্শবিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে গেলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপরিহার্য। যন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ শিল্পসংগঠনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। সুতরাং যন্ত্রসহযোগে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্র শিল্পব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল দূর করা যায়। এইরূপে গান্ধীবাদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের মধ্য দিয়া চিন্তাধারার উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে নূতন এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হইয়াছে। এদেশের প্রধান সমস্যা হইল অর্থনৈতিক দুর্গতি। এই দুর্গতি দূর করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার পক্ষে গান্ধীবাদ কতটা সহায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অন্য দেশ দূরে থাকুক, এমন কি তাঁহার স্বদেশ ভারতও উৎপাদনব্যবস্থায় গান্ধীবাদ গ্রহণ করে নাই। যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতীত অধিক উৎপাদন সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনোৎপাদন না হইলে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়।

গান্ধীবাদ রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া ব্যক্তিগত উন্নতি কতটা সম্ভব তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

বাস্তবক্ষেত্রে গান্ধীবাদ কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, গান্ধীজী এই হিংসাকুটিল ও সতত স্বার্থসংঘাতে লিপ্ত মানবসমাজে এক শান্তিময় জীবনযাত্রার বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। রণোন্মত্ত মানুষের কানে শান্তির সে বাণী না পঁহুছিতে পারে, কিন্তু মানুষ যেদিন রণক্লান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িবে, সেদিন গান্ধীবাদ—'মা হিংসীঃ'—একমাত্র সত্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমগ্র মানবজাতি হিংসার পথ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইবে। নতুবা সমগ্র মানবসমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

রাজনীতির শেষ সমস্যা (Ultimate Problem of Politics)

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ তাহার রাজনৈতিক জীবনে যে চরম সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে এবং আজ পর্যন্ত যে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে নাই, সে সমস্যাটি হইল—ব্যক্তি-স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সমন্বয়সাধন (Reconciliation between Individual Liberty and State Authority)। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সহিত রাষ্ট্রের সংঘাত চলিয়াছে এবং এই সংঘাতকে কেন্দ্র করিয়া উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিন্তাধারা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত নানাভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নানা মতবাদ এবং নানা প্রকার শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দেশেই এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নাই।

এই সমস্যার সহিত দুইটি প্রশ্ন জড়িত আছে। প্রথমটি হইল—কে বা কাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিবে? দ্বিতীয়টি হইল—কি পরিমাণ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করিতে দেওয়া যাইতে পারে? প্রথম প্রশ্নটি রাষ্ট্রীয় সংগঠন-সম্পর্কিত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা-বণ্টনের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়টি হইল—রাষ্ট্রীয় কার্যপরিধি-সম্পর্কিত এবং ব্যক্তির পৌর অধিকারের প্রকৃতি ও বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা ব্যক্তিগত অধিকার

এই দুইটির যে-কোনটির আধিক্য ঘটিলে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটে, অপরপক্ষে অত্যধিক রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্বৈরাচারে পরিণত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। গ্রীক দার্শনিক য়্যারিষ্টট্‌ল এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং এই সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। হব্‌স ও লক্ এই সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কারণ হব্‌সের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রকর্তৃত্বের আধিক্যের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়, আর লক্-প্রবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাব আধিক্যের ফলে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের স্থায়িত্ব দুর্বল হয়। ফরাসী দার্শনিক রুশো নীতিগতভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে রুশো কর্তৃক বর্ণিত উপায়ে এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আইনবিদ্‌গণ, হিতবাদী ও আদর্শবাদী দার্শনিকগণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদিগণ, বহুত্ববাদী, সাম্যবাদী ও ফ্যাসীবাদিগণ নিজ নিজ নীতি অনুযায়ী এই সমস্যা-সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কোন দেশের রাজনৈতিক জীবনে আজ পর্যন্ত এই দুইটি আপাতবিরোধী শক্তির সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বাস্তবক্ষেত্রেও এই সমস্যার সমাধানকল্পে লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি নানা শাসনতান্ত্রিক উপায় সাহায্যে একদিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানির্ধারণ এবং অপরদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্বীকরণের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উভয় শক্তির মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় সংগঠন এরূপভাবে পরিকল্পিত হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকারের আধিক্যহেতু শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে জনতা-শাসনে পর্যবসিত না হয়, আবার রাজনৈতিক অধিকারের স্বল্পতা-হেতু শাসনব্যবস্থা যাহাতে স্বৈরাচারে পরিণত না হয়।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে, ব্যক্তির পৌর অধিকারগুলি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইবে যাহাতে পৌর অধিকারগুলির আধিক্য রাষ্ট্র-

কর্তৃত্ব দুর্বল করিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করিতে না পারে। আবার পৌর অধিকারগুলির স্বল্পতা-হেতু যাহাতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার ন্যায্য দাবী ক্ষুন্ন না করে। এ সম্পর্কে কোন স্থায়ী বিধি-নিষেধ আরোপ করা সম্ভব নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যপলাপ—গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম পরিণতি বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহাদের মতে মানুষ রাষ্ট্রের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, রাষ্ট্র মানুষের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহারা ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। বর্তমানে এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের সহায়ক বলিয়া রাষ্ট্রের উপযোগিতা স্বীকৃত হয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক বিবিধ কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করা, মানব-সমাজের হিতসাধন করা প্রভৃতি নানা কার্য রাষ্ট্রের করণীয় বলিয়া বিভিন্ন লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ডাঃ গার্ণারের মত অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের কার্য হইল—১। ব্যক্তির উন্নতিসাধন করা, ২। জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধন করা ও ৩। সমগ্র মানবসমাজের হিতসাধন করা।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

অ-রাষ্ট্রতন্ত্র—মানবজীবনে রাষ্ট্রের যে আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র কৃত্রিম বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়া মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং তাঁহারা রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিয়া স্বাধীন মানবসমাজ গঠন করিবার পক্ষপাতী।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীদের মতই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা রাষ্ট্রকে অচিরাৎ ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। যতদিন মানবসমাজে নানাজাতীয় অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হইবে। মানুষ যখন দোষবিমুক্ত হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হইবে তখন আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। এইজন্যই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ বর্তমানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত অবাধ স্বাধীনতা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র শুধু অপরাধ নিবারণ করিবে, মানুষের অন্যবিধ উন্নতির জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা করিবে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সপক্ষে যুক্তি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে বলা হয়—১। মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝে, সুতরাং, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা দান করে। ২। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম টিকিয়া থাকে, দুর্বল মৃত্যু বরণ করে। ৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধিত হয় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস হইয়া ক্রেতার সুবিধা হয়। ৪। অতীতের অভিজ্ঞতাও রাষ্ট্র-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পরিচায়ক। ৫। রাষ্ট্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম, সুতরাং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারাই ব্যক্তিগত স্বার্থের সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

বিপক্ষে যুক্তি—১। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও বহুক্ষেত্রে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ২। মানুষ সর্ব সময়ে তাহার স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ নয় বলিয়া রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য। ৩। রাষ্ট্রের অবর্তমানে সমাজে আইন-শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। আইন-শৃঙ্খলার অবর্তমানে সমাজে প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বৈরাচারের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। ৪। জীবনসংগ্রামে যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাই একমাত্র যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার দ্বারা অক্ষম ব্যক্তিকে সক্ষম করিতে পারিলে সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর। ৫। সমান সুযোগ-সুবিধার অভাব অনেক সময় ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার দ্বারা সমান

সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সক্ষম হয়। এইরূপে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রে মানুষের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ—সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের একটি পরম হিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে। এই মত অনুসারে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারাই মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সম্ভবপর। তাই তাঁহারা সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বাস করেন না, তাই তাঁহারা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিতে বদ্ধপরিকর।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ—সমাজতন্ত্রবাদ অতীতে ও বর্তমানে নানাপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, যথা—১। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ, ২। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ, ৩। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, ৪। রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, ৫। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ, ৬। খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ, ৭। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ, ৮। সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, ৯। সাম্যবাদ।

আধুনিক যুগে সাম্যবাদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পৃথিবীব্যাপী ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই মতবাদ মার্কসীয় নীতি—'উদ্বৃত্ত মূল্য'-সূত্র ও ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে রুশীয় সাম্যবাদিগণ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁহাদের অনুসৃত সাম্যবাদী নীতি বহুলাংশে পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রথম পর্যায়ে ধ্বংসাত্মক কার্য দ্বারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া পরবর্তী কালে সাম্যবাদিগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় জীবনের অনেক উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাশিয়ার অনুকরণে মহাচীনেও সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি—১। সমাজতন্ত্রবাদ মুষ্টিমেয় ধনিক-শ্রেণীর সুবিধার পরিবর্তে সর্বশ্রেণীর সুবিধা প্রতিষ্ঠা করে। ২। প্রতিযোগিতা-মূলক উৎপাদনব্যবস্থার অপচয় নিরোধ করিয়া সহযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ফলে, অর্থনৈতিক জীবনে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। উৎপাদনের উপাদানগুলি জাতীয়করণের দ্বারা সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ৪। সমাজতন্ত্রবাদ সমষ্টিগত জীবনের উন্নতি দ্বারা ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যবস্থা করে। ৫। অর্থনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপায় হইল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।

বিপক্ষে যুক্তি—১। রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভবপর নয়, কারণ রাষ্ট্রও ভুল করিতে পারে। ২। ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত মুনাফা না থাকিলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা নষ্ট হইবে। ৩। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মানুষ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশ করিতে পারিবে না। ৪। অত্যধিক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ফলে সমাজে কর্মদক্ষতা লোপ পাইয়া কর্মবিমুখতা দেখা দিবে।

সত্য সিদ্ধান্ত—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ উল্লিখিত কোন একটিমাত্র নীতি অবলম্বনে পরিচালিত হয় না। দেশের প্রয়োজনানুসারেই প্রত্যেক দেশে রাষ্ট্রকর্তব্য নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়সাধন করিতে পারিলে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একটা সুনির্ধারিত মতবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

বর্তমান রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি—বর্তমান যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতীতে রাষ্ট্রকে মানুষ শুধু একটি ক্ষমতার আধার বলিয়া মনে করিত। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। বর্তমান রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য হইল জনকল্যাণসাধন। শুধু শাসকশ্রেণী বা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে এখন আর রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয় না। গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই আজ শক্তির ধারক অতীতের পুলিশ-রাষ্ট্র কল্যাণরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং জনকল্যাণের জন্য যাহা অপরিহার্য তাহা রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্তমান কালের রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপে কোন সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নয়। মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিবার জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন তাহার সব-কিছুই রাষ্ট্র করিতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের শ্রেণীবিভাগ—রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দুইটি কার্য সম্পাদনের উপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে বলিয়া এই কার্যগুলিকে প্রাথমিক বা অবশ্যকর্তব্য বলা হয়। ইহা ছাড়াও বর্তমান রাষ্ট্রগুলি আরও অনেক কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ২। ইচ্ছামূলক কার্য অর্থাৎ যে কার্যগুলি না করিলেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হয় না, যথা, কৃষিশিল্পের উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি।

নূতন মতবাদ—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও কয়েকটি নূতন মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে, যথা, ধনতন্ত্রবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ ও গান্ধীবাদ।

ষোড়শ অধ্যায়

শাসনতন্ত্র

(Constitution of the State)

শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of a Constitution)

প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা শাসক-শাসিতের আইনগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র-উৎপত্তির আরম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অতীত যুগে এই সম্পর্ক শুধু শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হইত। সম্পর্কনির্ণয়ে শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান ছিল না। বর্তমানে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্তমান যুগে মানুষ আর কোন উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট মানুষ দ্বারা শাসিত হইতে চায় না। এখন প্রবর্তিত হইয়াছে আইনের শাসন। এই শাসনব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছা শুধু যে কার্যকরী হইয়াছে তাহা নয়, শাসিতের ইচ্ছানুসারেই বর্তমান যুগে শাসনব্যবস্থা গঠিত হয়; পূর্বযুগের ক্ষমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসক-শাসিত সম্পর্ক বর্তমান যুগে শাসিতের ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশে এই শাসক-শাসিত সম্পর্ক যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে ও শাসকশ্রেণী স্বৈরাচারী হইতে না পারে, সেজন্য কতকগুলি মৌলিক বিধিনিষেধ দ্বারা শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মৌলিক বিধিনিষেধগুলিই বর্তমান যুগে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী রাখে।

সংজ্ঞা (Definition)

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটা নিজস্ব শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেরূপ কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কার্যকলাপও তদ্রূপ কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা সীমায়িত। এই বিধিনিষেধগুলির অবর্তমানে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পারে। শাসনতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি

কতকগুলি প্রয়োজনীয় আইন-কানুন এবং কতকগুলি বিধিনিষেধ ও প্রথা, যেগুলি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্র শাসনকার্য পরিচালিত করে। রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করে সরকার। শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারিত করিয়া শাসনব্যবস্থা চালু রাখে—সরকারের কি কি ক্ষমতা থাকিবে ও কি-ভাবে সেই ক্ষমতাসমূহ শাসনকার্যে প্রয়োগ করা হইবে, কি নিয়ম অনুসারে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে ও সর্বোপরি শাসক ও শাসিতের কি কি অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে। সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অ-লিখিত আইনের সমষ্টি, যেগুলির দ্বারা একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ অপরদিকে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কোন দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই দেশের রাষ্ট্রগঠনকালীন মূল শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাসনতন্ত্রের সংশোধন—এই উভয়ের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বলা হয়।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions)

পূর্বতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শাসনতন্ত্রের দুইটি ভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল **অ-লিখিত** (Unwritten), অপরটি হইল **লিখিত** (Written)। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। আইনসভা বা কোন প্রতিনিধিমূলক সংসদ্ দ্বারা রচিত আইন এই শাসনতন্ত্রে খুব কমই দেখা যায়। এই শাসনতন্ত্র কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি-সংসদ্ দ্বারা রচিত হয় না। ইহা ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই শাসনতন্ত্র কতকগুলি প্রথা এবং বিধিব্যবস্থা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের সমষ্টিমাত্র। যে প্রথা ও বিধি-ব্যবস্থাগুলি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, অ-লিখিত হইলেও সেগুলি লিখিত আইনের মতই কার্যকর হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকে। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ্ দ্বারা রচিত

হয়। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক এই শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থাকে লিখিত শাসনতন্ত্র একটিমাত্র বৃহৎ আইনের দ্বারা গঠিত হইতে পারে, যেমন আমাদের ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র, অথবা ইহা বিভিন্ন সময়ে রচিত আইনের সমষ্টিও হইতে পারে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, ভারত, সোভিয়েত প্রভৃতি দেশে এই লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয় (Distinction between a Written Constitution and an Un-written one—not well-marked)

শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞানসম্মতও নয়। প্রথমতঃ বলা যায় যে, কোন অ-লিখিত শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ অ লিখিত হইতে পারে না। অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে অনেক লিখিত অংশ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত নয়। ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের সনদ (Bill of Rights) প্রভৃতি কতকগুলি লিখিত অংশ এই অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, লিখিত শাসনতন্ত্রেও অ-লিখিত অংশ থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-নীতির পরিবর্তন প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক নিয়মগুলি অ-লিখিত প্রথার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশের ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সকল শাসনতন্ত্রই লিখিত ও অ-লিখিত বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ বেশী, অ-লিখিত অংশ কম। আবার কোন শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ বেশী, লিখিত অংশ কম সুতরাং ইহাকে মূলগত পার্থক্য বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে পরোক্ষভাবে এই ভুল ধারণা জন্মিতে পারে যে, যে-দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসনব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানকার উচ্চ আদালত আইনসভা-রচিত আইন শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ-কথা সত্য নয়। ফরাসী দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্তু সে-দেশের উচ্চ আদালত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, অ লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত করা যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের লিখিত প্রকৃতির উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে না। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অ-লিখিত, তাহা সত্ত্বেও বৃটিশ জাতি স্বাধীন, আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর লিখিত শাসনতন্ত্র হিট্‌লারের শাসনসময়ে জার্মান জাতির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই।

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে না বা হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। শাসনতন্ত্র যদি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। জাতীয় জীবন-ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনদর্শন ও আদর্শ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়া জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়। সুতরাং জাতীয় জীবনের প্রয়োজনেই শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিপুষ্ট ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Un-written Constitution)

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করা যায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া উহা জাতীয় অগ্রগতির পথ সুগম করে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া ইহার সংস্কার সকল সময়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হইতে পারে।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার কোন

স্থায়িত্ব থাকে না। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনেও সাধারণের দাবীতে ইহা পরিবর্তিত হইতে পারে। ফলে, শাসনতন্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার বিধিনিষেধগুলি সুস্পষ্ট হইতে পারে না। স্পষ্টতার অভাবের দরুণ শাসকগণ তাঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন ও সেজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক সময় ব্যাহত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অ-লিখিত শাসনতন্ত্র একেবারেই অনুপযোগী।

লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Written Constitution)

লিখিত শাসনতন্ত্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে লিখিত থাকে বলিয়া ইহাতে কোন বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই সুস্পষ্টতার জন্য শাসকবর্গ ও জনসাধারণ তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিয়া এই লিখিত শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী।

লিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক সময় জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির পথে ইহা বাধা সৃষ্টি করিয়া দেশে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে।

নমনীয় ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and Right Constitution)

শাসনতন্ত্রের লিখিত ও অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অলীক ও অবাস্তব বলিয়া লর্ড ব্রাইস্ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি সহজ কি জটিল এই

পার্থক্যের ভিত্তির উপর এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। যদি শাসনতন্ত্র সহজেই পরিবর্তন করা চলে অর্থাৎ দেশের আইনসভা সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্র-বিষয়ক আইনও ভোটাধিক্যে যদি পরিবর্তন করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের আইনসভা উভয়বিধ আইন পরিবর্তনের অধিকারী হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন পরিবর্তন-পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিও পরিবর্তন করিয়া থাকে। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না ও রাজা-সহ পার্লামেণ্ট সভা উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন ও পরিবর্তনের পূর্ণ-অধিকারী।

অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। এই শাসতন্ত্রের যদি একটি সামান্যতম পরিবর্তনও করিতে হয় তাহা হইলে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আইনসভা সাধারণ আইন-পরিবর্তন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। মার্কিন দেশে শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত জটিল পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। কংগ্রেস-সভার দুই পরিষদের মোট সদস্যদের ২/৩ অংশকে এই পরিবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, বিকল্পে পঞ্চাশটি রাজ্যের ২/৩ রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে। এইরূপে সমর্থিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ৩/৪ রাজ্যের আইনসভা কিংবা আহূত সভায় উপস্থিত ৩/৪ সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। এই পদ্ধতি সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা বহু গুণে জটিল। সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সংখ্যা অতি অল্প। যে-দেশে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি সাধারণ আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Flexible Constitution)

নমনীয় শাসনতন্ত্রের অনেকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা নাই বলিয়া জাতীয় প্রগতির সঙ্গে ইহার সমন্বয় সম্ভব করা যায়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া বিনা রক্তপাতে শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করা যায়। সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া জনমতের দাবী পূরণ করা যায় ও তাহাতে জনমত শান্ত থাকে। লোকে ইচ্ছা করিয়া শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে না।

স্থায়িত্বের অভাব হইল এই শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি। সদা-পরিবর্তনশীল জনমতের প্রভাবে এই শাসনতন্ত্রও পরিবর্তিত হইতে পারে। নিয়ত পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র জনমতের আস্থাভাজন হইতে সক্ষম হয় না। নাগরিক অধিকার ও স্বার্থ এইরূপ পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠে।

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ও অপগুণ (Merits and Demerits of Rigid Constitution)

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন শুধু জনমতের প্রভাবে হয় না। এই শাসনতন্ত্রের আইনগুলি লিখিত বলিয়া ইহা স্পষ্ট এবং ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা কম। দ্রুত ও সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া জনগণের অধিকার ও স্বার্থ ইহা দ্বারা অধিকতরভাবে সুরক্ষিত হয় ও সেজন্য শাসনতন্ত্রে জনগণের আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র অতীব উপযোগী।

কিন্তু ইহার ত্রুটি হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া জাতীয় অগ্রগতির পথে উহা অনেক সময় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের সামঞ্জস্যবিধান না করা যায়, তাহা হইলে সে শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্রের আধুনিক প্রবণতা (Modern Tendencies in Constitutions)

শাসনতন্ত্রকে যেরূপ লিখিত ও অ-লিখিত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা

যুক্তিসংগত নয়, তদ্রূপ নমনীয় ও অ-নমনীয়রূপে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা কতদূর যুক্তিসংগত তাহা বিচারসাপেক্ষ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে। শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। মানুষের চিন্তাধারা, প্রয়োজন ও আদর্শ ক্রমশঃ নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনও জাতীয় জীবনে অনস্বীকার্য। যেখানে এই পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শাসনতন্ত্রের মর্যাদাহানি হইবার সম্ভাবনা বর্তমান থাকে। তাই প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রে,—কি লিখিত বা অ-লিখিত, কি নমনীয় বা অ-নমনীয়,—পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকা অতীব প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। যে শ্রেণীরই শাসনতন্ত্র হউক না কেন, সকল শাসনতন্ত্রই অল্পবিস্তর তিনটি উপাদানের সমাবেশে গঠিত হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, প্রত্যেক শাসনতন্ত্রে অল্পবিস্তর পরিমাণে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইন স্থান পায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত প্রথা ও বিধিবিধান দ্বারা শাসনতন্ত্রের অনেকাংশ পরিপুষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, বিচারালয়গুলির সিদ্ধান্ত শাসনতন্ত্রের পরিবর্ধনে ও পরিবর্তনে অনেক সহায়তা করে। বৃটেন ও মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রে পার্থক্য থাকিলেও এই উভয় শাসনতন্ত্রই শেষোক্ত উপাদানটির দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাসনতন্ত্রের উপর উপরি-উক্ত তিনটি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর নাও হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হইলেও প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। অপরপক্ষে, বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত আইনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়।

সাধারণতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পার্থক্য মূলগত পার্থক্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অতি সহজেই সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক পরিবর্তিত

হইতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক্ একটি জটিল পদ্ধতি ব্যতীত পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অন্য পন্থা আছে ও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এ-কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, জাতীয় রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় রচিত ও ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে গৃহীত আদি শাসনতন্ত্র হইতে বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইল, এই অসংখ্য পরিবর্তন শাসনতন্ত্রের অ-নমনীয়তা সত্ত্বেও কিভাবে সম্ভব হইল? নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মাত্র ২৫টি সংশোধন হইয়াছে। অবশিষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব হইয়াছে প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে। প্রথাগত বিধির দ্বারাই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস-সভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা ধীরে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা কল্পনা করিতে পারিতেন না। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গঠনপ্রকৃতি ও তাৎপর্য উভয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি বা পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যেখানে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজ নয় সেখানে অন্য উপায়ে—প্রথা বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য করা হয়। শাসনতন্ত্র কোনক্রমে স্থাণুর মত থাকিতে পারে না। সুতরাং সকল শাসনতন্ত্রই পরিবর্তনশীল। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বৃটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কম নমনীয় নহে।

বর্তমান যুগে নানাকারণে শাসনতন্ত্রগুলি অ-নমনীয়তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এমন কি সর্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় বৃটিশ শাসনতন্ত্রও ক্রমশঃই অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকল্পে জনসাধারণ বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে ও

সেইজন্য অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ সহসা ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ নমনীয় শাসনতন্ত্রের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রাদেশিক সরকারগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত রাখে।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Constitutional Amendment)

শাসনতন্ত্র লিখিত হউক আর অ-লিখিত হউক, নমনীয় হউক আর অ নমনীয় হউক, জাতীয় অগ্রগতির জন্য ইহার পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু এই পরিবর্তনের পদ্ধতি সকল দেশে একপ্রকারের নয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনে কোনরূপ জটিলতা নাই। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত আইনসভাই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে—যেরূপভাবে ইংলণ্ডে পরিবর্তিত হয়।

কিন্তু অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্য সমগ্র ভোটদাতার সম্মতির প্রয়োজন হয়। সুইস্ দেশে ও অস্ট্রেলিয়ায় এই নিয়ম অনুসারে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব $\frac{3}{4}$ রাজ্য দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। অস্ট্রেলিয়া ও সুইস্ দেশেও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য ছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, অনেক দেশে সাধারণ আইনসভা একটা নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার উভয়কক্ষের $\frac{2}{3}$ অংশ সভ্যের সম্মতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধন একটা খসড়া

বিলের আকারে আইনসভায় পেশ করাইয়া সমগ্র সদস্যসংখ্যা ও উপস্থিত সদস্যসংখ্যার নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদন করাইতে হইবে। তারপর ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে ইহা কার্যকরী হইবে।

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু (Contents of Constitution)

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু কি এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্র কি শুধু সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া বিবেচিত হইবে, না শুধু ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত হইবে—ইহাই বিচার্য বিষয়। শাসনতন্ত্রের প্রধান কার্য হইল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ সুগম করিয়া দেওয়া। এইজন্য শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত বিধিনিষেধগুলি স্থান পায়।

প্রথমতঃ, শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া তাহাদের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয়। শাসনতন্ত্র একদিকে যেমন সরকার কি কি কার্য করিবে তাহা স্থির করিয়া দেয়, অপরদিকে সেইরূপ সরকার কি কি কার্য করিতে পারিবে না তাহাও নির্ধারিত করিয়া সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার উৎস। সমাজজীবনে নাগরিকগণ অন্য ব্যক্তির ও সরকারের সম্পর্কে কি পরিমাণ অধিকার ভোগ করিতে পারে শাসনতন্ত্র তাহা স্থির করিয়া পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে। শাসনতন্ত্র অন্যের ও সরকারের সম্পর্কে নাগরিক কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়া দেয়।

তৃতীয়তঃ, সরকারের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেইজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক শাসনতন্ত্র স্থির করে। বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা পরস্পর-বিরোধী না হইয়া কিভাবে পরিচালিত হইলে শাসনকার্য উন্নততর হইতে পারে, শাসনতন্ত্র সে নির্দেশ দেয়।

চতুর্থতঃ, সরকারী কার্যে লোক নিয়োগ করিবার জন্য কতকগুলি মৌলিক আইন শাসনতন্ত্রে সন্নিবদ্ধ করা হয়। এই আইনানুসারে গঠিত একটি সাধারণ নিয়োগ-সংসদ্ (Public Service Commission)-গঠনের ব্যবস্থা থাকে। এই নিয়োগ-সংসদ্ যোগ্যতানুসারে পরীক্ষা করিয়া বা অন্য পন্থায় সরকারী কর্মী নিয়োগ করিয়া থাকে।

পরিশেষে প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি স্থিরীকৃত থাকে, যে পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। কোন্ কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন বা কি পদ্ধতিতে সংশোধন করা যাইবে—সকল বিষয় স্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্র—স্থায়িভাবে আইনের ভিত্তির উপর শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হইল শাসনতন্ত্রের কার্য। শাসনতন্ত্র ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না।

সরকারের কার্য কিভাবে পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক হইবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে—শাসনতন্ত্র এইগুলি স্থির করে। সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া শাসনতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ—শাসনতন্ত্রকে সাধারণতঃ লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে ভাগ করা হয়। যে শাসনতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশদভাবে লিখিত থাকে এবং পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি প্রতিনিধি-সংসদ্ দ্বারা ইহা রচিত হয় তাহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। আর যে শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির দ্বারা গড়িয়া উঠে তাহাকে অ-লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। ইহা কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ্ দ্বারা গঠিত হয় না।

শাসনতন্ত্রের এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে না। লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে (যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেও অনেকক্ষেত্রে অ-লিখিত প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে), আবার অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকিতে পারে (যেমন, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের সনদ প্রভৃতি লিখিত অংশ স্থান পাইয়াছে)।

লিখিত শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ইহা অপরিহার্য।

কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইল যে, সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া লিখিত শাসনতন্ত্র অনেক সময় জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ করে।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কিন্তু ইহা অস্থায়ী ও অস্পষ্ট।

শাসনতন্ত্রকে অন্য দিক দিয়া নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়, যেমন বৃটিশ শাসনতন্ত্র। রাজা সহ পার্লামেণ্ট সভা একই পদ্ধতিতে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা জটিলতর ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহাকে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয় না—বিনা রক্তপাতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। জনমতের চাপে সদাসর্বদা ইহার রদবদল হইতে পারে।

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া উহা জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায় হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রের স্বরূপ—সকল দেশের শাসনতন্ত্রই প্রধানতঃ তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত হয়: নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত আইন, বিভিন্ন প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত। যে সমস্ত দেশের শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা দুরূহ, সেখানে প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে; উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যাইতে পারে। আবার বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধুনা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথার আবির্ভাবের ফলে ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সকল দেশের শাসনতন্ত্রই অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে।

শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি—নমনীয় শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনে কোন জটিলতা নাই। সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু অ নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতিতে প্রভেদ দেখা যায়। সাধারণ আইনসভা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, বা প্রতিনিধি-সংসদ্ আহ্বান করিয়া, কিংবা নির্বাচক-মণ্ডলীর সমর্থন দ্বারা, কিংবা যুগপৎ আইনসভার সমর্থন ও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্যের সমর্থন দ্বারা, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়।

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু—শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। সুতরাং ইহাতে থাকে—(ক) শাসকের ক্ষমতা ও ক্ষমতার সীমা, (খ) শাসিতের অধিকার, (গ) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, (ঘ) শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার নির্ধারিত পদ্ধতি।

সপ্তদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল ও জনমত

(Political Party and Public Opinion)

রাজনৈতিক দল (Political Party)

বর্তমান সভ্য রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আধুনিক গণতন্ত্রগুলিকে প্রতিনিধি-পরিচালিত গণতন্ত্র বলা যাইতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সকলে একমতাবলম্বী হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক একই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোক লইয়া এক-একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত যতই যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তাহা এককভাবে কার্যকর হইতে পারে না। সেজন্য এক নীতিতে আস্থাবান্ অধিকসংখ্যক লোক যদি একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে সেই সংঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। দল-গঠন ব্যাপারে মানব চরিত্রের দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রত্যেক মানুষের একটি স্বকীয় মত থাকে এবং সেইজন্য মানুষে মানুষে মতভেদ হয়। কিন্তু এই মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ সামাজিক জীব এবং সংঘবদ্ধভাবে সভ্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মতানৈক্য দূর করিয়া যথাসম্ভব ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পায়। দ্বিতীয়তঃ, একই নীতিতে বিশ্বাসী জনসমূহ সুসংবদ্ধ ভাবে তাহাদের নির্ধারিত নীতিকে রূপায়িত করিতে প্রয়াস পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল—একতাই বল। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে। জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন হইল রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দল গঠিত হইলে সে দল আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কুচক্রী দলে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া কার্য পরিচালনা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু দলীয় শাসন

ঈশ্বরানুমোদিত—এই কথা প্রচার করিয়া কোন রাজনৈতিক দলই বর্তমান যুগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। দলীয় শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকা চাই।

রাজনৈতিক দল গঠন করিতে নিম্নলিখিত চারটি উপাদান একান্ত অপরিহার্য :—

১। দলগঠনের প্রাথমিক উপাদান হইল যে, যে-সমস্ত লোক লইয়া রাজনৈতিক দল গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে বিস্তারিত কার্যক্রমে মতভেদ থাকিলেও দলীয় মূলনীতিতে সকলেরই আস্থা ও সমর্থন থাকা চাই। এই মূলগত ঐক্যের অভাবে রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে না।

২। রাজনৈতিক দলের প্রধান বল হইল একতা। সুতরাং দলের সদস্যবর্গকে সুসংবদ্ধ হইয়া তাহাদের নির্ধারিত নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। দলীয় সংগঠন যদি সুসংবদ্ধ না হইয়া শিথিল হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক দল একটি অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত জনতায় পর্যবসিত হয়।

৩। রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে উহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে চায়। যে দল বলপ্রয়োগে বা অন্য কোন অসৎ উপায়ে ক্ষমতা অধিকার করিবার প্রয়াস পায়, তাহা কখনই রাজনৈতিক দল পদবাচ্য হইতে পারে না। একমাত্র জনসাধারণের ভোট দ্বারা সমর্থনের উপরই রাজনৈতিক দলের অধিকার নির্ভর করে।

৪। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করা। একমাত্র এই উদ্দেশ্যের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলিকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক্ করা যায়। যখন কোন দল এই মহান্ আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়া ইহার দলীয় স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট হয়, তখন তাহাকে কুচক্রী দল (Faction বা Coteri) বলা হয়।

রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions of Political Parties)

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের মত

কার্যকর করিতে কৃতসংকল্প হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। জাতীয় সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হইল সেই নীতিকে নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অনুকূল করিয়া গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক এই প্রচারকার্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দলীয় নীতিতে আস্থাবান্ হয়, দলের সমর্থকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়। আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সাধারণ নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য। নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোটসংগ্রহের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে জোর প্রচারকার্য চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের নেতৃগণ মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করিয়া শাসনকার্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপে নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষমতালাভের পর সেগুলিকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যে দলগুলি আইনসভায় অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক আসন দখল করে, তাহারা বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধী দল আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত রাখে। মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিলে বিরোধী দল জনমত জাগ্রত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে ইহাদের মতের পার্থক্য অনুসারে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়—উগ্র বামপন্থী (Extreme Left), বামপন্থী

(Left), দক্ষিণপন্থী (Right) ও উগ্র দক্ষিণপন্থী (Extreme Right)। উগ্র বামপন্থী দল সব-কিছুরই আমূল পরিবর্তনসাধন করিয়া নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে চান। বামপন্থীরা প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার প্রগতিমূলক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। দক্ষিণপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান অবস্থাকে বজায় রাখা তাঁহারা সমীচীন মনে করেন। উগ্র দক্ষিণপন্থী দল অতিরিক্তমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁহারা অধুনালুপ্ত পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা অতীব প্রয়োজন। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কার্যকারিতা বহুলাংশে ইহাদের নীতি ও কার্যসূচীর উপর নির্ভর করে। যে দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম সময়োপযোগী করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে না, সে দলের পক্ষে স্থায়িত্ব-লাভ করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়। দলের নীতি ও কার্যক্রম যদি জাতীয় অগ্রগতির সমান পর্যায়ে না চলিতে পারে, তাহা হইলে দলীয় শাসনব্যবস্থা অসাড় ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। এইজন্য কি রক্ষণশীল, কি উদার-নৈতিক—সব দলেরই নীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশেই রাজনৈতিক দল শাসনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত বা সমর্থিত হয় না। সকল দেশেই রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত এলাকায় সীমাবদ্ধ (Extra-legal growth)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে যেখানে শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সমস্ত দেশেও রাজনৈতিক দলগুলির শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত কোন অস্তিত্ব নাই—অথচ সরকার-গঠনে এবং সরকারী কার্য-পরিচালনায় দলীয় সংগঠন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দলীয় সংগঠন শাসনতন্ত্রের কঠোরতা প্রশমিত করিয়া শাসনতন্ত্রকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করিতে সহায়তা করিয়াছে। দলীয় সংগঠনের অবর্তমানে মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট শাসনব্যবস্থা চরম ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যবিধানের জন্য পঙ্গু হইয়া পড়িত।

আধুনিক কালে কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক দল শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও বর্তমান বাংলা দেশের সংশোধিত শাসনতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দলকে (সরকারী দল) স্বীকৃতি দান করিয়া দলীয় প্রাধান্য বর্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও স্বাধীনভাবে কার্য করিবার সহজাত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে মানুষের মতানৈক্যের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। সাময়িক উত্তেজনা বা লঘু কারণে মানুষের মধ্যে যে মতভেদ হয় তজ্জন্য স্থায়ী কোন দল গঠিত হইতে পারে না। উত্তেজনা প্রশমিত হইলে মতভেদও দূর হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ভোগ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের ধারণার মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি প্রধানতঃ এই অর্থনৈতিক সমস্যা-সম্পর্কিত মূলগত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক সময় আবার ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল বিরল, কিন্তু ভারত প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবে এখনও পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল দেখিতে পাওয়া যায়।

দলীয় শাসনের গুণ (Merits of Party Government)

বর্তমান যুগে দেশের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণতঃ জনসাধারণের কোন সুস্পষ্ট অভিমত থাকে না বা থাকিলেও সেই অভিমত কার্যকর করিতে পারে না। রাজনৈতিক দল এই অসংবদ্ধ জনমতকে সুসংবদ্ধভাবে গঠন করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলে। এই উদ্দেশ্যে দলগুলি নানা প্রকারে প্রচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জনসাধারণকে ঐ সমস্ত বিষয়ে সচেতন করিবার প্রয়াস পায়। প্রচারকার্যের মধ্য দিয়া দেশবাসী ঐ সমস্ত জাতীয় সমস্যা ও তাহাদের সমাধান প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ জন্মে ও তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের মধ্য দিয়া জনশিক্ষা বিস্তারলাভ করে।

সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া

শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব সফল করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু আইনসভার সদস্যগণ যদি তাহাদের দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে সহায়তা না করিয়া তাঁহাদের খুশিমত ভোট দেন, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। দলের সদস্যগণের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাবে শাসনকর্তৃপক্ষ স্থায়িভাবে কোন শাসননীতি প্রবর্তন করিতে পারে না। দলের সমর্থন ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিয়া দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সফল করিতে পারে না।

দলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন না হইলে শাসনকার্যের কোনরূপ উৎকর্ষ-সাধন হওয়া সম্ভবপর হইত না। ক্ষমতার অধিকারী দল নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া যাইত। একমাত্র বলপ্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতার অধিকারী দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হইত না। বর্তমান যুগে দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সুযোগ পায় এবং এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে তাহারা জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করিতে সাহসী হয় না। আইনসভার বিরুদ্ধ দলগুলির সদাজাগ্রত দৃষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত রাখে। এইরূপে দলীয় শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারের প্রতিবন্ধকতা করে ও দলীয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে।

দলীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, যে-সমস্ত দেশে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান-নীতি শাসন-পরিচালনাক্ষেত্রে কার্যকরী করা হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়াই সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই যোগসূত্রের অভাবে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু দলীয় শাসনব্যবস্থার ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে যোগসূত্র ও সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া শাসনব্যবস্থা অব্যাহত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একই রাজনৈতিক

দলভুক্ত বলিয়া ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সত্ত্বেও তাঁহারা একযোগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

দলীয় শাসনের দোষ (Demerits)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য বিবেচিত হইলেও দলীয় শাসনব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন বলা যায় না। দলীয় শাসনব্যবস্থা আদর্শচ্যুত হইলেও শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে অনেক গলদ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দলাদলির সূত্রপাত করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক সময় ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত হয়। দলীয় সংহতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কোনরূপ মতানৈক্য বরদাস্ত করা হয় না। দলীয় নেতার মাধ্যমে যে-দলীয় নীতি নির্ধারিত হয়, বিবেকবুদ্ধি বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সদস্যকে সেই নীতি মানিয়া চলিতে হয়। ফলে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কোন কোন দেশে দলীয় বিধিনিষেধগুলি এত কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় যে দলের সমর্থকগণ দলের ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়। সুতরাং দলীয় শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

দলীয় অনুশাসনের প্রতি এই অন্ধ ও অখণ্ড আনুগত্যের ফলে দলের সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়। জাতীয় সমস্যাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা না করিয়া দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ভোটসংগ্রহ ব্যাপারে তৎপর হয়। আর এই ভোটসংগ্রহ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে তাহাতে দেশের নৈতিক আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃগণ তাঁহাদের সামাজিক পদমর্যাদা ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চালনা করিয়া সমাজে এরূপ দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাপ্রচার, কলহ-দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের মত আবির্ভূত হয়।

নির্বাচনদ্বন্দ্বে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় ও মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাকুরী, সরকারী সাহায্য ও সম্মান যোগ্যতা বিচার না করিয়া দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করিয়া দলের সংহতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগ্য ব্যক্তি অপর দলভুক্ত বলিয়া সরকারী কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভ করিতে পারে না, সে দল বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয় ও সর্বদা সরকারী কার্যের ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিদ্রান্বেষণ করে ও সর্বপ্রকারে সরকারী কার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপ আত্মকলহের ফলে জাতীয় প্রগতিমূলক কার্যসমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দলীয় শাসনের আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, দলের নেতৃত্ব যখন জনকয়েক স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয়, তখন এই কুচক্রী দল নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের নিমিত্ত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

উপসংহার (Conclusion)

দলব্যবস্থার উপরি-উক্ত দোষগুলি থাকার জন্য অনেকে দলীয় শাসনের অবসান ঘটাইতে ইচ্ছা করেন। দলব্যবস্থার নিষ্পেষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অসাড় ও মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে দলব্যবস্থা বিলুপ্ত হইলে ব্যক্তিগত ইচ্ছা আত্ম-প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তা করিবে। কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দলব্যবস্থার অবর্তমানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অভিমত এককভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমষ্টিগতভাবে দলব্যবস্থার মধ্য দিয়া কার্যকর হয়। অপরপক্ষে দলব্যবস্থার অবর্তমানে কোন শাসনব্যবস্থারই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। শাসক-গোষ্ঠীকে পরিবর্তন করিতে হইলে একমাত্র বল-প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত অভিমত কার্যকর করিবার নিমিত্ত ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য দলব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। সত্য বটে যে, দলীয় শাসনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিন্তু

সেজন্য দলব্যবস্থার অবসান না ঘটাইয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি যাহাতে দূর কর যায় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

নাগরিকগণকে লইয়াই রাজনৈতিক দলগুলি গঠিত হয়। নাগরিকগণ যদি প্রকৃত শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দলব্যবস্থায় কোনরূপ সংকীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে না। দলের নেতার প্রতি দলের সমর্থকগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু দলের নেতা যদি বিপথগামী হন ও জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে উচ্চতর স্থান দেন, তাহা হইলে এরূপ নেতাকে প্রতিরোধ করা প্রত্যেক লোকেরই নৈতিক কর্তব্য। দলব্যবস্থায় সাফল্য অনেক পরিমাণে নেতৃত্ব-নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। দলপতি নির্বাচন করিলে জনগণের কর্তব্য শেষ হয় না। দলপতির কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির উপরে জনগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। নতুবা দলপতি স্বৈরাচারী হইয়া পড়িতে পারেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি কম। তাহারা তাহাদের নেতার দ্বারা পরিচালিত হয়। নেতা যাহাতে স্বীয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত জনগণকে বিপথে পরিচালিত করিতে না পারেন সেজন্য শিক্ষিত, সচেতন ও সক্রিয় জনমত চাই। জনমত যদি হিতাহিতবোধসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে দলব্যবস্থার সমস্ত দুর্বলতা দূর হইয়া গণতন্ত্রকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিতে পারে।

চাপ সৃষ্টিকারী ও স্বার্থপ্রণোদিত সংস্থা (Pressure and Interest Groups)

রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলেও জাতীয় স্বার্থ-উন্নয়নের জন্য ইহারা একটি সাধারণ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু আধুনিককালে রাজনৈতিক দল কর্তৃক সাধারণ স্বার্থে সাধারণ নীতি পরিচালনায় কিছু বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। এই বাধার ফলে দলগুলি কর্তৃক জন প্রতিনিধিত্ব কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে।

বর্তমানে সমাজব্যবস্থায় বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ সংঘ গঠিত হইয়াছে। এই সংঘগুলি ইহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারে

ক্ষমতাসীন দলের উপর চাপ দিয়া ইহাদের স্বার্থের অনুকূল আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত দলগুলি জনসাধারণ বা ভোটদাতাগণের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করে না বা নির্বাচনকালে কোন প্রার্থী মনোনয়ন করে না। ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সরকারী দলের উপর চাপ দিয়া ইহাদের বিশেষ স্বার্থ সুরক্ষিত করা। শ্রমিক সংঘ, ব্যবসায়ী সংঘ প্রভৃতি হইল এইরূপ বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত চাপ সৃষ্টিকারী সংঘ। এই বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত সংঘগুলির চাপে অনেক সময় সরকারী দল ইহার সাধারণ নীতি নির্ধারিত কার্যক্রম অন্ততঃ আংশিকভাবে বাতিল করিয়া এই বিশেষ সংঘগুলির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিতে বাধ্য হয়। ফলে সরকারী দল ভোটদাতাগণের অপ্রিয় হইয়া পড়েন।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল সাধারণ স্বার্থের উন্নয়ন এবং শাসিতের নিকট শাসকের দায়িত্ব। কিন্তু এই চাপ সৃষ্টিকারী সংস্থাগুলির অভ্যুত্থানে উপরি-উক্ত গণতান্ত্রিক দুইটি নীতিই ব্যাহত হইয়াছে। চাপ সৃষ্টিকারী দলগুলি সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষমতা পরিচালনা করে, কিন্তু ভোটদাতাগণের নিকট ইহাদের কোন দায়িত্ব নাই। অপর পক্ষে এই সংস্থাগুলি ইহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু গণতন্ত্রের মূল নীতি হইল সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণ। সুতরাং এই বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত সংস্থাগুলি বর্তমানে গণতন্ত্রের এক বিশেষ বাধাস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয়।

দুই দল বনাম বহু দল (Two-Party System vs. Multiple-Party System)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বহু দল অপেক্ষা দুইটি দল দেশের স্বার্থের পক্ষে অধিকতর অনুকূল। ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে দুইটি প্রধান দলের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দুইটি প্রধান দল দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে।

দুই দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Two-Party System)

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে যে-দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ইহাতে রাষ্ট্রীয় সরকার স্থায়িত্বলাভ করিয়া নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ইহাদের কার্যক্রম রূপায়িত করিতে সক্ষম হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্থায়িত্বলাভ করিলেও ইহারা জনমত-বিরোধী কার্য করিতে সাহস পায় না। কারণ, বিরোধী দলের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ইহাদের কার্যকলাপের উপর নিবদ্ধ থাকে। শাসনকার্যে কোনপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা জনমতকে ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতে পারে। ফলে পরবর্তী নির্বাচনকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার ফলে শাসনকার্যও উৎকর্ষ লাভ করে। তৃতীয়তঃ, দুইটি দল বর্তমান থাকিলে ভোটদাতাগণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও অধিকতর সহজ ও সরল হয়। ভোটদাতাগণের মাত্র দুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। সুতরাং তাহারা সহজেই প্রার্থী স্থির করিতে পারে।

দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিবার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে জনমতের বিভিন্ন দিক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশে যদি উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপন্থী কোন লোকের পক্ষে উল্লিখিত দুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবুদ্ধিসম্মতভাবে যোগদান করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সমস্যাগুলিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তৃতীয়তঃ, দুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের শাসকগোষ্ঠীও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ্ স্থায়িত্বলাভ করে। ক্ষমতাচ্যুত হইবার আশংকা কম থাকিলে মন্ত্রিসংসদ্ তাহাদের খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সর্ববিষয়ে একাধিপত্য-স্থাপনে প্রয়াস পায়। ফলে, মন্ত্রিসংসদ্ সর্বেসর্বা হইয়া উঠে ও আইনসভার প্রাধান্য খর্ব হয়। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় এই প্রকারে মন্ত্রিসংসদ্ আইন-প্রণয়নে,রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে, শাসন-পরিচালনার সর্ববিষয়েই

একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আইনসভার সার্বভৌমত্বের হানি করিয়াছে। চতুর্থতঃ, দুই-দল ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। ভোটদাতা নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের অনুশাসন অনুসারে ভোট দিতে বাধ্য হয়। পঞ্চমতঃ, দুইটি মাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই নির্বাচনের ফলে প্রকৃত জনমতকে কতদূর প্রতিফলিত করিতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিতে পারে।

বহু-দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Multiple-Party System)

দুই-দল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্য অনেকে বহু দলের অস্তিত্ব সমর্থন করেন। বহু-দল থাকিলে জনমত এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে পারে ও আইনসভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণ তাহাদের স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করে। এই ব্যবস্থা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দল আলাপ-আলোচনার দ্বারা সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ফলে, আইন-প্রণয়ন-কার্য ও শাসনকার্য বহু-দলের সমর্থনলাভ করিয়া ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থতঃ, বহু-দল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলও শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। মন্ত্রিসংসদ্ একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বহু-দলের সম্মিলিত সমর্থনপুষ্ট বলিয়া স্বৈরাচারী হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এক-দল দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসংসদ্ অপেক্ষা বহু-দল-সমর্থিত মন্ত্রিসংসদ্ দেশের জনমতকে অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত করিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বহু-দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী ও স্থায়ী মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করা সম্ভব নয়। দুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে মন্ত্রিসংসদ্ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে সামান্য মতানৈক্য হইলেই ঐ মন্ত্রিসংসদ্ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আইনসভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে

মন্ত্রিসংসদ্‌কে দলগুলির সম্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মন্ত্রি-গণের মধ্যে মতদ্বৈত ঘটিলে এক বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া মন্ত্রিসংসদের পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ্‌ যে শুধু অস্থায়ী হয় তাহা নয়, উহার দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। মন্ত্রিসংসদের কোন সদস্যই অন্যনিরপেক্ষ হইয়া একক ও স্বাধীনভাবে তাঁহার নিজের বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। সর্বদাই আলাপ-আলোচনা দ্বারা অন্য দলের সদস্যদের সম্মতির উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। ফলে, কোন নীতি কার্যকরী করিতে গেলে বহু সময় অতিবাহিত হয়। তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইহাতে দেশের সুশাসন ও হিতকর কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, অল্প সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রিসংসদ্‌ পুনর্গঠিত হয় বলিয়া মন্ত্রিসংসদের সদস্য-নির্বাচনে অনেক সময় দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। ফরাসী দেশে এই ব্যবস্থার ফলে সে দেশের মন্ত্রিসভা বহুল পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কি আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতি বা কার্যক্রম সেখানে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, বহু-দল থাকার জন্য জনসাধারণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও একটা সমস্যারূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন দল তাহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়া ভোটদাতার কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত কারণে দুই-দল ব্যবস্থার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ লেখক বহু-দল অপেক্ষা দুই-দল ব্যবস্থাকে শাসনকার্যের অধিকতর অনুকূল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। দুই-দল ব্যবস্থার জন্যই গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্ব ও দক্ষতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এক-দলীয় শাসন ও গণতন্ত্র (One-Party Government and Democracy)

বিগত প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কালে ইয়ুরোপের কয়েকটি দেশে এক-দলীয় সরকারের সূত্রপাত হয়। রুশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী দল বলপ্রয়োগ দ্বারা অন্য দলগুলিকে উৎসাদিত করিয়া দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

রুশ দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও সাম্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। রুশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালীতে যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী দল ও ফ্যাসিবাদী দল সাম্যবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করে। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময় যে জাতীয় সরকার গঠিত হয়, তাহাকে কার্যতঃ এক-দলীয় সরকার বলা যাইতে পারে। জাতীয় বিপদের সময় ইংলণ্ডের বিভিন্ন দল তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়া জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়। সুতরাং রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশের এক-দলীয় সরকার ও ইংলণ্ডের জাতীয় সরকারকে এক পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন নয়।

'এক-দলীয় সরকার' ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলে জাতীয় শক্তি ও সংহতির অপচয় ঘটে। জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি সাধারণতঃ কম। জনসাধারণকে প্রচারকার্যের দ্বারা বিভ্রান্ত করিয়া বিভিন্ন দলের সমর্থন লাভ করা হয়। ইহাতে জাতীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। কাজেই শুধুমাত্র যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে জাতীয় সরকার গঠন না করিয়া সর্ব কালের জন্য এক-দলীয় সরকার গঠন করিলে জাতীয় শক্তির কোনরূপ অপচয় ঘটে না। জাতির সমগ্র সদস্যই যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক দলীয়, দ্বি-দলীয় বা বহু দলীয় সকল শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় ঐক্য অধিকতররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এক-দলীয় সরকারের সপক্ষে যতই যুক্তির অবতারণা করা হউক না কেন, এক-দলীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হইবে ততদিন এই সরকার স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। জার্মানি ও ইতালিতে এক-দলীয় সরকারের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু রুশ দেশে এক-দলীয় সরকার

আজও সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ রুশ দেশের এক-দলীয় সরকার বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নানাবিষয়ে দেশের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের আস্থাভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছে। রুশ দেশের এক-দলীয় সরকারের ভবিষ্যৎ ইহার জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট গঠনমূলক কার্যের উপর নির্ভর করে।

এক-দলীয় শাসন ও গণতান্ত্রিক শাসন পরস্পর-বিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসন জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছা ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। জনগণ বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের অভিমত প্রকাশ সাহায্যে শাসক শ্রেণী নির্বাচন করে। গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা ও মতবিরোধ নিষ্পত্তির পথ উন্মুক্ত থাকে। ভোটদাতাগণ নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলবৎ করিতে পারে। কিন্তু এক-দলীয় শাসনব্যবস্থায় ভোটদাতার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র নাই বলিলেও চলে। যে ব্যবস্থায় ক্ষমতা একটি মাত্র দলের হস্তে কেন্দ্রীভূত, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। একটি মাত্র দলের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধ-নিষ্পত্তির কোন ক্ষেত্র নাই। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী দলের স্তাবক হইতে হয় অথবা তাহার নিজস্ব মতামত বিসর্জন দিয়া আধ্যাত্মিক মৃত্যুবরণ করিতে হয়।

[নবম অধ্যায়—একনায়কতন্ত্র দ্রষ্টব্য]

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায় (Means of Removing the Defects)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বী নাগরিক-সমষ্টি লইয়া গঠিত হয়। দলপ্রথার যে অসুবিধাগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে নাগরিক জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্যই দেখা দেয়। দলপ্রথার কুফলগুলি দুই প্রকারে দূরীভূত করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসনব্যবস্থাকে এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ শাসনব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে না পারে। এই নিমিত্ত শাসনব্যাপারে জনসাধারণের অভিমতকে গুরুত্ব প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

দেশের শাসনতন্ত্রে যদি গণভোট, গণপ্রস্তাব ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় একনায়কত্বের পরিবর্তে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসন-ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে, শাসনব্যবস্থা হইতে সেই পরিমাণে দলীয় একনায়কত্বের ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্য, সম্মান ও সরকারী চাকুরী বিতরণ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের সমর্থকগণকে বশীভূত রাখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই ত্রুটি দূরীকরণের জন্য শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে একমাত্র যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সংসদের দ্বারা সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে। তৃতীয়তঃ, শাসকবর্গ যাহাতে নিজেদের খুশিমত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হয় সেজন্য দেশের সংবিধান যথাসম্ভব অ-নমনীয় রাখিতে হইবে। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি যদি সাধারণ আইনগুলির মত সহজে পরিবর্তনশীল হয়, তাহা হইলে শাসকগোষ্ঠী তাহাদের সুবিধা অনুসারে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করিয়া দলীয় একনায়কত্ব স্থায়ী করিতে পারে। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ-বিচারালয় বর্তমানে শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিচারপতিগণ যাহাতে দল নিরপেক্ষ হইয়া বিচারকার্যের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে দলনিরপেক্ষভাবে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রে তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কোনরূপ প্রলোভন বা ভয়ের দ্বারা তাহারা যাহাতে কর্তব্যচ্যুত না হয় সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ষষ্ঠতঃ সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেজন্যও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সংশিক্ষা পাইয়া প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা সাম্প্রদায়িক বা দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সব সময়ে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনই দলীয় প্রচারকার্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া সমষ্টিগত স্বার্থের হানি করিতে পারে না। দলগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন—এই কথাটি সম্বন্ধে যদি দলের সমর্থকগণ অবহিত থাকেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রীয় জীবনকে নানাদিক দিয়া সমৃদ্ধ করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার দ্বারা জাতীয় জীবনের এই ত্রুটিগুলি দূর করা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়।

দলবিহীন শাসন (Non-Party Government)

দল-প্রথার কুফল দেখিয়া অনেক লেখক দল-প্রথার বিলোপসাধন করিয়া দলশূন্য স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দলীয় শাসনের কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব কি? মানুষ হিতাহিতবোধসম্পন্ন চিন্তাশীল জীব। যতদিন মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি থাকিবে, ততদিন মানুষে মানুষে মতভেদ থাকিবে ও এই বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল গঠিত হইবে। সুতরাং মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক জীবনেও রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান মানুষের এই স্বাধীন চিন্তাশক্তির এক অভিব্যক্তি মাত্র। বলপূর্বক এই স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে বিনাশ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান যদি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে দলীয় শাসনের বিকল্প হিসাবে অনেকে বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় (Coalition) শাসনব্যবস্থা সংগঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু বহু-দলের সহযোগিতায় যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ফরাসী দেশের শাসনব্যবস্থা এই কারণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় শাসনের বিকল্প হিসাবে এক-দলীয় শাসনের (One-Party Government) সপক্ষে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক-দলীয় শাসন অনেক বিষয়ে শ্রেয় হইলেও এই ব্যবস্থা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্তরায় ইহা

অনস্বীকার্য। তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসনের অবসান ঘটাইয়া প্রাচীন কালের ব্যক্তিগত শাসন (Monarchy) প্রবর্তন করিতে পারা যায়। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিগত শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দলীয় শাসনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা বর্তমান গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যথাসম্ভব মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা কর্তব্য। দেশে যদি শিক্ষিত ও সচেতন জনমত গঠিত হয়, তাহা হইলে দলীয় শাসনের কুফল রাজনৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করিতে পারে না।

জনমত (Public Opinion)

গণতন্ত্র ও জনমত (Democracy and Public Opinion)

গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত সৃষ্টি করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের অবসান হইয়া স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কত্বের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য জনগণকে সর্বদা সজাগ থাকিয়া শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। শাসকশ্রেণী যদি বুঝিতে পারে যে, জনসাধারণ তাহাদের অন্যায় কার্যকলাপ কখনই বরদাস্ত করিবে না, তাহা হইলে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। সুতরাং দেশের জনসাধারণ যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া সরকারী কার্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে—সরকারী কার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে তাহা প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে সরকার কখনও বে-আইনী কার্য করিতে সাহসী হয় না। যেখানে জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকারে শাসকবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সেখানে জনগণের অধিকার কখনও ক্ষুণ্ন হইতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একমাত্র পরিমাপক হইল শাসনব্যবস্থার উপর জনমতের প্রভাব। শাসনব্যবস্থা যদি

জনমত অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা সচেতন ও সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে।

জনমতের প্রকৃতি (Nature of Public Opinion)

জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তি একমত হইবে। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। জনমত বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝায় না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতই যে সকল সময় নির্ভুল হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং জনমত বলিতে সর্ববাদিসম্মত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় না। এ অবস্থায় কোন্ মতকে জনমত বলা যায় তাহা স্থির করা এক সমস্যা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মত পোষণ করে, সাধারণতঃ তাহাই জনমতরূপে পরিগণিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এই জনমত সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা এই মতের প্রতি যেন বিদ্রোহভাবাপন্ন না হয়। সংখ্যালঘু দল যদি বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন হইয়া সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করে, তাহা হইলে তাহাকে সুসংবদ্ধ জনমত বলা চলে না। তবে এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত কোন মত পোষণ করে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত বলিয়াই তাহাকে প্রকৃত জনমত বলা সমীচীন নয়।

জনসাধারণের প্রায়ই নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। বুদ্ধিমান্ ও কর্মঠ ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ ও তাহাদের সমাধানের উপায়গুলি স্থির করেন এবং এইগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে মতের সৃষ্টি করিতে সহায়তা করেন। জনসাধারণ তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই সকল চিন্তানায়কের মতে আস্থাবান্ হয়। এইরূপে জনসংখ্যার বিশাল এক অংশ যখন কোন নির্দিষ্ট মতের সমর্থক হয়, তখন তাহাকে জনমত বলা হয়। সুতরাং যে মত জনগণের বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর

কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই প্রকৃত জনমত বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন মতকে জনমত আখ্যা দেওয়া চলে না।

জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপায় (Agencies for the Formation and Expression of Public Opinion)

জনমত সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই সুপ্ত জনমতকে জাগ্রত করা আবশ্যক। জনমত একদিনে বা সহসা জাগ্রত হয় না—জনমতের সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ সময়সাপেক্ষ। বিভিন্ন উপায়ে এই জনমতকে রাজনৈতিকচেতনা-সম্পন্ন করিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিতে হয়। জনমত গঠনে নিম্নলিখিত উপায়গুলি বর্তমানযুগে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে।

১। সংবাদপত্র—The Press

জনমত গঠনে ও জনমত প্রকাশে সংবাদপত্র আজ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জনমত গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হইল কোন বিষয় সম্পর্কে জনগণকে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা যাহাতে এই তথ্যের ভিত্তিতে জনগণ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহাদের মত গঠন করিতে পারে। সংবাদপত্রগুলি এই তথ্য সরবরাহ করে। আইনসভার তর্ক-বিতর্ক, সরকারী আদেশ-নির্দেশ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্গণের মতামত, সভা-সমিতিগুলিতে প্রদত্ত বক্তৃতা, রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্রগুলি শুধু নিছক তথ্য সরবরাহ করে না—ইহারা এরূপ প্রণালীতে তথ্যগুলিকে বিন্যাস ও পরিবেশন করে যাহাতে সংবাদপত্র পাঠকবর্গ তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে মত গঠন করিতে পারে। প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কোন সংবাদপত্র সরকারী নীতির সমর্থক, কোনটি বা বিরোধী, আবার কোনটি বা মধ্যপন্থী। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র একই ঘটনার বিষয়বস্তু এরূপ বিভিন্নভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করে যাহাতে উক্ত সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ উক্ত সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদের ভিত্তিতে তাহাদের মতামত গঠন করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে, এক এক শ্রেণীর পাঠকবর্গের নিকট কোন একটি সংবাদপত্র বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

সুতরাং সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদপরিবেশনার মধ্য দিয়া সংবাদপত্রগুলি জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে। এতদ্ব্যতীত সংবাদপত্রে চিঠিপত্র প্রকাশ করিবার সুযোগ দান করিয়া সংবাদপত্রগুলি জনমত প্রকাশ ও সংগ্রহ করে। সংবাদপত্রগুলি একদিকে যেরূপ জনমত গঠনে ও প্রকাশে সাহায্য করে অপরদিকে তদ্রূপ জনমত বিকৃত ও সংকীর্ণ করিতে পারে। বিকৃত তথ্য বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ইহারা জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, সরকার-বিরোধী মনোভাব প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারে। বর্তমান যুগে শিক্ষা বিস্তারের ফলে সংবাদপত্র পাঠার্থীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অধিকাংশ পাঠক সংবাদ পরিবেশনার ভিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করে। সুতরাং সংবাদপত্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাম্য হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণও সমভাবে কাম্য। যেহেতু সংবাদপত্রগুলি অজ্ঞ জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারে সাহায্য করে, সেইহেতু সংবাদপত্রগুলি যাহাতে স্বল্প মূল্যে দরিদ্র জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হয়, দেশের সরকারের সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

২। সভা-সমিতি—Platform

জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল সভা-সমিতির মাধ্যমে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মত যতই যুক্তিযুক্ত হউক না কেন তাহা কার্যকর হয় না। সেইজন্য সমবেতভাবে বহুজন সমষ্টি মিলিত হইয়া শোভা-যাত্রা, সভা বা সমিতির মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকাশ করে এবং এই সঙ্ঘবদ্ধ মত শক্তিশালী জনমতে পরিণত হয়। কোন মতের বিশিষ্ট সমর্থকগণ এইরূপ সভা-সমিতি মাধ্যমে তাঁহাদের মতের সারবত্তা বক্তৃতার সাহায্যে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া জনমত গঠন করিতে সাহায্য করেন। এরূপ সভা-সমিতি শুধু জনমত গঠন করে না—এইগুলি জনমত প্রকাশও করে। সভা-সমিতিগুলি জনস্বার্থের দাবীতে ও জনস্বার্থ-বিরুদ্ধ নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সেই প্রস্তাব কার্যকর করিবার উপায় হিসাবে আন্দোলন পরিচালনা করে। ইহাতে সুপ্ত জনমত জাগ্রত ও সক্রিয় হইয়া আত্মপ্রকাশ করে।

৩। চলচ্চিত্র—The Cinema

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে সবাক্ চলচ্চিত্র জনমত গঠন ও প্রভাবিত করিবার একটি অভিনব উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়। সংবাদপত্র শুধু লিখন-পঠনপটু শিক্ষিত জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে চাক্ষুষ প্রমাণসহ তথ্য সরবরাহ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল চলচ্চিত্র। লোকে যুগপৎ চোখে দেখিয়া ও কানে শুনিয়া চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে এবং এই চলচ্চিত্রলব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করিতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, চলচ্চিত্র সাধারণতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় দেশের সরকার তাহার অনুসৃত নীতির সমর্থনে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। ব্যবসায়িগণও তাঁহাদের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু চলচ্চিত্র জনমত গঠনের একটি বিশিষ্ট উপায়।

৮। বেতার ও দূরদর্শন—The Radio and the Television

চলচ্চিত্রের ন্যায় বেতারও একটি জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে চলচ্চিত্রের ন্যায় এই উপায়ও জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। বেতার কিছু তথ্য সরবরাহ করে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনাও করে। কিন্তু ভারত প্রভৃতি অধিকাংশ দেশে বেতার প্রতিষ্ঠান সরকারের একচেটিয়া আয়ত্তে থাকিবার ফলে সরকার অনুসৃত রাজনীতিই বেতার ভাষণে স্থান পায়। সুতরাং বেতারে প্রচারিত সংবাদ ও ভাষ্যগুলি নিরপেক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং বেতার শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠনের একটি বিশিষ্ট উপায় হইলেও ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। দূরদর্শন যন্ত্র বর্তমানে জনমত গঠনে ও জনমত প্রভাবিত করিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। দূর-দূরান্তরের ঘটনা ও বক্তৃতা লোকে আজ ঘরে বসিয়া চাক্ষুষ দেখিতেছে ও শুনিতেছে। মার্কিন দেশে এই দূরদর্শনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সাপ্তাহিক বাণী জনগণের মধ্যে প্রচার করেন।

৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—Educational Institutions

জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে। এ সম্পর্কে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব আছে। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে মানুষ যে শিক্ষালাভ করে, পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিক্রমণীয় হয়। দেশের যাঁহারা নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টা তাঁহারা প্রায় সকলেই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন এই কারণে একনায়কতন্ত্র পরিচালিত দেশগুলিতে শিক্ষায়তনগুলির ছাত্রদের এই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা পরবর্তী জীবনে উক্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

৬। রাজনৈতিক দল—Political Parties

জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই হইল রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড। কিন্তু জনসাধারণ হইল অসংবদ্ধ ও কোন রাজনৈতিক বিষয়ে স্বকীয় মত গঠনে সাধারণত অসমর্থ। রাজনৈতিক দলগুলি এই অসংবদ্ধ ও রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে কৌতুহল ও সচেতনতা সৃষ্টি করিয়া সুযোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হইল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা। কিন্তু জনসমর্থন ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। তাই দলগুলি শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি ও প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে উদাসীন ভোটদাতাকে উৎসাহশীল ভোটদাতায় পরিণত করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতা শিক্ষামূলক হইলেও দলগুলি যখন হীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে তখন সামাজিক আবহাওয়া দূষিত হয়।

আইনসভা (Legislatures)

আইনসভা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সরকার গঠনকারী দল ব্যতীতও সরকার সমর্থক ও সরকার-বিরোধী দলগুলি আইন-সভায় তাঁহাদের ভাষণ ও তর্ক-বিতর্কের দ্বারা জনমত জাগ্রত ও সক্রিয় করিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন দলের নেতাগণ আইনসভায় তাঁহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের তুলনামূলক বিচার করিতে পারে। এইরূপে আইনসভা জনমত গঠনে সাহায্য করে।

আইন ও জনমত (Law and Public Opinion)

বর্তমান যুগে নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা রাষ্ট্র-প্রণীত আইন দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও কৃষ্টিগত জীবন-ধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়তা করিবার অধিকার দাবী করে। বস্তুতঃ, মানবজীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহাকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত বলা যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রণীত আইন-কানুন ও বিধিনিষেধগুলি যদি সার্বজনীন ও সর্ববাদিসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইনগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। এইজন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রযোজন এবং গণতন্ত্রের মূল কথা হইল যে, শাসনব্যবস্থা জনমতের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এবং আইনসভার প্রধান কর্তব্য হইল জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা। যে আইন জনস্বার্থের প্রতিকূল সে আইন সর্বথা পরিত্যাজ্য। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জনগণের আস্থাহীন হইবেন ও পরবর্তী নির্বাচনকালে জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং শাসনবিভাগ বা আইন-সভার পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনমত-বিরোধী কার্য করা সম্ভব নয়। আইনসভা প্রণীত আইন যদি দেশের জনমতকে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইনের বিশেষ কোন মর্যাদা থাকে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাকে জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যে শাসনব্যবস্থা জনমত দ্বারা সমর্থিত নয়, তাহা কখনও সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও বশ্যতার অভাবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। জনগণ সভা-সমিতি, সংবাদপত্র, শোভাযাত্রা, প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতির দ্বারা

আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলি ব্যর্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অস্ত্র 'বিদ্রোহ' দ্বারা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সুতরাং আইন-প্রণয়নে জনমতের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের জনমত (Public Opinion in India)

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতে প্রকৃত জনমত বলিয়া কার্যতঃ কোন শক্তি ছিল না। জনমত-গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও পরাধীনতা। পরাধীনতার অবসান হইবার ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃ আত্ম সচেতন হইয়া তাহার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে শিখিতেছে। শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের ফলে তাহাদের জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের সংকীর্ণ স্বার্থদ্বারা প্ররোচিত না হইয়া জাতীয় স্বার্থদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে অচিরে ভারতে শক্তিশালী ও সক্রিয় জনমত গঠিত হইবে।

বর্তমানে প্রাদেশিকতা ভারতে জনমত গঠনের একটি প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিয়াছে। প্রাদেশিকতার মূল কারণ হইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণ এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া মনে করিবেন। জনমত যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, সেইজন্য দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্তসার

রাজনৈতিক দল—যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। দল-গঠন মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের মত এককভাবে কার্যকর হইতে পারে না, সেজন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষ তাহাদের সমবেত মতকে কার্যকর করিবার

প্রয়াস পায়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ-সাধন করা।

রাজনৈতিক দলের কার্য—জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার নীতি ও কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা দলের প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। জনসাধারণকে প্রচার-কার্যের দ্বারা দলীয় নীতিতে আস্থাবান্ করিয়া তাহাদের সমর্থন লাভ করা দলের আর একটি কার্য। সংখ্যাধিক্যের সমর্থন লাভ করিলে নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া রাজনৈতিক দল শাসনভার গ্রহণ করিতে পারে। শাসনভার হস্তগত হইলে দলীয় নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া রাজনৈতিক দল তাহার প্রতিশ্রুতি পূরণ করিতে পারে।

দলীয় শাসনের গুণ—১। অসংবদ্ধ জনমতকে প্রচারকার্যের দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া রাজনৈতিক দল জনশিক্ষা-প্রচারে সহায়তা করে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ লোকও উৎসাহিত হইয়া শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ্ স্থায়িত্ব লাভ করে ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম অনুসরণ করিতে পারে। ৩। দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে শাসনকার্যে উন্নতি হয়। বিরোধী দলের সমালোচনার জন্য ও পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হইবার আশঙ্কায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল স্বৈরাচারী হইতে পারে না বা জনমতকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে না। ৪। দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া সরকারী কার্য অব্যাহতভাবে পরিচালিত হইতে পারে।

দলীয় শাসনের দোষ—১। দলীয় শাসন মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে। ২। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ নষ্ট করিয়া দল-প্রথা ব্যক্তিত্ব উপেক্ষা করে। ৩। অনেক সময় দলের সমর্থকগণ দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন, ইহাতে জাতীয় স্বার্থ সঙ্কুচিত হয়। ৪। নির্বাচনকালে নানারূপ অবাঞ্ছিত ও নীতি-বিরোধী উপায়ে বিভিন্ন দল ভোট সংগ্রহ করে, ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়া নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। ৫। সংখ্যালঘু দল

শুধু বিরুদ্ধাচরণ করিবার উদ্দেশ্যে ভালমন্দ বিচার না করিয়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সকল কার্যক্রমে বাধা প্রদান করে।

দুই-দল বনাম বহু-দল—দুই-দলের গুণ: ১। দুই-দল থাকিলে ভোটদাতার প্রার্থিনির্বাচনের সমস্যা সহজ হয়। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভ করিয়া শাসনপরিষদ্ স্থায়িত্ব লাভ করে। ৩। বিরোধী দলের সমালোচনার দ্বারা জনমত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে এই ভয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বে-আইনী কার্য করিতে পারে না।

দুই-দলের দোষ: ১। এই ব্যবস্থায় দেশের জনমত বিশেষ করিয়া মধ্যপন্থী মত সম্যক্‌রূপে প্রকাশ হইতে পারে না। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা থাকে। ৩। মন্ত্রিসংসদ্ একটিমাত্র দলের নেতৃগণ দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া দেশের বিভিন্ন জনমত মন্ত্রিসংসদের কার্য দ্বারা প্রতিফলিত হয় না।

বহু-দলের গুণ: বহু-দল থাকিলে ১। দেশের জনমত অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইবার সুযোগ পায় ও জনসাধারণ এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারে। ২। মন্ত্রিসংসদ্ বহু-দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে জনমতের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক বলা যাইতে পারে। ৩। বহু-দলের সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদ্ অত্যাচারী হইতে পারে না।

বহু-দলের দোষ: ১। বহু-দলের সহযোগিতায় যে মন্ত্রিসংসদ্ গঠিত হয় তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। ২। অস্থায়ী বলিয়া মন্ত্রিসংসদ্ জাতীয় প্রগতিমূলক কোন দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না। ৩। বহু-দলের সম্মতি-সাপেক্ষ বলিয়া শাসনপরিষদ্ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। ৪। মন্ত্রিসংসদ্-গঠনে অনেক কূটনীতি প্রশ্রয় পায়।

এক দলীয় শাসন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রুশিয়া, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে এক-দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এক-দলীয় সরকার অন্য দলগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করে। এক-দলীয় শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল, যে-কোন প্রকারে

হউক না কেন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য তাহারা ধর্ম, ন্যায় ও নীতি পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এক-দলীয় সরকার দেশের স্বার্থে বিনা বাধায় দ্রুতগতিতে কার্য করিতে পারে। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা যে ক্ষুণ্ণ হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায়

১। শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের গণভোট, গণ-প্রস্তাব, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রভৃতি দ্বারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করা সম্ভব। ২। শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তির উপর সরকারী চাকুরী ও সরকারী সম্মান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইলে দলীয় শাসনের গলদ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে। ৩। লিখিত ও অ নমনীয় শাসনতন্ত্র এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে রাজনৈতিক দল তাহাদের খুশিমত কার্য করিতে পারে না। ৪। সরকারী কর্মচারী ও সংখ্যালঘু দলের ন্যায্য অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইলে দলীয় ত্রুটি দূর করা সহজসাধ্য হয়।

দলবিহীন শাসন

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অনেকে রাজনৈতিক দলগুলির বিলোপসাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। দলব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে এক-দলীয় সরকার বা দলগুলির সহযোগিতায় মন্ত্রিসংসদ্ গঠনের প্রস্তাবও করা হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে দলের অভ্যুত্থান স্বাভাবিক ও অনিবার্য। রাজনৈতিক দলের বিলোপসাধন না করিয়া দল-প্রথার দুর্বলতাগুলি দূর করিতে পারিলে দল-প্রথা অধিকতর কার্যকরী করা যায়।

জনমত—গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে শাসন-পরিচালনায় জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। জনমতের কার্যকর শক্তির অভাবে গণতন্ত্র বিকৃত হইয়া স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে।

জনমতের প্রকৃতি—জনমত বলিতে সকল ব্যক্তিই যে একমতাবলম্বী হইবে ইহা বুঝায় না বা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতও বুঝায় না। যে মত

জনগণের বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই জনমত বলা হয়। সংখ্যালঘু দল এই মত সমর্থন না করিলেও সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না।

জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপায়—দেশে প্রকৃত জনমত গঠনে সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, রাজনৈতিক দল, চলচ্চিত্র, বেতার দূরদর্শন বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও বেতার-সাহায্যে জনমত প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্য এইগুলিকে ঠিক পথে পরিচালিত করা জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

আইন ও জনমত—গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমতের সমর্থন। রাষ্ট্র-প্রণীত আইন যদি জনমত প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইন লোকে মান্য করিতে চায় না। জনমতের প্রতিকূলতা করিয়া কোন সরকারই স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণ নানা উপায়ে, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতি দ্বারা আইন-প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতে জনমত—অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্য ভারতে এতদিন পর্যন্ত কোনরূপ প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে নাই। স্বাধীনতা-লাভের পর জাতীয় জীবনে নানা দিক দিয়া যে পরিবর্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, শিক্ষাবিস্তার হইলে ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠিত হইতে পারিবে। জনমত গঠনে ভারতের সংবাদপত্রগুলির ও রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী

(The Electorate)

নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার (The Electorate and the right of voting)

আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র বুঝায়। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাই তাহারা একটি নির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা সকল দেশেই একটা বিশেষ মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার কাহাদের থাকা উচিত, নির্বাচনব্যবস্থা কি ধরনের হওয়া উচিত, ইহা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দেশে যে সমস্ত লোকের ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার থাকে, তাহাদের সমষ্টিগতভাবে ভোটদাতৃমণ্ডলী বা নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকার: ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Universal Franchise: Arguments for and against the System)

গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভোটদানক্ষমতা আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ভোটদানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে তদনুরূপ ব্যাপক। অপরপক্ষে যত বেশী সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে গণতন্ত্রের পরিসর সেই অনুপাতে সঙ্কীর্ণতর হইবে। একটি দেশে যখন

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ভোটদানের অধিকার থাকে, তখন তাহাকে ব্যাপক বা সার্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকর হইলেও একটি দেশের সমস্ত নাগরিকেরই এই অধিকার থাকে না। সমস্ত জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে।

ভোটদান-ক্ষমতাকে সাধারণতঃ একটা অধিকার বলা হয়। কিন্তু একদিকে ইহা যেমন একটি অধিকার বলিয়া গণ্য হয়, অন্যদিকে ইহা আবার একটি গুরুদায়িত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। ভোটদান করার অধিকার হউক আর কর্তব্যই হউক, প্রত্যেক ভোটদাতার এই অধিকার অর্জন করিবার ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যেক্ষেত্রে এই অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায়, সেখানে ভোটদান-ক্ষমতা অর্পণ করা সমীচীন নয়। এই কারণে প্রত্যেক সভ্যদেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত, বিদেশীয় প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার-নীতির সপক্ষে বলা হয় যে, এই ক্ষমতা ব্যক্তিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি হইল জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা। সমষ্টিগত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার একমাত্র পন্থা হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার-দান। ভোটদান করিবার মাধ্যমেই জনসাধারণ শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ইচ্ছাকে কার্যকর করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে কোন শাসনব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রসম্মত শাসন-ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী হইয়া যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে না পারে তজ্জন্য জনগণের ভোটাধিকার একান্ত আবশ্যক। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া জনগণ দায়িত্ববোধহীন ও অকর্মণ্য সরকারকে অপসারিত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে সকল নাগরিকই সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। একদল লোককে ভোটাধিকার দান

করিয়া অন্য সকলকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে, রাষ্ট্র তাহার সকল নাগরিকের নিকট হইতে সমান আনুগত্য লাভ করিতে পারে না। ফলে, রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ও এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য নাগরিকের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। সার্বজনীন স্বার্থের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এরূপ রাষ্ট্রকে কখনও কল্যাণরাষ্ট্র বলা যায় না।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে মিল, মেইন, লেকি প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভোটদান-অধিকার নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করিবার যোগ্যতা যাহাদের নাই, তাহাদের ভোটদান-অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত। মিল ভোটদান-ব্যাপারে ভোটদাতার শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা লিখিতে-পড়িতে জানে না ও গণিত শাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত অপরিচিত, তাহাদের ভোটদান-অধিকার দেওয়া সমীচীন নয়। সুতরাং মিলের মতে পূর্বে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান-অধিকার দেওয়া উচিত ("Universal teaching must precede universal enfranchisement")। শুধুমাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিলে ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত সামান্য পরিচয় হইলেই যে লোকের ভোটদানের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়—এ-কথা সত্য নয়। ভোটদান-ব্যাপারে সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও মিলের উক্তির সমর্থন করা যায় না। সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহা সব সময়ে সত্য নয়। অধিকন্তু বর্তমানকালে দেখা যায় যে, ভিন্নমুখী নানাবিধ মতবাদ-প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির নিজস্ব মতের যতটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, অজ্ঞ এবং সংবাদপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা পাঠে অক্ষম ব্যক্তির নিজস্ব মতের ততটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ বুদ্ধি, পরার্থপরতা বা সমষ্টিগত হিতজ্ঞান প্রভৃতি যে গুণগুলি ভোটদানক্ষমতা-প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ভোটদানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া

অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। সুতরাং পূর্বে শিক্ষা বিস্তার, পরে ভোটদান-ক্ষমতার সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করা যায় না। মিলের নিজ দেশ ইংলণ্ডেও মিল-বর্ণিত নীতি অনুসৃত হয় নাই। ইংলণ্ডে সংস্কার আইনগুলি পাস করিয়া যত সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোকই তখন লিখিতে পড়িতে পারিত। ভোটদান-ক্ষমতা সম্প্রসারণের ফলে জনগণের শিক্ষাবিস্তারের দাবী স্বীকৃত হইয়া শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল।

অনেকে বলেন যে, ভোটদাতার কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া চাই এবং কিছু কর-প্রদানের ক্ষমতা থাকা চাই। সম্পত্তিহীন ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ও মর্যাদা বুঝিতে পারে না, সেজন্য তাহারা সকল সময়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে নষ্ট হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু অধুনা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ভোটদান-অধিকারের একটি যোগ্যতা বলিয়া বিশেষ পরিগণিত হয় না। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত এবং এই প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার করা বর্তমান কল্যাণরাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Women Suffrage)

বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীজাতি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এমন কি, ইয়ুরোপের বহু প্রগতিশীল দেশেও বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিপক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইত সেগুলি শুধু শিশু-সুলভ নয়, সেগুলিকে পুরুষের স্বার্থপরতার পরিচায়কও বলা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা যে, স্ত্রীজাতি যদি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্যার মধ্যে মতভেদের ফলে গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তি নষ্ট হইতে পারে। স্ত্রীজাতি অত্যধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে তাহাদের স্ত্রীসুলভ গুণগুলি অন্তর্হিত হইবে এবং তাহার ফলে শিশুপালন ও পারিবারিক জীবনযাপনে স্ত্রীজাতির অবশ্যকরণীয় কার্য-গুলি ব্যাহত হইবে। ইহা ছাড়াও বলা হয় যে, স্ত্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম নয়। আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়,

সুতরাং তাহাদের পৃথক্ ভাবে ভোট দিবার অধিকার থাকিতে পারে না। যুদ্ধে যোগদান করিবার ক্ষমতাকে অনেকে ভোটদানের একটি অপরিহার্য যোগ্যতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে যুদ্ধে যোগদানের অক্ষমতা-হেতু স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার জন্মিতে পারে না। পরিশেষে বলা হয় যে, অনেক স্ত্রীলোক এই ভোটাধিকার চায় না, সুতরাং স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

কিন্তু সুখের বিষয় যে, প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কাল হইতে স্ত্রীলোকের ভোটদানের ন্যায্য অধিকার প্রায় সমস্ত সভ্যদেশ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের ভোটদান-অধিকার শুধু যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নয়, আজ স্ত্রীজাতি ভোটদান ব্যাপারে পুরুষের সমানাধিকার অর্জন করিয়াছে। ইংলণ্ডে পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যা অপেক্ষা নারী ভোটদাতার সংখ্যা কিছু বেশী। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও সেই পার্থক্যের অজুহাতে সমাজের একটা বিরাট ও বিশিষ্ট অংশকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। জন স্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির ভোটদান-ক্ষমতার একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাঁহার মতে মাতৃত্ব ও শিশুপালন স্ত্রীজাতির একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি যদি মধ্যে মধ্যে ভোটদান করেন, তাহাতে তাহাদের স্ত্রীসুলভ বৃত্তিগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা যদি পুরুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্যও অনুরূপ উপাদান অপরিহার্য—এ কথা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের সমাবেশে সমাজ গঠিত। সুতরাং সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। স্ত্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে পারে না বা যুদ্ধক্ষম নয়—এ-কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। সক্রিয়ভাবে সৈনিকের কার্য না করিলেও অন্য নানাপ্রকারের বিশেষ করিয়া ধাত্রীহিসাবে স্ত্রীজাতি যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে স্ত্রীজাতি যে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্রীজাতিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত

রাখিবার আর সঙ্গত কারণ নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করেন ও দশ বছর পরে নূতন আইনের বলে তাঁহারা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টাদশবর্ষীয়া সকল নারীরই পুরুষের সমান ভোটাধিকার আছে। ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর প্রচারক ফরাসী দেশে এখনও পর্যন্ত স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন (Direct and Indirect Election)

সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়—প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ নিজেরাই সরাসরিভাবে ভোটদান করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। আইনসভার নিম্ন-পরিষদের সদস্যগণ ও স্থানীয় সরকারগুলির আইনসভা ও বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যমণ্ডলী সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

গুণ (Merit)

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারা অধিকতর সচেতন থাকেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকেও ভোটদাতাগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে হয়। এইরূপে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে, শাসকের দায়িত্ব বোধ ও শাসিতের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

দোষ (Demerit)

কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, ভোটদাতাগণ যদি অশিক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা নির্বাচনপ্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিতে পারেন না। অনেক সময় ভোটদাতাগণ ভালমন্দ বুঝিতে না পারিয়া প্রচারের

দ্বারা বিভ্রান্ত হন ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থের হানি করেন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের এই ত্রুটির জন্য অনেকে **পরোক্ষ নির্বাচন** পছন্দ করেন। পরোক্ষ নির্বাচন দ্বারা যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাঁহারা দুইটি দেশের পর্যায় ভোটদানের ফলে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, দেশের প্রাথমিক ভোটদাতৃমণ্ডলী ভোট দিয়া একদল প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এইরূপ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সুতরাং এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধিগণ সোজাসুজি ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে দ্বি-কক্ষ আইনসভা আছে, সেখানে উচ্চ-পরিষদের সদস্যগণের একটি অংশ ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত নিম্ন-পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

পরোক্ষ নির্বাচনের গুণ (Merit)

পরোক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রাথমিক ভোটদাতাগণ ভোট দিয়া অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর যে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আসল প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন বলিয়া যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরোক্ষ নির্বাচনের আর একটি সুবিধা হইল যে, আসল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে অল্পসংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং নির্বাচনের উত্তেজনা বা নির্বাচন-সংক্রান্ত কলহ, অশান্তি ও দুর্নীতি কম হয়।

দোষ (Demerit)

পরোক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতি নয় বলিয়া অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সহিত প্রাথমিক ভোটদাতাগণের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। প্রতিনিধিগণ অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা নির্বাচিত হন বলিয়া অনেক সময় জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যায়। জনসাধারণও প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে

প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান দোষ হইল যে, আসল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপার অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে থাকে। সুতরাং নির্বাচনে নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। যুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও পরোক্ষ নির্বাচন বাহুল্যমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভোটদাতাগণ যদি যোগ্য মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে সরাসরি আসল প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে তাঁহাদের অক্ষম ভাবিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্র বনাম বহুসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্র (Single-Member Vs. Multiple-Member Constituency)

নির্বাচনকেন্দ্রগুলি এরূপভাবে সংগঠিত হইতে পারে যে, প্রতি নির্বাচন-জিলা হইতে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন অথবা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনপ্রথার বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্র দেশটিকে প্রতিনিধির সংখ্যানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিলায় ভাগ করিয়া প্রত্যেক জিলা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং প্রত্যেক ভোটদাতাকে একটিমাত্র ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। গ্রেট বৃটেন, ভারত প্রভৃতি দেশে এই প্রথা অনুসারে নিবাচনকায পরিচালিত হয়।

অপরপক্ষে, বহুসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনপ্রথার বৈশিষ্ট্য হইল যে, যত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন সমগ্র দেশটিকে তদপেক্ষা অনেক কম সংখ্যক নির্বাচন-জিলায় বিভক্ত করিয়া প্রতি জিলা হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং সেই জিলা হইতে যত সংখ্যক প্রার্থী নিবাচিত হইবেন প্রত্যেক ভোটদাতা তত সংখ্যক ভোটদান করিতে পারেন। এই প্রথায় নির্বাচন-জিলাগুলি আকারে বৃহত্তর হয়। ফরাসী দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Single-Member Constituency)

প্রথমতঃ, একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনপ্রথার প্রধান সুবিধা হইল যে, এই প্রথায় ভোটদানব্যবস্থায় কোন জটিলতার না থাকার জন্য সাধারণ ভোট-

দাতাও তাহার একটিমাত্র ভোট তাহার পছন্দ অনুসারে যে-কোন প্রার্থীকে দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় নির্বাচন-জিলাগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য নির্বাচনপ্রার্থী এবং ভোটদাতা পরস্পরের পরিচিত হইয়া থাকেন এবং পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য তাঁহারা সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া কা[র্য] সম্পাদন করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এই প্রথার আর একটি সুবিধা হইল যে, সংখ্যালঘু দলগুলি কোন-না-কোন জিলা হইতে তাঁহাদের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সমর্থ হন।

কিন্তু এই প্রথার প্রধান ত্রুটি হইল যে, নির্বাচন-জিলাগুলি ক্ষুদ্র হওয়া[র] কারণে ভোটদাতার পছন্দ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। নির্বাচন-জিলায় ভোটদাতার পছন্দমত যোগ্য প্রার্থী না থাকিলেও তাহাকে বাধ্য হইয়া নিম্নস্তরের প্রার্থীকে ভোট দিয়া নির্বাচন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ একসদস্য-সমন্বিত নির্বাচন-জিলায় বহু প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবা[র] ফলে ভোটগুলি ভাগ হইয়া যে প্রার্থী আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাইয়া থাকেন তিনিই নির্বাচিত হন। সমগ্র ভোটসংখ্যার অর্ধেক ভোট না পাইয়াও আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপে সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত প্রার্থীকে জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধি বলা সমীচীন নহে।

তৃতীয়তঃ, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে একটি রাজনৈতিক দল অল্পসংখ্যক ভোট পাইয়াও অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার অনুপাতে সেই দল অধিক সংখ্যক আসন দখল করিতে পারে। ভারতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেসদল প্রদত্ত সমুদয় ভোটসংখ্যার শতকরা চল্লিশটি ভোট পাইয়াও সমুদয় আসন সংখ্যার শতকরা প্রায় সত্তরটি আসন দখল করিতে সক্ষম হয়।

চতুর্থতঃ, এই প্রথার আর একটি মারাত্মক ত্রুটি হইল যে, ক্ষমতায় আসীন দল তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছামত নির্বাচন-জিলাগুলির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ক্ষুদ্র নির্বাচন-জিলা হইতে নির্বাচিত হওয়ার ফলে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতঃই সংকীর্ণ হয়

পড়ে। এইজন্য তিনি তাঁহার প্রধান কর্তব্য অর্থাৎ দেশের বৃহত্তর স্বার্থ-সম্পর্কিত ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়েন।

বহুসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Multi-Member Constituencies)

এই প্রথার পক্ষে বলা হয় যে, নির্বাচন-জিলাগুলি বৃহত্তর হওয়ার ফলে ভোটদাতাগণ বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্য হইতে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন করিবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থার দ্বারা দেশের প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকতর সুযোগ হয়।

এই প্রথার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি তুলনামূলক বিচার করিলে অসুবিধাগুলিই অধিকতর স্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ, নির্বাচন-জিলাগুলি বৃহত্তর হওয়ার ফলে সাধারণ ভোটদাতার পক্ষে প্রার্থিগণের যোগ্যতা বিচার করিয়া ভোটদান করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রার্থিগণের পক্ষে ভোটদাতার ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মতামত জ্ঞাত হওয়া একরূপ অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় যে-কোন রাজনৈতিক দল আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অধিক সংখ্যক আসন দখল করিয়া সংখ্যালঘু দলগুলিকে তাহাদের ন্যায্য আসনসংখ্যা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় আইনসভায় বহু দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়—ফলে একাধিক দল লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয় বলিয়া কোন মন্ত্রিসভাই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ইহাতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ব্যাহত হয়।

উভয় প্রথার সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক যে, কোন প্রথাই এককভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এ সম্পর্কে ডঃ গার্ণারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতিনিধি-নির্বাচনে নির্বাচন-জিলাগুলির সংগঠন উভয় প্রথার সংমিশ্রণে হওয়া উচিত। গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে এই মিশ্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতের নির্বাচন-জিলাগুলি প্রধানতঃ একসদস্য-সমন্বিত হইলেও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতিগুলির

জন্য আসন সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে একাধিক সদস্য-সমন্বিত নির্বাচন জিলা গঠিত হইয়াছে।

অবৈতনিক বনাম বেতনভুক্ প্রতিনিধিত্ব (Should Representatives be paid or not ?)

জন স্টুয়ার্ট মিল অবৈতনিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন যে, আইনসভার সদস্যগণ যদি বেতনভুক হন, তাহা হইলে অর্থের লোভে তাঁহারা আইনসভার সদস্য হইবার নিমিত্ত অধিকতর উৎসাহিত হইবেন। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বা অন্য জনহিতকর কার্যে তাঁহাদের তাদৃশ আগ্রহ থাকিবে না। এই সামান্য অর্থের লোভে অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আইনসভার সদস্য হইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। ফলে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ অর্থের লোভে আইনসভার সদস্য হওয়াকে সম্মানহানিকর বলিয়া বিবেচনা করিবেন। সদস্যগণ যদি বেতনভুক্ হন, তাহা হইলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও জনসাধারণের উপর করভারের চাপ বেশী পড়িবে।

বর্তমান যুগে উপরি-উক্ত মতবাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রায় সকল দেশের আইনসভার সদস্যগণই বেতন পাইয়া থাকেন। বেতনভুক্ প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যায়। আইনসভার কার্য বর্তমানে এত ব্যাপক ও জটিল হইয়াছে যে, সদস্যদের যথাযথভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে এই কার্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়। বাস্তব অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে তাঁহাদের সর্বদা স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হয়। সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া জনগণের সংস্পর্শে আসিতে হয়, নতুবা বাস্তবতার সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইতে পারে না। ইহা ছাড়া, বর্তমানে অধিক সংখ্যক সদস্য বিত্তহীন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বেতন না পাইলে তাঁহাদিগের পক্ষে আইনসভার সদস্যের কর্তব্য সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সরকারের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ বেতন পাইয়া থাকে। সুতরাং আইন-পরিষদের সদস্যগণ কিজন্য বেতন পাইবেন না, তাহার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অধুনা, গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশের আইনসভার সদস্যগণই বেতন পাইয়া থাকেন।

প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ (Nature of Representation)

নির্বাচিত প্রতিনিধির কর্তব্য সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন যে, প্রতিনিধি শুধু নিষ্ক্রিয় মুখপাত্র হিসাবে তাঁহার কার্য পরিচালনা করিবেন। তিনি যে কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইবেন, সেই কেন্দ্রের ভোটদাতাগণের নির্দেশ অনুসারে তাঁহার কার্য পরিচালনা করা অবশ্য-কর্তব্য। তাঁহার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিবার কোন অধিকার নাই।

উপরি-উক্ত মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয় এবং বর্তমান কালে প্রতিনিধির কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রতিনিধি বর্তমানে আর নিজ কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয় মুখপাত্র বলিযা বিবেচিত হন না, তিনি সমস্ত জাতির প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হন। এ-কথা সত্য যে, প্রতিনিধিমাত্রই একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্বাচনের সময় প্রতিনিধিকে তাঁহার নির্বাচনের উদ্দেশ্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদের সমর্থন লাভ করিতে হয়। নির্বাচনের পরেও প্রয়োজনমত প্রতিনিধিকে নির্বাচকমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জ্ঞাত হইতে হয়। কিন্তু ভোটদাতাগণ বর্তমানে প্রতিনিধির ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির রাজনৈতিক মতামতের জন্যই ভোটদাতাগণ তাঁহাকে নির্বাচিত করেন। ভোটদাতাগণ ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা মতবিশেষের সমর্থক বলিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। প্রতিনিধি হইলেন মত বা নীতি-বিশেষের প্রতিনিধি, কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের প্রতিনিধি নহেন। সুতরাং নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ভোটদাতাগণের নির্দেশ অনুসারে কার্যপরিচালনা করিলে প্রতিনিধি যে মতের সমর্থক তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। প্রতিনিধি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী এবং সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ বলিয়া ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থ অপেক্ষা জাতির বৃহত্তর স্বার্থসংরক্ষণ ও ইহার উৎকর্ষসাধন হইল তাঁহার প্রধান কর্তব্য। প্রতিনিধি জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতেই তাঁহার বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহার নির্বাচনকেন্দ্র তাঁহাকে বেতন প্রদান করে না। নির্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইলেও তিনি জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে

সমগ্র জাতির প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। যে কার্যকে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল বলিয়া প্রতিনিধির বিবেকবুদ্ধি নির্দেশ দিবে, নিজ নির্বাচনকেন্দ্রের স্বার্থবিরোধী হইলেও বৃহত্তর স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সেই কার্য করাই প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্য বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। সুতরাং প্রতিনিধিকে নির্বাচনকেন্দ্রের নিষ্ক্রিয় মুখপাত্র না বলিয়া জাতির প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা অধিকতর সমীচীন।

একাধিক ভোটদান (Plural Voting or Weighted Voting)

অনেকক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিক ভোটদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। একই ব্যক্তি যখন বিভিন্ন যোগ্যতার জন্য দুই বা ততোধিক ভোট প্রদান করিতে সক্ষম হন, তখন তাহাকে একাধিক ভোটদানব্যবস্থা বলা হয়। সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে যেখানে ভোটদানের যোগ্যতা স্থির হয়, সেখানে নির্বাচক বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রে সম্পত্তির মালিক হইলে পৃথক্ ভাবে ভোটদান করিতে পারে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে একই ব্যক্তি বিভিন্ন যোগ্যতার মাপকাঠিতে একাধিক ভোট প্রদান করিতে পারেন। নির্দিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্রের প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী মাত্রই ভোটদান করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে এবং তিন বৎসর কাল অন্ততঃপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে শিক্ষাকার্যে ব্রতী থাকা ব্যক্তি হিসাবেও তাঁহার ভোটদান-ক্ষমতা থাকে।

একাধিক ভোটদানপদ্ধতির আর একটি প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারভেদের বিশেষত্ব হইল যে, শিক্ষিত ব্যক্তির বা সম্পত্তির মালিকের ভোটদান ক্ষমতায় অন্য ব্যক্তি বা সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির ভোটদান অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের এবং সম্পত্তির মালিক ও সম্পত্তিহীন ব্যক্তিগণের মধ্যে পার্থক্য করিবার জন্যই প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতির সপক্ষে বলা হয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিনিধি-নির্বাচনের যোগ্যতা অশিক্ষিত ব্যক্তির যোগ্যতা অপেক্ষা অনেক বেশী, সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থসংরক্ষণের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা অতীব

প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত ব্যক্তি ও সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা অশিক্ষিত ও সম্পত্তিহীন ব্যক্তিদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং শিক্ষিত ব্যক্তি ও সম্পত্তির মালিকগণের একাধিক ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে, সম্পত্তিহীন ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থ সংকুচিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার দ্বারা নানাপ্রকারে জাতীয় উন্নতির সহায়তা করেন, অজ্ঞ লোক অপেক্ষা জাতীয় ব্যাপার পরিচালনায় তাঁহাদের অধিকতর অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দান করা যুক্তিযুক্ত।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে উহাদের সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি ও শিক্ষিত ব্যক্তির ভোটের গুরুত্ব স্থির করিবার উপযুক্ত এমন কোন মাপকাঠি নাই যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তির ভোট সব সময়েই অশিক্ষিত ব্যক্তির ভোট অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থের অধিক অনুকূল হইবে। সম্পত্তির মালিকানা-ভিত্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, সম্পত্তির মালিকানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকারসূত্র হইতে প্রাপ্ত, সম্পত্তির মালিকের নিজ যোগ্যতার দ্বারা অর্জিত নয়। গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল সমানাধিকার। একাধিক ভোটদান-পদ্ধতি সমানাধিকার নীতিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করে। সুতরাং এই পদ্ধতি গণতন্ত্রবিরোধী ও সেই কারণে বর্জনীয়।

প্রকাশ্য অথবা গোপন ভোট (Public or Secret Voting)

ভোটদান প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে, না গোপনে অনুষ্ঠিত হইবে এ সম্বন্ধে পূর্বে মতভেদ ছিল। প্রকাশ্য ভোটদান-পদ্ধতির সমর্থকগণের মতে ভোটদান করা নাগরিকগণের একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য এবং এই কর্তব্য নির্ভীকভাবে সর্বসমক্ষে পালন করা উচিত। ইহাতে ভোটদাতার স্বাধীন-ভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে। ভোটদাতা অপরের প্রশংসা বা নিন্দা উপেক্ষা করিয়া তাহার সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারে।

প্রকাশ্যে ভোটদান করা সৎসাহসের পরিচায়ক হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ভোটদাতার পক্ষে বা সমাজের পক্ষে হিতকর নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধারণ ভোটদাতা অপেক্ষা নির্বাচনপ্রার্থী উচ্চস্তরের

ব্যক্তি। নির্বাচনপ্রার্থী নানাপ্রকারে ভোটদাতাগণকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচনকার্য পরিচালিত হয়। সেইজন্য নির্বাচনপ্রার্থীর পশ্চাতে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সমর্থন থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্য ভোটদান-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইলে ভোটদাতার নানাভাবে বিব্রত ও উৎপীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে ভোটদান করা ভোটদাতার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। অনেক সময় বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া শুধু আত্মরক্ষার জন্যই ভোটদাতাকে ভোট দিতে বাধ্য হইতে হয়। সুতরাং ভোটদাতা যাহাতে নিজের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বাধীনভাবে তাহার প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে, সেজন্য গোপন ভোটদান-ব্যবস্থা অপরিহার্য। ব্যক্তি-বিশেষ বা দলবিশেষকে ভোট দিয়া ভোটদাতার যদি নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ভোটদান-ক্ষমতা বিড়ম্বনা মাত্র। রাষ্ট্র যদি ভোটদাতাকে উৎপীড়নের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রকাশ্য ভোটদান-ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব নয়। প্রকাশ্যে ভোট-ব্যবস্থার এই অসুবিধার জন্য বর্তমানে গোপন ভোট-ব্যবস্থা সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের নির্বাচনসমস্যা (Problem of Minority Representation)

রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি-নির্বাচন হইয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া গণ্য হয়। এই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসনকার্য, পরিচালনা করে। সংখ্যালঘু দল তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না, ফলে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ প্রতিপদেই ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিবে—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেইজন্য আইনসভায় তাহাদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া, যে দল আজ সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহারা ভবিষ্যতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে

পারিবে না তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সুতরাং আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের দাবী উপেক্ষণীয় নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মতের প্রতিনিধিমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা গণতন্ত্রের একটা প্রধান উপাদান। সংখ্যালঘু দল যদি আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে না। নির্বাচনে এমনও হইতে পারে যে, সংখ্যালঘু দল শতকরা ৪৯টি ভোট পাইয়া একটি আসনও দখল করিতে পারিল না, আর শতকরা ৫১টি ভোট পাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সকল আসনগুলিই দখল করিল। এইরূপ নির্বাচনব্যবস্থার ফলে শতকরা ৪৯টি ভোটের অধিকারী দল একটিও আসন না পাইলে এ-জাতীয় নির্বাচনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট হইবে, তাহা নয়। প্রত্যেক সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহার সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে সেই জন্য অনুরূপভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর পুনর্গঠন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নির্বাচকমণ্ডলীর দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি দল বিশেষের পক্ষে ভোট দেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয় তাহা হইলে সংখ্যাগুরু দল আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করিতে পারিবে এবং সংখ্যালঘু দল এক-তৃতীয়াংশ আসন দখলের অধিকারী হইবে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরু দলই সর্বত্র শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলের যে কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকিবে না, এরূপ ব্যবস্থা কখনই গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক সংখ্যালঘু দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহাদের সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে, সেজন্য নানারূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। নিম্নে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হইল।

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী

(Methods of Minority Representation)

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন—Proportional Representation by Single Transferable Vote (Hare Scheme)

এই নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশটিকে নির্বাচন উদ্দেশ্যে কতকগুলি বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করিয়া এক একটি অঞ্চল হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইলেই নির্বাচিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটকে Electoral quota বলা হয়। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে যত সংখ্যক বৈধ ভোট গণনা করা হয়, সেই সংখ্যাকে সেই কেন্দ্রের আসন-সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হয়, তাহাই হইবে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা quota. এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতাকে নির্বাচনপ্রার্থিগণের নামের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং ভোটদাতা একটির অধিক ভোট প্রদান করিতে পারেন না। এই তালিকায় ভোটদাতা যে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য মনে করেন তাহার নামের পাশে '১' লিখিয়া দেন। ভোটদাতা তাঁহার পছন্দমত অন্য প্রার্থিগণের নামের পাশে যোগ্যতা অনুসারে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫ লিখিয়া দিতে পারেন। এই সংখ্যাগুলি হইল ভোটদাতার পছন্দের পরিমাপক।

ভোট-গণনার সময় যে সমস্ত প্রার্থী ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ অনুসারে পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা quota-র সমান ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যদি কোন নির্বাচন-প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই নির্বাচিত প্রার্থীর অতিরিক্ত ভোট তাহার পরবর্তী দ্বিতীয় পছন্দ-প্রাপ্ত প্রার্থীদের হস্তান্তরিত করা হয়। অতঃপর তাঁহাদের ভোট গণনা করা হয়। দ্বিতীয় পছন্দ-প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইবেন, তাঁহাদিগকেও নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহাদের অতিরিক্ত

ভোটগুলি তৃতীয় পছন্দ-প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। এইরূপে সকল আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গণনাকার্য চলিতে থাকে।

এই পদ্ধতি যাহাতে ত্রুটিবিহীন হয় সেইজন্য অনেক সময় quota ('কোটা') স্থির করিবার জন্য আসনসংখ্যার সহিত এক (১) যোগ করিয়া সেই সংখ্যা দ্বারা নির্বাচন-কেন্দ্রের সমগ্র বৈধ ভোটসংখ্যাকে ভাগ করা হয় এবং ভাগফলের সহিত এক (১) যোগ করা হয়। প্রণালীটি নিম্নে দেওয়া হইল :

$$\frac{\text{বৈধ ভোটসংখ্যা}}{\text{আসনসংখ্যা} + ১} + ১ = \text{নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা quota}$$

এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, সংখ্যানুপাতে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু দল আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতিতে কোন প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট না পাইলে ভোটদাতাদের ভোটটি কার্যকর হয় না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ভোটদাতার একটি ভোট অন্ততঃ কার্যকর হইবেই। ভোটদাতার প্রথম পছন্দ কার্যকর না হইলে দ্বিতীয় পছন্দ, না হইলে তৃতীয়—এইরূপে তাহার একটি পছন্দে একজন প্রার্থী নিশ্চয়ই নির্বাচিত হইবে। এই পদ্ধতির আরও একটি বিশেষ গুণ হইল যে, উহা যোগ্যতর ব্যক্তির নির্বাচন সম্ভব করিয়া আইনসভার মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

কিন্তু পদ্ধতিটি অতিশয় জটিলতাপূর্ণ ও ভোটগণনা করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ ও সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তালিকা-প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন (Proportional Representation by the List System)

তালিকা-প্রথা আনুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতির একটি প্রকারভেদ বলিয়া গণ্য হয়। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির ন্যায় তালিকা-প্রথায়ও মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটসংখ্যাকে নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে উহাকে quota ('কোটা') বা নির্বাচনের উপযুক্ত ভোটসংখ্যা বলা হয়। এই প্রথায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ইহার মনোনীত নির্বাচনপ্রার্থীদের একটি তালিকা প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রদান

করে। তালিকায় প্রদত্ত প্রার্থীসংখ্যা নির্বাচন-কেন্দ্রের আসনসংখ্যার সমান হওয়া চাই। সেই কেন্দ্রে যতগুলি আসন পূরণ করিতে হইবে, ভোটদাতাগণ প্রত্যেকে সেই সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবে। কিন্তু এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হইল যে, ভোটদাতাকে প্রার্থী-হিসাবে ভোট না দিয়া তালিকা-হিসাবে ভোট দিতে হয়। ভোটদাতা যে-কোন একটি তালিকাকে তাহার সমগ্র ভোট প্রদান করিবে। প্রত্যেক তালিকার উপর প্রদত্ত মোট ভোট-সংখ্যাকে 'কোটা' দিয়া ভাগ করিলে যে ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি-সংশ্লিষ্ট তালিকা হইতে নির্বাচিত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি নির্বাচন-কেন্দ্রে চারিটি আসন পূরণ করিতে হইবে এবং এই কেন্দ্রে প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যা হইল ৪,০০০ হাজার। তাহা হইলে ৪,০০০ ÷ ৪ অর্থাৎ ১,০০০ সংখ্যা 'কোটা' বলিয়া স্থির হইবে ও প্রত্যেক নিবাচনপ্রার্থী দলের তালিকায় অন্ততঃপক্ষে 'কোটা' সংখ্যক ভোট পড়িলে সেই তালিকা হইতে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারিবে। ভোটদানের পর দেখা গেল যে, 'ক' দল মোট ভোটসংখ্যার মধ্যে দুই হাজার ভোট পাইয়াছে এবং 'খ' ও 'গ' দল যথাক্রমে এক হাজার করিয়া ভোট পাইয়াছে। প্রত্যেক দল কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটসংখ্যাকে 'কোটা' দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা দাঁড়াইবে, সেই সংখ্যক আসন তিনটি দলের মধ্যে বণ্টন করা হইবে অর্থাৎ 'ক' দল দুইটি আসন এবং 'খ' ও 'গ' দল যথাক্রমে একটি আসন লাভ করিবে।

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় ও প্রত্যেকটি দল সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি-নিবাচনে সুযোগ পায়। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির মত ইহা জটিল বা ব্যয়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া নির্বাচনপ্রার্থীর যোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

সীমাবদ্ধ ভোট (Limited Vote System)

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের আর একটি উপায় হইল সীমাবদ্ধ ভোট-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে। যদি কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে ছয়টি আসন

পূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন ভোটদাতাই চারিটির অধিক ভোট দিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কোনমতেই চারিটির অধিক আসন দখল করিতে পারে না। অবশিষ্ট দুইটি আসন সংখ্যালঘু দল পাইতে পারে।

এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু দল কিছুসংখ্যক আসন পাইলেও তাহাদের সংখ্যানুপাতে যে প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হইতে পারিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি হইতে আদৌ কোন আসন দখল নাও করিতে পারে।

স্তূপীকারী বা একত্রিত ভোট (Cumulative Vote)

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নির্বাচনের আর একটি উপায় হইল স্তূপীকারী ভোটপদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ নির্বাচন কেন্দ্রের আসনসংখ্যার সমসংখ্যক ভোটদান করিতে পারেন। কিন্তু ভোটগুলি বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ না করিয়া ভোটদাতা ইচ্ছা করিলে একজন প্রার্থী বা দুইজন প্রার্থীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে পারেন। ধরা যাউক, কোন নির্বাচনকেন্দ্রের পাঁচটি আসন পূরণ করিবার জন্য ভোটদাতার পাঁচটি ভোট আছে। এক্ষেত্রে ভোটদাতা পাঁচজন পৃথক্ প্রার্থীকে একটি করিযা ভোট দিতে পারেন, অথবা পাঁচটি ভোট একজন প্রার্থীকে দিতে পারেন, কিংবা একজনকে তিনটি ও অপর একজনকে দুইটি ভোট দিতে পারেন। এইরূপে একটি সংখ্যালঘু দল তাহাদের সমুদয় ভোট একজন প্রার্থীকে দিয়া তাহাকে নির্বাচিত করিবার সুযোগ পায়।

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দল প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার সুযোগ পায় বটে কিন্তু সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় অনেক ভোট নষ্ট হয়। একজন জনপ্রিয় প্রার্থী তাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিপুল সংখ্যক ভোট পাইতে পারেন, অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় প্রার্থী অল্পসংখ্যক ভোট পাইতে পারেন।

দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ (Second Ballot System)

নির্বাচনপ্রার্থী যাহাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বাচিত হইতে

পারেন সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে একটিমাত্র আসনের জন্য যখন দুইটির অধিক প্রার্থী প্রতিযোগিতা করেন, তখন ইহাদের মধ্যে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পান তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইলেও এই প্রার্থী নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্বাচিত নাও হইতে পারেন। ধরা যাউক, কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে বার হাজার ভোট প্রদত্ত হইয়াছে। এই বার হাজার ভোট তিনজন নির্বাচন-প্রার্থীর মধ্যে পাঁচ হাজার চার হাজার ও তিন হাজার করিয়া ভাগ হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার, ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্বাচন করিবার জন্য যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে প্রার্থীপদ হইতে অপসারিত করিয়া অধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত দুইজন প্রার্থীর পক্ষে পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়বার দুইজন প্রার্থী থাকায় একজন নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বাচিত হইতে পারেন।

এই ব্যবস্থায় নির্বাচনে বিলম্ব ঘটে ও প্রার্থীগণেরও নির্বাচনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Proportional Representation)

আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যেক দলই ইহার সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যখন দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন দল আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে, তখন আইনসভা সার্থকরূপে জনমত প্রতিফলিত করিতে সক্ষম হয়। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সন্তুষ্ট থাকে এবং সর্বদলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সরকারকে প্রকৃত জনগণ দ্বারা পরিচালিত সরকার বলা যায়। চতুর্থতঃ, হেয়ার উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতা জানে যে, তাহার একটি ভোট নিশ্চিতরূপে সার্থক হইবে। এইজন্য ভোটদাতার আত্মপ্রত্যয় জন্মে এবং তাহার রাজনৈতিক

চেতনা বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণ ব্যাপারে তাহার উৎসাহ জন্মে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা যোগ্যতার নির্বাচন সম্ভব হয়। ফলে আইনসভার মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল ও সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত নহে। এই পদ্ধতির বিশেষ ত্রুটি হইল যে, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও উপদল সৃষ্টি করিয়া আইনসভার সংহতি বিনষ্ট করে। ফলে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে আইন-প্রণয়ন কার্য বাধা পায়। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্যের অভাবে সরকার দুর্বল হয় এবং এই দুর্বলতার ফলে শাসনব্যবস্থায় নানাপ্রকার দুর্নীতি আশ্রয় পায়।

বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার উপায় (Methods of Protection of the Rights of Minorities in different Countries)

আধুনিক অনেক দেশেই বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেখা যায়। আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারগুলি যাহাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য লিখিত বা অলিখিত আইন বা অন্য নানা উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারগুলি সুরক্ষিত করা হয়।

ইংলণ্ড—ইংলণ্ডে সংখ্যালঘু সমস্যা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইংলণ্ডে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা-কল্পে তাহারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ উপেক্ষা করিতে পারে। ইংলণ্ডে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের সনদ, অধিকারের আবেদন, হেবিয়াস্ করপাস্ অ্যাক্ট প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক

আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। এতদ্ব্যতীত স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থা জনগণের অধিকাররক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান অধিকার ভোগ করে এবং এই অধিকার মানবিক অধিকার ঘোষণার (Declaration of Rights of Man) দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট ইহার সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কে এই বিচারালয় কতকগুলি বিশেষ নীতি নির্ধারণ করিয়া তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু জাতি বাস করে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষাগত, কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় অধিকারগুলি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic), স্ব-শাসিত অঞ্চল (Autonomous Region) ও জাতীয় এলাকা (National Area) সৃষ্টি করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি এই স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সাহায্যে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে পারে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহারা নিজস্ব ভাষায় ইহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, প্রত্যেকটি অঞ্চল ও প্রত্যেকটি জাতীয় এলাকা সুপ্রীম সোভিয়েতে যথাক্রমে ১১, ৫ ও ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সর্ববিষয়ে সমান অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কাজ করিবার, বিশ্রাম করিবার, শিক্ষা ও ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার সকল সম্প্রদায়ের লোক ভোগ করে।

ভারত—ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অধিকারসমূহ শাসনতন্ত্রে বর্ণিত মৌলিক অধিকার দ্বারা সংরক্ষিত করা হইয়াছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। যদি কোন কারণে এই মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে উহার প্রতিবিধান করিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা করে। ইহা ব্যতীত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার বিশেষ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (Territorial or Geographical Vs. Occupational or Functional or Vocational Representation)

প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ, আঞ্চলিক ভিত্তিতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি নির্বাচন-অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চল হইতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেকটি অঞ্চলের সমগ্র অধিবাসিবৃন্দ জাতি, বর্ণ ও বৃত্তি-নির্বিশেষে প্রতিনিধি-নির্বাচনে ভোট প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভায় একজন প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের একটি জিলা বা মহকুমার সমস্ত ভোটদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ভোটে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। উক্ত জিলায় বা মহকুমায় শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, তাঁতি, কর্মকার, রেলকর্মী প্রভৃতি নানা পেশার লোকের বাস থাকিলেও এই সকল বিভিন্ন পেশার লোক ভোটদাতা হিসাবে একত্রে ভোটদান করিয়া তাহাদের পছন্দমত যে-কোন বৃত্তির লোককে প্রতিনিধি-নির্বাচন করিতে পারে। এই ব্যবস্থামত একজন ডাক্তার তাহার নিজ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পেশার অন্যান্য লোকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। মানুষ যখন একই অঞ্চলের অধিবাসী হয় তখন তাহারা সমস্বার্থসম্পন্ন হয়। সুতরাং একজন ডাক্তার বৃত্তিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেই অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের—তাঁতি, কর্মকার, সূত্রধর, শিক্ষক, রেলকর্মী, উকিল প্রভৃতির—প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের মূল কথা হইল যে, মানুষের রাজনৈতিক মতামত তাহার আঞ্চলিক স্বার্থদ্বারা যতটা প্রভাবিত হয় অন্য কিছুর দ্বারা ততটা প্রভাবিত হয় না। সুতরাং আঞ্চলিক ভিত্তির মধ্য দিয়াই তাহাকে তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদিগণ দাবী করেন যে, আঞ্চলিক নির্বাচন-কেন্দ্রের সাহায্যে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দ্বারা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি

নির্বাচিত হইতে পারে না। একই অঞ্চলের অধিবাসী হইলে যে সকল অধিবাসীই সমস্বার্থসম্পন্ন হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একজন ডাক্তারের প্রতিবেশী হইলে একজন কর্মকার যে ডাক্তারের সমস্বার্থসম্পন্ন হইবে তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না। শ্রমিক ও মালিক, জমিদার ও প্রজা, কোন কার্যালয়ের বড়কর্তা ও চাপরাশী একই অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও তাহাদের সমস্বার্থসম্পন্ন বলা দূরে থাকুক বিরুদ্ধস্বার্থসম্পন্ন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের রাজনৈতিক মতামত তাহার জীবিকা অর্জনের বৃত্তিদ্বারা অধিক পরিমাণে স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং বৃত্তিগত নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়াই তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। একজন ডাক্তার ও একজন কর্মকারের স্বার্থের মধ্যে এত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় যে, একজন ডাক্তার একজন কর্মকারের প্রতিবেশী হইলেও কর্মকারের প্রতিনিধিত্ব করিতে সক্ষম নয়। ডাক্তার ও কর্মকারের জীবনযাত্রা প্রণালী ও চিন্তাধারার মধ্যে এত বৈষম্য আছে যে, কেহ কাহারও প্রতিনিধিত্ব করিলে অন্যের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য ডাক্তারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন একজন সমস্বার্থসম্পন্ন ডাক্তার, অপরপক্ষে একজন কর্মকারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন একজন সমস্বার্থসম্পন্ন কর্মকার। তাহা হইলে উভয়কেই প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হইবে। সুতরাং নির্বাচন-কেন্দ্রগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া বৃত্তি অনুযায়ী সংগঠিত করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থামত সমস্ত দেশটিকে কতকগুলি বৃত্তিমূলক কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বৃত্তির লোকের জন্য পৃথক নির্বাচন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। জমিদার, প্রজা, শ্রমিক, মালিক, শিক্ষক, কর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন পেশার ভোটদাতৃগণ এক অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও পেশাগত নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই ব্যবস্থার মূল কথা হইল যে, মানুষের রাজনৈতিক মতামত তাহার বৃত্তিগত স্বার্থের দ্বারা যতদূর প্রভাবিত হয় অন্য কিছুর দ্বারা ততটা হয় না। সুতরাং বৃত্তিগত নির্বাচন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই তাহার রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে।

সমালোচনা (Criticism)

যুক্তির দিক দিয়া দেখিলে বৃত্তিগত ব্যবস্থার দাবী একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আইন-পরিষদ্‌কে বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের দ্বারা সংগঠন করিলে আইনসভার কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তিত করিবার পথে অনেক অন্তরায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, কোন্ বৃত্তিগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবে ও কোন্‌গুলি নির্বাচন করিতে পারিবে না তাহা স্থির করা একটা জটিল সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্যার সমাধান হইলেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিগুলিও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিগুলির মধ্যে আসনসংখ্যা কি নীতিতে বণ্টন হইবে তাহা স্থির করা আর একটি সমস্যারূপে দেখা দিবে। তৃতীয়তঃ, বৃত্তি-মূলক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা গঠিত আইন-পরিষদে বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিগণ জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণ অপেক্ষা বৃত্তিগত স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অধিকতর যত্নবান্ হইবেন। ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিদ্বেষ ও কলহের ফলে আইনসভার সংহতি ও মর্যাদা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। আইনসভা শেষ পর্যন্ত একটা বিতর্কসভায় পর্যবসিত হইবে। চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, নির্বাচনব্যবস্থা মানুষের নাগরিকত্ববোধকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বৃত্তিবোধের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষ তাহার সমগ্র নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসনব্যবস্থা সংগঠন করে। বৃত্তিগত জীবন মানুষের সমগ্র নাগরিক জীবনের একটি অংশ মাত্র। সুতরাং বৃত্তির মধ্য দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনব্যবস্থা পরিচালিত হইলে নাগরিক জীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। যিনি প্রতিনিধিত্ব করিবেন তিনি কোন বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধি নহেন, তিনি নাগরিক জীবনের সমগ্র স্বার্থের প্রতিনিধি। পঞ্চমতঃ, প্রতিনিধি জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে তাঁহার বেতন পাইয়া থাকেন, কোন বিশেষ বৃত্তির লোকেরা তাঁহার বেতন প্রদান করে না। সুতরাং কোন বৃত্তি-বিশেষের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় ভোটদাতার দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র তাহার বৃত্তিগত স্বার্থের উপর নিবদ্ধ থাকার ফলে তাহাকে সংকীর্ণমনা করিয়া তুলে। এ জাতীয় ভোটদাতা কখনই প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক হইতে পারে না। সুতরাং

বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব কোনমতেই কাম্য নহে। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই প্রতিনিধি-নির্বাচন হওয়া উচিত। কিন্তু নির্বাচনব্যবস্থা এরূপভাবে সংগঠিত হইবে যাহাতে দেশের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন স্বার্থ আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পায়।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচন (Communal Representation through Separate Electorate)

ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদের পার্থক্য অনুসারে সংগঠিত না হইয়া সামাজিক এবং ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তির উপর সংগঠিত হইয়াছিল। এই রাজনৈতিক দলগুলির হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি নামকরণও হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনকালে নির্বাচনপ্রথার দ্বারা যখন আইনসভার আসনগুলি পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইল তখন হইতে প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল। আইন-পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন রক্ষিত ছিল এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচনের দ্বারা এই আসনগুলি পূরণ করা হইত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আসনগুলি হিন্দু ভোটদাতাগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত হিন্দু প্রতিনিধি দ্বারা পূরণ করা হইত, আর মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুসলমানগণের প্রদত্ত ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইত। হিন্দুর মুসলমান ভোটদাতার ভোটের প্রয়োজন হইত না, আবার মুসলমান প্রতিনিধির নির্বাচনের জন্য হিন্দুর ভোটপ্রার্থী হইতে হইত না। এক অঞ্চলের অধিবাসী ও সমস্বার্থসম্পন্ন হইলেও হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করিত হিন্দু, আর মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিত মুসলমান।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচনের পক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু দল একমাত্র পৃথক্ নির্বাচনের সাহায্যে প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পৃথক্ নির্বাচন-প্রথার অবর্তমানে তাহাদের একটি প্রতিনিধিও হয়ত আইনসভার সদস্য নির্বাচিত না হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থহানি হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। এই ব্যবস্থা মানুষের চিন্তাধারাকে সঙ্কুচিত করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক সাম্প্রদায়িক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠে, ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া অন্য সম্প্রদায়ের সমস্বার্থের ক্ষতি করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। সরকারী চাকুরীগুলিতে যোগ্যতার মাপকাঠির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের দাবীতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ফলে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায়। যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু বলিয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়, তাহারা কখনই নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় জীবনে একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার করিবার প্রয়াস পায় না। সাম্প্রদায়িকতার ফলে ভারত আজ দ্বিধাবিভক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য (Functions of the Electorate)

স্বৈরাচারী অথবা এক-নায়কের অধীন শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় দর্শকের পর্যায়ে পরিণত হয়। শাসকের ইচ্ছানুসারেই শাসিতের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আধুনিক যুগে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শাসিতেরাই শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া শাসনকার্যকে চালু রাখে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ভোটদানের অধিকারী। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার সদস্য নির্বাচন করে। আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যের তদারক করে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষমতা যে-কেহই পরিচালিত করুক না কেন, ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল নির্বাচকমণ্ডলী।

প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যতীত ভোটদাতৃমণ্ডলীর আর একটি কর্তব্য হইল শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা

শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি নির্বাচকমণ্ডলীর মত উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন বা শাসনকার্য পরিচালিত করে, তাহা হইলে ভোটদাতাগণ শক্তিশালী জনমত গঠন করিয়া সর্বতোভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে জনমত অনুসারে কার্যপরিচালনায় বাধ্য করিতে পারে। অল্প ব্যবধানে নির্বাচন, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ, গণভোট ও গণপ্রস্তাব অধিকারের মধ্য দিয়া নির্বাচকমণ্ডলী সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অপরপক্ষে, সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়াও নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের উপর পরোক্ষভাবে জনমতের শক্তিকে কার্যকরী করিতে পারে।

বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের সরকারই দলীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ নীতি ও কার্যক্রম আছে। এই নীতি ও কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সমর্থিত না হইলে সেই দলের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলী শাসনব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচকমণ্ডলী শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র নহে, তাহাদের কার্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শাসনকার্যে দক্ষ ও জনস্বার্থের পরিপোষক হইবে কিনা তাহা প্রধানতঃ নির্বাচকমণ্ডলীর যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য বলা যায় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য সুসংবদ্ধ ও সদাজাগ্রত জনমতের উপর নির্ভর করে।

সংক্ষিপ্তসার

নির্বাচকমণ্ডলী ও সার্বজনীন ভোটাধিকার—জনসংখ্যার যে অংশ ভোটদান করিয়া আইনসভার সদস্য নির্বাচন করিতে সক্ষম, তাহাকে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদান-ক্ষমতা থাকা গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত, বিদেশী প্রভৃতির ভোটদান-ক্ষমতা থাকে না। ভোটদান-ক্ষমতা একটা নাগরিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা নাগরিক জীবনের

একটা প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য যাহারা সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে অক্ষম, তাহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার—স্ত্রীজাতি পুরুষের উপর নির্ভরশীল, যুদ্ধে যোগদানে অক্ষম ও পারিবারিক সুখশান্তির পক্ষে অপরিহার্য—এই সমস্ত কারণে এতদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। অধুনা স্ত্রীজাতি জীবনের নানাক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া পুরুষের সমান ভোটদান-ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। স্ত্রীজাতি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অনেক নীচতা লোপ পাইবে ও রাষ্ট্রের শক্তি দ্বিগুণিত হইবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন—প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ ভোট দিয়া সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পরোক্ষ প্রথায় ভোটদাতাগণ একদল মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ও এই প্রতিনিধিগণ আসল প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতা ও প্রতিনিধি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত থাকিয়া মতামতের আদান-প্রদান করিতে পারেন। এই প্রথা ভোটদাতার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। পরোক্ষ নির্বাচনে ইহা সম্ভব নয়। ইহাতে প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক ভোটদাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়। পরোক্ষ নির্বাচনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর প্রতিনিধির নির্বাচন সম্ভব হয় ও নির্বাচনকার্যে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে না।

অবৈতনিক বনাম বেতনভুক্ প্রতিনিধিত্ব—পূর্বে প্রতিনিধিগণকে সাধারণতঃ কোনরূপ বেতন বা ভাতা দিবার রীতি ছিল না। সামান্য অর্থলোভের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অনেক অযোগ্য ব্যক্তি প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করা হইত। বর্তমানে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আইনসভার সদস্যগণকে বর্তমানে নানাবিধ কার্য করিতে হয় ও তাঁহাদের এইজন্য অনেক সময় ব্যয় করিতে হয়। তাহা ছাড়া যদি শাসন-বিভাগীয় ও বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিগণ বেতনভুক্ হন, তাহা হইলে আইনপরিষদের সদস্যগণেরও বেতন পাওয়া উচিত বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয়। এই কারণে আইনসভার সদস্যগণকে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ—প্রতিনিধিকে শুধু তাঁহার নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা হইলে ভুল করা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচন-কেন্দ্র-বিশেষ হইতে নির্বাচিত হইলেও তিনি জনমতের প্রতিনিধি, কোন অঞ্চল-বিশেষের প্রতিনিধি নহেন। সাধারণ স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তাঁহাকে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিনিধি সাধারণ তহবিল হইতে তাঁহার বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন, সুতরাং কোন অঞ্চল-বিশেষের প্রতি তাঁহার বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

একাধিক ভোটদান পদ্ধতি—নির্বাচনে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন যোগ্যতার জন্য অনেক সময় একাধিক ভোটপ্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। একই ব্যক্তিকে সম্পত্তির মালিক হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে দুই বা তিনটি ভোটের অধিকারী হইতে দেখা যায়। এই প্রথা গণতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া অনেক দেশে ইহার বিলোপ সাধন করা হইয়াছে।

প্রকাশ্য অথবা গোপন ভোট—প্রকাশ্য ভোটদান-ব্যবস্থায় সর্বসমক্ষে ভোটদাতাগণ ভোটদান করে। গোপন ভোটদান-পদ্ধতিতে ভোটদাতা সকলের অলক্ষ্যে নিজ ইচ্ছানুসারে ভোটদান করিতে পারে। প্রকাশ্য ভোটদান-ব্যবস্থার ফলে ভোটদাতার নিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকে ও সেইজন্য ভোটদাতা সব সময়ে নিজ ইচ্ছানুসারে ভোটদান করিতে পারে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের নির্বাচনসমস্যা—আইনপরিষদের সংগঠন এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু দল সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধির অভাবে গণতন্ত্র কার্যকর হইতে পারে না। এইজন্য নিম্নলিখিত নির্বাচন-প্রণালীগুলির দ্বারা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে:—

১। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন, ২। তালিকা প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন; ৩। সীমাবদ্ধ ভোট; ৪। পুঞ্জীকারী ভোট, ৫। পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা।

এই প্রণালীগুলির মধ্যে পূর্বে ভারতে প্রবর্তিত পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। এই ব্যবস্থায় জাতীয়তাবোধ নষ্ট হয় ও বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ অনিবার্য হইয়া উঠে। ফলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে।

আঞ্চলিক বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব—সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি নির্বাচনকেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রতি কেন্দ্র হইতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনব্যবস্থাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বলা হয়। এই ব্যবস্থার মূল কথা হইল যে, একই অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া বিভিন্ন বৃত্তি-অবলম্বী হইলেও সেই অঞ্চলের সমুদয় অধিবাসীই সমস্বার্থসম্পন্ন হয়। সুতরাং এই বিভিন্ন পেশার ভোটদাতাগণের একত্রে ভোট প্রদান করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিত। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের মূল কথা হইল যে, একই বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জন করিলে এক অঞ্চলের অধিবাসী না হইয়াও একই বৃত্তির লোকগণ অধিকতর সমস্বার্থসম্পন্ন হয়। সুতরাং নির্বাচনব্যাপারে সমস্বার্থ-সম্পন্ন ভোটদাতাগণকে একই নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া তাহাদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত অর্থাৎ শিক্ষকের প্রতিনিধি হইবেন শিক্ষকশ্রেণী দ্বারা নির্বাচিত শিক্ষক, আর রেলকর্মীর প্রতিনিধিত্ব করিবেন রেলকর্মী দ্বারা নির্বাচিত রেলকর্মী।

পেশাগত প্রতিনিধিত্ব যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ কাম্য নহে। আইনসভার আসনসংখ্যা বৃত্তিগতভাবে ভাগ করা দুরূহ। এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধিগণের দৃষ্টিভঙ্গী তাহাদের সংকীর্ণ বৃত্তিগত স্বার্থে আবদ্ধ থাকার ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি হয়। আইনসভায় জনমতের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়, কোন বৃত্তি-বিশেষের প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে আইনসভা গঠিত হয় না।

নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য—১। প্রতিনিধি নির্বাচন করা; ২। প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন কর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্যক্রমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; ৩। প্রত্যক্ষভাবে গণভোট, গণপ্রস্তাব-অধিকার ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দ্বারা সক্রিয়ভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the functions performed by the electorate in a modern state. How were the constituencies organised in West Bengal for the recent elections? (C. U. 1952)